আশাপূর্ণা : নারী পরিসর

সম্পাদক

তপোধীর ভট্টাচার্য

বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ

৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট

কলকাতা : ৭০০০০৯

চিরস্মরণীয়াসু
সুবর্ণপ্রভা দাস
মালতী শ্যাম
অমিয়া বিশ্বাস
সহ
পূর্বমাতৃকাদের
প্রতি
উত্তর-প্রজন্মের এই প্রণাম

সূচি

প্রাক্‌কথন ৫ সম্পাদক

নারী আন্দোলনের প্রেক্ষিতে আশাপূর্ণা দেবীর ত্রয়ী উপন্যাস ১১ অনুরূপা বিশ্বাস

স্ত্রী-শিক্ষা, উনিশ শতক, প্রথম প্রতিশ্রুতি ২০ রবিন পাল

আসন্ন, শুশ্রূষার বার্তা ত্রয়ী উপন্যাস : নারীসত্তার আখ্যান ৩২ রামী চক্রবর্তী

প্রথম প্রতিশ্রুতি, সুবর্ণলতা, বকুলকথা : নারীজীবনেয় কালান্তর ৫৮ অনসূয়া হালদার

পিতৃতন্ত্রের প্রহরী : নারী ৭৭ রূপা ভট্টাচার্য

প্রথম প্রতিশ্রুতি : সামাজিক প্রেক্ষিত ৮২ প্রসাদ রায়

প্রথম প্রতিশ্রুতি : সময়ান্তরের ব্যঞ্জনায় ৯০ অনন্যা বড়ুয়া

'পৃথিবী দেখুক, এই তীব্র সূর্যের সামনে তুমি' ১০১ রাহুল দাস

প্রথম প্রতিশ্রুতি : সময় ও সমাজের বিন্যাস ১০৫ বেলা দাস

লিঙ্গ-ভূমিকা অতিযায়ী সত্তার অন্তর্দর্শন : সত্যবতী ১২৫ দূর্বা দেব

প্রথম প্রতিশ্রুতি : প্রতিবাদী কথকতার নির্মাণশৈলী ১৩২ উদয়চাঁদ দাশ

সত্যবতী : প্রতিস্পর্ধী নারীচেতনার পরিসর ১৪৪ সর্বাণী বিশ্বাস রায় চৌধুরী

আশাপূর্ণার উপন্যাসে অন্তঃপুরের জীবন ১৫১ সুদীপ্যা চৌধুরী

কোথায় আলো? কোথায় ওরে আলো? ১৬৭ সঙ্গীতা ত্রিপাঠী মিত্র

সুবর্ণলতা · নারীসত্তার নির্মাণ-প্রকল্প ১৯৬ তপোধীর ভট্টাচার্য

সুবর্ণলতার অনর্জিত বারান্দা ২১৪ সুচরিতা চৌধুরী

অমীমাংসিত জিজ্ঞাসার গ্রন্থনা ২২৩ রূপরাজ ভট্টাচার্য

সুবর্ণলতা : নারীর আবহমানকালের ধারাভাষ্য ২৩১ বিকাশ রায়

বকুলকথা : ঔপনিবেশিক সমাজের প্রেক্ষিত ২৩৮ প্রিয়কান্ত নাথ

বকুলকথা : আধুনিকতার সমালোচনা-প্রকল্প ২৪৩ বিশ্বজিৎ চৌধুরী

পিতৃতন্ত্রের প্রতি উচ্চারিত জিজ্ঞাসা : আশাপূর্ণা দেবীর দুটি গল্প ২৬৭ নন্দিতা বসু

প্রাক্‌কথন

শতবর্ষ এগিয়ে আসে শতবর্ষ যায় : বিশেষ একটি অনুষঙ্গে এই পঙ্‌ক্তি দুটি লিখেছিলেন কবি জয় গোস্বামী। একথা অবশ্য না-মেনে উপায় নেই যে শতবর্ষের মাপকাঠি আমাদের সাংস্কৃতিক অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। কবি-লিখিয়ে সহ সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের খ্যাতনামা ব্যক্তিদের শতবার্ষিকী পর্যালোচনা করতে আমরা পছন্দ করি। এতে পূজনীয়কে পূজার স্থলে ভুলে থাকছি কীনা তা অবশ্য স্বতন্ত্র কথা। কেননা আমাদের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতায় দেখেছি, শতবর্ষ উদ্‌যাপনের আগে এবং পরে আলোকিত জনেরা রয়ে যাচ্ছেন অভিনিবেশের বাইরে। আশাপূর্ণা দেবীর শতবর্ষ কতখানি গুরুত্ব দিয়ে উদ্‌যাপিত হবে, তা এখনই বলা যাচ্ছে না। প্রথম প্রতিশ্রুতি ও সুবর্ণলতা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যগ্রন্থের তালিকায় এসে গেছে বলে নিঃসন্দেহে এই দুটি বই আলাদাভাবে বা ত্রয়ী উপন্যাসের অংশ হিসেবে তুলনামূলকভাবে বেশি পর্যবেক্ষণের বিষয় হবে, তা নিশ্চিত।

সাময়িক উৎসাহ বৃদ্ধির প্রভাব পাঠক হিসেবে আমরা এড়িয়ে যেতে পারব না। তবু এরই মধ্যে সংবেদনশীল পাঠকেরা নিশ্চয় নতুন নতুন পাঠ-ভাবনার নিরিখে আশাপূর্ণার লিখন বিশ্বে দৃষ্টিপাত করবেন। পুনর্বিশ্লেষিত হবে স্বল্প আলোচিত দিকগুলি কিংবা বহু-আলোচিত ক্ষেত্রগুলিও যাচাই করা হবে সাম্প্রতিক পাঠ-চিন্তার নিরিখে। ত্রয়ী উপন্যাসের রচয়িতাকে কোনও পাঠকই এড়িয়ে যেতে পারেন না, তা লেখাই বাহুল্য। সেই সঙ্গে তাঁর মধ্যবিত্ত বর্গ নির্ভর অন্যান্য উপন্যাসে ও ছোটগল্পে কত নিরবচ্ছিন্নভাবে চেনা জগতের অচেনা আদল খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা রয়েছে, তাও পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে আলোচিত হবে। হোক। এটাই স্বাভাবিক। যে সব পাঠক ফিরে ফিরে পড়েছেন তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্পগুলি, তাঁরা বরং নিজেদের আগেকার পাঠ-অভিজ্ঞতাকে পুনঃপরীক্ষার মধ্য দিয়ে সম্প্রসারিত করুন। নারীর আপন কথা সত্যিই তার নিজস্ব কথা কী না অথবা তাতে রয়েছে পিতৃতন্ত্রের দ্বারা গভীর ও ব্যাপক ভাবে উপনিবেশীকৃত পরাধীন মনের অনিবার্য বিস্ফুরণ—তা অণুবীক্ষণী দ্রষ্টা চক্ষু দিয়ে উন্মোচিত হোক।

আশাপূর্ণার কাছে পাঠক হিসেবে আমাদের অনেক কিছুই চাওয়ার থাকতে পারে। কিন্তু সেই চাওয়া দিয়ে যদি তাঁর যথাপ্রাপ্ত অবস্থানকে আচ্ছন্ন করে ফেলি, তা হবে মারাত্মক ভুল। 'শশীবাবুর সংসার', 'বালুচরী', 'অগ্নিপরীক্ষা' প্রভৃতি উপন্যাস যে নিটোল গল্পের সামর্থ্যে সফল ছায়াছবিতে রূপান্তরিত হয়েছিল, সেই বৈশিষ্ট্যকে কি আখ্যান-তাত্ত্বিক নন্দনের নিরিখে খারিজ করে দেব? দিতেই পারি, কিন্তু তা করার আগে শিল্প-সম্ভব আখ্যানের কাছে আমাদের দাবি ঠিক কী কী, তা বুঝে নেওয়াটা জরুরি। আমাদের সাহিত্যে সূচনালগ্ন থেকেই কাহিনির বয়ন ও আখ্যানের সম্ভাবনা নিয়ে যথেষ্ট নিরীক্ষা হয়েছে। কিন্তু ভিন্ন গোত্রীয় পাঠকেরাও শেষ পর্যন্ত কোনও না কোনও ভাবে

গল্পই খুঁজেছেন। গল্প মাঝে মাঝে সোনার হরিণ হয়ে পড়ে কিংবা নিপুণভাবে পরিকল্পিত প্রতারক ফাঁদ হিসেবে প্রমাণিতও হয়—তবু মোটামুটি দেড়শত বছর ধরে অব্যাহত রয়েছে কাহিনির-ই প্রতাপ। সুতরাং আশাপূর্ণা যদি কাহিনির মায়ায় পাঠক ও দর্শকদের মুগ্ধ করে থাকেন, একুশ শতকের পুনঃপাঠে তাঁকে তির্যক চোখে দেখব কেন?

দুই

অথচ এটা কেউ-ই অস্বীকার করতে পারি না যে আমাদের পাঠাভ্যাসে ও ভয়াবহভাবে একদেশদর্শী লৈঙ্গিক রাজনীতির শিকার। আমাদের সাহিত্যের ইতিহাস সহ সাম্প্রতিক সাহিত্যের পাঠযোগ্য গ্রন্থের শিথিল তালিকা প্রণয়নে ও নিজেদের অজ্ঞাতসারেই আমরা শুধু পুরুষ লেখকদেরই খুঁজতে থাকি। যে সব মহিলারা লেখেন, আমাদের বিবেচনায় তাঁরা চিরকালই থেকে যান স্বতঃসিদ্ধভাবে জল-অচল অন্তত পিছিয়ে-থাকা 'also ran' দের দলে। এই সেদিন পর্যন্ত আশাপূর্ণাকে বৃহত্তর পাঠক সমাজ তাঁর প্রাপ্য মর্যাদা দেয়নি। এবং ঠিক এখানেই তাঁর ঔপন্যাসিক পরিচয় জোরালো প্রতিবাদ হয়ে আমাদের কাছে দেখা দেয়। তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে ও ছোটগল্পে তিনি কী লিখেছেন, এর চেয়ে ঢের বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল, তিনি কেন লিখেছেন! এই জন্যে আমাদেব লক্ষ করতে হয় 'আর এক আশাপূর্ণা' বইটি। শুধু তো তাঁরা সৃষ্ট চরিত্রেরা নয়, তিনি নিজেও কীভাবে একটু একটু করে নারী হয়ে উঠেছেন তারও সংকেত ছড়িয়ে রয়েছে ঐ বয়ানে।

পুরুষের সাংস্কৃতিক ও মনস্তাত্ত্বিক নির্মাণই তো নয় নারী, মেয়েরাও তো মেয়েদের অহরহ একমাত্রিকভাবে গড়ে তুলেছে। যুগযুগ ধরে অব্যাহত রয়েছে এই প্রক্রিয়া। আশাপূর্ণা যখন লিখছিলেন, বাংলা সাহিত্যে অপ্রতিহত প্রতাপ নিয়ে উপস্থিত ছিলেন শরৎচন্দ্র। 'নারীর মূল্য' নামক প্রতিবেদনের রচয়িতা নারী-দরদী লেখক হিসেবে মান্যতা পেয়ে গিয়েছিলেন। তখন মেয়েদের আপন কথা আপন ভাষায় ও ভঙ্গিতে প্রকাশ করা খুব সহজ ছিল না। তবুও সেই প্রত্যাহ্বান নিজের মতো করে নিয়ে আশাপূর্ণা যথেষ্ট সাহসের পরিচয় দিয়েছেন। এটা ঠিক যে ত্রয়ী উপন্যাস প্রকাশিত হওয়ার পরবর্তী কালপর্বে আধুনিকতা ও ছদ্ম-আধুনিকতার জটিল দ্বন্দ্ব আরও প্রসারিত হয়েছে, ব্যক্তিসত্তা আরও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে এবং ভোগবাদ ও পণ্যায়নের কুহকে আচ্ছন্ন সাম্প্রতিক নৈতিকতা—মূল্যবোধ—সংবেদনা সম্পর্কে আরও অসাড় হয়ে পড়েছে। মেয়েরা অভাবনীয়ভাবে প্রাগ্রসর হয়েছে যেমন, তেমনি তাদের ভালোমন্দ বোধও আমূল রূপান্তরিত হয়ে গেছে। আশাপূর্ণা এই প্রক্রিয়ার সূত্রপাত শুধু দেখে গিয়েছিলেন; আলো ও অন্ধকারের সংজ্ঞা ও তাৎপর্য কালান্তরের মেয়েরা যে সম্পূর্ণ বিনির্মাণ করতে দ্বিধাবোধ করছে না, তার আভাস মাত্র পেয়েছিলেন তিনি।

মল্লিকা সেনগুপ্ত চেয়েছেন, পুরুষ সর্বস্ব এই পৃথিবী উভলিঙ্গ হোক যাতে মেয়েরা

ব্যক্তি-মানুষ হিসেবে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। ইতিহাস কেবলমাত্র 'his story না-হয়ে 'her story' ও হোক। আশাপূর্ণারও বক্তব্য ছিল এই উচ্চারণের কাছাকাছি, তবে আখ্যানের নিজস্ব দাবি মেটাতে গিয়ে যতটুকু জোর দেওয়ার দরকার ছিল, ততটা তিনি দিতে পারেননি। কিন্তু এটা তাঁর অপূর্ণতা নয়, বরং বিবর্তনশীল ইতিহাসের প্রতি তাঁর গভীর দায়বোধেরই প্রমাণ। নইলে তিনি চাইলেই ইচ্ছা-পূরণের মনোরঞ্জক কাহিনি লিখতে পারতেন।

তিন

পারিবারিক কাঠামোর ঘেরাটোপ কিংবা সমাজ সংস্থার যথাপ্রাপ্ত নির্দেশনামাকে সাধারণভাবে মেনে নেয় মেয়েরা : এই মৌলিক সত্যটি বারবার নানাভাবে প্রকাশ করে গেছেন আশাপূর্ণা। কিন্তু এই মেনে নেওয়া ও মানিয়ে নেওয়ার বৃত্তে স্বেচ্ছাবন্দী হয়েও মেয়েরা কীভাবে নিজস্ব পরিসর খুঁজে নেওয়ার জটিল ও আত্মক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত হয়, এই সূক্ষ্ম বিষয়টি পুরুষের জগৎ ঠিক মতো বুঝে উঠতে পারে না। তাই এই কিছুতেই শুরু হয় আশাপূর্ণার উপন্যাস—বিশ্বের দুরূহ উন্মোচন প্রক্রিয়া। নিতান্ত আটপৌরে আপাত-সহজ বাক্‌ভঙ্গি, বর্ণনা ও পরিস্থিতি নির্মাণের সূত্রে আভাসিত হয় এই বার্তা যে, লেখিকা নিতান্ত অনাড়ম্বরভাবে নিজস্ব নান্দনিক রণকৌশল উপস্থাপিত করেছেন। নারী অখণ্ড অবিভাজ্য মানববিশ্বের শরিক হতে চাইছে অথচ তার চোখেই শুধু ধাঁধা এবং তার পথেই শুধু বাধা—গল্পস্থলে এই সত্যের প্রস্তাবনা করে আশাপূর্ণা আসলে শান্ত প্রতিবাদের অন্তহীন প্রতিবেদনই তৈরি করে গেছেন।

তাঁর আখ্যান বিশ্বে মেয়েরা যে অনেক বেশি ব্যক্তিত্বময়ী এবং সেই তুলনায় ছেলেরা নিষ্প্রভ, একমাত্রিক, ব্যক্তিত্বহীন ও অনাকর্ষণীয়—একে কি এক ধরনের নান্দনিক ক্ষতিপূরণ বলব অথবা সাহিত্যিক প্রতিশোধ? সত্যবতী-সুবর্ণলতা-শম্পাদের আমরা কেউ ভুলতে পারি না; এমন কি মনে রাখি সৌদামিনী-সুহাস-পারুলদেরও : এর গভীর তাৎপর্য আছে নিশ্চয়। কিন্তু এদের তীব্র ও তীক্ষ্ণ দীপ্তির জন্যে উপযুক্ত প্রেক্ষাপট কি রচনা করেনি রামকালী-নবকুমার-প্রবোধ এর মতো পুরুষেরা? যে সব প্রশ্ন আমাদের মধ্যে জাগিয়ে দিয়েছেন আশাপূর্ণা, সে সব কি পূর্ব নির্ধারিত নয়? হোক। তবু বদ্ধ জলাশয়ের নিস্তরঙ্গ পরিসরে প্রশ্নের আবর্ত তৈরি করাও ইতিহাস-সম্মত এবং সেইজন্যে অনিবার্য। প্রশ্ন থাকলেই প্রতিপ্রশ্ন হওয়া সম্ভব। সংশয় ও অনিশ্চয়তা ছিল আশাপূর্ণারও। পাঠকৃতির মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে তার ইশারা। কিন্তু কথার মতো কথা এই যে, আশাপূর্ণা নিশ্চিত ছিলেন তাঁর উপন্যাসগুলির সামাজিক উপযোগিতা ও পরাপাঠ সম্পর্কে। কথাটি ত্রয়ী উপন্যাস সম্পর্কে অবশ্যই সবচেয়ে বেশি প্রাসঙ্গিক; তবে অন্য সব রচনা সম্পর্কেও তা কম বেশি প্রযোজ্য।

আশাপূর্ণার উপন্যাস-বিশ্বে আমাদের পরিক্রমার চার দশক অতিক্রান্ত। তাঁর

প্রতিবেদনগুলির প্রস্তাবক হিসেবে তিনি যেখানে ছিলেন, আমাদের বিবেচনায় ঠিক সেখানেই রয়ে গেছেন কি? একুশ শতকের প্রারম্ভিক সম্পর্কও যখন শেষ হতে চলেছে, বিবেচনা—পুনর্বিবেচনার নানাবিধ পালা বদল ঘটে যাওয়াতে ঐ সব প্রতিবেদনের তাৎপর্য সম্পর্কে নতুনভাবে চিন্তা না-করে উপায় নেই। গ্রহীতা পাঠক হিসেবে আমরাও কি আর একই বিন্দুতে স্থির থেকেছি! অন্তহীন দ্বন্দ্ব-যন্ত্রণা-স্ববিরোধিতা- কূটাভাস জর্জরিত চারপাশের পৃথিবী গত চার দশকে মুহুর্মুহু বদলে গেছে। জীবনকে দেখার ধরন ভেঙেচুরে তছনছ হয়ে গেছে আমাদের। জগৎ-মানুষ-সম্পর্ক-অপ্রাপ্তি সহ যাবতীয় বিষয় আমাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত অস্তিত্বে এতবার রূপান্তরিত হয়েছে যে সাহিত্য পাঠের প্রকরণ কিছুতেই কোনও অচল অনড় আদর্শের অনুসারী হতে পারছে না। এই সব কিছুর সামূহিক অভিঘাতে নারী-নারীচেতনা-নারী বিশ্ব আমাদের চোখের সামনেই অজানা ও অচেনা হয়ে গেছে।

তাহলে আশাপূর্ণার সত্যবতী-সুবর্ণলতা-পারুল-মন্দিরাদের নিরন্তর সংঘর্ষ, ব্যক্ত ও অব্যক্ত হাহাকার, ব্যর্থতা ও শূন্যতার দহন, নিশ্চিদ্র অন্ধকারের পরে একটুখানি আলোর ইশারা ইত্যাদি আমাদের মতো পরিবর্তিত পৃথিবীর পাঠকদের কাছে কী বার্তা নিয়ে আসবে? অন্ধবেগে ধাবমান এই প্রজন্ম ফেলে-আসা অতীতের দিনগুলি নিয়ে কোনও রোমান্টিক আবেশ অনুভব করে কি আদৌ? অশ্মীভূত অতীত সম্পর্কে মনোযোগী হওয়ার অবকাশ পাওয়া তো দূরে থাক, উত্তেজক বর্তমান ও আকাঙ্ক্ষা-ভরা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মুগ্ধ প্রজন্ম এমনকি সদ্য অতীত সময়ের দিকেও নিষ্ঠুর তাচ্ছিল্য নিয়েই তাকায়। বিবাহ-বন্ধনের তাৎপর্য নিয়ে যে আকুল জিজ্ঞাসা জেগেছিল সত্যবতী ও সুবর্ণলতার মনে, তা প্রগল্ভ সাম্প্রতিকের কাছে নিষ্প্রয়োজন। তাহলে আশাপূর্ণার ত্রয়ী উপন্যাস সহ অন্যান্য মধ্যবিত্ত বর্গ নির্ভর প্রতিবেদনগুলি যাদুঘরের প্রত্ন সামগ্রী হয়ে গেছে ইতিমধ্যে?

চার

এসব নিরুচ্চার ও সোচ্চার জিজ্ঞাসা নিয়েই শতবার্ষিকী পুনঃপাঠের আয়োজন করতে হয়। লৈঙ্গিক পীড়নের সাংস্কৃতিক রাজনীতি সম্পর্কে আন্তর্জাতিক মনন বিশ্বে ইদানীং যত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বয়ান রচিত হয়েছে, এদের নিরিখে আশাপূর্ণার রচনাকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা যেতেই পারে। কিন্তু এর চেয়েও বেশি জরুরি হলো, তাঁর যথাপ্রাপ্ত বাস্তব ও মনোজগতের আদল তৈরি করে নিয়ে এটা বিচার করা যে, লেখিকা তাঁর ঘেরাটোপ ও সীমাবদ্ধতাকে কীভাবে কতখানি পেরিয়ে যেতে পেরেছিলেন! নারী-পরিচয়ের সাংস্কৃতিক নির্মাণ-কৌশল সম্পর্কে তাঁর রচনাগুলি কার্যত বিশ্বকোষের ভূমিকা নিয়েছে কী না, তাও আমরা বিশেষভাবে ভেবে দেখতে পারি। আশাপূর্ণা নারী-বিশ্ব বা নারী-প্রতিবেদন প্রস্তাবনার ক্ষেত্রে কতখানি সাফল্য অর্জন করেছেন, তা নিশ্চয়

ভাবনার বিষয় হতে পারে। কিন্তু বর্গ-নারীর সামূহিক উপস্থাপনার প্রতি বিশ্বস্ত থেকেও কীভাবে ব্যক্তি-নারীর স্বতন্ত্র অবয়ব তৈরি করে নেওয়া সম্ভব, আশাপূর্ণা তা খুব নিপুণভাবে দেখিয়ে গেছেন।

আর-একটু আগে যেমন লিখেছি, গল্প বলা ও গল্প শোনার চিরাচরিত আকর্ষণকে মান্যতা দিয়েও ভাঙনকালের প্রতি কত বেশি বিশ্বস্ত থাকা যায়, তা তুলে ধরতেই আশাপূর্ণার সমধিক কৃতিত্ব। আজ যখন প্রতিমুহূর্তে বর্তমান আমাদের পায়ের তলা থেকে পিছলে সরে যাচ্ছে এবং ভবিষ্যৎ প্রতিভাত হচ্ছে আশঙ্কা ও অনিশ্চয়তাপূর্ণ কুহকী পরিসর হিসেবে হারিয়ে-যাওয়া ধূসর অতীতের কিছুটা মায়াবী কিছুটা বিষণ্ণ কথকতা না হয় খুঁজেই নিলাম আশাপূর্ণার জগৎ থেকে! ত্রয়ী উপন্যাসের পাঠ-অভিজ্ঞতাকে অভিনিবেশের কেন্দ্র বিন্দুতে রেখেও বরং যাচাই করে নিতে পারি সমান্তরালভাবে উপস্থিত অন্যান্য অনালোকিত বয়ানগুলিকেও কেননা বাঙালির পারিবারিক জীবনের বহু ছোট ছোট নিশ্চিন্দিপুরের দোসর সেখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। আশাপূর্ণা যেন অর্ধস্ফুট কাল ও পরিসরের অসমাপ্ত বয়ানেরই কথকতা করে গেছেন অন্তরীকৃত ঔপনিবেশিক ইতিহাসের নথিরক্ষার অবচেতন তাগিদে। তাঁর যাবতীয় সাফল্য ও অপূর্ণতার হদিশ রয়েছে সেখানেই।

নৈঃশব্দ্যের ঝরোখা যেমন ছিল, তেমনই রয়ে গেছে—এই সিদ্ধান্ত যদি নিই, তাহলেও এর কারণ খুঁজতে হয় আশাপূর্ণার পাঠকৃতিগুলির ছায়াঞ্চলে, অনুচ্চারিত ও অনুদ্‌ভাসিত পরিসরগুলিকে। চিরাভ্যস্ত গার্হস্থ্যের কৃষ্ণ মহাদেশে মেয়ে হয়ে, বউ হয়ে, মা হয়ে যারা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে স্বতন্ত্র ব্যক্তি হয়ে ওঠার আনন্দ-যন্ত্রণা-প্রত্যাহ্বান তেমনভাবে অনুভব করতে পারল না—খানিকটা কল্পনা খানিকটা আকাঙ্ক্ষা খানিকটা ইচ্ছা-পূরণ দিয়ে মূলত তাদেরই পুনর্গঠন করে গেছেন আশাপূর্ণা। কিন্তু ছোট সময়ের ছোট গণ্ডি তাঁর দৃষ্টি ও বিবেচনাকে কি বিরুদ্ধ করে দিয়েছিল? বড় সময়ের বড় গণ্ডি যে-প্রেক্ষাপট রচনা করে, তাতে সমকালীন রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক ভাঙা-গড়া অনিবার্য ভূমিকা নিয়ে থাকে। সংবেদনশীল আখ্যানকারেরা তার সূক্ষ্ম তরঙ্গাভিঘাত অনুভব করেন এবং পাঠকৃতির কোষেকোষে তা ইশারায় সঞ্চারিতও করেন। কিন্তু আশাপূর্ণার উপন্যাস-বিশ্বে এর অনুপস্থিতি খুব প্রকট। কখনও কখনও রাজনৈতিক অন্তঃস্বরের অনুপস্থিত উপস্থিতি যদি অনুভব করতাম, বহুবিধ আধিপত্যবাদের প্রতাপ—বিচ্ছুরণ সম্পর্কে আশাপূর্ণার উপলব্ধি স্পষ্টতর হত। তবু লিখব, অসমাপ্ত আধুনিকতার খণ্ডিত আবহে কেমন করে ধীর লয়ে বিনির্মিত হচ্ছিল বাঙালির অন্তঃপুর, তা বোঝার জন্যেই আশাপূর্ণার উপন্যাস-বিশ্বের পুনঃপাঠ প্রয়োজন।

পাঁচ

আশাপূর্ণার নারী পরিসর সম্পর্কে গত দুই দশকে জিজ্ঞাসু পাঠক ও গবেষকদের

মধ্যে যে-কৌতূহল জাগ্রত রয়েছে, তা মূলত ত্রয়ী উপন্যাসকে ঘিরেই। তাই একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা মাফিক এই গ্রন্থ প্রকাশের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এতে মূলত লিখেছেন তরুণ প্রজন্মের গবেষক-গবেষিকারা যদিও কয়েকজন সুপ্রতিষ্ঠিত প্রাবন্ধিকও এই উদ্যমে অংশ নিয়েছেন। আবার বারবার অনুরোধ জানানো সত্ত্বেও অনেকে লেখার অবকাশ পাননি। তবু, এই বইটি সম্পাদনা করতে গিয়ে অনুভব করেছি যে আশাপূর্ণার প্রতি তরুণ প্রজন্মের আগ্রহ বজায় রয়েছে এখনও।

বিভিন্ন স্তরে প্রুফ দেখে সাহায্য করেছেন বিশিষ্ট কবি ও প্রাবন্ধিক শ্রী বিশ্বজিৎ চৌধুরী, এবং আমার দুই ছাত্রী, শ্রীমতী দূর্বা দেব ও শ্রীমতী রামী চক্রবর্তী। স্নেহাস্পদ শ্রী দেবাশিস ভট্টাচার্য বইটি প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছে, তাকে ধন্যবাদ। কিছু লেখা সংগ্রহ করে দিয়েছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক অনুজ প্রতিম উদয়চাঁদ দাস। এভাবেই সমবায়ী চেষ্টার ফসল হিসেবে নিবেদিত হচ্ছে আমাদের এই শতবার্ষিকী পর্যালোচনা। প্রত্যেক লেখকই নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন। সম্পাদক হিসেবে আমি প্রত্যেকের স্বাতন্ত্র্যকে মর্যাদা দিয়েছি। সবাইকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। এভাবে আশাপূর্ণা-মনন আরও অনেক নতুন আরম্ভের সূত্রপাত করুক।

তপোধীর ভট্টাচার্য

নারী আন্দোলনের প্রেক্ষিতে আশাপূর্ণা দেবীর ত্রয়ী উপন্যাস

অনুরূপা বিশ্বাস

আমাদের দেশের নারী আন্দোলনের প্রেক্ষিতটি তুলে ধরতে চাইলে পাড়ি দিতে হবে অনেকটা পথ—তা প্রায় দুটি শতাব্দীতে বিধৃত। শুরু করা যেতে পারে রামমোহন রায়ের সতীদাহ প্রথা নিবারণের উদ্যোগ থেকে। মৃত স্বামীর সঙ্গে সহমরণে আগুনে পুড়ে মরার হাত থেকে মেয়েদের প্রাণরক্ষার আন্দোলন তো নারী আন্দোলনই, হোক না তা পুরুষের হাতে গড়া। রাজা রামমোহন রায়ের সতীদাহ প্রথা নিবারণ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ—এসব অন্ধ সংস্কার ও কুপ্রথার মূলোচ্ছেদ করা এবং বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের ব্রত : সবই ছিল সমাজসংস্কারমূলক। বাঙালির সমাজজীবনে নারী আন্দোলন সামাজিক আন্দোলন রূপেই এসেছিল এবং তা-ই ছিল স্বাভাবিক এবং মানবিক নীতি-প্রণোদিত। আর মানুষের অধিকারে বঞ্চিত ব্যাপক নারীসমাজের কাছে জীবনদাতা রূপে অবতীর্ণ দুই যুগপুরুষ—রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এখনও আমাদের চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন উজ্জ্বল বাতিঘরের মতো।

উনিশ শতকের প্রথম ভাগে নারীমুক্তির অভিপ্রায়-সূচক যেসব কর্মকাণ্ড উপস্থিত হয়েছিল, সেইসব ছোট বড় ঘটনার দিকে একবার চোখ ফেরানো যাক। দেখছি, ১৮১৮ তে রামমোহন রায়ের সতীদাহ প্রথাকে প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দেবার অভিনব প্রয়াস—'সহমরণবিষয়ক প্রবর্তক ও নিবর্তকের সংবাদ' পুস্তিকা প্রকাশে। অবশ্যই এই ঘটনা স্থবির সমাজ-মানসের বদ্ধ জলায় ঢিল ছোঁড়ার মতন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ১৮১৯-এ কলকাতায় গৌরীবাড়িতে বাঙালি মেয়েদের জন্য স্থাপিত হল প্রথম বালিকা বিদ্যালয় ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটির উদ্যোগে। একই বছরে রামমোহন রায় প্রকাশ করলেন—'প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সংবাদ।' সতীদাহ নামক ভয়ংকর প্রথার মূলোচ্ছেদে রামমোহন রায় ছিলেন আপসহীন। রীতিমতো যুদ্ধ চালিয়ে সনাতন ধর্মের দোহাইকে শাস্ত্রের যুক্তিতে পরাস্ত করতে পারলেন বলেই না ১৮২৯-এ দস্তুরমতো আইন পাশ করে সতীদাহ নিষিদ্ধ হয়ে গেল। নারীমুক্তি আন্দোলনের গতিপথে ১৮২৯-এর ৪ ডিসেম্বর দিনটি সত্যিই একটি স্মারক ফলক।

দুই দশকের ব্যবধানে ১৮৪৯-এ বাংলায় প্রাতিষ্ঠানিক নারীশিক্ষার সূচনা হল। মে মাসে বেথুন সাহেব কলকাতায় ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল যা পরে বেথুন স্কুল নামে প্রসিদ্ধি পায়, সেই স্কুলটির প্রতিষ্ঠা করলেন। একটি যুগান্তকারী অধ্যায় সূচিত হল বাংলার সমাজ-অচলায়তনে। তবে এই যুগান্তর কলকাতার চৌহদ্দির বাইরে ঠিক কতটা ছড়িয়ে পড়েছিল, তা নিয়ে সংশয় আছে। বস্তুত নিশ্ছিদ্র এক অন্ধকারের বন্দিশালার আজীবন আবাসিক রূপে যে মেয়েদের জীবন সত্যিই শুকিয়ে মরুভূমি হয়েছিল, সেই বন্ধ্যাভূমিতে করুণাধারা হয়ে এসেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তাই তো সমকালের কত মানুষ, বিশেষ করে মেয়েরা তাঁকে 'অবলাবান্ধব', 'বঙ্গীয় স্ত্রী জাতির পিতৃস্থানীয়', Female friend, liberator of the females এমনই কত নামে ডেকেছে। যথার্থ ছিল এইসব অভিধা। তিনি ছিলেন

বাংলার নারী আন্দোলনের জনক। তাই তিনি স্বাভাবিকভাবেই নারী আন্দোলনের পিতৃত্বের অধিকারী। এই পিতৃত্ব অবশ্য পিতৃতন্ত্রের পোষকতা নয়, আসলে পিতৃতন্ত্রের নিগড় ভেঙে মেয়েদের মুক্তিদাতা রূপেই তাঁর এই পিতৃত্বের অঙ্গীকার গ্রহণ। ব্যাপারটা মোটেই সহজ বা সরল ছিল না। সামাজিক পরিবর্তন এক জটিল প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়াকে বেগবান করেছিল প্রচলিত সমাজবিধির বিপরীতে দৃঢ় অবস্থানের সৎসাহস। যে-সাহস এবং বঞ্চিত নারীদের দুঃখে কাতর হৃদয় নিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বাল্যবিবাহ, কৌলীন্য প্রথায় বহুবিবাহের অনুষ্ঠান ইত্যাদির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে বিধবাবিবাহ প্রবর্তন পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছিলেন, পাশাপাশি স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের কাজে আত্মনিয়োগ করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন, সেই সময়টা ছিল চূড়ান্ত প্রতিকূল। তাই তো তাঁকে দেখি বেথুন স্কুল খোলার পর দীর্ঘকাল এই স্কুলের সম্পাদকের জটিল কর্মভার সম্পাদনে—একই সঙ্গে পল্লিগ্রামের মেয়েরা যাতে শিক্ষার সুযোগ পায়, সেই ব্যবস্থাপনায় ছোটলাট হ্যালিডের সমর্থন নিয়ে ১৮৫৭-৫৮-র মধ্যে বর্তমান পশ্চিমবাংলার বেশ কিছু গ্রামে ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনায়।

১৮৫০-এ 'বাল্যবিবাহের দোষ' নামে ঈশ্বরচন্দ্রের লেখা প্রবন্ধ 'সর্বশুভকরী' পত্রিকায় প্রকাশিত হলে পর তুমুল বিতর্ক দেখা দেয়। অবশ্য এর কিছু কাল আগে থেকেই উনিশ শতকীয় নবজাগরণের চিন্তা-চেতনায় উদ্বুদ্ধ ইয়ং বেঙ্গল, অনুরূপ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে কূপমণ্ডুক সমাজদেহের পরিবর্তনের ইচ্ছা লক্ষ করা যাচ্ছিল। ১৮৫৪-তে 'বিধবাবিবাহ হওয়া উচিত কিনা' নামে ২২ পৃষ্ঠার একখানি পুস্তিকা ঈশ্বরচন্দ্র প্রকাশ করলেন। খুবই আশ্চর্যের কথা, এক সপ্তাহের মধ্যে প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হয়েছিল আর এতে বোঝা যাচ্ছিল স্থবির সমাজের দেহে প্রাণসঞ্চারের লক্ষণ ফুটে উঠছে। প্রচারের হাওয়া উঠে গেল বলে ১৮৫৫-তে এই বিষয়ে দ্বিতীয় পুস্তিকা প্রণয়ন করলেন ঈশ্বরচন্দ্র। এভাবেই তিনি যেন যোদ্ধ বেশে লড়াইয়ের ময়দানে নেমে গেলেন। এই দুইখানি প্রচার-পত্রের ইংরেজি এবং মারাঠি অনুবাদ এক বছরের মধ্যেই প্রকাশিত হবার তথ্যটি থেকে আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, ঈশ্বরচন্দ্রের এই প্রণোদনা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ছিল। ফলে ১৮৫৬ সালের ২৬ জুলাই বিধবাবিবাহ আইনসম্মত হল। কারণ ব্যাপক জনসমর্থন। একই বছরে বঙ্গমহিলা রচিত সর্বপ্রথম বই কৃষ্ণকামিনী দাসীর 'চিত্তবিলাসিনী' প্রকাশিত হবার ঘটনাও বিশেষ তাৎপর্যবহ। আর-একটি আইন ও বিধিবদ্ধ হল—যা দ্বারা পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী রূপে কন্যাসন্তানের আইনি স্বীকৃতি লাভে নারীর মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি মিলল। ক্রমশ সমাজদেহে পরিবর্তন-চিহ্ন নারীর অগ্রগতি সূচিত করল। ১৮৬৩-তে 'বামাবোধিনী' পত্রিকার প্রকাশ। এই পত্রিকায় মেয়েদের লেখা বেশি গুরুত্ব পেত। যাতে মেয়েরা স্বাধীনভাবে চিন্তা প্রকাশ করতে পারে সেই উদ্দেশ্য ছিল পত্রিকাটির। তাই দেখা যায় 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় 'বাল্যবিবাহের দোষ দেখিয়ে কলম ধরেছিলেন কৈলাসবাসিনী দেবী। ততদিনে উনিশ শতক সমাজ-পরিবর্তনের দিশা নিয়ে নানাবিধ কর্মকাণ্ডের সঙ্গে নারীজীবনের উন্নয়নের সমস্যাটিকে সামিল করে দ্রুত বাস্তবায়নের দিকে এগিয়ে চলেছে। স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার এগিয়েছে। ১৮৮৩ সালে বেথুন কলেজ থেকে দুই বাঙালিনি প্রথম স্নাতক হলেন—কাদম্বিনী গাঙ্গুলি ও চন্দ্রমুখী বসু। তারপর আরও

উচ্চশিক্ষার ধাপ পেরিয়ে তাঁরা দুজনই সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। তাঁরাই বাঙালি মেয়েদের স্বাধীন স্বতন্ত্র নারীসত্তার জীবন্ত প্রতীক হয়েছিলেন অনগ্রসর পশ্চাদ্‌বর্তিনীদের কাছে। ১৮৮৬-তে স্বর্ণকুমারী দেবীর 'সখীসমিতি' স্থাপিত হল। এটিই বাংলায় প্রথম মেয়েদের দ্বারা পরিচালিত প্রতিষ্ঠান। ১৮৮০ সালে পূর্ববঙ্গের এক অখ্যাত গ্রামে জন্ম নিলেন নারী আন্দোলনের অগ্নিপ্রতিমা বেগম রোকেয়া। শিক্ষাদীক্ষায় বঞ্চিত, মানুষের অধিকারচ্যুত, অন্ধকারের বন্দিনি মুসলমান নারীসমাজের উদ্ধারের স্বপ্ন তাঁকে দুরূহ কর্তব্যসাধনে প্রবৃত্ত করেছিল। আজীবন নারীমুক্তি সাধনে তাঁর মহৎ অবদান আজ ইতিহাসের অঙ্গীভূত। এই উদ্দেশ্য সাধনে তিনি কলমকেও হাতিয়ার করেছিলেন। নারীচেতনার উদ্দীপনে তাঁর অসামান্য রচনা 'আমাদের অবনতি' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯০৪ সালে নবনূর পত্রিকায়।

অতি সংক্ষেপে নারী আন্দোলনের প্রেক্ষিতটি বর্ণনা করে আবার ফিরে যাই সেই অনির্বাণ বাতিঘরের কাছে। বিগলিত করুণাধারায় অবহেলিত নারীজীবনকে সিক্ত করে, উদ্ধারের পথ প্রদর্শন করে ১৮৯১-র আগস্ট মাসে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবনদীপ নির্বাপিত হলেও তাঁর আজীবন সাধনার দীপটি আজও জ্বলছে।

নারী আন্দোলনের কথায় মনের পটে ভেসে ওঠে প্রতিদিন চোখের সামনে দেখা অথচ অদেখা এক অনির্বচনীয় দৃশ্য। চারদিকে নিকষ কালো অন্ধকার, তার মধ্য দিয়ে চলছে রাতের রেলগাড়ি। কামরার জানালায় চলন্ত আলোর হাতছানি। এমন একটি পটভূমির শিল্পিত ছবি আমরা দেখতে পাই প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক আশাপূর্ণা দেবীর কিংবদন্তিতুল্য রচনা 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'তে। কালের বিচারে উনিশ শতকের প্রথমভাগ থেকেই শুরু হয়েছে এর কাহিনির বিন্যাস। সত্যবতীর কালে আসতে সময় শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে প্রবেশ করেছে। সত্যবতী গ্রামের মেয়ে, বাবার অধিক বয়সের সন্তান। মাত্র ৮ বছর বয়সে বিয়ে দিয়ে গৌরীদানের পুণ্য অর্জন করেছিলেন পিতা কবিরাজ রামকালী চাটুজ্জে। আশাপূর্ণা দেবীর মানস-প্রতিমা সত্যবতীর মধ্যে আমরা নারী আন্দোলনের প্রথম প্রতিশ্রুতি লক্ষ করি। সত্যবতী থেকে সময় গড়িয়ে গেছে সুবর্ণলতায় তারপর এসেছে বকুল-পারুল। বিবর্তনের চেহারাটা সততার সঙ্গেই ফুটিয়ে তুলেছেন লেখিকা। শুরুতেই এর স্বীকৃতি রয়েছে, যেখানে আশাপূর্ণা লিখেছেন—'আজকের বাংলাদেশের অজস্র বকুল পারুলদের পিছনে রয়েছে অনেক বছরের সংগ্রামের ইতিহাস। বকুল পারুলদের মা দিদিমা পিতামহী আর প্রপিতামহীদের সংগ্রামের ইতিহাস। তারা সংখ্যায় অজস্র ছিল না। তারা অনেকের মধ্যে মাত্র এক একজন। তারা একলা এগিয়েছে। এগিয়েছে খানা ডোবা ডিঙিয়ে, পাথর ভেঙে, কাঁটাঝোপ উপড়ে। পথ কাটতে কাটতে হয়তো দিশেহারা হয়েছে, বসে পড়েছে নিজেরই কাটা পথের পথ জুড়ে। আবার হয়তো এসেছে আর একজন, তার আরব্ধ কর্মভার তুলে নিয়েছে নিজের হাতে। এমনি করেই তো তৈরি হল রাস্তা। যেখান দিয়ে আজ বকুল পারুলরা এগিয়ে চলেছে। বকুলরাও খাটছে বৈকি। না খাটলে চলবে কেন? শুধু তো পায়ে চলার পথ হলেই কাজ শেষ হল না। রথ চলার পথ চাই যে।' সেই রথ চালাবার পথ করতে নেমে আজকের প্রজন্মের মেয়েরা সত্যবতীকে সামনে দেখছে, দেখছে সত্যবতীর মতো আর কত নাম-না-জানা পূর্বমাতৃকাদের। খুব দ্রুত পর্দা সরে যাচ্ছে। নারী আন্দোলন যেদিন নারীমুক্তি আন্দোলনে

পর্যবসিত হল সেদিন থেকে খোঁজ পড়েছে, অনেকেই খুঁজতে লেগেছে। 'বকুলকথা'র বকুল এদেরই অগ্রবর্তিনী হয়ে বুঝতে পেরেছিল, 'পিতামহী, প্রপিতামহীদের ঋণশোধ না-করে নিজের কথা বলতে নেই'। তার কথার প্রতিধ্বনি শুনছি এ যুগের নারীচেতনাবাদীদের কণ্ঠে। তা সত্যবতীও তো একজন পূর্বমাতৃকা। তাকে কেমন দেখছি 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র আরম্ভে? 'নাকে নোলক, কানে সার মাকড়ি, পায়ে ঝাঁঝর মল, বৃন্দাবনী ছাপের আটহাতি শাড়ি পরা আট বছরের সত্যবতী। বিয়ে হয়ে গেছে বছর খানেক আগে। এখনও ঘরবসত হয়নি। অপ্রতিহত প্রভাবে পাড়াসুদ্ধ ছেলেমেয়ের দলনেত্রী হয়ে যথেচ্ছ খেলে বেড়ায়'। তবে এটাই তার আসল রূপ নয়, বহিরঙ্গের রূপ মাত্র। অন্তরঙ্গে সত্যবতী অন্যরকম—সে-যুগের এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। এরাই তো পথ কাটার মানুষ। উপন্যাসের কাহিনির বিস্তীর্ণ প্রান্তরে যাওয়া যাবে না। ঘটনাচক্রে সত্যবতীর জেঠতুতো দাদা বিবাহিত রাসবিহারী তথা রাসুর দ্বিতীয় বিয়ে এবং বউ নিয়ে বাড়ি আসার দিনের ঘটনায় সেই অন্য সত্যবতী ঝলসে উঠল আমাদের চোখের সামনে। কাকা রামকালী সদ্য বিয়ে হওয়া বর-কনে নিয়ে বাড়ির দুয়ারে এসে গেছেন। স্ত্রীআচার সব হচ্ছে নিয়ম মেনে। দুধ ওথলানোর জন্য রাসুর প্রথম পক্ষের বৌ সারদাকে ডেকে-আনার কথা ঠাকুমা দীনতারিণী যেইমাত্র বললেন, অমনি ঠিকরে উঠে সত্যবতী বলে উঠল—'বৌকে? বড়দার বৌকে ডেকে দেব? বৌ কী আর বৌ তে আছে? ভোর থেকে মাটিতে পড়ে কেঁদে কেঁদে মরছে!' অথচ রাসুর প্রথম পক্ষের বৌ সারদার মনের জ্বালা, অপমানের আঘাত বোঝার মতন বয়স তো সত্যবতীর হয়নি, মাত্রই আট বছরের মেয়ে। আর এই মেয়েটিই কিনা তার ভারিক্কি গম্ভীর মেজাজের বাবাকে মুখের উপর বলে দিল—'আমি কী আর সাধে আগুনে হাত দিয়েছি বাবা, বড়বৌয়ের মুখ চেয়েই দিয়েছি। আহা বেচারি, একেই তার সতিন কাঁটার জ্বালা, তার উপর আবার দুধ ওথলানোর হুকুম। মানুষের প্রাণ তো!' সত্যবতী জীবনভর ওই 'মানুষের প্রাণ'টির দিকে চোখ রেখে চলেছে। স্বামী গ্রামের বাড়িতে বিনা চিকিৎসায় মরতে বসলে সাহেব ডাক্তার আনিয়ে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করে আলোড়ন তুলে তার বাসাবদল করে কলকাতায় চলে আসা, সেখানে সংসার পেতে ছেলেমেয়েদের সুশিক্ষার ব্যবস্থাপনায় তার স্বাধীন সত্তার প্রকাশ সত্যবতীকে স্বতন্ত্র করেছে। অন্যরা সত্তার বদলে শান্তি কিনে বেঁচে থাকতে চেয়েছে, আত্মার বদলে আশ্রয়-চিন্তা ছাড়া তো অন্য উপায় ছিল না তাদের। সত্যবতী উপলব্ধি করেছে, সমাজ ওদের সহায় নয়, অভিভাবকরা ওদের অনুকূল নয়, প্রকৃতি পর্যন্ত ওদের প্রতিপক্ষ। ওরা অন্ধকারের জীব। এই অবস্থানের বিরুদ্ধেই ছিল সত্যবতীর আপসহীন বিদ্রোহ। একমাত্র মেয়ে সুবর্ণলতাকে বেথুন স্কুলে ভর্তি করিয়ে সত্যবতী ভেবেছিল তার জীবনের সমস্ত অপূর্ণতা মেয়ের জীবনে সম্পূর্ণ করে তুলবে। গরমের ছুটিতে আট বছরের সুবর্ণলতাকে বারুইপুরের দেশের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ব্যক্তিত্বহীন পিতা যখন মায়ের আদেশ শিরোধার্য করে সত্যবতীর অজান্তে বিয়ে দিয়ে বসলেন তখন সত্যবতীর আর যুদ্ধ করার প্রবৃত্তি থাকল না। স্বামীর মত-অনুরোধ উপেক্ষা করে তৎক্ষণাৎ ক্রূর সমাজ, সাধের সংসার ত্যাগ করে কাশীবাসিনী হল। সংসার ত্যাগের আগে সত্যবতী নাকি বলেছিল—সংসারটা নাগপাশ না লতাপাতার বন্ধন তাই দেখব বাকি জীবনটা। শেষ পর্যন্ত কী দেখেছিল সে তো জানা যায়নি। তবে সুবর্ণলতাকে লেখা শেষ চিঠি,

যে-চিঠি সুবর্ণলতা হাতে পেয়েছিল তার মায়ের মৃত্যুর পরে, তাতে লেখা ছিল সত্যবতীর জীবন-অভিজ্ঞতার কথা। সত্যবতী মেয়েকে লিখেছিলেন—'স্ত্রীলোকেরা তো আজও অজ্ঞতার অহঙ্কার আর মিথ্যা স্বর্গের মোহে তমসাচ্ছন্ন। তাহারা যেন বিচারবুদ্ধির ধার ধারিতেই চাহে না। ভাবনা হয় সহসা যেদিন তাহাদের চোখ ফুটিবে, যেদিন বুঝিতে শিখিবে ওই 'স্বর্গের' স্বরূপ কি, সেদিন কী হইবে? বোধকরি সেদিনের পথনির্ণয় আর শত গুণ কঠিন'। সত্যবতীর পৃষ্ঠবল ছিলেন তার বাবা রামকালী চাটুজ্জে। তিনিও তখন কাশীবাসী।

সুবর্ণলতার কোনো পৃষ্ঠবল ছিল না। সে বড়ই হতভাগিনি। বিয়ের পর বাপ-ভাইয়ের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখেনি। কলকাতার দর্জিপাড়ার অন্ধগলিতে জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় বৃথা অপচয় করে শেষ পর্যন্ত বাসাবদল করলেও তার একমাত্র সাধ একটি দক্ষিণের বারান্দা সে পায়নি। তা হলে কি কলকাতার মধ্যেই এমন পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকারের বিস্তার ছিল উজ্জ্বল চোখ-ধাঁধানো আলোর পাশাপাশি?

'বিদ্যে বিদ্যে উঠতে বসতে মা ওই কথাই বলতো। বলতো, বিদ্যেই হচ্ছে আসল, বুঝলি? মেয়েমানুষের বিদ্যেসাধ্যি নেই বলেই তাদের এত দুর্দশা! ...তাই তাদের সবাই হেনস্তা করে। আর যেসব মেয়েমানুষরা বিদ্যে করেছে, করতে পেরেছে, বিদূষী হয়েছে কত গৌরব তাদের—কত মান্য। সেই মান্য, সেই গৌরব তোরও হবে'—বলতেন সত্যবতী, সুবর্ণলতার মা। সেসব কিছুই হল না, কিছুই পেল না। সুবর্ণলতার জীবনটা মাটি হয়ে গেল। চোখ ফোটবার বয়সের আগেই হাতে-পায়ে বেড়ি পড়ে গেল, তবু সুবর্ণলতার সারা জীবনভর কী আকুতি, কী তীব্র জীবন-পিপাসা! বেথুন স্কুলের ছাত্রী ছিল সে, তার চোখে লেগেছিল নতুন দিনের আলোর আভাস, তাই তো তার এত প্রশ্ন। সাধারণ পারিবারিক জীবনের কোনো প্রাপ্তি যেন প্রাপ্তি নয় তার কাছে। ভিতরের অব্যক্ত যন্ত্রণাকে প্রকাশ করার কোনো ভাষা খুঁজে না-পেয়ে দেওয়ালে মাথা কুটে কেবলই প্রশ্ন করে—কেন? কেন? আসলে সুবর্ণলতা সার্থক মানবী হতে চেয়েছিল, পারেনি। তার প্রখর ব্যক্তিত্ব অন্ধ, জড়, যুক্তিহীন, কুসংস্কারাচ্ছন্ন পুরুষতন্ত্রের প্রতাপের বিরুদ্ধে সারাটা জীবন কেবলই লড়াই করে গেছে। হিসাবনিকাশে বসল যখন, একই সঙ্গে তার জীবন থেকে বহু আগে হারিয়ে-যাওয়া মা এবং বাবাকে চিরতরে হারাবার ক্ষণ এল। তার চাওয়া এবং পাওয়াকে নিজস্ব তুলাদণ্ডে তুলে বিচার করতে বসে নতুন করে সত্য উপলব্ধি হল তার। 'একদল লড়াই করে করে ধ্বংস করছে নিজেকে। অন্যদল আপন সত্তাকে বিলিয়ে দিয়ে পুরুষসমাজের ইচ্ছের পুতুল হয়ে বসে আছে।'

সুবর্ণলতা সারা জীবন প্রতিবাদ করে গেছে। সমস্ত রকম অন্যায়-অবিচার যা প্রতিনিয়ত সংসারে ঘটত দজ্জাল শাশুড়ি আর অন্ধ মাতৃভক্ত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন স্বামীর দ্বারা, সব চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে মুখে মুখে জবাব দিত। তাই কখনও পরিবারের কাউকে, এমনকী ছেলেমেয়েদেরও পাশে পায়নি। কেউ তাকে সমর্থন করেনি। বাস্তবিকই সে ছিল একা, বড় একা—সংসারের পক্ষে বেমানান তার নিজস্ব মূল্যবোধ। একান্ত ব্যক্তিগত নির্জনতায় সুবর্ণলতা ডায়েরি লিখত। লিখত তার এলোমেলো ভাবনাগুলোকে ধরে রাখতে। এমনি এক জায়গায় লিখেছে—'দেখতে পাচ্ছি, শুধু আমি একা নয়, সমস্ত মেয়েমানুষ জাতটাই একটা

অপমানের পঙ্ককুণ্ডে পড়ে ছটফটাচ্ছে। কেউ টের পাচ্ছে, কেউ টের পাচ্ছে না। কারণ, কারণ তারা রোজগার করে না, অপরের ভাত খায়, হ্যাঁ, এই একমাত্র কারণ। আর স্বার্থপর পুরুষজাত সেই অবস্থাকেই কায়েমী রাখতে মেয়েমানুষকে শিক্ষার সুযোগ দেয় না, চোখ কান ফুটতে দেয় না। দেবে কেন? বিনি মাইনের এমন একটা দিনরাতের চাকরানি পাওয়া যাচ্ছে, এমন সুযোগ ছাড়ে কখনো? পা বেঁধে বলব, ছি ছি হাঁটতে পারে না! চোখ বেঁধে রেখে বলব, রামরাম দেখতে পায় না। আর সমস্ত অধিকার কেড়ে নিয়ে বলব—ঠুঁটো ঠুঁটো! এ কী কম মজা! চিরদিন এই রকমই তো করে আসছে পুরুষসমাজ আর সমাজপতিরা! দু বেলা দু মুঠো ভাতের বদলে আস্ত একটা মানুষকে নিয়ে যা খুশি করতে পারার অধিকার, এ কী সোজা সুখ? ওই দু মুঠোর বিনিময়ে সেই মানুষটার দেহ থেকে মন থেকে, আত্মা থেকে, সব কিছু থেকে খাজনা আদায় করা যাচ্ছে—তার ওপর উপরি পাওনা নিজের নীচতা আর ক্ষুদ্রতা বিস্তার করবার একটা অবারিত ক্ষেত্র।'

সুবর্ণলতা তার এইসব টুকরো লেখা সাজিয়ে-গুছিয়ে বই ছাপানোর ইচ্ছা মনের নিভৃতে কতদিন পুষে রেখেছিল। তারপর জগু বট্‌ঠাকুর ছাপাখানা খুলেছেন শুনে চুপি চুপি একদিন গিয়ে মামিশাশুড়ির হাতে দিয়েও এসেছিল যক্ষের ধনের মতো আগলে-রাখা তার স্মৃতি-কথা। যথারীতি ছাপাও হয়েছিল। ভালোমানুষ ভাসুরঠাকুর বাড়ি পৌঁছেও দিয়ে গিয়েছিলেন। তারপর বইয়ের ছিরি-ছাঁদ দেখে, সুবর্ণলতার প্রতি অবজ্ঞার দৃষ্টি থেকে পরিবারের সবাই যখন এ নিয়ে হাসাহাসি করতে লাগল তখন ক্ষোভে-দুঃখে সুবর্ণলতা সব বই পুড়িয়ে দিল যেমন একদিন বিলিতি বর্জনের দিনে ছেলেপুলেদের পুজোর পোশাক-আশাকসুদ্ধু সব কাপড় পুড়িয়ে দিয়েছিল। সুবর্ণলতার সারা মন জুড়ে ছিল জ্বালা, জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরির মতো লাভা উদ্‌গীরণ করেছে সে। ব্যর্থতায় মাথা খুঁড়ে মরেছে, অভিমানে নিজেকে নিঃশেষ করেছে। লেখিকা শেষমেশ প্রশ্ন রেখেছেন—'আজও কী অগনিত সুবর্ণলতা মাথা কুটে মরছে না এই 'আলোকোজ্জ্বল যুগের' চোরা কুঠুরীর ঘরে? রুদ্ধকণ্ঠে বলছে না—তোমরা শুধু সমাজের মলাটটুকু দেখেই বাহবা দিচ্ছ, আত্ম-প্রশংসায় বিগলিত হচ্ছ, আত্মপ্রচারের জৌলুসে নিজেকেই নিজে বিভ্রান্ত করছ, খুলে দেখছ না এর ভিতরের পৃষ্ঠা? দেখ সেই ভিতরের পৃষ্ঠায় কোন্ অক্ষর, কোন্ ভাষা, কোন্ লিপি।' কথাটা ভাববার মতন অবশ্যই।

সুবর্ণলতা তার মনের মতন সংসার পায়নি, তবু অবাঞ্ছিত মাতৃত্বে ভরে উঠেছিল তার কোল। ছেলেমেয়েদের মধ্যে ছেলেরা পড়াশোনা করেছে, যুগোপযোগী জীবিকা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। মেয়েদের মধ্যে সব চাইতে ছোট বকুল ছাড়া আর সবাই অল্পবয়সে বিয়ে হয়ে স্বামীর ঘর করতে লেগে গেছে। বকুল বড় হয়েছে অবহেলায়, অযত্নে। তার দিকে কেউ বড় একটা নজর দেয়নি। প্রতিবেশী যে-ছেলেটির সঙ্গে তার ভালোবাসার সম্পর্ক হয়েছিল, সামাজিক ভিন্নতায় তার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারল না। মা সুবর্ণলতা যতদিন বেঁচেছিলেন, তীব্র আত্মাভিমানে কেমন যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে রইলেন। বকুল শিক্ষার আলো পেয়েছিল, ধীরে ধীরে লাজুক মেয়েটির ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটল। যুগের পরিবর্তন ঘটে গেছে ততদিনে। কাল বিশ শতকের মধ্যভাগে প্রবেশ করতে উদ্যত। অন্তর্মুখী মেয়েটির মন

আত্মপ্রকাশের মাধ্যম করে নিল লেখাকে। চিরকুমারী বকুলের জীবনে প্রতিষ্ঠা এল সাহিত্যিক রূপে। কথাসাহিত্যিক রূপে তার মননশীলতায় সমকালের চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বকুল বলেছে—'না, এ যুগে সে-যুগের কোনো স্পষ্ট অবয়ব খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কোথাও সে দুরন্ত সংহারের মূর্তি নিয়ে মুহূর্তে মুহূর্তে রেণু রেণু করে উড়িয়ে দিচ্ছে বহুযুগসঞ্চিত সংস্কারগুলি, উড়িয়ে দিচ্ছে চিরন্তন মূল্যবোধগুলি, অভ্যস্ত ধ্যানধারণার অবলম্বনগুলি, আবার কোথাও সে আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ির মতো আজও তার বহু সংস্কারে বোঝাই ঝুলিটি আগলে বসে আছে।' বাবা প্রবোধচন্দ্র পৈতৃক তেতলা বাড়িতে তার স্থায়ী বসবাসের ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন বলেই পিতৃদত্ত অধিকার বলে সেই বাড়িতে বাস করলেও ভায়েদের পৃথক সংসারের সঙ্গে তেমন সংযোগ রেখে চলেনি। বকুল থাকত তার নিজের মতন করে। কলেজ-পড়ুয়া ভাইঝি শম্পার সঙ্গে ছিল তার প্রাণের যোগ। শম্পাও ছিল পিসি-অন্ত প্রাণ। প্রাণচঞ্চল এই মেয়েটিই যেন ছিল তার বর্তমান যুগের সঙ্গে সচল সেতুবন্ধনের সূত্র। বকুল একের পর এক উপন্যাস লিখছে আর নাম কুড়োচ্ছে। তার সামাজিক প্রতিষ্ঠা বহুজনের ঈর্ষার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভাই, ভাইয়ের বউরাও তির্যক দৃষ্টিতে দেখে তার স্বাধীন জীবনযাত্রার চলন। যখন বাজারে বেরোল বকুলের নতুন উপন্যাস 'নবকন্যা',—শম্পা কলেজ থেকে এসে উচ্ছ্বসিত হয়ে পিসিকে বলল—'তবে তোমার ওই 'নবকন্যা' পড়ে কলেজের মেয়েরা তোমায় ফুলচন্দন দিচ্ছে এই খবরটা জানিয়ে দিলাম। লিলি তো বলছিল, ইচ্ছে হচ্ছে গিয়ে পিসির পায়ের ধুলো নিয়ে আসি। ...লেখক মশাইরা তো দেখতে পান শুধু যুগযন্ত্রণায় ছটফটিয়ে মরা ছেলেগুলিকেই, সে-যন্ত্রণা যে মেয়েদের মধ্যেও আছে, তা কে কবে খেয়াল করেছে। ওনারা জানেন কেবলমাত্র দেহ-যন্ত্রণা ছাড়া মেয়েদের আর কোনো যন্ত্রণা নেই। ঘেন্না করে, লজ্জা করে, রাগে মাথা জ্বলে যায়।' (পৃ: ১০৫)

বকুলের কাছে বৃদ্ধ সনৎকাকা অনেকখানি। রক্ষণশীল প্রবোধচন্দ্রের বাধানিষেধ অতিক্রম করে তিনি বকুলকে শান্তিনিকেতন নিয়ে গিয়ে কবিগুরুর সঙ্গেও সাক্ষাৎ করার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। পরম স্নেহে হাত ধরে বাইরে নিয়ে গিয়েছিলেন বলেই অন্তর্মুখী বকুল বাইরের জগতের আলোহাওয়ার স্পর্শ পেয়েছিল, জানবার সুযোগ হয়েছিল বিচিত্র জীবনধারাকে। লেখালেখি নিয়ে সনৎকাকার সঙ্গে তার অনেক কথাবার্তা হত। একদিন তিনি যখন জানতে চাইলেন নতুন কী লিখেছে সে, উত্তরে বকুল বলল, নতুন কিছু লিখতে পারছি না। সবিস্ময়ে সনৎকাকার জিজ্ঞাসা—'সমাজে সংসারে এত নতুন ঘটনা ঘটছে রোজ রোজ, মুহূর্তে মুহূর্তে সমাজের চেহারা পাল্টাচ্ছে, তবু নতুন কথা কিছু লিখতে পারছিস না?' বকুল বলেছিল : 'চেষ্টা করছি, হচ্ছে না। ওই মুহূর্তগুলো তো স্থায়ী কিছু দিয়ে যাচ্ছে না, ওরা শুধু সাবানের ফেনার মতো রঙিন বুদ্বুদ কেটে বাতাসে মিলিয়ে যাচ্ছে। আর একদিকে কোথায় যেন চলছে ভয়ানক একটা ভাঙনের কাজ, তার থেকে ছিটকে-আসা খোয়া পাথরের টুকরো, উড়ে আসা ধুলো গায়ে চোখে এসে লাগছে, কিন্তু সেই 'ভয়ানক' কেই বা ধরে নেব কী করে? তার সঙ্গে তো আমার প্রত্যক্ষের যোগ নেই, যোগ নেই নিকট অভিজ্ঞতার। আধুনিক, না 'আধুনিক' বলব না, বলব বর্তমান সমাজকে তবে আমি কলমের মধ্যে ভরে নেব কী করে? শুনতে পাই অবিশ্বাস্য রকমের সব নাম-না-জানা ভয়ানক প্রাণী জঙ্গল থেকে

বেরিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ছে, ঘরের লোকের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে, এবং সেই প্রাণীরা তাদের নখ দাঁত শিঙ লুকোবারও চেষ্টা করছে না। বরং ঐগুলোই গৌরবের বস্তু ভেবে সমাজে দেখিয়ে বেড়াচ্ছে। আর ঘবের লোকেরাও তাই দেখে উঠে পড়ে লাগছে নখ দাঁত শিঙ গজাবার কাজে। কিন্তু এ সমস্তই আমার শোনা কথা!'

পারুল বকুলের ঠিক ওপরের বড় বোন। বিয়ের আগে সে কবিতা লিখত, রোমান্টিক প্রেমের কবিতা। বিয়ের পর স্বামীর সন্দেহ জেগেছে দেখে অভিমানে লেখা ছেড়ে দিলেও পারুল বরাবরই মেধাসম্পন্ন মেয়ে। ঘর করল সন্দেহবাতিকগ্রস্ত অথচ ভালোমানুষ স্বামীর সঙ্গে, সুযোগ্য দুটি ছেলের মা-ও হল। সাংসারিক কর্তব্য সবই যথারীতি পালন করলেও কিছুতেই যেন সংসারটির সংলগ্ন হতে পারল না। স্বামী অমলের তৈরি গঙ্গাতীরে তার সুন্দর বাড়িটিতে পরিণত বয়সে তার একাকী জীবনে অতীত ফিরে ফিরে আসে প্রতিদিনের মননে, আত্মগত চিন্তায়। তখন তার মৃত মাকে মনে পড়ে। এই প্রসঙ্গে 'বকুলকথা'য় আশাপূর্ণা দেবী লিখেছেন—'পারুল যে কেবল দীর্ঘদিন পূর্বে মৃত অমলবাবু নামের ভদ্রলোকটির স্ত্রী নয়, পারুল যে মোহনলাল আর শোভনলাল নামক দু-দুজন ক্লাস ওয়ান অফিসারের মা নয়, পারুল যে বহু আত্মীয়স্বজনের মধ্যেকার একজন নয়, পারুল একটি সত্তাব নাম, সেই কথাটাই অনুভব করে পারুল। আর তেমনি এক অনুভবের মুহূর্তে মাকে মনে পড়ে পারুলের। আগে পারুল মাকে বুঝতে পারত না। পারুল তার মার সদা উত্তেজিত স্বভাব প্রকৃতির প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করত, পারুল তার মার ওই ডজনখানেক ছেলেমেয়ে বরদাস্ত করতে পারত না। কিন্তু এখন পারুল যেন দর্শকের ভূমিকায় বসে মাকে দেখতে পায়। পাকলের একটা নিঃশ্বাস পড়ে। পারুল ভাবে, মা যদি খুব অল্পবয়সে বিধবা হয়ে যেতো তা হলে হয়তো মা বেঁচে যেতো। হযতো বকুলই পারুলকে এই দৃষ্টিটা দিয়েছে। ...সেই অবরোধের অসহায় যুগে প্রায় সব বাঙালি মেয়ের জীবনেই তো বকুল-পারুলের মায়ের জীবনের ছায়ার প্রতিফলন।

শুধু কেউ ছিল অন্ধ অবোধ, কেউ দৃষ্টিশক্তি আর বোধের যন্ত্রণায় জর্জরিত। পারুল তার মার সেই বোধ জর্জরিত জীবনের জ্বালা দেখেছে।

তখন পারুল মাব ওই জ্বালাটা নিয়ে মাতামাতি দেখে বিরক্ত হতো, এখন দূরলোক থেকে মমতার দৃষ্টিতে তাকায়।' অতিক্রান্ত একটি যুগের মুখ দেখছে আরেক অতিক্রম-উদ্যত যুগ। চোখের নজর পালটে গেছে তাই পারুল ব্যর্থ অসফল মায়ের তীব্র দহনজ্বালাকে মমতার দৃষ্টিতে দেখতে পারছে। বকুল অহরহ দেখছে যুগের পরিবর্তন। তার লেখক-সত্তায় ধরা পড়ছে পাল্টে-যাওয়া সময়ের জলছবি, ভালোমন্দ, অভিপ্রেত আর অনভিপ্রেত—দুয়ের মধ্যেকাব দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের চেহারা নিয়ে। 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র সত্যবতী বকুলের দিদিমা, সুবর্ণলতার মা—এদের কথা বকুল লিখেছে। 'বকুলকথা'য় নিজের কথা বলতে তার যত সংকোচ, তার কলমে ফুটে উঠেছে দ্বিধাদীর্ণ, আত্মহননোদ্যত নিষ্ঠুর এক কালের কথা। এ যুগের নারীচেতনাবাদী মেয়েরা বলছে পূর্বমাতৃকাদের কথা, খুঁজছে অতীতের অন্ধকারে, খুঁড়ছে মাটি শিকড়ের টানে। এদের অনেক কাল আগেই বকুল কেমন বুঝতে শিখে গিয়েছিল—'পিতামহী, প্রপিতামহীদের ঋণ শোধ না-করে নিজের কথা বলতে নেই।' পিতামহী মুক্তকেশী নয়, মাতামহী সত্যবতীর কথা এমন করে বলেছিল বলেই না আমরা

বিগত কালের এক অনন্যা নারীসত্তার প্রতিমূর্তিকে পূর্বমাতৃকারূপে পেয়ে গিয়ে ধন্য হয়েছি—চোখ মেলে দেখতে পেয়েছি নারীসত্তার উন্মোচনের উষাকালের অরুণোদয়।

বাস্তবিকই আমরা স্বয়ম্ভু নই। আজ যে স্বপ্রতিষ্ঠার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে মেয়েরা, তার বাস্তব ঐতিহাসিক ভিত্তি ছিল আমাদের পূর্বমাতৃকাদের চেতনায়। তাঁদের কেউ কেউ সেই শ্বাসরুদ্ধ জড় অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়েও নিজের দেহ বিদীর্ণ করে আলোর পথ করে দিতে চেয়েছিলেন—সত্যবতী, সুবর্ণলতা এঁদেরই প্রতিনিধি। পারুল-বকুল তাঁদের স্পষ্ট বুঝতে না-পারলেও এ যুগের মেয়েরা পারছে। আত্মকথনের ঢঙে লেখা আশাপূর্ণা দেবীর ত্রয়ী উপন্যাস তাই এ-কালীন মেয়েদের জীবনের ধ্রুবপদ বলে গণ্য হতে পারে। মেয়ে সুবর্ণলতার কাছে সংসারত্যাগী সত্যবতী কাশীধাম থেকে লেখা শেষ চিঠিতে লিখেছিলেন তাঁর অভিজ্ঞতায়, উপলব্ধিতে ধরা-পড়া এক পরম সত্য। নারীমুক্তি আন্দোলনের বহু গড়নপিটন এখনও বাকি রয়েছে। কে বলতে পারে হয়তো সত্যবতীর সেই উপলব্ধিকে মেনে নেবে অনাগত কালের মেয়েরাও নারীমুক্তির দিশা বলে—'যদি সংসারের মধ্যে থাকিয়াই জীবনের সর্ববিধ উৎকর্ষ সাধন করিয়া পূর্ণতা অর্জন সম্ভব হয়, তাহাই প্রকৃত পূর্ণতা।' এটাই ছিল সত্যবতীর শেষ উচ্চারণ। এর সত্যাসত্য নির্ধারণ করবে ভাবীকাল।

স্ত্রী-শিক্ষা, উনিশ শতক; প্রথম প্রতিশ্রুতি

রবিন পাল

কোনো সাহিত্যগ্রন্থের সংরূপের (Genre) বিচার, ভাষা ও বর্ণনার সার্থকতা, চরিত্রায়ন ও ভাষাগত মুন্সিয়ানা (কথাসাহিত্য হলে) দেখানোর পরিবর্তে ওই সাহিত্যগ্রন্থের ঐতিহাসিক প্রাসঙ্গিকতা, রচনার ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিত পর্যালোচনা বোধ করি নব্য ইতিহাসবাদের লক্ষ্য ও পরিসীমা যাকে Louis A. Montrose সুন্দর ও সংহত করে বলেছেন 'the historicity of texts and the textuality of history.' পূর্বসূরি লুই আলথুসের বলেছিলেন, আদর্শগত ধ্যান-ধারণা (Ideology) সাহিত্যের মধ্য দিয়ে ফুটে বেরোয়, আর এই আদর্শই সাহিত্যের সাহিত্যস্থ ভাষা ব্যবহার ও অবস্থান নির্ণয়ে কার্যকরী ভূমিকা নেয়। আর একজন পূর্বসূরি তত্ত্বাচার্য মিশেল ফুকো বলেছিলেন একটা কালের ডিসকোর্স, প্রচলিত ধ্যান-ধারণার পরিবর্তে কালের প্রবহমান ধ্যান-ধারণা, বিরোধাভাস, বিশৃঙ্খলার, যেগুলি ওই কালের 'শক্তি' বা 'সামাজিক ফোর্স' হয়ে উঠছে তার পরিচয় বহন করতে পারে কোনো সাহিত্য-টেক্সট। এইসব একটু আধটু মাথায় রেখে আশাপূর্ণা দেবীর ম্যাগনাম ওপাস (ত্রয়ী) উপন্যাসের প্রথম খণ্ডটি নিয়ে, তার প্রচলিত বিচার পদ্ধতি (অর্থাৎ কোন জাতীয় উপন্যাস, চরিত্রায়ন ও ভাষা ব্যবহারগত পারদর্শিতা ইত্যাদি) পাশ কাটিয়ে একটি বিষয়ের প্রতিফলন দেখতে চেয়েছি। সে-বিষয়টি হল—স্ত্রী-শিক্ষা, যা মনে হয়, এ উপন্যাসের অন্যতম প্রধান বিষয়। এখানে আমরা স্মরণ করতে পারি Hayden White -এর কথা, যিনি লেখক, তাঁর ইতিহাস রচনা এবং প্রত্যাশিত পাঠক এই তিনের সম্পর্ক বিষয়ে সচেতন থেকে বলেছিলেন ইতিহাস রচনায় ঘটনা নির্বাচন, আদর্শগত পরিপ্রেক্ষিত কীভাবে ইতিহাসগত Impulse-কে তুলে ধরে তার কথা। (Meta history : The Historical Imagination of Nineteenth Century Europe) হোয়াইট যে-কথা বলেছিলেন সে-কথা উপন্যাস সম্পর্কেও প্রযোজ্য। আশাপূর্ণাও আলোচ্য বইটির ভূমিকায বলছেন—'বহির্বিশ্বের ভাঙাগড়ার কাহিনি নিয়ে রচিত হয় বিগত কালের ইতিহাস। ...তবু রচিত ইতিহাসগুলি চিরদিনই এই অন্তঃপুরের ভাঙাগড়ার প্রতি উদাসীন। ...বাংলাদেশের সেই অবজ্ঞাত অন্তঃপুরের নিভৃতে প্রথম যাঁরা বহন করে এনেছেন প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর, এ গ্রন্থ সেই অনামী মেয়েদের একজনের কাহিনি।' আমাদের এই বঙ্গদেশে ঊনবিংশ শতাব্দীর ৩য় ও ৪র্থ দশকে অল্প কিছু শিক্ষিত ভদ্রলোক গোপনে মেয়েদেব কিছু কিছু শিক্ষা দিতে শুরু করলেও ১৮৪৯-এর আগে ভদ্রলোক পরিবারের মেয়েদের জন্য কোনো স্কুল তৈরি হয়নি। সে-সময়, অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত অল্প কিছু মহিলা-জমিদার লেখাপড়া শিখতেন হিসেব রাখার জন্যে, নিঃসন্তান বিধবা মহিলা শিখতেন ধর্মগ্রন্থ পড়ার জন্য। আসলে পুরুষরা মহিলাদের লেখাপড়া শেখানোর দরকার বোধ করেনি, মনে করত মেয়েদের বোধ-বুদ্ধি নেই, অতএব তাদের লেখাপড়া শেখানো যাবে না। রামমোহন এবং তাঁর বন্ধুরা, যথা প্রসন্নকুমার ঠাকুর, গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতি স্ত্রী-শিক্ষার প্রয়োজনীযতা বোধ করেন, এ নিয়ে বই-টই লেখালিখি শুরু করেন। ইয়ংবেঙ্গল নামধারী বিদ্রোহী ছাত্ররাও

মহিলাদের সমমর্যাদার দাবি তুলেছিল, টম পেইন, মেরি ওলস্‌টোন ক্রাফট, কার্লাইল প্রভৃতির রচনা পাঠ করে। ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবও স্বামীদের শিক্ষিতা স্ত্রীর দরকার সম্পর্কে ভাবিত করে তোলে। তবে নানা পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতায় দ্বারকানাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো মানুষও স্ত্রীদের শিক্ষিত সহযোগী করে তুলতে পারেননি। ইয়ংবেঙ্গল শুধু মেয়েদের শিক্ষার কথাই বলেনি, বলেছিল মেয়েদের দাসত্বের মাত্রা, মেয়েদের অধীনতার কথা। (জ্ঞানান্বেষণ, সমাচার দর্পণ-এ উদ্ধৃত, ১৬ ডিসেম্বর, ১৮৩৭, সংবাদপত্রে সেকালের কথা দ্র.) চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে অক্ষয় দত্ত, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দ্বারকানাথ রায় প্রভৃতি স্ত্রী-শিক্ষার উপকারিতার কথা লিখছিলেন। অক্ষয় দত্ত তো এমন কথাও লিখেছিলেন—মেয়েরা পুরুষদের তুলনায় মোটেই নিকৃষ্ট নন, বরং অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠতর। (তত্ত্ববোধিনী, ১ পৌষ ১৭৬৬ শকাব্দ) আসলে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার হচ্ছে, সমাজে এর উপকার উপলব্ধ হচ্ছে আবার স্ত্রী-শিক্ষার বিরুদ্ধে আপত্তিও উঠছে—এ দুটোই দেখা যাবে।

প্রথম মেয়েদের স্কুল হচ্ছে চুঁচুড়ায় ১৮১৮-তে, রবার্ট মে নামে এক পাদ্রির দ্বারা, তারপর এ ব্যাপারে খুব উৎসাহ দেখায় কলকাতার ব্যাপটিস্ট (১৮১৯) এবং চার্চ মিশনারি সোসাইটি (১৮২৩)। এদেরই অধীনে মিস মেরী অ্যান কুক ১৮২৩ থেকে ১৮২৮ সালের মধ্যে অন্তত তিরিশটা মেয়ে স্কুল স্থাপন করেন। কিন্তু তখনও উচ্চশ্রেণির কর্তারা মেয়েদের এ ধরনের স্কুলে দিতে চাইতেন না। জানা যাচ্ছে কেবল বাগদি, ব্যাধ, বৈরাগী এবং কতিপয় বেশ্যাকন্যা পড়তে যেত। (বঙ্গদূত, সমাচার দর্পণ-এ উদ্ধৃত, ২৫ জুন ১৮৩১। সংবাদ পত্রে সেকালের কথা, ২য়) কেন ভদ্রঘরের মেয়েরা অনুমতি পায়নি, এর কারণ—পর্দাপ্রথা ভাঙতে নারাজ তারা, ভয় ছিল ধর্মান্তরেরও। ১৮৪৯ সালের মে মাসে জি. ই. ডি. বেথুন কলকাতায় ভিক্টোরিয়া গার্লস স্কুল স্থাপন করলেন, যা পরে বেথুন বালিকা বিদ্যালয় নামে পরিচিত। এর পেছনে বিদ্যাসাগর, কালীকৃষ্ণ দেব, হরচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি থাকায় ব্রাহ্ম এবং উচ্চশ্রেণির হিন্দু মেয়েরা যেতে শুরু করল এই স্কুলে। কিন্তু প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া বিরূপ। হরদেব চট্টোপাধ্যায় স্কুলে মেয়ে পাঠিয়েছিলেন বলে একঘরে হলেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাঁর মেয়ে সৌদামিনীকে স্কুলে পাঠাতে দ্বিধান্বিত ছিলেন। ঈশ্বর গুপ্ত বেথুন স্কুল স্থাপনে উৎসাহী হলেও অল্প পরে স্ত্রী-শিক্ষায় বিরূপ হয়ে ওঠেন। ১৮৫০ থেকে ১৮৬০-এর মধ্যে স্ত্রী-শিক্ষার বিকাশ যে সামান্য, তার কারণ গোঁড়া হিন্দুদের বিরোধিতা। আর মেয়েদের অল্প বয়সে বিয়েও প্রতিবন্ধকতার আর-এক কারণ। তবে কোনো কোনো ভাগ্যবতী মহিলা নিজের চেষ্টায়, স্বামী অথবা অন্য কোনো আত্মীয়ের সাহায্য নিয়ে লেখাপড়া করেছেন। বৈষ্ণবীরাও বাড়িতে লেখাপড়া শিখতে সাহায্য করত। তবে তা ব্যতিক্রমী ঘটনা মাত্র।

গোলাম মুরশিদ তাঁর বইতে এ প্রসঙ্গে কৈলাসবাসিনী দেবী, দ্রবময়ী, বামাসুন্দরী, কুমুদিনী, নিস্তারিণী দেবী, ব্রহ্মময়ী, অন্নদায়িনী লাহিড়ী, মনোরমা মজুমদার, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, রাজকুমারী দেবী, সৌদামিনী দেবী, স্বর্ণকুমারী ও তরু দত্তের নামোল্লেখ করে দেখান এদের মধ্যে তিনজন বাদে সবাই স্বামীর (ব্রাহ্ম) তত্ত্বাবধানে লেখাপড়া শেখেন, আর ঐ তিনজনের একজন পিতার কাছে, একজন বৈষ্ণবী ও মেমসাহেবের কাছে, তৃতীয়জন

বাড়িতে, ইংল্যান্ডে ও ফ্রান্সে লেখাপড়া শেখেন। (নারী-প্রগতি : আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণী/গোলাম মুরশিদ, পৃ. ৩৩-৩৪)

তিনটি মাসিক পত্রিকা (মাসিক পত্রিকা, ১৮৫৪, বামাবোধিনী পত্রিকা ১৮৬৩, অবলা বান্ধব ১৮৬৯) মেয়েদের অবস্থার উন্নতি করা, স্বশিক্ষিত হওয়া প্রভৃতিতে সাহায্য করেছিল। ১৮৭০ নাগাদ একজন লিখছেন—'এক্ষনকার যুবকেরা শিক্ষিত স্ত্রী চাহেন; কেনই বা না চাহিবেন? যুবকদের লিখাপড়া শিখাইলে স্ত্রীদিগকে অবশ্যই লিখাপড়া শিখাইতে হইবে।' (স্ত্রী-শিক্ষা, জ্ঞানাঙ্কুর, আশ্বিন ১২৮২) এইভাবে একটা চমৎকার ব্যাপার ঘটছিল। তা হল—আকর্ষণীয় মহিলা কাকে বলব, এই ধারণাটাই বদলে যাচ্ছিল। গোলাম মুরশিদ-এর বইয়ের সূত্রেই আমরা জানছি বালিকা বিদ্যালয় ও ছাত্রী সংখ্যার ক্রমবর্ধমানতার কথা। ১৮৬৩—৯৫ (বা. বি./২৪৮৬ (ছা.), ১৮৭১-৩৪৪ (বা. বি.) ৬৭১৭ (ছা.), ১৮৮১-১, ০৪২ (বা. বি.) ৪৪, ০৯৬ (ছা.) এবং ১৮৯০-২২৩৮ (বা. বি.), ৭৮,৮৬৫ (ছা.) আর এটাও জানা হচ্ছে বর্ণভেদে শিক্ষার হার কেমন—ব্রাহ্মণ (৫.৬%), কায়স্থ (৮.০%), বৈদ্য (২৫.৯%) ব্রাহ্ম (৫৫.৬%)। এক্ষেত্রে ইংরেজি শিক্ষিতের সংখ্যাও ছিল ব্রাহ্মদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি।

সম্বুদ্ধ চক্রবর্তীর পর্যবেক্ষণ হল—উনিশ শতকের শেষে একটি বিশেষ স্তরের পর স্ত্রী-শিক্ষা আর সমর্থিত নয়। স্ত্রী-শিক্ষার উদ্দেশ্য—'পরিবারে শৃঙ্খলা রক্ষা' এবং 'চরিত্র গঠন'। কিন্তু মেয়েরা পুরুষের সমান শিক্ষা পেলে পারিবারিক কাজ ব্যাহত হবে,- মেয়েরা পুরুষের সমান অধিকার দাবি করবে—এ ভয় ছিল। (অন্দরে অন্তরে, পৃ. ৭০-৭১)

আশাপূর্ণা দেবীর 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' (১৯৬৫)

উপন্যাসটিকে আমরা উনিশ শতকের শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতাতেই দেখব মাত্র। উপন্যাসটিতে স্পষ্টত সমসাময়িক কোনো রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বিস্তারী উপস্থাপনা নেই। যেটুকু পাচ্ছি তা হল সত্যবতী যখন স্বামী পুত্র নিয়ে বারুইপুর ছেড়ে কলকাতায় বাসা নিল তার অনেক আগেই 'চল্ হয়েছে বিধবা বিয়ের।' দাপুটে মেয়ের সঙ্গে মহারানি ভিক্টোরিয়ার তুলনা আসছে সিপাহি বিদ্রোহের পর ব্রিটিশ সাম্রাজ্য পাকাপাকি হবার পর অর্থাৎ ১৮৫৮-র পর। এ ছাড়া এক জায়গায় আছে পরোক্ষ প্রবর্তনায়—কেশবচন্দ্র সেনের বাড়িতে পরমহংসের আসার কথা। সত্যবতী এক জায়গায় স্বামীকে বলছে—'তা ইংরিজি শিখব বলেছি বৈ তো গাউন পরে হোটেলে খানা খেতে যাব বলিনি?' (পৃ. ৩৯১) আমাদের মনে পড়ে যাবে ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা—'আগে মেয়েগুলো ছিল ভালো, ব্রত-ধর্ম কর্তো সবে।/একা 'বেথুন' এসে শেষ করেছে, আর কী তাদের তেমন পাবে।/' এই 'দুর্ভিক্ষ' (১৮৫০-তে রচিত) কবিতাতেই আছে মেয়েদের বিলিতি বোল, কাঁটা চামচ ধরা, আপন হাতে গাড়ি চালিয়ে গড়ের মাঠে হাওয়া খাওয়া, এবং বুট পায়ে চুরুট ফোঁকার কথা।

আশাপূর্ণা লিখছেন 'সুবর্ণলতা হচ্ছে সেই যুগের, যে যুগকে আমার শৈশব বাল্যে প্রত্যক্ষ দেখেছি।' তাঁর জন্ম ১৯০৯-এ, অতএব সত্যবতীর কালটা হচ্ছে আর অন্তত পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগের ব্যাপার। ওঁর প্রাসঙ্গিক শেখা থেকে এটাও পাঠকের জানা হয়—তিনি 'তিনযুগের পৃষ্ঠপটে' 'তিন কন্যার ছবি' আঁকতে চান। এর মাধ্যমে গড়ে উঠবে ত্রয়ী উপন্যাস,

নারী অবস্থান, প্রাসঙ্গিকভাবে সমাজ-বিবর্তন।

এইসব এলোমেলো উদাহরণ থেকে আমরা আলোচনার সুবিধার্থে কালটাকে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ যদি ধরে নিই তাহলে খুব বেশি আপত্তির কারণ থাকবে বলে মনে হয় না।

আমরা হাজার বিষয়ের মধ্য থেকে শিক্ষার ব্যাপারটা নিয়েই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখতে চাই। আমরা, মানে পাঠকরা, জেনে যাই সত্যবতী, সুবর্ণলতা, বকুল—এই তিন পরম্পরার মধ্য দিয়ে একটা সমাজ-বিবর্তনের ইতিহাসকে লেখিকা তুলে ধরতে চান ঔপন্যাসিক ভঙ্গিমায়। সত্যবতী শিক্ষা পেয়েছে রামকালীর কাছে, আর জীবন-অভিজ্ঞতার বাঁক তাকে উদ্বুদ্ধ করেছে আর বেশি বেশি মাত্রায় শিক্ষিত হয়ে উঠতে। সত্যবতী সুবর্ণলতাকে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য বলেছিল—'বিদ্যেই হচ্ছে আসল, বুঝলি? মেয়েমানুষের বিদ্যে সাধ্যি নেই বলেই তাদের এত দুর্দশা। ..তাই তাদের সবাই হেনস্থা করে।' আমাদের মনে পড়ে যাবে ভারতী, বৈশাখ ১২৯২-এ এক মহিলা লিখছেন—'সমাজ উন্নতির জন্যই মহিলাদের অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে উদ্ধার করা প্রয়োজন।' সৌদামিনী দেবী, নগেন্দ্রবালা দেবী প্রভৃতি উপলব্ধি করতে শুরু করেছিলেন, শিক্ষা অমূল্য সম্পদ, শিক্ষা ছাড়া জীবন অর্থহীন। 'বিদ্যাশিক্ষা পুরুষের ন্যায় নারীরও অতীব প্রয়োজনীয়।' সত্যবতী তার মেয়েকে বলছে—'আর যেসব মেয়েমানুষরা বিদ্যে করেছে, করতে পেরেছে, বিদুষী হযেছে। কত গৌরব তাদের—কত মান্য। সেই মান্য, সেই গৌরব তোরও হবে।' (সুবর্ণলতা, পৃ. ২৫৬) সত্যবতীকে গড়ে তোলার জন্যই 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' উপন্যাসটি শুরু হয় তার যথার্থ শিক্ষাকর্তা পিতা রামকালীর সামাজিক জীবনে স্বতন্ত্রতার উপস্থাপনায়। সত্যবতী রামকালীর বুড়ো বয়সের প্রথম সন্তান, সে-কারণে এবং অভিলষিত রূপ নিতে চাওয়ায় 'কিছু প্রশ্রয়' থাকে। ৩য় অধ্যায় থেকেই সত্যবতী সমাজনীতি ভাঙার একাধিক উদাহরণ লেখিকা সাজিয়ে দেন। মৃত্যু সম্পর্কে তার 'তলিয়ে ভাবা' রামকালীকে মুগ্ধ করলেও তিনি মনে করেন, এই স্বতন্ত্রতা বৃথা, মেয়েমানুষ বলেই। ৪র্থ অধ্যায়েই আমরা পাই সত্যবতীর ছড়া বাঁধার তাৎক্ষণিক দক্ষতার কথা, কিন্তু মোক্ষদা 'ভাইপোর মেয়ের কবিত্ব-শক্তির পরিচয়ে অভিভূত হয়ে নয়, স্তম্ভিত হলেন এ মেয়ের ভবিষ্যৎ ভেবে।' (পৃ. ৪৮) এই মোক্ষদাই ননদকে বলেন, 'সত্য পয়ার বেঁধেছে, তুমিই বা বাকি থাক কেন?' (পৃ. ৬৯) এবং এ ব্যাপারটা 'গেরস্ত ঘরের যুগ্যি নয়।' এই সত্যবতীই প্রচলিত ছড়া উদ্ধৃত করে রামকালীকে বোঝান কীভাবে সতিন-বিদ্বেষ জাগিয়ে তোলা হচ্ছে মেয়েদের মনে। (পৃ. ৯১, ৯২) ইতিহাসের পাতা ওল্টালে গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর গার্হস্থ্য কবিতা, মানকুমারী বসুর বিষাদপূর্ণ ও বাৎসল্যরসের কবিতা, ব্রজবালা দেবীর বিধবাবিবাহ সমর্থনে কবিতা ইত্যাদি চোখে পড়বে। কিন্তু এ হল ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত। সমাজ চাইত না, মেয়েরা লেখাপড়া শিখুক, কবিতা লিখুক।

"মেয়েমানুষরা যে রাতদিন ঝগড়া কোঁদল করছে, যাকে তাকে গালমন্দ শাপমন্যি করছে, তাতে পাপ হয় না, আর বিদ্যে শিখলে পাপ হবে?" (পৃ. ১৬১) রামকালী ওকে লেখাপড়ার অনুমতি এবং সত্যকার দোয়াত কলম দেন। (পৃ. ১৬৭) মেয়েদের লেখাপড়া শেখার গুরুত্ব নিয়ে যারা বলেছেন, তারাও, এমনকী ব্রাহ্মরাও বলেছেন অবকাশকালে ঘরে বসে বসে

লেখাপড়ার চর্চা করার কথা (পৃ. ৩৮৯) এবং ভবতোষ মাস্টার এ-ও বলেছে : 'মেয়েছেলেদের জন্যে আরও অনেক ভালো ভালো কাজ আছে বৌমা, তাতেও সময় কাটবে।' (পৃ. ৩৮৯) সত্যবতী নতুন যুগের অভিঘাতকে বুঝতে চেয়েছিলেন, তাই সন্তানদের ভালো ইস্কুলে ভর্তির তাগিদ দিয়েছেন এবং নবকুমার, তার স্বামী তাতে আপত্তি করেনি। আমরা এটাও দেখব যে শিক্ষার মর্ম উপলব্ধি করতে পেরেছে বলেই সত্যবতীর সামন্ত-গরিমার প্রতি কোনো আকর্ষণ নেই। রঙ্গরসের গল্প তার পছন্দ নয়। (পৃ. ৪২৯) অন্যদিকে এই স্বতন্ত্রতার সাধনাকে সত্যর বাড়িওলি অহঙ্কার বলে গণ্য করে। তবে ছেলেদের ভালো ইস্কুলে পড়ানোতে নবকুমারের আপত্তি না-থাকলেও 'মানুষের মতো মানুষ' করায় আপত্তি। (পৃ. ৪৩৫) এটা নবকুমারের কাছে বাড়াবাড়ি মনে হয়। এইখানে প্রাসঙ্গিক বোধে আমবা রামকালী ও সত্যবতীর শিক্ষা সম্পর্কে অ্যাটিচুড আর একবার উল্লেখ করব। রামকালী নবকুমার অর্থাৎ জামাইকে মৃদু ভর্ৎসনা কবে বলেছেন—'গুরু, শিক্ষক এরাও তেমনই পিতৃতুল্য। তাছাড়া তিনি তো তাঁর ধর্মবিশ্বাস·তোমার ওপব চাপাতে আসছেন না।' (পৃ. ৪৯৬) এখানে দুটো কথা আছে। শিক্ষক পিতৃতুল্য এটাই ঐতিহ্যগত শিক্ষা এবং ধর্মবিশ্বাস চাপানো-না-চাপানোর সংকট উনিশ শতকীয় সংকট। রামকালীর চরিত্রের একটা বড় মাপের আধুনিকতা আমরা পাই উপন্যাসটির শেষের দিকে। বিড়ম্বিত জীবনের অংশীদার সুহাস সত্যবতীর হাতেই গড়ে উঠেছিল, তার বহুবিধ অশিক্ষা-কুশিক্ষা এবং চরিত্রগত দোষ আস্তে আস্তে সরিয়ে দেওয়া হয। সেই মেয়ে, মেয়ে-স্কুল থেকে প্রথম হচ্ছে এটা যুগেব বাতাবরণে রীতিমতন এক স্বীকৃতিযোগ্য ঘটনা। 'রামকালী মৃদু হেসে বলেন—'নাতির ফার্স্ট হওয়া আহ্লাদের কথা। কিন্তু নতুন কথা নয় দিদি, নাতনির ফার্স্ট হওয়াটাই নতুন কথা।' (পৃ ৪৯৯) এইভাবে রামকালীব মুখ দিয়ে আশাপূর্ণা নতুন যুগের নতুন কথাকে প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছেন। এবার একবাব ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক। ১৮৫০-এ 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্রিকার একটি প্রবন্ধ থেকে জানা যায় অনেক ভদ্রলোক স্ত্রী-শিক্ষার সমর্থক হলেও প্রকাশ্য স্থানে বালিকা প্রেবণ করতে অসম্মত। ১৮৪৯-এ বেথুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা বাংলাদেশের স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই বিদ্যালয় মারফতই 'অন্তঃপুব শিক্ষার প্রবর্তন', যদিও আশাপূর্ণা এই দিকটি আব ঘাঁটাঘাঁটি কবেননি। ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দের আগে মেয়েরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার অনুমতি পেত না। ১৮৮৬-তে এন্ট্রান্স পাশ করে তেইশ জন ছাত্রী, এফ. এ. পাশ করে চারজন, বি. এ. তিনজন। সুহাসের ফার্স্ট হওয়াকে এই প্রেক্ষিতে দেখতে হবে। সম্বুদ্ধ চক্রবর্তী সুন্দর বলেছেন যে 'এই সময়ের লেখায় মেয়েদের আধুনিকতা ও শিক্ষা সমার্থক করে তোলা হয়েছিল। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি পাবে বা উচ্চ শিক্ষায় পুরুষের সমান হবে, এটি রক্ষণশীল সমাজ খুব সহজে গ্রহণ করতে পারেনি।' (অন্দরে অন্তরে, পৃ. ৫২) সত্যবতীর সংলাপ আকারে আশাপূর্ণা আলোকপ্রাপ্ত ভবতোষ মাস্টার প্রভাবিত বক্তব্যকে স্পষ্টত উপস্থিত করেছেন। পরিস্থিতির অগ্রসরমানতায় সত্যবতী ভবতোষের মতোই বিশ্বাসভিত্তিক উচ্চারণ করে যে, মেয়েমানুষ কি মানুষ নয়? এদেশে মেয়েমানুষ হওয়ার অনেক জ্বালা। সে আরও বলে—'অন্নদানের চেয়েও বড় পুণ্য বিদ্যাদানে। মানুষে আর জন্তুজানোয়ারে যে তফাৎ সে তো ওই বিদ্যে

থেকেই। ...সেই বিদ্যে বস্তু তা য্যর মধ্যে এতটুকুও আছে, তার উচিত আর একজনকে সে বিদ্যের ভাগ দেওয়া।' (পৃ. ৪৮৫) সত্যবতীর এই বিশ্বাসে যেমন প্রাচীন শাস্ত্রের অনুমোদন তেমনি আধুনিকতা আছে। এটাই তার শিক্ষক হয়ে ওঠার পিছনে কাজ করেছে। রামকালী ছিলেন আলোকপ্রাপ্ত, তাই ম্লেচ্ছ রাজত্বে জামাইয়ের ইংরেজি শেখাকে 'ম্লেচ্ছ বিদ্যা' বলে হেয় করার পক্ষপাতী নন। (পৃ. ২১৯) লোক-পরম্পরায় এ-কথা শুনে তিনি সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। (পৃ. ২৪৫) অন্যদিকে মোক্ষদা সত্যবতীর লেখাপড়ার আগ্রহে ওর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশঙ্কিত হয়েছিলেন। অন্যদিকে শিক্ষা, পাঠচর্চা সত্যবতীকে এই বোধে উন্নীত করেছিল যে 'বিদ্যেটা তো আর ঘটিবাটি নয় যে, অসুবিধে ঘটাচ্ছে বলে সরিয়ে রাখব' (পৃ. ৩৯৭)। নবকুমারও মোক্ষদাপন্থী—'মেয়েছেলের অধিক বিদ্যে সর্বনাশের মূল।' (ঐ) এখানে 'অসুবিধা' যেটা সেটা হল দুই ভিন্ন মূল্যবোধের সংঘাত, যেটা স্বাভাবিক যেটা অনেক পরিবারে ঘটতে শুরু করেছিল। কৈলাসবাসিনী দেবী লিখেছেন—পণ্ডিতদের মতে 'স্ত্রীগণ বিদ্যাধ্যয়ন করিলে অকালে বৈধব্যদশা প্রাপ্ত হয়।' গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারের স্ত্রী-শিক্ষাবিধায়ক গ্রন্থে একজন প্রশ্ন করছে, মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে নাকি বিধবা হয়! উত্তরে আর একজন বলছে—'না বইন, সে কেবল কথার কথা। কারণ আমি আমার ঠাকুরানি দিদির ঠাঁই শুনিয়াছি যে-কোনো শাস্ত্রে এমত লিখা নাই যে, মেয়্যামানুষ পড়িলে রাঁড় হয়। কেবল গতর শোগা মাগিরা এ-কথার সৃষ্টি করিয়া তিলে তাল করিয়াছে।' (পুরাতন বাংলা গদ্যগ্রন্থ সংকলন, ২য়) রাসসুন্দরী দেবীও আত্মজীবনীতে লেখেন, মেয়েদের লেখাপড়া শিখতে নেই, এটাই ছিল সাধারণ নিয়ম। এটা 'ভারি মন্দ কর্ম' বলে লোকে বিশ্বাস করত। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী লেখেন তাঁর মা ও ছেলেমেয়েরা ঘুমিয়ে পড়লে কিছু লিখতেন বা পড়তেন। তাদের এক প্রতিবেশিনী লোক-নিন্দার ভয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে হিসেব-কিতেব চিঠিপত্র লিখতেন।

এইখানে বলে নেওয়া যাক সত্যবতীর ক্ষেত্রে শিক্ষানিয়ন্ত্রণের কথা। এ-ও এক অর্থে অর্জিত শিক্ষার উত্তরাধিকাব। নবকুমারের ব্যঙ্গের সামনে সত্যবতী বলেছিল—'মাস্টারি করা তো সত্যবামনীর জন্মগত পেশা গো, আজন্ম তো মাস্টারি করেই এলাম।' (পৃ. ৪৯০) সত্যবতীর বাবা রামকালী বুঝেছিলেন ম্লেচ্ছ ভাষা হলেও ম্লেচ্ছ যুগে আর্থিক নিরাপত্তার সুযোগ-সুবিধা পেতে হলে ওই ভাষা আয়ত্ত করা একান্ত প্রয়োজন। রামকালীর মেয়ে চারপাশের জগৎ থেকে বুঝেছিল—'মানুষে আর জন্তুজানোয়ারে যে তফাৎ সে তো ওই বিদ্যে থেকেই।' কলকাতায় বাসা করার পর সত্যবতী যখন তার ঘর-সংসার নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার পেল তখন সে তার ছেলেদুটোকে ভালো স্কুলে ভর্তি করে দেবার দাবি জানায়। (পৃ. ৩৯২)

ছেলেদের কলেজে পড়া নবকুমার পছন্দ করেনি। সে বলেছিল সনাতন পিতার মতোই—'ছেলেরা এন্ট্রান্স পাশ করেছে শুনে সাহেব তো মহাখুশি।' সাহেব চাকরি দিতে চায় (পৃ. ৫৬৩) কিন্তু অল্পশিক্ষা, চাকরি, বিয়ে এই ছকে ছেলেদের জীবন চালাতে দিতে চায়নি সত্যবতী। তাই শেষ পর্যন্ত ছেলেরা কলেজে ভর্তি হয় এবং সুবর্ণলতা মায়ের কাছে অ আ শিখতে শুরু করে।

কিন্তু সত্যবতীর শিক্ষানিয়ন্ত্রণের দুঃসাহসিক উদাহরণ বংশপরিচয়ে কলঙ্কিত সুহাসকে আশ্রয় দেওয়া, তাকে বেথুন স্কুলে ভর্তি করা। এখানে অবশ্য তিনি অর্থাৎ লেখিকা অনেক জটিলতা এড়িয়ে গেছেন। যথা, তার সহপাঠিনীদের সঙ্গে সুহাসের সম্পর্ক, সুহাসের মনে বিদ্যা সম্পর্কে ইচ্ছা, সুহাসের মনে অন্যান্য বিষয়ে আগ্রহ অনাগ্রহ ইত্যাদি।

শিক্ষানিয়ন্ত্রণ প্রসঙ্গে পুনরুল্লেখ করি—মেয়েদের শিক্ষা দিলে তারা পুরুষের সমানাধিকার দাবি করবে. এ আশঙ্কা ছিল। সেকালের অনেকে, প্রকৃত সমাজে, এবং প্রথম প্রতিশ্রুতির নবকুমার স্ত্রীর মর্যাদা পুরুষের সমান কিছুতেই করতে চায়নি। পুথিগত শিক্ষা এবং সামাজিক শিক্ষার অর্জনই নারী-পুরুষ এবং দাম্পত্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে রুচি ও প্রবণতা গড়ে তুলতে, সমালোচনা করতে, সমালোচনা না-করতে প্রবৃত্ত করে। লেখিকা নগেন্দ্রবালা মুস্তাফী ১৮৯৫-তে লেখেন বাঙালি মহিলাদের অবস্থা পিঞ্জরাবদ্ধ পাখির মতো। স্ত্রী-শিক্ষার বিকাশ শুরু হওয়াতে অবরোধ নামেমাত্র কমছিল, সত্যবতীর মতো মেয়েদের ঔদার্য থাকলেও অবস্থা খুব সুবিধার ছিল না। পুরুষরা মেয়েদের কেবল এটুকু শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন যাতে মেয়েরা ভালো স্ত্রী হয়ে ওঠে, চিঠি লিখতে ও দিনের হিসেব রাখতে পারে। রমাসুন্দরী দাসী সেকালে এক প্রবন্ধে লেখেন : বাঙালি মেয়েরা পুরুষের পদানত, খাঁচার পাখির মতো বন্দি, মুক্তি চাই, দিতে পারে কেবল বিধাতা। (এতদ্দেশীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাভাব, বামাবোধিনী পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ ১২৭৫) অন্যদিকে মেয়েদের বড় অংশই মানকুমারী বসুর মতো মনে করতেন—'পুরুষজাতি স্ত্রীলোকের রক্ষাকর্তা ও আশ্রয়দাতা।'[১] স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক তখন ঘনিষ্ঠ ছিল না, দিনের বেলায় দেখাসাক্ষাৎ ছিল না, ছেলে বৌকে ভালোবাসছে দেখলে বাবা-মা অসুখী হতেন, বৌকে 'ডাইনি'ও মনে করতেন। (বৌমা, স্বর্ণলতা চৌধুরী, অন্তঃপুর, ১ম বর্ষ ১৮৯৮) বালিকাবধূর থেকে 'খোকার মা'র মর্যাদা বেশি ছিল। আর একটি কথা—মেয়েরাই ছিল মেয়েদের বাধা।

'প্রথম প্রতিশ্রুতি' উপন্যাসে গোড়াতেই দেখব সত্যবতীর মতো 'ধিঙ্গি' মেয়েকে এতটা বাড় বাড়তে দেওয়া উচিত নয়, ছেলের থেকে দাপট বেশি হবে কেন, তা-ছাড়া সে মেয়ে ছেলে, 'মান্যিমান ঘরের বৌ', ওরা জানলে বৌকে ঘরে নেবে না। আর একজায়গায় আছে 'পরিবারকে আবার না মারে কোন্ মন্দ?' এ নিয়ে লোককে বলার ছড়া বাঁধার কাজ কী? (পৃ. ৪৬) 'গলায় দড়ি' কথাটা ছিল মেয়েদের নিত্যব্যবহৃত কথার একটা, মেয়েরা অনেকেই শান্তি পেতে চাইত আত্মহত্যায়, যদিও সত্যবতী নয়। রাসু-সারদার দাম্পত্য কথোপকথনে দেখি সারদা বলছে—'আহা, পুরুষ ছেলে কী আর সহজে বুড়ো হয়'। (পৃ. ৭৯) সে সতিনের আশঙ্কা করে। রামকালী শাস্ত্রজ্ঞ মানুষ। তাই ভেবেছিলেন, 'সত্যবতীর দাম্পত্য সূচনায় সদুপদেশের দ্বারা কন্যার হৃদয়-কানন হতে সতিন কন্টকের মূলোৎপাটন করা কর্তব্য' (পৃ. ৯১) কিন্তু সত্যবতী উল্‌টো অনেকগুলো ব্রতমন্ত্র শুনিয়ে দেয়, যাতে সতিনের মৃত্যু কামনা করা হয়েছে, এক ধরনের বিক্ষোভ। শঙ্করী চরিত্রটিকে আশাপূর্ণা আনেন একটু বিপরীতমুখী হিসেবে, সামন্ত অবরোধ ডিঙিয়ে তার পালিয়ে যাওয়া, সত্যবতীর খানিকটা সমর্থন, পরে আবার দেখা ইত্যাদি আছে। যাই হোক, এই শঙ্করীর সূত্রেই তিনি বলে নেন মেয়েমহল এবং পুরুষমহলের পার্থক্য। 'চাটুয্যেদের এই শতখানেক সদস্য সম্বলিত সংসারে স্ত্রীরাই সহজে

স্বামীদের তত্ত্ব পান না, তা আর কেউ! অবশ্যি পুরুষের তত্ত্ববার্তা নেবার প্রয়োজনটাই বা কী মেয়েদের? দুজনের জীবনযাত্রার ধারা তো সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী। পুরুষের কর্মধারার চেহারা যেমন মেয়েদের অজানা, সেদিকে উঁকি মারবার সাহস মেয়েদের নেই, তেমনি পুরুষের নেই অবকাশ মেয়েদের কর্মকাণ্ডের দিকে অবহেলার দৃষ্টিটুকুও নিক্ষেপ করবার।" (পৃ. ১০৫) সত্যবতী মানতে চায়নি মেয়েরা মাটির পাত্র আর ছেলেরা সোনার বাসন। (পৃ. ৪৪২)

আশাপূর্ণা গল্পকে এভাবে সাজিয়েছেন—সত্যর বাপের বাড়িতে মা নেই, পিসি কঠোর সমালোচক, বাবা লিবার‍্যাল। শ্বশুরবাড়িতে সবাই স্ত্রী-বিচরণের বিরোধী। ইংরেজি শিক্ষার অপরিহার্যতা, কলকাতা গেলে অবধারিত চাকরি ইত্যাদি জানে সত্যবতীর স্বামী নবকুমার এবং এরকম আরও দু একজন, কিন্তু এজন্য ভবতোষ মাস্টার সমালোচিত হয় 'গাঁয়ের ছোঁড়াগুলোকে ক্ষ্যাপানোর গুরু' হিসেবে। এ যেন কলির পূর্ণতারই আর-এক প্রকাশ। (পৃ. ১৯৩) রামকালীর মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব রাখেননি তারাশঙ্করের পুরাতন মূল্যবোধ-আশ্রয়ী মানুষের মতো, তিনি 'ম্লেচ্ছ বিদ্যা বলে হেয় করবেন, এমন সংস্কারাচ্ছন্ন রামকালী নন। শিখুক, ভালোই।' (পৃ. ২১৯)

আশাপূর্ণার Plot arrangement-এর মধ্যে লক্ষ করব প্রথম প্রতিশ্রুতিতে সত্যবতী ও নবকুমার এবং সুবর্ণলতাতে সুবর্ণলতা ও প্রবোধের দাম্পত্য দেখানো হয়। সত্যবতী ও নবকুমারের নৈকট্য দেখানো হয় কলকাতার বাসাবাড়িতে। আর একটা কথা, তাহলে সত্যবতীকে বিদ্রোহিনী করার জন্য তিনি তাকে বাপের বাড়িতে রেখে ও পরে শ্বশুরবাড়িতে এবং চূড়ান্ত রূপ প্রকাশে একক বাসায় রেখেছেন কেন?

গোলাম মুরশিদ লিখছেন পাশ্চাত্য শিক্ষাহেতু নগরবাসী যুবকের মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য দানা বাঁধতে শুরু করে, এই শিক্ষাবশত মেয়েরাও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য চায়। 'বলা শক্ত, ঠিক কখন থেকে একক পরিবারেব ধারণা জনপ্রিয় হতে থাকে। তবে পূর্বোক্ত তরুণ ব্রাহ্মরা একান্নবর্তী পরিবার থেকে সরে আসেন ১৮৬০ ও ১৮৭০-এর দশকে।' ১৮৭৩ সালে 'বামাবোধিনী পত্রিকা'র একটি লেখায় বলা হয় 'আধুনিকা স্ত্রী একান্নবর্তী পরিবারের পরিবর্তে স্বামীর কর্মস্থলে স্বামী ও সন্তানদের সঙ্গে একক পরিবারেই বাস করতে চান এবং সেখানে পরিবারের একচ্ছত্র কর্ত্রী হতে চান।' (নব্যবঙ্গ মহিলা, বামাবোধিনী পত্রিকা, ফাল্গুন ১২৭৯) [নাবী-প্রগতি : আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণী/গোলাম মুরশিদ, পৃ. ৯৮-৯৯] সাল তারিখ মেলালে দেখা যাবে সত্যবতীর কলকাতায় বাসা করা এবং স্বামীপুত্র নিয়ে সংসারের 'একচ্ছত্র কর্ত্রী' হয়ে ওঠা ওই একই কালের ঘটনা। আনন্দচন্দ্র সেনগুপ্ত তাঁর 'গৃহিণীর কর্তব্য' বইতে 'পতির সুখ সন্তোষার্থে কী কী করিতে হইবে' তার একটি সুদীর্ঘ তালিকা পেশ করেছিলেন। তা হল- -(ক) স্বামীর প্রিয় জিনিস যত্নে রাখবে। (খ) নিজে রান্না করে খাওয়াবে। (গ) শোয়ার ঘর ও বিছানা নিজে পরিষ্কার করবে। (ঘ) সংসারে কোনো কিছুর অভাব হলে যখন তখন জানিয়ে স্বামীর বিরক্তি আনবে না। (ঙ) স্বামী কোনো কারণে রাগ করলে, অন্যায় গালমন্দ করলে অম্লানবদনে সহ্য করবে। (চ) স্বামীর সঙ্গে রহস্যালাপ করে তাকে খুশি করা কর্তব্য, কিন্তু তারও সময় আছে। (ছ) বৃথা অভিমান করে, কেঁদে স্বামীর

ভালোবাসা/দয়া আকর্ষণ বোকামি। (জ) সর্বদা নিজে ও ছেলেমেয়েদের পরিষ্কার রাখবে। (সম্বুদ্ধ চক্রবর্তীর বইতে উদ্ধৃত ১১০-১১১) সত্যবতী কখনোই এই বিধি মেনে চলেনি, সে তার কালের স্বতন্ত্র নায়িকা। সত্যবতীকে লেখিকা নিঃসঙ্গতায় স্থাপন করেননি। সত্যবতী স্বেচ্ছায় বাবাকে ফিরিয়ে দিয়েছে। যদিও বাবার কাছে উড়ো চিঠি গিয়েছিল—'আপনার কন্যা তাহার পূজনীয়া শ্বশ্রুমাতা কর্তৃক প্রহারিতাও হইতেছেন। সেই অবলা বালিকাকে রক্ষা করে, নিষ্ঠুর পাষাণপুরীতে এমন কেহই নাই। আপনার জামাতা ধর্মপত্নীর এবম্বিধ নির্যাতনে অবিরত অশ্রু বিসর্জন সার করিয়াছে।' (পৃ. ২৪৩) উপন্যাসের মধ্যে অবশ্য সেরকমের পরিচয় নেই, যদিও বাক্যের প্রহার আছে বিস্তর। সত্যবতী বুঝতে পেরেছিল চিঠির রচয়িতা কে বা কারা, তাই সে সমালোচনা করে নবকুমার, নিতাই, ভবতোষ মাস্টার সবাইকেই। এইভাবে 'প্রথম পত্নী-সম্ভাষণের বহুবিধ রোমাঞ্চময় এবং আবেগময় মধুর কল্পনা' কালিমালিপ্ত হয়ে যায়।

নবকুমার রামকালীর কাছ থেকে চলে আসার পরই সত্যর অবস্থা, লেখিকার মতে 'বাঁধা গরু ছাড়া পাওয়ার ধরন।' রামকালী ভুবনেশ্বরী দুজনেই সত্যবতীকে আনুগত্যের দীক্ষা দিতে চান। সত্যবতীর প্রথম সন্তানের জন্মপূর্ব মৃত্যুকে চিকিৎসাগত দিক থেকে না-দেখে 'ধিঙ্গী-পনার ফল' বলে পাড়ার বর্ষীয়সীরা।

শিক্ষালাভকে যদি ভিত্তি ভাবি তাহলে সামাজিকতার নানা ধরন-ধারণে এই শিক্ষা প্রভাবের পরিচয় ধরা পড়ে। পারিবারিক, অন্তঃপুরগত এবং পরিবারের বাইরে যে-সামাজিকতার পরিচয় তা যেমন অর্জিত শিক্ষার পরিচায়ক, অন্যদিকে নানা সংঘাতের ব্যাপার ঘটতে থাকে। উপন্যাসের গোড়ার দিকে, ৩য় অধ্যায়ে আমরা দেখি 'রান্নার দায়িত্ব দীনতারিণীর, মোক্ষদার ওপর সে রান্নার বিশুদ্ধতা রক্ষার দায়িত্ব।' (পৃ. ১০) সত্যবতী যেহেতু এখানে-ওখানে ঘোরে এবং রান্নার শুদ্ধতা নিয়ে তার ধারণা আলাদা, তাই অল্পেই মোক্ষদার সঙ্গে তার ঝগড়া লেগে যায়। বিধবার হেঁসেল থেকে পান্তাভাত চাওয়ার অভ্যাস থাকলে শ্বশুরবাড়িতে পেটুকতার কথা উঠবে। 'মুখে মুখে চোপা'র সমালোচনা এবং পরের ঘরে যাওয়ার বিভীষিকা দেখিয়ে' সত্যবতীকে সংযম শিক্ষার ব্যর্থ প্রয়াস চলে। মেয়ে-মানুষের ছিপ ফেলে মাছ ধরা, দূরে একা যাওয়া তাই প্রচলিত স্ত্রী-আচরণবিধির ব্যতিক্রম। সত্যবতী নেড়ু এবং পুণ্যিপিসির সঙ্গে পেঁচার চোখ গোনে, প্রয়োজনে দিবানিদ্রা দেয়। সত্যর যাবতীয় ব্যবহারের বড় অংশটা সমালোচ্য, রক্ষণশীল আত্মীয়াদের মধ্যে এর কারণ নির্ণয় হল—'এ হল খোলের গুণ' (পৃ. ৩২), রামকালীর প্রশ্রয়ে ধিঙ্গি মেয়েকে বাড়তে দেওয়া এ সব অলক্ষণ ঘটাচ্ছে। সে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে মস্করা করে, জটা সম্পর্কে ছড়া আউড়ে তাকে অতিষ্ঠ করে; ফলে সিদ্ধান্ত 'এ আর গেরস্ত ঘরের যুগ্যি নয়।' আসলে লেখিকা সত্যবতীকে বিদ্রোহিনী করলেও একেবারে কালাপাহাড় করতে চাননি। তাই সত্যবতী কোষ্ঠীতে বিশ্বাস করে, আঁতুড়ে কান্নাকে অকল্যাণকর মনে করে ইত্যাদি। এইখানেই আমরা বলে নিই যে, উনবিংশ শতাব্দীর পরিবর্তমান সমাজে, ইংরেজ-নিয়ন্ত্রিত সমাজে সত্যবতী-ও পয়সার মহিমা উপলব্ধি করতে শেখে (পৃ. ৪১৬), কলিকালে যে পয়সা মোক্ষ, তা বোঝে। (২,৪০২,৪১৩)

এইখানে আর একটি ব্যাপার বলে নিই। উনিশ শতকীয় বিত্তবানদের যেমন একাধিক বিবাহ তেমনি বারবনিতায় শ্বশুরের গমন সমাজ মেনে নিয়েছিল। সত্যবতীর শ্বশুর নীলাম্বর বাঁড়ুয্যে সন্ধ্যা-আহ্নিক-গায়ত্রী সেরে 'নিত্যনিয়মিত রাত চরতে' বেরিয়ে পড়েন, বাগদি পাড়ায় যান। এ নিয়ে স্বামী নবকুমারের কাছে তীব্র প্রতিবাদ প্রকাশ করে সত্যবতী। (২৭৪-৭৬) সে প্রতিবাদ করে আবার অসহায়তার দুঃখে কাঁদেও বটে।

ইতিহাসকার বলছেন 'দাম্পত্যও, যে মানুষের অনেকগুলি সম্পর্কের অন্যতম এ নিয়ে গত শতকের মধ্যভাগের আগে কাউকে তেমন চিন্তা করতে দেখি না।' (সম্বুদ্ধ চক্রবর্তী/অন্দরে অন্তরে, পৃ. ৯০) সম্বুদ্ধবাবু 'সংবাদ প্রভাকর' উদ্ধৃত করে জানাচ্ছেন—'আমি পূর্বে লিখিয়াছি যে স্ত্রী পুরুষে প্রায় অধিক প্রণয় থাকে না, তাহার কারণ এতদ্বিষয়ে পুরুষেরা প্রায় লম্পট, সমস্ত নিশি পরের ঘরে আমোদ-প্রমোদে থাকেন, এমত ব্যবহার স্ত্রীলোকদিগের সহ্য হয় না এবং সেইজন্য প্রায় পরস্পর দেখা হয় না।' এগুলো আগেও ছিল, কিন্তু এগুলো যে দাম্পত্য সম্পর্ক রচনায় অন্তরায় এই ধারণা টা ছিল না।

পুরুষের বারাঙ্গনাসক্তি যে ভীষণ বেড়ে গিয়েছিল তা সমসাময়িক কয়েকটি প্রহসনের নাম থেকেও বোঝা যায়। যেমন—ঘর থাকতে বাবুই ভেজে (হরিশচন্দ্র মিত্র, ১৮৬৩), ষাঁড় ভাঁড় মিথ্যা কথা তিন লয়ে কলকাতা (প্যারীমোহন সেন, ১২৭০), বেশ্যাসক্তি নিবর্তক নাটক (প্রসন্ন কুমার পাল, ১৮৬০) ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথও লেখেন—'এখনও দেখা যায় দেশের অনেক খ্যাতনামা লোক প্রকাশ্যে রাজপথে গাড়ি করিয়া বেশ্যা লইয়া যাইতে এবং ধূমধাম করিয়া বেশ্যা প্রতিপালন করিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করিবেন না এবং সমাজও সে বিষয়ে তাহাদিগকে লাঞ্ছনা করে না।' (হিন্দু বিবাহ) [সম্বুদ্ধ/পৃ. ১৫৫] গণিকাপল্লিতে যাতায়াত এবং বহুবিবাহ ব্যাপক হয়েছিল। আশাপূর্ণা অবশ্য এইসব সমস্যাগুলির উল্লেখ করলেও বিস্তৃত করেননি। বামাবোধিনী পত্রিকায় নিস্তারিণী দেবী লিখেছিলেন, 'কত ধর্মপরায়ণা সাধ্বী সুরাপায়ী বেশ্যাসক্ত মূর্খ নরাধম স্বামীর অত্যাচারে দিবানিশি অশ্রুবিগলিত নেত্রে কালযাপন করিতেছেন. ." ইত্যাদি। সত্যবতীর শ্বশুর নীলাম্বর বাঁড়ুয্যেকে নিয়ে নীলাম্বরের স্ত্রী এলোকেশীর কোনো মানসিক প্রতিক্রিয়া নেই, যদিও তার "আছে দেব-দ্বিজে পরমা ভক্তি। নীলাম্বরও সারা সকাল ওইখানেই থাকেন, চণ্ডীর পুথি পড়েন, মহিম্নস্তব আওড়ান।" (পৃ. ২৮০) এলোকেশী ছেলে-বৌয়ের কলকাতা-আসা প্রাণপণে বাধা দিতে চেয়েছিল। কিন্তু কলকাতায় আসার পর এবং নবকুমারের স্ত্রী-আনুগত্য থাকায় সমস্যা সৃষ্টি হয়নি। তবে কেমন যেন যান্ত্রিক লেগেছে। এলোকেশী যেহেতু দেখেছে তার আধিপত্যের চাপ বারেবারে থাকছে না, তাই বারংবার "বৌ বিদেয় করে দেওয়ার নাটক" করেছে কিন্তু নাটক জমেনি। বত্রিশ নম্বর অধ্যায় থেকেই আমরা সুখী দাম্পত্যের চেহারা পাই, যদিও নিতাই বা ভবতোষ মাস্টারকে নিয়ে পুরুষঘটিত আকর্ষণ-সম্পর্ক এনে প্লটের জটিলতা তৈরি করতে চেয়েছেন। দাম্পত্যটার সুখ জমে ওঠে বাচ্চা দুটির কথাবার্তা, আচার-আচরণে।

এরপরই আমরা দেখব দুটি তাৎপর্যপূর্ণ প্রয়াস আসছে সত্যবতীর জীবনে। তীব্র ব্যক্তিত্ব দিয়ে সে প্রয়োজনবোধে নিতাই বা ভবতোষকে দূরে সরিয়েছে। আবার প্রয়োজনে তাদের কাছে গেছে। ভবতোষের সঙ্গে সুহাসের বিয়ে দেওয়া রীতিমতো বৈপ্লবিক, কারণ সুহাসের

বংশপরিচয় কলঙ্কিত। ভবতোষ মাস্টারের সঙ্গে সত্যবতীর কথাবার্তায় আমরা জেনেছি enlightened ব্রাহ্ম ভবতোষ বলছে—"মেয়েছেলেদের জন্যে আরও অনেক ভালো ভালো কাজ আছে বৌমা, তাতেও সময় কাটবে। তা ছাড়া অবকাশ কালে ঘরে বসে বসে লেখাপড়া চর্চা করলেও..."। (পৃ. ৩৮৯) অর্থাৎ দুটো কথা বলা হচ্ছে—(ক) লেখাপড়া চর্চা (খ) "অনেক ভালো ভালো কাজ"। আমরা উপন্যাসটি পড়ে দেখব সত্যবতী স্বামী-পুত্র-পরিজনকে গোপন করে স্কুল চালায় সর্বমঙ্গলাতলায়, গিন্নি ও মাঝবয়সিদের আড্ডায়, কেউ ফুল-বিল্বপত্তর বেছে রাখে, কেউ মালা গাঁথে, একজন মুখে মুখে পুরাণ, রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনি বলে, পাঁচজনে শোনে, আবার গাল-গল্পও চলে। (পৃ. ৪৮৯)

শিক্ষা থেকেই কি আসে প্রতিবাদের সাহস? শিক্ষাই কি দিতে পারে প্রতিবাদের ফলশ্রুতি বহনের শক্তি ও সহিষ্ণুতা? রাসসুন্দরী দেবী লিখেছেন যে-সব মেয়েরা মাথা নত করে পুরুষেব সামনে দাঁড়িয়ে থাকত, তারাই ছিল সমাজের চোখে লক্ষ্মী মেয়ে। বস্তুত সত্যবতী প্রথমাবধি এর বিপরীতপন্থী। সত্যবতীকে তার স্রষ্টা প্রতিবাদিনী রূপেই এঁকেছেন। সত্যবতী অতি বাল্য থেকেই বিস্তর গালাগালি খেয়েছে, বিস্তর গালাগালি দিয়েছে। বাড়িতে মোক্ষদা তার বিরুদ্ধে, রামকালী তার পক্ষে। শ্বশুরবাড়িতে এলোকেশী তার বিরুদ্ধে, নবকুমারও অনেকটা বিরুদ্ধে। তার লাঞ্ছনা যেমন শুধু বাক্যের লাঞ্ছনা, (Romanticized), তেমনি তার কোনো বন্ধু নেই, ছোটবেলায় অবশ্য নেড়ু ছিল, পরে উধাও, উপন্যাসের শেষপর্বে আবার তাকে আনা হয় ভবঘুরে হিসেবে। কলকাতায় সে তার ইচ্ছামতন কাজ চালিয়েছে। মাঝেমাঝে অন্নপ্রাশনে বা বাড়িওলার ওখানে বিরোধ। এ অংশটা যেন একটু যান্ত্রিক। সাজানো। তাই বিবর্ণ। উনিশ শতকে এমনকী বিশ শতকেও 'অধিকাংশ মেয়ের কাছেই জীবনেব সার্থকতা ছিল স্বামী কেন্দ্রিক'। (সম্বুদ্ধ/পৃ.২১৯) কিন্তু সত্যবতী বা সুবর্ণলতা কেউই তা করতে চায়নি। এ-কথা ইতিহাসগত ভাবে সত্য যে, পুরুষরাই আমাদের সমাজে নারীমুক্তি ও নারীপ্রগতির দাবি জানিয়েছিল প্রথম। উনিশ শতকী বিবাহব্যবস্থায় স্বামীদেবতার উদ্দেশ্যে স্ত্রীকে বলিপ্রদান যেমন সত্যবতীর জীবনে তেমনি তার মেয়ে সুবর্ণলতার জীবনে ঘটেছে। এটা জানতে পেরে সত্যবতী চিরকালের মতো স্বামীকে ত্যাগ করে। এ রীতিমতন বিদ্রোহ, আদর্শের জন্য ত্যাগ, আর এর জোর আসছে শিক্ষা থেকে। সম্বুদ্ধ ঠিকই মন্তব্য করেন—'মুখ না খুললেও মেয়েদের মধ্যে বাষ্প যে ধীরে ধীরে জমা হচ্ছিল, তা অনেকে বুঝেছিলেন। মেয়েরা তাদের স্থান কাল পাত্রপাত্রীভেদে নিজস্ব ভঙ্গিতে সেই বাষ্পকে প্রকাশ করছিল।' (সম্বুদ্ধ/পৃ. ১৪৭)

ভাবাব্যবহারে অশালীন শব্দ ব্যবহারের জন্য (মাগীটা) সত্যবতী স্বামীকে সমালোচনা করে। ছেলেদের কলকাতার ভালো স্কুলে পড়ানো, সুহাসকে বেথুনে পড়ানো, বয়স্ক মহিলাদের কাছে নিজেকে শিক্ষয়িত্রীরূপে উপস্থিত করা, প্রয়োজনে পুরুষের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করা, ইংরেজ পুলিশ সাহেবের কাছে নিজের নামে 'এনকোয়ারি'র আবেদন জানিয়ে চিঠি পাঠানো (নিতাই এর বৌ ভাবিনীর বোনের শোচনীয় অকালমৃত্যু) এবং ইংরেজ পুলিশ সাহেবের সঙ্গে কথার মোকাবিলা ('ওজস্বিনী বক্তৃতা') ইত্যাদি যেমন উনিশ শতকী শিক্ষার ফল, তেমনি প্রগতি ও প্রতিবাদের দৃষ্টান্ত বটে। বস্তুত আশাপূর্ণার উদ্দেশ্যও ছিল

তাই। তিনি লিখেছেন—'যদি কিছু বিদ্রোহিনী চরিত্র সৃষ্টি করে থাকি সেটা করেছি প্রতিবাদ করবার মাধ্যম হিসেবেই।' (যা দেখি, তাই লিখি, আর এক আশাপূর্ণা, পৃ. ১৭) আরেক জায়গায় আরও স্পষ্ট করে বলছেন—'ছেলেবেলা থেকেই আমার প্রশ্ন-মুখর মন তখনকার প্রচলিত সমাজব্যবস্থার অসঙ্গতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে প্রখর হয়ে উঠেছে।...বেশি পীড়িত করেছে মেয়েদের অবস্থা। কেন তাদের সকল বিষয়ে এই অধিকারহীনতা? ...এইসব প্রশ্ন আমায় স্থির হতে দেয়নি, হয়তো এই প্রশ্নের ফলশ্রুতিই আমার প্রথম প্রতিশ্রুতি।' (আমার সাহিত্য চিন্তা, আর এক আশাপূর্ণা, পৃ. ২০) যশবীর জৈন লিখছেন—'Education is the second strength of this country. Because if women are educated it is possible for them to use their brains. Education has enabled them to work for the progress of the land...Education increasingly helps more efficiently.' (Feminizing political Discourse/Jasbir Jain, pg. 155)। সত্যবতী ও সুবর্ণলতার আলেখ্য এই কথারই ঔপন্যাসিক কায়ারূপ। অন্যদিকে নারী-প্রশ্ন রাজনৈতিক প্রশ্নও বটে। পার্থ চ্যাটার্জি লিখেছেন, 'A central element in the ideological justification of British Colonial rule was the criticism of the degenerate and barbaric social customs of the Indian people, sanctioned or so it was believed, by the religious tradition...by assuming a position of sympathy with the unfree and oppressed womanhood of India...' (The Nation and Its Fragments, pg. 117-18) আশাপূর্ণা এই দৃষ্টিতে নারী-প্রশ্নকে দেখেননি। যেমন তাঁর বইতে তৎকালীন ধর্মাচরণের যে প্রবল চাপ তা তেমন গুরুত্ব পায়নি, বহুবিবাহ ও সতিন-সমস্যা পরোক্ষে স্থান পেয়েছে, রান্না-ঘরকন্না নিয়ে বিদ্রোহ নেই, স্বামীর ভালোবাসা পাওয়া-না-পাওয়ার সংকট নেই। কিছুটা অতিসরলীকৃত মনে হতে পারে। কিন্তু নায়িকার বিজয় ও দাপট সৃষ্টি করতেই হবে, প্রেরণা জাগাতে হবে শত নারীর মনে এমন একটা অভিলাষ প্লট পরিকল্পনায় ছিল তা বুঝতে কষ্ট হয় না। সেই সামাজিক কর্তব্য পালন, দায়বদ্ধতার সার্থক কারুকৃতি, ঈষৎ Romaticized হলেও, তা যে 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' এ বিষয়ে সংশয় নেই আমাদের। এদিক অভিব্যক্তি থেকে, ইতিহাসবোধের প্রতি ভাবাবেগগত আনুগত্যের কারণে, উপন্যাস-প্রচেষ্টাটি অভিনন্দনীয় নিশ্চয়ই বলা যাবে।

আসন্ন, শুশ্রূষার বার্তা ত্রয়ী উপন্যাস : নারীসত্তার আখ্যান

রামী চক্রবর্তী

প্রথম প্রতিশ্রুতি

'আম্রপালী পালিয়ে যায়, পেছনে তার সমাজ তাড়া করে/আম্রপালী বাঁচতে চায়...'[১] পরম নারী[২] আম্রপালীর পক্ষে গণবিধান ছিল নগর 'নটী হওয়া'[৩] কিন্তু বৈশালীর নিষ্পাপ এই নারী কি এই অ-সাধারণ জীবন চেয়েছিল! প্রশ্ন জাগে হাজার হাজার বছর ধরে আম্রপালীরা কি শুধু সমাজে অনুমোদিত লক্ষ্মণরেখায় বন্দি জীবন কাটাবে, এটাই ভবিষ্যতের ইঙ্গিত! ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, সময়ের পরিক্রমায় কোনো কিছুই স্থায়ী বলে অনড় হতে পারে না। তাই আম্রপালী, খনা, সুলতানা রিজিয়ার উত্তরসূরিদের বাঁচার অভীপ্সা থেকে বঞ্চিত করা যায় না। তারা বেঁচে থাকার জন্য মরণপণ সংগ্রামে মেতে ওঠে। মেতে ওঠে রক্তক্ষয়ী অস্তরাগে নতুন শতক গড়ে তুলতে। কেননা যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত অত্যাচারের নিষ্ঠুরতাকে জয় করে আম্রপালীকেই যে অচলায়তনের রুদ্ধ দ্বার ভাঙার সত্যকে বহন করার পক্ষে সক্ষম সত্যবতী হয়ে উঠতে হবে। যুগোত্তীর্ণ হতে হবে তাকে। তবেই না পূর্ণ আকাশের নিঃশুল্ক অধিকারিণী হতে পারবে সে। সেই সমাজগত সত্যকেই প্রতিষ্ঠা করার আন্দোলনে মুখরিত হয়ে উঠেছিল উনিশ শতক। তাই বলতে বাধা নেই আম্রপালী থেকে সত্যবতী—এই দীর্ঘ পথপরিক্রমার ঊষালগ্নের ভিত্তিপ্রস্তরটি কিন্তু গড়ে উঠেছিল সেই শতকে ঘটে যাওয়া নারীমুক্তি আন্দোলনের প্রেক্ষিতে। প্রকৃত অর্থে তা গুটিকয়েক নারীদরদি ব্যক্তির অক্লান্ত সাধনারই প্রতিশ্রুতি। উনিশ শতকের সামাজিক ইতিহাসের চিত্রপটটি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি না তাতে নারীর মুক্তি আন্দোলনের রূপরেখাটি অনালোকিত থেকে যায়। উনিশ শতকের সমস্ত প্রহর জুড়েই আন্দোলনের ঘনঘটা, স্বাধীন স্বকীয় আত্মবিকাশের অবরুদ্ধ পথকে ভেঙে ফেলে মুক্ত আকাশে নিঃশ্বাস নেওয়ার অবকাশের পালা। রাজা রামমোহন রায়, আলেকজেন্ডার ডাফ্, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, নর্মান বেথুন প্রমুখ সমাজসংস্কারকদের ইতিহাস সচেতন অন্তর্দৃষ্টির জাগৃতিতে স্ত্রী-শিক্ষা প্রচলনের পাশাপাশি সতীদাহ নিবারণ, বিধবাবিবাহ প্রচলন, বহুবিবাহ বিরোধী আন্দোলন, বাল্যবিবাহ বিরোধী আন্দোলন ইত্যাদি নারীকেন্দ্রিক সামাজিক প্রক্ষেপণে সমাজের বহুপ্রোথিত ভিতটি যেন নড়ে ওঠে। উনিশ শতকীয় নবজাগরণের প্রত্যক্ষ প্রভাবে তৎকালীন প্রগতিশীল ব্যক্তিবর্গের চেতনায় যে উগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ জন্ম নিয়েছিল, তারই কল্যাণকামী সদিচ্ছা যেন ধ্রুবসত্য রূপে দেখা দিল; ঘোষিত হল, 'মানুষের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতিই এ যুগের মানবধর্মের সাধনা'[৪]। আর এই ব্যক্তিত্ববিকাশের চলমান পথ ধরেই উন্মোচিত হয়েছিল নারীর অন্তর্জগতের অন্ধকার যবনিকা উন্মোচনের ইতিহাস।

জলের তলদেশে কম্পন সৃষ্টি হলে বাইরে আছড়ে পড়ে তার ঢেউ। সেটার বহিঃপ্রকাশ স্বাভাবিক। কিন্তু বাইরে যখন প্রবল ঝড়ো হাওয়া বয়ে যায় তখন ঘরের নিশ্চিত নিরাপদ আশ্রয়ে থেকেও কি ঝড়ের উপস্থিতিকে অস্বীকার করা যায়! যায় না-বলেই অন্ধকার প্রকোষ্ঠের ফাঁকফোকর দিয়ে যখন বাইরের আলো প্রবেশ করে তখন নিতান্ত অসহায় হয়েই

অসহিষ্ণু মন বিদ্রোহ করে বসে। তখন দুঃসাহসিক কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় প্রাণ। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে যে-ইতিহাসকে নথিবদ্ধ করেছিল সময়, তা এই অন্ধকারের অন্তঃপুরচারিকাদের বৈপ্লবিক কথকতারই বিক্ষিপ্ত দলিল। বিশ শতকে এসে তার প্রকাশ অনাবৃত হয়ে পড়ে। সেই সময়েরই একজন বঙ্গললনার সংগ্রামী জীবন-অভিজ্ঞতায় তাই যেন আত্মজিজ্ঞাসার সুর শোনা যায় :

> *'এই বিংশ শতাব্দীর সভ্য সমাজে আমরা কী, দাসী!! পৃথিবী হইতে দাস ব্যবসায় উঠিয়া গিয়াছে শুনিতে পাই, কিন্তু আমাদের দাসত্ব গিয়াছে কি? আমরা যে নরাধীন সেই নরাধীন। দিদিমাদের মুখে শুনি যে, নারী নরের অধীন থাকিবে, ইহা ঈশ্বরেরই অভিপ্রেত—তিনি প্রথমে পুরুষ সৃষ্টি করিয়াছেন, পরে তাহার সেবা শুশ্রূষার নিমিত্তে রমণীর সৃষ্টি হয়। কিন্তু এ কথায় আমার সন্দেহ আছে। কারণ দিদিমাদের এ জ্ঞান পুরুষের নিকট হইতে গৃহীত। তাঁহারা তো বলিবেনই যে, রমণী কেবল পুরুষের সুখশান্তি ধাত্রীরূপে জন্মগ্রহণ করে।'*[৫]

এ ধরনের ব্যতিক্রমী কণ্ঠস্বর আন্দোলিত যুগাগ্নির উত্তাপকে বহন করেই ভাস্বর হয়ে উঠেছে। কিন্তু কতটা সুদূরপ্রসারী ছিল সে-জাগরণ, এ বিস্ময় আমাদের এক প্রশ্নচিহ্নের সম্মুখীন করে। নারীর স্বাধীন আত্মবিকাশ কিংবা আত্মোন্মোচন : উনিশ শতকের মুক্তি আন্দোলনের প্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে এ কথাগুলোর পুনর্মূল্যায়ন খুব প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। কেননা সেই শতকের নারীমুক্তি আন্দোলন প্রকৃত অর্থে কতটা নারীর অন্তর্মুক্তি ঘটিয়েছিল, সেটা বিচার সাপেক্ষ। যেসব প্রগতিশীল সমাজব্যক্তিত্ব (দু-একজন ব্যতিরেকে) পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহে পড়ে নারীকে (বিশেষ অর্থে তাদের স্ত্রীদের) রুদ্ধাবস্থা থেকে মুক্তি দিয়ে তাদের নিজেদের সঙ্গে মানিয়ে নিতে সমাজের পক্ষে 'চলনসই' করে তুলতে চেয়েছিলেন, পিঞ্জরাবদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্ত বাতায়নে নারীর এই প্রবেশাধিকারকে যদিও নারীমুক্তি আন্দোলন আখ্যা দেওয়া হয়, এ সঙ্গে এ সত্যটিও অস্বীকার করা যায় না যে অবগুণ্ঠন থেকে মুক্তি মানেই অন্তর্মুক্তি নয়।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তখন দেখা গেছে যেসব ব্যক্তি নারীর অবরোধ মোচনের জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন সন্দেহাতীতভাবে তাঁরাই আবার একটি বিবর্তনের সীমায়িত গণ্ডি নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন নারীদের জন্যে। প্রাসঙ্গিক উল্লেখ্য হতে পারে ১৮৭২ সালের জানুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ'-এর উপাসনা কক্ষে পুরুষের সঙ্গে একই স্থানে বসতে আগ্রহী কিছু কিছু শিক্ষিত ব্যক্তির পরিবারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নারীদের নিষেধ করা হয়েছিল। সে-যুগের অন্যতম নারীদরদি প্রগতিশীল ব্রাহ্ম নেতা কেশবচন্দ্র সেনও এর বিরুদ্ধেই যুক্তি দেখিয়েছিলেন। তাই 'নারীমুক্তি বলতে পুরুষরা যা যা বুঝতেন, তা হল অতি হীনাবস্থা থেকে মহিলাদের যৎকিঞ্চিৎ উর্দ্ধে তোলা'[৬]। সে-সময়ের স্ত্রী-শিক্ষার অবস্থার বর্ণনা কল্পে নারীদের শিক্ষা পাঠক্রম পুরুষদের চেয়ে ভিন্নতর হওয়া উচিত কী না এ নিয়েও বিতর্ক শুরু হয়েছিল। সেই সঙ্গে এ-ও উল্লেখ্য যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারীর অবরোধ মোচনের আন্দোলন শুরু হয়েছিল ব্রাহ্ম সমাজের গণ্ডিতেই। তাই তৎকালীন রক্ষণশীল হিন্দু পরিবারের অন্তঃপুরের

চিত্রটি কিন্তু আমাদের কাছে খুব স্পষ্ট নয়। উনিশ শতক পেরিয়ে বিশ শতকের শুরুতেও যখন 'একান্নবর্তী পরিবারই তাদের কাঙ্ক্ষিত ছিল'[৭], গুটিকয়েক ব্যক্তি ছাড়া শিক্ষাকে তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন এক ধরনের আধুনিকতায় যোগ্য হয়ে ওঠার প্রশিক্ষণ হিসেবে; সেখানে নিতান্ত আটপৌরে সমাজের অব্যক্ত যন্ত্রণার ইতিহাসকে তুলে ধরা একজন সমকালীন লেখকের পক্ষে খুবই দুরূহ কাজ।

তবুও সেই দুরূহ কাজটিকে অর্থাৎ অন্তঃপুরের অকথিত পাঁচালিকে নিতান্ত আটপৌরে রীতিতে সর্বসমক্ষে তুলে ধরার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন আশাপূর্ণা। যুগগত ভাব-সংঘাতের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে অনালোকিত স্থবির অন্তর্জগতে বহির্জগতের হাজারও আন্দোলন কোনো বিপ্লব সৃষ্টি করতে না পারলেও তাতে পরিবর্তনের এক চোরাস্রোত বয়ে চলে, সেই নেপথ্য রঙ্গমঞ্চের অলিখিত ভাবনার বয়ান নির্মাণ তাঁর পক্ষে যথেষ্টই প্রগতিশীল পদক্ষেপ ছিল। কেননা, আশাপূর্ণার পূর্বসূরি বা সমকালীন লেখক-লেখিকাদের হাত ধরে তখন সাহিত্যের অঙ্গনে নারী তার শারীরিক উপস্থিতিকে কায়েম করে নিয়েছে। আবার কোথাও কোথাও মাঝে মাঝে মানসিক অভিপ্রায়টিও যে সম্পূর্ণ অকথিত রয়ে যাচ্ছে, এ কথাটিও বোধহয় খুব জোর দিয়ে বলা যাবে না। অবস্থানগত স্পষ্টীকরণের জন্য (যদিও সেটা তুলনামূলক সময়ের তুলাদণ্ডে বাড়ে, কমে) প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে কোনো পুরুষের চোখে নারীর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের অভিপ্রায়টি। প্রত্যক্ষ রাজনীতিক ভাবাদর্শে দীক্ষিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের 'রাজনীতিক অধিকার সচেতন'[৮] নারী বলে ওঠে :

> *"আমাদের মেলামেশায় সব কৃত্রিম ব্যবধান ভেঙে দেওয়া হয়, কাজেকর্মে চলাফেরার সময়ে অসময়ে সব অবস্থায় সবসময় সমানভাবে আমরা মেলামেশা করি। ঠিক এজন্যই বাইরে আমাদের বদনাম রটে, কিন্তু আসলে এইজন্যই সমাজের উঁচু থেকে নিচু পর্যন্ত সমস্ত স্তরের চেয়ে আমাদের মধ্যে বিকাব কম, অসংযম কম। সর্বত্র খোঁচা দিয়ে যৌনচেতনাকে জাগিয়ে রাখার সব ব্যবস্থা আমরা বাতিল করে দিয়েছি।"*[৯]

সেই লেখকের ভাবনার টানাপোড়েনেই যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে ব্যক্তিক এবং নৈর্ব্যক্তিক রাজনীতির দ্বান্দ্বিক রূপ। তাই তাঁর 'স্বাধীনতার স্বাদ' উপন্যাসে ভূষণের ফ্যাসিস্ট বিরোধী কথা শুনে মনিমালার যখন মনে হয় 'তাকে আর তার ছেলেমেয়েদের সুশীলের পায়ের জোরে দাসদাসী বানিয়ে রাখার চেষ্টাও অনেকটা এই রকম।'[১০] সেই স্বাধীন সত্ত্বাধিকারিণীকেও কিন্তু কোনো উত্তরণবিহীন স্বামীর কাছেই ফিরিয়ে দেন লেখক। এখানেই যেন প্রত্যক্ষ রাজনীতি কিংবা সামাজিক শিক্ষার পরোয়া না-করেও আশাপূর্ণার সত্যবতী শুধুমাত্র জীবন-অভিজ্ঞতার পাঠ নিয়ে স্বামীর বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিরোধ করে বসে। ঘর ছাড়ার দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

এ তো গেল একজন লেখকের কথা। কিন্তু সে-সময়ের একজন লেখিকার কলমে কেমন ছিল নারীর অবস্থান, একজন নারীর দৃষ্টিতে অঙ্কিত নারী কতটা নারীর আঙরাখায় বেষ্টিত নারী হিসেবে এবং কতটা পিতৃতান্ত্রিক সমাজে আরোপিত নারীর খোলসমুক্ত ব্যক্তিনারী

হিসেবে সপ্রতিভ হয়ে উঠতে পেরেছে, সেটাই বিচার্য। তবে সর্বাগ্রেই এটা অনস্বীকার্য যে ত্রয়ী উপন্যাসের ক্ষেত্রে এই অলিখিত বিভাজন রেখাটি যতটা স্পষ্টভাবে আলোচিত হয়েছে, অন্য উপন্যাসগুলিতে ভাবনার উপস্থিতি খুবই অস্পষ্ট। তাই আশাপূর্ণার উপন্যাসে নারীর দ্বৈতসত্তার স্পষ্টীকরণ খুব প্রাসঙ্গিক। নারীর আদলে গড়া নারী এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে ভাস্বর নারী—এই দ্বৈত অবস্থানের নিরিখেই তাঁর ত্রয়ী উপন্যাসের নারীর যথার্থ অবস্থানকে চিহ্নিত করা যেতে পারে। যেখানে তিনি বিশ্বাস করেন :

> *"যে বস্তুগুলির প্রতি মানুষের পরম মূল্যবোধ 'স্নেহ প্রেম ভালোবাসা' এক কথায় যা জীবনের বনেদ বলে মনে হয়, যে বস্তু হয়তো মুহূর্তেই শূন্যের অঙ্কে পরিণত হয়ে যেতে পারে। তবুও মানুষ ওই অভ্যাসের সংস্কারটাকেই পরম মূল্যবান বলে আঁকড়ে ধরে রাখতে চায়।"*[১১]

আর সেখানেই আশাপূর্ণার নায়িকারা নারীর সহজাত স্বভাববোধে কল্পায়িত হয়ে যান। তিনি নারীর অধিকাবহীনতার প্রশ্নে মুখর হয়ে ওঠেন, অনাদিকাল ধরে সঞ্চিত করে রাখা ক্ষোভটাকে উগ্রে দেন এই বলে ·

> *"মেয়েদের সবকিছুতেই এমন অধিকাবহীনতা কেন? তাদের উপর অন্যায় শাসনের জাঁতা চাপানো কেন? তার জীবন অবরোধের মধ্যে কেন?"*[১২]

—এই 'কেন'-র উত্তর খুঁজতেই তাঁর ত্রয়ী উপন্যাসের নারীরা প্রজন্মগত পরম্পরায় জীবনরক্ষায় ভিন্নমাত্রা খুঁজে নেওয়ার প্রয়াস করে।

তাই রচনার মাত্রাগত ভিন্নতা যখন একই লেখিকার মধ্যে ভাবনাগত দিক থেকে বৈষম্যের সৃষ্টি করে, তখনই শিল্পসৃষ্টির পেছনে দায়ী অন্তর্নিহিত তাগিদ বা ভাবনার স্পষ্টীকরণ খুব প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ত্রয়ী উপন্যাস (বিশেষ করে প্রথম দুটি)-র সঙ্গে আশাপূর্ণার অন্য উপন্যাসগুলোর, বরং উল্টো করে বলা ভালো, ত্রয়ী নারীসত্তার সৃষ্টিকর্ত্রী আশাপূর্ণার সঙ্গে যেন অন্যান্য জনপ্রিয় উপন্যাসের ঔপন্যাসিক আশাপূর্ণাকে মেলানো যায় না। এর উৎস সূত্র খুঁজতে গেলে প্রথমেই সেই সময়ের প্রেক্ষিতটিকে স্পষ্ট করে নেওয়া দরকার, যে-সময়ে বসে এক নারীই তাঁর বয়ানে অন্য নারীর অবস্থানগত আখ্যান রচনার অলিখিত দায়িত্ব তুলে নেন হাতে। এক সামন্ততান্ত্রিক পরিকাঠামোই ছিল আশাপূর্ণার রচনা সাম্রাজ্যের মূল পটভূমি। তাই এ অবস্থায় যেখানে বাহ্যত কিছু ক্ষেত্রে নারীকে যুগগত কারণেই শিক্ষিত 'চলনসই' করে তুলে সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রে আপাত-প্রতিষ্ঠ করার কাজ চলছিল, তার মর্ম উদ্‌ঘাটনে কোনো সংবেদনশীলতার প্রশ্নই গড়ে ওঠেনি। সেই পরিবেশে দাঁড়িয়ে আশাপূর্ণার উপন্যাসে যেসব নারীদের কথা উঠে আসে (ত্রয়ী উপন্যাস ছাড়া) সেখানে পরিসরকেন্দ্রিক নারীর স্বচ্ছ কোনো অবস্থানই স্পষ্ট হয় না। সর্বত্রই যেন নারী-পুরুষ সম্পর্কিত সেই ক্ষমতার সম্পর্কটি অস্পষ্ট থেকে যায়। কেননা সেখানে চিরঅবদমিত কণ্ঠের অশ্রুত স্বরটাকেই সহজ স্বাভাবিক বলে মনে হয়। এর ব্যতিক্রম শুধু ত্রয়ী উপন্যাস। ত্রয়ী উপন্যাসের মধ্যেই প্রথম আশাপূর্ণা যেন স্পষ্ট করে দেখালেন আভিজাত্যহীন মধ্যবিত্ত মানসিকতা আঁকড়ে-থাকা পরিবারের অন্ধকার কুণ্ডে থেকেও

সত্যবতী কিংবা সুবর্ণলতার মতো নারীরা ব্যক্তি হিসেবেই নিজেদের পরিসরকে স্বতন্ত্র মর্যাদায় চিহ্নিত করে নিতে চাইছে সাংস্কৃতিক রাজনীতির সাপলুডোকে উপেক্ষা করেও। সার্থকতা কিংবা ব্যর্থতা—এই প্রশ্নের থেকেও যেন বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ে সে-যুগে দাঁড়িয়ে কোনো নারীর মনে আত্মজিজ্ঞাসা জেগেছে কী না তার যথাযথ অবস্থান সম্পর্কে। তাই 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' কিংবা 'সুবর্ণলতা' উপন্যাস দুটি কোনো পুরোপুরি নারীবাদী লেখিকার লেখা না-হলেও লেখিকা তাতে ব্যক্তি-সমাজের দ্বিমাত্রিক ভাবনার বিনিময়ে উত্তরসূরিদের কাছে অনেকটা প্রত্যাশাই জাগিয়ে তোলেন।

কিন্তু অন্তর্দৃষ্টির সন্দিগ্ধ চেতনার অবকাশে ত্রয়ী উপন্যাসের শেষ লগ্নে আশাপূর্ণার লিখন-অভিজ্ঞতায় যে মধ্যবিত্ত রক্ষণশীল দোটানা মনোভাবটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে, সেখানেই তার সাহিত্যচর্চার নিরন্তর অভিজ্ঞতার ফসল থেকে উঠে-আসা সাহিত্যের পরিসরে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ক্রমবিবর্তিত বিকশিত রূপটি প্রচ্ছন্ন থেকে যায়। তাই একজন শিল্পীর উত্থানকে ত্রয়ী উপন্যাসের তৃতীয় প্রজন্মের আত্মকথায় খুঁজে পাওয়া যায় না। কোথাও যেন স্রষ্টার জিজ্ঞাসা এবং নির্মাণের মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর থেকে যায়। 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'-র সত্যবতী এবং 'সুবর্ণলতা'-র সুবর্ণকে যে-জিজ্ঞাসায় তাড়িত হয়ে নির্মাণ করেন তিনি, সেই স্রষ্টার প্রতিকল্প সত্তাই যখন অনামিকা দেবী রূপে 'বকুলকথা'য় নির্মিত হন তখন সময়েব দিক থেকে অনেকটা এগিয়ে গিয়েও ভাবনার বিন্যাসে কোনো-এক পিছুটানের চোরাবালিতে আটকে যান তিনি। আধুনিকতার বিনির্মিত আকল্পকে নির্মাণ করতে গিয়ে যা করতে চান তা যেন এক সব অবস্থাতেই 'না-সময়ের' বিকৃত মানসিকতার প্রতিকৃতি হয়ে ওঠে। যা-ই হোক, শুরুতেই আপাত-সমাপ্তি না-ঘটিয়ে নির্ধারিত স্থানে ভাবনার ক্রমিক বিস্তার ঘটা'লে তাতে লক্ষ্যের পারম্পর্যটুকু রক্ষিত হবে। তাই সরাসরি চলে যেতে হয় সে-আলোচনায়, যেখানে এই সম্ভাবনাগুলির প্রাক্‌শর্তগুলি খুব স্পষ্টভাবেই ধরা পড়েছে। সেই সম্ভাব্য প্রতিশ্রুতিরই পূর্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' উপন্যাসে। সত্যবতী তারই রূপকার।

উপন্যাসের শুরুতেই এক তৃতীয় নারীর উপস্থিতিকে স্পষ্ট করে নেন লেখিকা। সে আর কেউ নয়, সত্যবতীর তৃতীয় প্রজন্ম বকুল যার কাছে তার দিদিমা সত্যবতী শুধু স্বপ্ন, কল্পনারী। তাই লেখিকা যেন বকুলের রূপকের আড়ালে ছবি আঁকেন সেই নারীর, যে-কল্পিত সত্তাকে তিনি দেখেছেন, 'স্বপ্নে আর কল্পনায়, ক্ষমতায় আর শ্রদ্ধায়'।[১৩] নিজেকে সরিয়ে রেখে দর্শনের গভীরতায় দেখেছিলেন সেই যুগকে, উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন সে-যুগের নারীদের; যে-যুগে একটু একটু করে নারী তার মৌলিক অভিজ্ঞান রচনায় প্রয়াসী হয়েছিল। তাই সমাজ নারীর জন্য যেসব অযৌক্তিক অচলায়তন গড়ে দিয়েছিল সনাতনকাল ধরে, তার প্রতিটি অর্গল ধরেই যেন নাড়া দিতে সক্ষম হয়েছিল লেখিকার কল্পনারী সত্যবতী। প্রয়োজনে যুক্তি-পারম্পর্যে সেসব সংস্কারপ্রথাকে ভেঙে দিয়েছিল সে। শৈশবেই তার চরিত্রে সেই নেতৃত্বের পূর্বকল্পিত রূপটি এঁকে দেন লেখিকা। তাই তো সত্য 'অপ্রতিহত প্রতাপে পাড়াসুদ্ধ ছেলেমেয়ের দলনেত্রী হয়ে যথেচ্ছ খেলে বেড়ায়।'[১৪]

লেখিকা উপন্যাসের প্রাক্‌শর্তরূপেই যেন পাঠককে সঙ্গী করে নিতে চান সত্যবতীর সেই

দুরন্ত শৈশবের সঙ্গে পরিচিতি ঘটিয়ে দিয়ে কেননা তাকেই তো লিখে যেতে হবে সেই অন্তঃপুরের অকথিত ঘটনার ইতিহাস যার প্রতি বহির্বিশ্ব চিরকালই উদাসীন। তাই তো রামকালী চাটুয্যে 'চাটুয্যে বামুনের ঘরের ছেলে হলেও ব্রাহ্মণজনোচিত পেশা'[১৫] নেননি; সেই মুক্তমনা বাবার কাছেই শুরু হয়েছিল তার সংসার-নাট্যের মহড়া। 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' উপন্যাসের ক্যানভাসে ধরা পড়েছে এমন এক একান্নবর্তী পরিবারের ছবি যেখানে বাপ-ঠাকুর্দার পরিবারের এবং তাদের সংশ্লিষ্ট আশ্রিতদের ভিন্ন জীবনচর্যায় হিন্দু সমাজের এবং বিশেষ করে সেই সমাজের নারীর অবস্থানটুকু স্পষ্ট মাত্রায় চিহ্নিত। যে-সমাজ একদিকে গোঁড়া রক্ষণশীলতার শতাধিক শরশয্যা বিছিয়ে রেখেছে নারীদের জন্যে, কমবয়েসি মেয়েদের 'ছিপ ফেলে মাছ ধরা'[১৬] টা' যেমন সাপের পাঁচ পা দেখার মতো গর্হিত কাজ মোক্ষদার কাছে আবার বিধবার হাঁড়িতে পান্তাভাত থাকাটাও এক অনৈতিক কাজ বলেই বিবেচিত হয়। দীনতারিণী, শিবজায়া, মোক্ষদা এরা কিন্তু কেউ স্বয়ংসম্পূর্ণা নারী নয়। নারীর আঙরাখায় বেষ্টিত এই সমাজেরই তৈরি নারীত্বের আদল মাত্র। এরা পুরুষদের শিখিয়ে দেওয়া পাঁচালিকেই গেয়ে বেড়ায় আজীবন নিজেদের সব আকাঙ্ক্ষাকে, জীবনের স্বাভাবিকতাকে গলা টিপে দিয়ে। যে মোক্ষদা 'দুরন্ত ক্ষিদে তেষ্টা'[১৭] চেপে রেখে জল খেয়ে তিন প্রহর কাটান, চোখের সামনে নিজেরই শৈশবের ব্যর্থ স্মৃতি' (সত্যবতী)-র সচল রূপকে যখন স্বেচ্ছায় ছুটে বেড়াতে দেখেন তাতে যে হাজারটা ত্রুটি দেখবেন তাতে সন্দেহ কী? মোক্ষদাদের মতো নারীদের জীবনধর্মকে নিঃশেষ করে দিয়ে যে-সমাজ তার শাসনযন্ত্রকে কায়েম রাখে শক্ত হাতে, সেই সমাজই কিন্তু বদ্যিবাড়িতে জাত-খোয়ানো রামকালী চাটুয্যের অর্থসচ্ছলতার বাড়বাড়ন্তের কাছে হার মেনে নিজে শাস্ত্র তৈরি করে। সে-শাস্ত্রে 'জাতের যিনি মাথা'[১৮] সেই ফেলু বাড়ুয্যের নয় বছরের মেয়ে ভুবনেশ্বরীর সঙ্গে রামকালীর বিয়ের বিধান দেয় বিনা প্রশ্নেই। শাস্ত্রের এই ঘৃণ্য অবাস্তব রূপ নয় বছরের সত্যকেও হতবাক করে দিয়েছিল। তাই বদ্ধ পুকুরে ঢিল ছুড়ে দিলে যেমন অসংখ্য তরঙ্গের সৃষ্টি হয়, ঠিক তেমনি এই সমাজের আরোপিত নিয়ম-শৃঙ্খলায় তৈরি অচলায়তনের বিরুদ্ধে ঢিল ছুড়ে দিয়ে যেন প্রথম বিরোধিতার তরঙ্গ সৃষ্টি করে সত্যবতী ঠাকুরমা, ছোট ঠাকুরমার বিরুদ্ধে বিষোদগার করে ·

> *'গামছা দিয়ে ধরলে দোষ হয় না, ছিপ দিয়ে ধরলেই দোষ! চুনোপুটি ধরলে দোষ হয় না। বড় মাছ ধরলেই দোষ! তোমাদের এসব শাস্তর কে লিখেছে গা?'*[১৯]

ফেলু বাড়ুজ্যেদের তৈরি করা সমাজে জটার বৌদের মতো নারীদের স্বতন্ত্র কোনো পরিচয় থাকে না। কখনো অমুকের বৌ আবার কখনো অমুকের মা। ফলে তার পক্ষে মরতে-মরতে বেঁচে যাওয়াটা যেন ভয়ংকর কোনো পাপের সামিল। সমাজের বৈধতায় সে তো 'মামাশ্বশুরের ছোঁয়াচ খাওয়া'[২০] ম্লেচ্ছ নারী, তাই তাকে সমাজে ঠাঁই পেতে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। আবার এই সমাজেই বেড়ে ওঠা নয় বছরের সত্য যেন বারুদে তৈরি কোনো কিশোরী। সেই বয়সেই সে জটার অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে ছড়া বাঁধে। আশাপূর্ণা যেন তাঁর কল্পনারীর ভিতকে শক্ত করে নেন কঠোর হাতে কারণ 'হেরে যেতে একান্ত আপত্তি

সত্যবতীর। কোনো ক্ষেত্রে কোথাও হার মানবে না এই পণ'।[২১] লেখিকার এই স্বীকারোক্তি যেন পাঠককে উদ্দেশ্য করেই; আগামী কোনো ঝড়ের পূর্বাভাসের ইঙ্গিত দিয়ে প্রথম থেকেই একটু একটু করে পাঠককে সঙ্গী করে নেন তিনি। আরম্ভ থেকেই লেখিকার সচেতন শিল্পসৃষ্টির দায়বদ্ধতাটুকু যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যে-সমাজে বড় হয়েছে সত্য, সে-সমাজে নারীর মূল্য নির্ধারিত হয় বস্তু বা বিষয় হিসেবে। সেখানে স্বামীর সোহাগকে ভাগ করে নেওয়াটই পরিচিত রীতি। তাই সারদার ভাগ্যের শনিকে ঢাকতে মোক্ষদা নৈতিক বাক্য পাঠ করেন :

> *'সোয়ামী কী মণ্ডা মিঠাই, যে একলা আস্তটা না খেতে পেলে পেট ভরবে না, ভাগ হয়ে গেলে প্রাণ ফেটে যাবে?'*[২২]

পিতৃতান্ত্রিক সমাজের এটাই বোধহয় সবচেয়ে নিষ্ঠুর চিত্র। নারীর মুখের ভাষাটুকুও নিজস্বতা হারিয়ে মান্যতার ভাষা শিখে নেয়, উপনিবেশীকৃত হয়ে পড়ে। সমাজের অগ্রগতিতে সংস্কারমুক্ত সমাজ গড়ার উপলব্ধিকে অনুধাবন করলেও শুরুর দিকে কিন্তু হিন্দু একান্নবর্তী পরিবারের অন্তঃপুরগুলিতে কোনো পরিবর্তন ছিল না। শিক্ষার প্রবেশও সেখানে ছিল অবৈধ। তাই সহজেই লগ্নভ্রষ্টা মেয়েকে (পটলী) বিবাহের সূত্রে বাঁধতে অনুমতি দেন রামকালী আর একটি মেয়েকে চিরকালের জন্য স্বামীর সোহাগ থেকে বঞ্চিত করে। কারণ তিনিও তো সেই কায়েমি শাসনতন্ত্রের অঙ্গস্বরূপ। তাই উপলব্ধির ক্ষমতা থাকলেও স্বরূপ পাল্টে নেবার সাহস কোথায়। কারণ তিনিও সেই দলেই, যাদের—'মানুষকে মানুষের মর্যাদা দেবার শিক্ষা আছে তাঁর শিক্ষা আছে বয়োজ্যেষ্ঠকে সম্মান সমীহ করবার, কিন্তু সমগ্র মেয়েমানুষ জাতটার প্রতি নেই তেমন সম্ভ্রমবোধ, নেই মূল্যবোধ।'[২৩]

সমগ্র উপন্যাস জুড়ে পুরুষ চরিত্র ব্যাখ্যানে স্বস্তির জায়গা যেটুকু, তা সত্যবতীর পিতা রামকালী চাটুয্যে কিন্তু তবুও তাকে ত্রুটিমুক্ত করেননি লেখিকা। এর নেপথ্য কারণ বোধহয় লুকিয়ে আছে এই ভাবনাতেই যে লেখিকা ত্রয়ী উপন্যাসের রূপরেখায় প্রজন্মগতভাবে নারীর উত্তরণ দেখাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ক্রমিক বিকাশের রূপরেখাকে তুলে ধরতে হলে বিভিন্ন স্তর পেরিয়ে-আসা নারীর আত্মসংগ্রামের পথটিকে স্পষ্ট করতে হবে। এই আত্মসংগ্রামের পথে প্রথম এবং শেষ পর্যন্ত যে-বাধাটি আসে সেটা হল নারী-পুরুষের ক্ষমতা-সম্পর্কের ব্যাপারটি। এ ক্ষেত্রে সমালোচকদের এ মন্তব্যটি প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয় :

> *'...সম্পর্ক যেখানে ক্ষমতা সম্পর্ক-সেখানে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার প্রকৃত স্বরেরও একটা রাজনৈতিক মাত্রা আছে। সেই ব্যক্তিগত স্বরকেও ধরতে চেয়েছেন আশাপূর্ণা। সেই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার রাজনৈতিক মাত্রা আজও বড় বেশি প্রাসঙ্গিক। নারী-পুরুষ ক্ষমতা সম্পর্কের প্রধান ভিত সদর-অন্দরের বিভাজন।'*[২৪]

পরবর্তী পর্যায়ে সত্যবতীর সঙ্গে স্বামী নবকুমারের প্রতিতুলনায় তা স্পষ্টাকারে বোঝা গেলেও পিতার ক্ষেত্রে এর সূক্ষ্ম রূপটি কিন্তু একেবারে মিটিয়ে দেওয়ার মতো নয়। সত্যবতীর বাবা, যিনি বাবার শাস্তি স্বরূপ দেওয়া অপমানের জ্বালাকে উপেক্ষা করে

আত্মসম্মানবোধে দেশান্তরী হন এবং স্বনির্ভরশীল হয়ে ফেরেন, এত সহজে কী করে তিনি নিজের কন্যার ভাবনার কাছে হার মেনে নেবেন। কন্যা হলেও তো সে নারী। তাই ক্ষমতায়নের প্রতাপেই বাইরে কাটিয়ে আসা ব্যক্তিটিও কিছুতেই মনের কুসংস্কারকে জয় করতে সমর্থ হন না। তাই নয় বছরের কন্যাকে বিয়ে দিয়ে গৌরীদানের পুণ্যসঞ্চয়ে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন না যেমন, ঠিক তেমনি সারদার সতিন সমস্যাকে তেমন গুরুত্ব না দিয়ে সত্যকে সেজুঁতি ব্রত বন্ধের আদেশ দেন। কারণ এ ব্রতে সতিনের অমঙ্গল কামনা করা হয়। তা হলে বলা যায় তিনিও এই সম্পর্কিত গণ্ডিতেই আবদ্ধ যার কাছে—

'মেয়ে মানুষ জাতই কুয়ের গোড়া'[২৫]

তার পক্ষে মানুষকে মানুষ হিসেবে সম্মান দেখানোটা সম্ভব হলেও সেই মানুষের সংজ্ঞায় 'মেয়েমানুষ বা নারীরা' যে তখনও অপাঙ্‌ক্তেয়, সেটা অস্বীকার করা যায় না। তাই সতিন-বরণ যে সারদার পক্ষে আর পাঁচটা পারিবারিক অনুষ্ঠানের মতো মেনে নেওয়া সম্ভব নয়, সেটা রামকালীর মতো দৃঢ় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষের পক্ষেও ভাবা সম্ভব ছিল না। সত্যবতীর প্রখর জিজ্ঞাসার সামনে রামকালীর সেই দুর্বল সত্তাটি জেগে উঠেছিল। তাই বাবার অজ্ঞতার প্রত্যুত্তরে সত্যবতী বলেছিল,

'...রুগীর চেহারা তুমি ওপর থেকে বলে দিতে পারো তার শরীরের মধ্যে কোথায় কী হচ্ছে, আর মানুষের মুখ দেখে বুঝতে পারো না তার প্রাণের ভেতরটায় কী হচ্ছে?'[২৬]

কিন্তু তবুও বলতে হয় রামকালীর মধ্যে অনুভূতিপ্রবণ একটি মন ছিল বলেই সত্যবতীর মতো প্রখর আত্মজিজ্ঞাসা সম্পন্ন মেয়েরও একমাত্র নির্ভরযোগ্য আশ্রয়স্থল ছিল বাবার সান্নিধ্য।

আশাপূর্ণার উপন্যাসে সত্যবতীর ভূমিকা এক প্রতিবাদী নারীর, তার প্রতিটি পদক্ষেপ সেই বদ্ধ সমাজের বিরুদ্ধে। যে-সমাজ কখনো ব্যক্তিসম্পর্কের ক্ষমতাবিন্যাসে, আবার কখনো বহুদিনের প্রচলিত সামাজিক প্রথার অনুশাসনে দীর্ঘ অচলাবস্থার শিকার। আশাপূর্ণা এক বিশাল সামাজিক বিন্যাসে ক্ষমতার সেই বহুমাত্রিক বিন্যাসকেই ফুটিয়ে তোলার যথার্থ প্রয়াস করেছিলেন। ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের (অর্থাৎ পারিবারিক) নিরিখে ক্ষমতা প্রক্রিয়াকরণের ব্যাপারটি আলোচনার অচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবেই এসেছে কারণ একজন ব্যক্তি পুরুষ কিংবা নারী হোক তার ব্যক্তিক এবং পারিবারিক দুটো অবস্থানই যথার্থ চিহ্নিত হয় পরিবারে ফল্গুধারার মতো প্রবাহিত ক্ষমতার চোরাস্রোতটির নিরিখে। সেই ক্ষমতা বিভাজনের মূল দুটি স্তম্ভ যেহেতু নারী এবং পুরুষ এবং প্রথম স্তম্ভটি চিরাচরিত প্রথানুসারেই দ্বিতীয় স্তম্ভের অধীন বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। তাই এ সূত্র ধরে নারী-পুরুষের মধ্যে লিঙ্গগত বৈষম্যের দিকটিও প্রাধান্য পেয়ে যায় অন্যতম বিশ্লেষিত বিষয় হিসেবে। 'চাটুয্যে বাড়ি'-তে জয়কালী চাটুয্যের দ্বিতীয় প্রজন্ম রামকালী চাটুয্যের একান্নবর্তী পরিবারে প্রধান ভূমিকাতে তিনি নিজেই অধিষ্ঠিত। সে-অধিকারকে তিনি অর্জন করে নিয়েছিলেন পেশা এবং আর্থিক স্বাচ্ছল্যের ভিত্তিতেই। তাই জ্ঞাত কিংবা অজ্ঞাতসারে অন্দর-বাহির প্রতিটি স্থানে প্রতিটি ক্ষেত্রেই ছিল তার প্রতাপের বিস্তার, সকলের সঙ্গে সম্পর্কের গণ্ডিটি সীমায়িত ছিল সমীহের মানদণ্ডে।

এমন অবস্থায় ক্ষমতার শীর্ষবিন্দুতে যার অবস্থিতি তার পক্ষে ক্ষমতা মেনে চলতে অভ্যস্ত অপরপক্ষের অন্তর্লোকের বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। কারণ বিশ্লেষণ তখনই সম্ভব হয় যখন অপরপক্ষ থেকে কোনো প্রতিবাদ উঠে আসে। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে যখন কোনো 'যৌক্তিকতা ছাড়াই ক্ষমতার আস্ফালন কায়েম'[২৭] থাকে এবং অপরপক্ষের কাছে সেটাই জীবনে সাধারণ স্বাভাবিকতা বলে মান্যতা পেয়ে যায়, তখন সেখানে কোনো জিজ্ঞাসা উঠে আসে না, ফলে প্রতিবাদের ভাষাও গড়ে ওঠে না।

রামকালী চাটুয্যের যৌথ পরিবারে আশ্রিতের সংখ্যাই বেশি, পিতৃকুল এবং তাদের শ্বশুরবাড়ির লোকেদেরও আশ্রয়স্থল এই চাটুয্যে বাড়ি। ফলে আশ্রয়ের পরিধি যতটা বেড়েছে মানসিক নৈকট্য কমে সেখানে প্রভু-আশ্রিত মধ্যেকার সমীহের সম্পর্কটাই বেড়ে উঠেছে। রামকালীর অজান্তেই তাঁর স্বরেও যেন প্রতাপের অন্তঃস্বরটি স্পষ্ট ধরা পড়ে। মোক্ষদা, শিবজায়া, কাশীশ্বরী এবং মা দীনতারিণীর অর্থাৎ বিধবা মহলের সঙ্গে রামকালী যেমন একটি দূরত্ব বজায় রেখে চলতেন, পুরুষ মহলেও তাঁর নিজস্ব একটি গণ্ডি গড়ে উঠেছিল নিজের ব্যক্তিত্বের গুণেই। আর যারা অনেকটাই দূর সম্পর্কের তারা তো রামকালীর গুরুগম্ভীর প্রতাপী স্বরের কাছে ভীতসন্ত্রস্ত থেকেও তাঁকে দেবতা জ্ঞান করতেন। শঙ্করীর বারবারই মনে হত এত পাপকর্ম সত্ত্বেও যিনি আশ্রয় দিয়েছেন তিনি সাধারণ মানব নন, ঈশ্বরের সমতুল্য, তা না-হলে 'এত ক্ষমা আর কোনো মানুষের মধ্যে সম্ভব?'[২৮] কিন্তু এতটা আশ্রয়-নির্ভরতাও শঙ্করীকে রামকালীর কাছে সত্য উত্থাপনে সাহসী করে তোলেনি; তাই তাকে পালিয়ে যেতে হয়েছিল। চাটুয্যে পরিবারে রামকালীই শাসন ব্যবস্থার শীর্ষবিন্দুতে আসীন, সে-সম্পর্কে সন্দেহের কোনো অবকাশই দেননি লেখিকা। রামকালীর ব্যক্তিক কিংবা প্রাতিষ্ঠানিক (পারিবারিক) দুটো সত্তাকেই পরিণতি দিয়েছিল অপ্রতিহত শাসনক্ষমতা। কিন্তু যাদের ক্ষমতার প্রতাপ রয়েছে তাদের মধ্যে যদি স্নেহবিগলিত হৃদয় না-থাকে তখনই শাসনের গণ্ডি শুধু শৃঙ্খলের নাগপাশ থেকে যায়। সেখানে সত্তা-অপরতাব, আশ্রয়দাতা-আশ্রিতের মধ্যে শুধু প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্কই কায়েম হতে পারে, সেখানে শুধু শোষণের অধিকারই প্রতিষ্ঠিত হয়, গৌরবের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। সত্যবতী ছাড়া অন্যদের কাছে রামকালীর যোগ্যতার বিচারের কোনো প্রয়োজন ছিল না। শুধুমাত্র সত্যবতীর যৌক্তিকতার কাছেই রামকালীকে থমকে যেতে হয়েছে। সত্যবতী যেন সমস্ত সম্পর্ককে বিনির্মিত করতে চেয়েছে যুক্তি-বিশ্লেষণের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে। সহজ সত্যকে সহজ করে বলাটাই তো সবচেয়ে কঠিন কাজ। কিন্তু সেই কঠিন কঠোর তপস্যায়ই ব্রতী হতে হয়েছিল সত্যবতীকে কেননা গোড়ায় গলদ থাকলে বিশাল ইমারত গড়ে তোলা যায না। তাই না সম্পূর্ণ সমাজের গোড়া ধরেই টান দেওয়া—যেখানে সবচেয়ে শ্রদ্ধার পাত্রটিও সত্যের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারেন না। এই সত্যবতীকেই তো সংকল্প নিতে হয়েছে মেয়েমানুষের ইতিহাস লেখার যা অদূর ভবিষ্যতে বহির্বিশ্বে স্থান পাবে।

বিবাহ-পূর্ব জীবনে রামকালীর সংসারে সত্যবতীর যে-অবস্থান ছিল সেখানে ক্ষমতায়নের প্রকোপের ইঙ্গিতটি প্রচ্ছন্ন। কেননা শেষ বয়সের একমাত্র কন্যার দুরন্তপনাকে অনেকখানি প্রশ্রয় দিয়েছেন রামকালী। তাই সত্যবতী এখানে যেন ক্ষমতার প্রতিবিম্বিত

দর্পণ মাত্র। তবে এ ধারণায়ও পুরোপুরি সত্যটি প্রচ্ছন্ন থেকে যাবে যদি না শৈশব থেকে সত্যের শ্বশুরবাড়িতে বসবাসকালীন পরিসরে ক্ষমতায়নের বিভিন্ন দিক কিংবা লিঙ্গগত বৈষম্যের বিরুদ্ধে সত্যের উত্থাপিত যুক্তি-বিশ্লেষণ উপেক্ষিত থেকে যায়। নেড়ুর উত্থাপিত 'মেয়েমানুষের' বিদ্যাশিক্ষা নিয়ে সত্যের যুক্তি প্রদর্শন কিংবা পরিবারের অন্যান্য নারী সদস্যের 'মেয়েমানুষ'-এই হীনমন্যতার স্বীকারোক্তির বিরুদ্ধে আত্মসচেতনতা ইত্যাদি ছোট ছোট ঘটনাই ইঙ্গিত দিয়ে যায় সত্যবতীর নেতৃত্বে গড়ে উঠবে কোনো ভবিষ্যৎ সংগ্রাম। তাই সময়ের সঙ্গে পরিসরের পরিবর্তনেরও যখন পরিকল্পনা চলে, তখন লিঙ্গ-বৈষম্যের স্বরূপ পাল্টে যায়।

উপন্যাসে প্রতিটি চরিত্রের যথার্থ অবস্থানকে নিয়ন্ত্রিত করে কাল এবং পরিসর। তাই উপন্যাসে কোনো চরিত্রের কার্যক্ষমতার গতি অনেকটাই নির্ভর করে সেই সময় এবং ক্ষেত্রের ওপর যেখানে তার অবস্থান রয়েছে। প্রতিটি মানুষই, বলা ভালো, উপন্যাসের চরিত্র নিজস্ব ধরনে অস্তিত্ব-সংকটের মীমাংসা খুঁজতে চায়। সে-ক্ষেত্রে সময় এবং পরিসরের যথার্থ সংযোগ সেই চরিত্রের গতিশীলতাকে এগিয়ে দিতে সাহায্য করে। 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' উপন্যাসেও সত্যবতীর নিজস্ব সংসারে নিজস্ব ভঙ্গিতে আত্মঅভিজ্ঞান গড়ে তোলার পর্বটি কেটেছিল কলকাতা শহরে। বাবার বাড়িতে থেকে সত্য যে-কলকাতার স্বপ্ন দেখেছিল এবং সেখানে যাওয়ার প্রতিজ্ঞা করেছিল, সেই স্বপ্নবীজকেই যেন একটু একটু করে মহীরূহ করে তোলার ব্রতে নিজেকে প্রস্তুত করে সত্য। লেখিকা খুব সূক্ষ্ম সচেতনতায় এমন একটি পরিসরকেই উপন্যাসের বিস্তৃত ক্যানভাসে নিয়ে আসাব চেষ্টা করেন, বঙ্গদেশে যেখানে নগরায়নের হাত ধরে স্ত্রী-শিক্ষার অর্থাৎ নারী-প্রগতির প্রথম বীজ রোপিত হয়েছিল। শৈশবে ছোট মামির মুখে সত্য শুনেছিল সেই স্বপ্নের দেশের কথা যেখানে 'একজন মেম নাকি দেশী ইস্কুল খুলেছে আর একজন সায়েব বিলিতী ইস্কুল খুলে দিয়েছে, কলকাতার মেয়েরা আর মুখ্যু থাকবে না।'[২৯] তখন থেকেই সত্য বদ্ধপরিকর ছিল সেখানে যাওয়ার জন্য। বিয়ের পরেও চলে তারই পূর্ণ প্রস্তুতি। তবে এবার উদ্দেশ্য সাধনে যোগ হয়েছে ভিন্ন মাত্রা। উদ্দেশ্য হল যাকে সঙ্গী করে সে জীবনের নবতর দিকে যাত্রা শুরু করেছে, তাকে নবযুগের সঙ্গে তৈরি করে নেওয়া কেননা সত্যবতী চেয়েছিল তার পরের প্রজন্মকে সেই নব আলোর মুখ দেখাতে। আর সেটা সম্ভব ছিল শুধুমাত্র গ্রাম থেকে শহরের মধ্যে দূরত্ব স্থাপন করেই। কেননা, তৎকালীন গ্রামীন পরিবেশে শিক্ষা সংস্কৃতির বৈধতা কিন্তু নির্ণীত হত বর্ণভিত্তিক পরম্পরাক্রমে। ম্লেচ্ছ জাতির (ব্রিটিশ) ভাষা মানেই তো ম্লেচ্ছ। তাই গ্রামের শিক্ষাবিমুখ পরিবেশকে যখন ভবতোষ মাস্টার কলকাতামুখী করে তোলার প্রয়াস করেন ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে, তিনি আখ্যায়িত হন 'নষ্টের গোড়া'[৩০] বলে। আর যাকে সঙ্গী করে সত্যবতী নিজের 'ডোবার ঘোলা জল থেকে মুক্ত হয়ে সাগরে তরী ভাসাতে'[৩১] চাইছে সেই নবকুমার তো শৈশব থেকেই বড় হয়েছে এক 'এঁদো' পরিবেশে যেখানে ইংরেজি পড়ে এলে 'জামা কাপড়গুলো'[৩২] ঘরে তোলা হত না; 'ছেড়ে হাত-পা ধুয়ে গঙ্গাজল স্পর্শ করে'[৩৩] তবে ঘরে ঢুকতে হত। কিন্তু নবকুমারের মনে কোনো প্রশ্ন জাগে না। কেননা শিক্ষাটা যেমন তাদের মতো মায়ের সোহাগে ভীত কাপুরুষদের কাছে একটা শখের বস্তু, জীবনের

বাস্তবতার সঙ্গে এর কোনো যোগসূত্র খুঁজে পায় না—ঠিক তেমনি কোনো সমাজবিদ্রোহী শিক্ষিত নারীর কল্পনা কবাই তো অন্যায়। লিঙ্গগত বৈষম্যের আরোপিত স্তরটিকে এভাবেই স্পষ্ট করে দেন আশাপূর্ণা।

লিঙ্গবৈষম্যের অনেকগুলো স্তর থাকে। সমালোচকের মতে 'লিঙ্গ সমস্যা একটি ত্রিমাত্রিক সমস্যা। চর্যা তার একটি মাত্রা, প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থন তার আর একটি মাত্রা এবং এই দুইয়ের আড়ালে কাজ করে চলে ধারণার রাজ্য যা কিনা সমস্যাটির তৃতীয় মাত্রা।'[৩৪] চর্যা মানে আচরণ—নারীর আচরণ কেমন হবে তার একটি প্রচলিত ছাঁচ তৈরি করে দেয় আমাদের পরিবার অর্থাৎ সমাজের প্রাথমিক সংস্করণ যাকে আভিধানিক নাম দেওয়া যেতে পারে প্রতিষ্ঠান; ফলে সেখানে পরিবারের কিংবা সমাজ নামক প্রতিষ্ঠানের সমর্থন না-থাকলে আচরণের তারতম্যের ওপর কোনো নারী বন্দিত হয় সতী লক্ষ্মী বলে আবার কেউ নিন্দিত হয় জাহাঁবাজ-অলুক্ষুনে-মুখরা—এসব বিশেষণে। এসব কিছু নির্ভর করছে কিছু আরোপিত ধারণার ওপর যে-ধারণাগুলি একপেশেভাবে দাঁড়িয়ে আছে সেই পারিবারিক প্রতিষ্ঠানের চালকশক্তির সুদৃঢ় মতামতের ওপর। একপেশে বলার কারণ হচ্ছে দীর্ঘকাল ধবেই এমন একটি ধারণা প্রচলিত আছে যে যাদের কর্তৃত্বের দৃঢ়তা আছে তাদেরই মতামত প্রতিষ্ঠার অধিকার আছে এবং তার অধিকর্তা শুধুমাত্র পুরুষেরাই। কারণ নারী তো বিনা যোগ্যতা প্রমাণেই অসম্পূর্ণ বলে প্রমাণিত। যদিও যোগ্যতা প্রমাণের যথাযোগ্য কাল এবং পরিসব, দুটোই তার কাছে ছিল অন্ধবিবরের সমতুল্য। তাকে শেখানো হয়েছে তাব জীবনের সার্থকতা সন্তান ধাবণের সক্ষমতায়। প্রথমে গ্রাম, পরে সমাজ, এরপরে পরিবার এবং সব শেষে আঁতুড়ঘর—ক্রমশই ঘরের মধ্যে ঘর তৈরি করে দিয়ে তাকে পিঞ্জবে বন্দি কবা হয়েছে। সে জেনেছে খাঁচার বদ্ধ পাখির মতো সে-ও প্রভুব অধীন, কিন্তু খাঁচাবন্দি পাখিবও একদিন মুক্ত বিহঙ্গকে দেখে উপলব্ধি জাগে তারও চাই পর্যাপ্ত আকাশ যেখানে সে স্বচ্ছন্দে তার ডানা মেলে ধরতে পারে। সত্যবতীও তাই চেয়েছিল শহরের কোলাহল দিযে গ্রামের নির্জীবতা ভাঙতে। কিন্তু যাকে নিয়ে সে চলতে চায়, সে যদি কালঘুমে অচেতন থাকতে চায, জেগে ওঠার সচেতনতাই উপলব্ধি না-করে, তাকে আত্মসচেতন কিংবা সমাজসচেতন বলা যায় না। সচেতনতাই দৃঢ়তার জন্ম দেয় আর দৃঢ়তা থেকে আসে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার অধিকার। এক্ষেত্রে সত্যবতীকেই যোগতার শিরোপা দেওয়া যায়। বুদ্ধি-বিচার-মননের ওপর নির্ভর করেই যোগ্যতার বিশ্লেষণ করা উচিত। অনেক ক্ষেত্রে দাম্পত্য সম্পর্কে ভুল ধারণার বশীভূত হয়েই লিঙ্গগত বৈষম্যের সৃষ্টি করা হয়। সত্যবতী এবং নবকুমারের সম্পর্কে সেটা প্রচ্ছন্ন নয়। পরিবারে সব ক্ষেত্রে সব সিদ্ধান্ত নিয়েছে সত্যবতী, সেখানে নবকুমারের ভূমিকা নিছক এক ভীতু, অস্থিরচিত্ত, বালকসুলভ বলেই মনে হয়েছে। কোনো যুক্তির সত্যতা প্রতিষ্ঠার পেছনে যে গভীর দৃষ্টিভঙ্গি বা মননের প্রয়োজন, সত্যবতীর ক্ষেত্রে তার কোনো অভাব ছিল না। প্রয়োজন ছিল শুধু সুস্থ আলো-ছায়ার যেখানে সে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত মন নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে। যুগগত পরিবেশের পরোক্ষ সমর্থনও ছিল তাতে। তাই গ্রামের ভবতোষ মাস্টারই শহরে তার কাছে প্রমাণিত হয়েছিলেন সবচেয়ে কাছের মানু" বলে। সত্যবতী চেয়েছিল স্বামী-সন্তান নিয়ে সভ্য শিক্ষিত মার্জিত এক স্বপ্নসৌধ গড়ে তুলতে।

কিন্তু কতটা সফল হয়েছিল, সেট্যা চিন্তা সাপেক্ষ। সে হয়তো সফল হয়নি। তাই তো ঘর ছেড়ে যাবার প্রাক্কালে সে সদুকে অর্থাৎ সৌদামিনীকে বলেছিল, 'আমি যে কতখানিকটা হয়েছি ঠাকুরঝি, তার প্রমাণ তো এই দেখছো।'[৩৫] সত্যবতী হয়তো চেয়েছিল সম্পূর্ণ সফলতা, যে-সফলতা ভিন্ন মাত্রাসূচক। সে চেয়েছিল নারীকে মেয়েমানুষের তকমা ছেড়ে মানুষের সহজ পরিচয়ে বিচার করা হোক। নারী হয়ে বাঁচার মধ্যে কোনো গ্লানিবোধ নেই কিন্তু যখন তাকে মেয়েমানুষের বর্গভিত্তিক বিভাজনে ফেলে কিছু আরোপিত প্রথার বদ্ধতায় তার কর্মক্ষমতাকে, মননশীলতাকে নীচ দৃষ্টিতে দেখা হয়, সেখানেই ছিল তার বিরোধ। সামগ্রিক নারী সমাজের প্রতি পীড়নের বিরুদ্ধেই সে তার প্রতিবাদ ঘোষণা করেছিল। তাই ভাবিনীর বোনের অকাল-মৃত্যুর বিরোধিতা যেমন করেছে, শঙ্করীর একমাত্র সম্বল সুহাসকেও যোগ্য ব্যক্তির সান্নিধ্যে পৌঁছে দিয়েছে। শুধু শেষ রক্ষা হয়নি বলেই আপাত-ব্যর্থতা মনে হয়েছিল তা সত্যবতীর কাছে। স্বামীকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করে সুবর্ণের বাল্যবিবাহকে সে প্রতিরোধ করতে পারেনি। তাই তাকে ফিরে যেতে হয় সেই শহরেই। আশাপূর্ণা গ্রাম-শহরের অবস্থানগত ব্যবধানকে স্পষ্ট করেন অসামান্য সঙ্কেতধর্মিতায় 'সহসা স্তব্ধতা নামে। গাড়ি ধীরে ধীরে হাটতলায় থামে। গরুর গাড়ির পথ শেষ হয়।'[৩৬] যুগের হাওয়া শহুরে পরিবেশের সান্নিধ্যে এসে যদিও সত্যবতীর মানসিক বিকাশ ঘটিয়েছিল, নবকুমার কিংবা তার আত্মজদের ক্ষেত্রে সেই যুগের স্পর্শ অধরা থেকে যায় রক্ত-সম্পর্ককে মিথ্যে করে দিয়ে। কালের পট পরিবর্তনের সংলাপকে বুঝতে হলে চাই এক গভীর প্রজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টি, অন্তর্দৃষ্টির স্বচ্ছতা। নবকুমার কিংবা তার ছেলেদের কলকাতার পরিবেশে হয়তো বাহ্যিক আচরণটুকু রপ্ত হয়েছিল কিন্তু মনের ভিত প্রোথিত ছিল সেই বারুইপুরের সামন্ততান্ত্রিক পরিবেশে। সে-জন্যই মনের অগভীর বাসনাটুকু সহজেই শহুরে কেতা হারিয়ে গ্রামতন্ত্রের কাছে হার মেনে বসে। আর নবকুমারও মাতৃআজ্ঞা অলঙ্ঘ্য বলে শিশুকন্যাকে বিয়ের পিড়িতে তোলে প্রতিশ্রুতি ভেঙে। সত্যবতীকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ এবং সবচেয়ে প্রিয় কন্যা সুবর্ণের বিয়ে—এই দুটো কাজই সে করে তার সামন্ততান্ত্রিক অধিকারবোধ থেকে, যেটা একেবারেই গ্রামীন পরিবেশজাত। মূল্যবোধহীন নবকুমার অধিকার ফলিয়ে ভালোবাসা জাহির করতে চায়।

সত্যবতীর নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে এসে কোনো সিদ্ধান্তকে (সেটা ভুল হলেও) পরিণতি দেওয়ার স্পর্ধা দেখিয়ে সে তার পুরুষত্বের প্রমাণ দিতে চায়। এটা সত্যি যে সত্যবতীর মধ্যে কর্তৃত্বের দৃঢ়তা আছে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আছে, দূরদৃষ্টির জন্য অভিজ্ঞ বোধগম্যতা আছে কিন্তু তবুও সত্যবতী শুধু সত্য প্রতিষ্ঠার জন্যই ন্যায়-অন্যায় বিচারের ক্ষেত্রে অধিকারবোধকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। সামন্ততান্ত্রিক গ্রাম-সংস্কৃতিকে সত্যবতী চেয়েছিল নগরাভিমুখী করতে কোনোরকম কর্তব্যকর্ম থেকে বিচ্যুতি না ঘটিয়েই। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সার্থক সম্পর্ক তৈরি করতে সে চেয়েছিল। একদিকে রুদ্ধ সময় এবং অন্যদিকে মুক্ত সময়ের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে যেন আশাপূর্ণা দুয়ের মেলবন্ধনে আখ্যান গড়েছেন। তাই একদিকে যেমন স্ত্রী-শিক্ষা প্রচলন—নারী-প্রগতির অনেক অনুষঙ্গই ছড়িয়ে ছিটিয়ে ইতিহাসবন্দি সময়ের উপস্থিতিকে অবগত করায় পাঠকদের আবার সত্যবতীর

কাহিনিকথায় আখ্যানের দায়বদ্ধতাও মেদহীন অবয়বে লিখনরীতির স্বাতন্ত্র্যকে পরিস্ফুট করেছে। আখ্যানের সহজ সাবলীল ভাব যেমন ইতিহাসের দুর্বহ বোঝায় ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠেনি আবার ইতিহাসের সত্যকে রপ্ত করেই আশাপূর্ণার এই আখ্যানে অন্তঃপুরের নারী অন্তর্গূঢ় অভিজ্ঞানের জীবন্ত চিত্র হয়ে উঠেছে। এ ধরনের আটপৌরে ভাষায়-রীতিতে নারীর অন্তর্দ্বন্দ্বের কাহিনিকে তুলে ধরা সে-সময়ের পুরুষ কিংবা নারী ঔপন্যাসিকদের লেখায় অকল্পনীয় ছিল।

সুবর্ণলতা

মেয়েদের জন্য কি কোনো পৃথক ইতিহাস হতে পারে না যেখানে ঘটনা পরম্পরায় মেয়েদের জয়ের কথা, আত্মক্রন্দনের কথা, অনুভূতিপ্রবণ মননের কথা উঠে আসবে, যেখানে পুরুষ তার শতবাহু বিস্তার করে সেই অর্ধেক আকাশের ব্যাপ্তিকে ঢেকে দিয়ে একচেটিয়া শাসনতন্ত্র কায়েম করবে না। এ জাতীয় ভাবনার নির্যাসেরই যেন অনুরণন শোনা গিয়েছিল আশাপূর্ণার অগ্রবর্তী লেখিকা জ্যোতির্ময়ী দেবীর উপন্যাসের নায়িকার উচ্চারণে। সেই ইতিহাসচর্চার কি কোনো পৃথক রাস্তা তৈরি হয়েছিল পরবর্তী নারীবীক্ষণ এবং অভিজ্ঞানের পথচারিতায়? সাহিত্যের ইতিহাস যতদূর সাক্ষ্য দেয় খুব কম সংখ্যক লেখিকার ভাগ্যেই জুটেছিল সেই লিখিত ঐতিহাসিকীকরণের শিরোপা। আবার যাঁদের অন্তর্ভুক্তি ঘটেছিল তাঁদেরকেও একটি অলিখিত উপায়ে পর্যায়ভুক্ত করা যেতে পারে। যারা নারী হয়েও আত্মিক দিক দিয়ে উপনিবেশীকৃত, তাদের লেখায় নারীর অন্তর্বয়ন তৈরি হয় পুরুষের ইচ্ছানুসারে। আবার যাঁরা নিজস্ব ভাবনায় স্বতন্ত্র স্বর উচ্চারণে প্রয়াসী, অনেক ক্ষেত্রেই তাঁদের অমর্যাদার শিকার হতে হয়েছে লেখকের (পুরুষ) ছদ্মবেশ বলে। আবার দু-একজন যাঁরা স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন, তাঁদেরও সাময়িক স্তোকবাক্যে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। তখন গোটা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মেয়েদের লেখার সম্পূর্ণ চালচিত্র ছিল এটাই। কিন্তু আপাত-সত্যের পেছনে লুকিয়ে থাকে যে প্রকৃত তথ্য, সেই তথ্যের নিরিখেই গড়ে উঠেছিল মেয়েদের বোবা যন্ত্রণার ইতিহাস। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের এগিয়ে যাওয়ার ইতিহাসের পাতা ভরে উঠেছে পিছিয়ে-পড়ার করুণ দৃশ্যের উপস্থাপনাতে। এই বৈপরীত্যের প্রদর্শনই তো নারী-লেখনীর চরম সত্য। এগিয়ে গেছে সময় পিছিয়ে-থাকা ঘটনার ইতিহাস তৈরি করে। কিন্তু যা ঘটে যায় এবং যা দলিল-পত্রে নথিবদ্ধ হয়, সেটাই শুধুমাত্র ইতিহাসের স্বর্ণখনিতে শোভা পায়। কিন্তু তার পাশাপাশি সমান্তরাল গতিতে আরও কিছু ঘটনার বিস্তার ঘট্‌তে থাকে, যা ইতিহাসের যুগ বিভাজনে প্রকাশ্যে মুদ্রিত না-হলেও অপ্রকাশিত দীনতায় তার উপস্থিতির পদচিহ্ন এঁকে দিয়ে যায়। এমনই এক 'সদ্য বিগত কালের'[৩৭] ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়ে 'একটি বিশেষ কালের আলেখ্য'[৩৮] রচনা করতে গিয়ে আশাপূর্ণা যেন একবার পিছন ফিরে তাকিয়ে প্রায় প্রচ্ছন্ন অতীতকে বাঙ্‌ময় করে তুলতে আত্মজিজ্ঞাসায় অধীর হয়ে ওঠেন। কল্পিত মানসী সত্যবতীর পরবর্তী প্রজন্মের কথা বলতে গিয়ে আসলে বলেন আবাল্য দেখা নিজেরই কাল-স্মৃতির কথা, যার ছায়া আজও সমাজের আনাচে-কানাচে তার ছাপ ফেলে রেখেছে। আর তাই তো সংস্কারদগ্ধ অন্তঃপুরচারিকাদের বঞ্চনার খণ্ড কাল অখণ্ড কালস্রোতের প্রবাহের সঙ্গে নিজেকে সামিল করতে পারে না। কিন্তু

মীমাংসাহীন প্রশ্নের অবতারণা যেহেতু উপন্যাসের শর্ত নয়, তাই এটাই ধরে নিতে হয়, অসূর্যম্পশ্যা অন্তর্লোকবাসিনীদের অপূর্ণতার ইতিহাসকে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার অদম্য দুঃসাহসই আপাত-সত্যকে প্রকৃত-সত্যের দিকে নিয়ে যায়। এভাবেই প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে পূর্বসূরিদের ভাবনার সঙ্গে উত্তরসূরিদের ভাবনার বয়নের গ্রন্থিবন্ধনের মধ্য দিয়ে মীমাংসার দিকে এগিয়ে চলা। এরই মধ্য থেকে সন্ধান করে নিতে হয় সমাধানের সুপ্ত বীজ। তাই লেখিকার অন্তর্দাহের ভাষা ফুটে ওঠে সুবর্ণলতাদের ইতিহাসের প্রাক্‌শর্ত রচনায় :

> *'একাল-সেকাল নিয়ে তর্ক তো চিরকালের, কিন্তু কেমন করে চিহ্নিত করা যায় সেই 'কাল' কে? এক একটা কালের আয়ু শেষ হলেই কী এক একবার যবনিকা পড়ে? যেমন যবনিকা পড়ে নাট্য মঞ্চে?'*[৩৯]

নাট্যমঞ্চে যবনিকা পড়ে না-বলেই বোধহয় সুবর্ণলতার আখ্যানে উন্মোচিত হয় অন্তঃপুরের সেই নেপথ্যদৃশ্যের, যেখানে সত্যবতীর পরবর্তী প্রজন্ম হয়েও সুবর্ণলতা এমন এক আভিজাত্যহীন অহঙ্কারের আস্ফালনে উচ্চকণ্ঠ পরিবারের মেজবৌ, যাকে সবসময় বোঝাতে চেষ্টা করা হয়েছে আত্মপরিচয়ের চেয়েও বড় হল মেজবৌ-এর আবরণী সত্তা। আর সেই দর্জিপাড়ার বাড়ির মেজবৌ-এর দায় মেটাতে নয় বছরের সুবর্ণের যে শ্বশুরবাড়ির চৌকাঠ পেরোতে হয়েছিল, তার পর থেকেই তার সমস্ত জিজ্ঞাসাকে স্তব্ধ করে দিয়েছে দর্জিপাড়ার শ্বশুরবাড়ির কিছু অলিখিত নিয়ম– যার প্রবল প্রতাপী কর্ত্রী ছিলেন মুক্তকেশী। কেননা মুক্তকেশীর নীতিবাক্যে নীতির পাঠ শেখানো হয় এভাবে,

> *'বেটাছেলের আবার কিছুতে দোষ আছে নাকি? মেয়েমানুষকেই সবকিছু মেনে শুনে চলতে হয়।'*[৪০]

কিন্তু এই মেনে শুনে প্রচলিত ছকে চলার অভ্যাসকে রপ্ত কবে নিতে পারে না বলেই তো সে আত্মমর্যাদার যন্ত্রণায় বিহ্বল হয়, খাঁচাবন্দি পাখির মতো যন্ত্রণায় ছটফট করে ওঠে। মধ্যবিত্ত সংসারের প্রচলিত রীতি মেনে বারবার আশ্রয় নিয়েও এর প্রতিরোধের প্রশ্ন তোলে। সম্পূর্ণ জীবন পাশাপাশি কাটিয়েও কোথায় যেন আবিষ্কার করে এক অনতিক্রম্য গরমিলের দুঃসহ বেদনাকে।

আশাপূর্ণা দেবীর 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' যদি হয় খাঁচা ভেঙে ফেলার দুঃসাহসিক অভিযান তবে 'সুবর্ণলতা'-কে বদ্ধ খাঁচার অব্যক্ত যন্ত্রণার মুক্তিকামী বাসনার প্রকাশ বলা যেতে পারে। সুবর্ণলতার মনোযোগী পাঠক প্রথমেই যে-ভাবনার মুখোমুখি হন, তা হচ্ছে সত্যবতীর এক প্রজন্মের পরের হয়েও সুবর্ণলতাকে ঘিরে রেখেছে দাসত্বের ধাতব বলয়, যে-বলয়কে ভেঙে ফেলার ব্যর্থ প্রয়াস করেছে সুবর্ণলতা বিবাহোর্ধ্ব পঞ্চাশ বছর ধবে। তবুও একে ভাঙতে না-পারার দীর্ঘ ব্যর্থতার মধ্যেও সুবর্ণের আত্মসত্তাকে বাঁচিয়ে রাখার সামান্য সফল প্রয়াস হচ্ছে ঔপনিবেশিক অবস্থাকে শনাক্ত করে এরই বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে তোলা। দুটি উপন্যাসের মধ্যে সংযোগসূত্র রক্ষার দায়িত্বটি কোনো পাঠকের অবশ্য আলোচ্য বিষয় না-ও হতে পারে কিন্তু সময়ের প্রগতির সঙ্গে বিষয়গত প্রতিগতি এবং একই সঙ্গে লেখিকার স্বীকারোক্তি 'একটি ভাবকে পরবর্তী কালের ভাবধারার সঙ্গে যুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা' এই দুটি বিরোধাভাসের মধ্যে সংযোগসূত্রটুকু খুঁজে বার না-করলে সুবর্ণলতার আত্মকথন

উপলব্ধিতে অবিশ্বাসের রেশটুকু থেকে যাবে। প্রশ্ন জাগে সুবর্ণলতার যে-কালকে লেখিকা নিজের দেখা কাল বলেছেন, সে-কাল কি লেখিকার নিজস্ব শৈশব-কৈশোরের কাল নাকি তার পূর্বসূরির চোখে দেখা কাল। কেননা লেখিকার স্বীকারোক্তিমূলক পারম্পর্যটুকুকে যদি ত্রয়ী উপন্যাসের শেষ প্রজন্ম অবধি ধরে রাখা যায়, তাহলে বকুলকথার অনামিকা দেবী যে লেখিকারই আত্মজৈবনিক সত্তা সেটা বুঝতে দেরি হয় না; বাকি যেটুকু গরমিল, সেটুকু উপন্যাসের রীতিকে সমর্থন করেই। তা হলে বিশ্লেষণের নিরিখে যে-তথ্যটি নির্ভরযোগ্য হয়ে ওঠে, তা হল সত্যবতীর কালকে লেখিকা কল্পনা করে নিয়েছিলেন অনেকটা বাস্তবকে ভিত্তি করেও বাস্তবোত্তীর্ণ কল্পিত কালে। আর সুবর্ণলতাকে আঁকতে গিয়েও পূর্বসূরির ভাবনায় অনতিদূর অতীতের অস্পষ্ট আলোককে তার সমসাময়িক বাস্তবের সমাজে বিন্যস্ত করেছেন। 'বকুলকথা'-র অনামিকা লেখিকারই সমসাময়িক বাস্তবের সঙ্গে সম্ভাব্য বাস্তবের অগভীর বিশ্লেষণের প্রতিচ্ছবি।

সত্যবতীর আখ্যানে একটি একপেশে মানসিক জয়ের আনন্দ আছে, সত্যবতী আপন ব্যক্তিত্বের জোরে রামকালী থেকে নীলাম্বর—প্রত্যেকের কাছেই একটি নিজস্ব স্বতন্ত্র গণ্ডি তৈরি করে নিয়েছে, সুবর্ণলতার যন্ত্রণাদগ্ধ আখ্যানে সেই সফলতার আনন্দ নেই, আছে বন্দি খাঁচার মধ্যে বন্দিত্বকে অনুভব করে সেই শৃঙ্খল মোচনের ব্যর্থ প্রয়াস জনিত ডানা ঝাপটানোর শব্দ। সত্যবতী তার অস্তিত্ব প্রত্যেককে মেনে নিতে প্রায় বাধ্য করেছিল কিন্তু সুবর্ণলতার জীবনের দুঃসহ বেদনা হচ্ছে তার অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দেয়নি কেউ। তাই স্মৃতি-বিস্মৃতিব প্রথম পঙ্‌ক্তিতেই ছিল সেই অপূর্ণতার স্বীকৃতি :

> *'আমি একটি নিরুপায় বঙ্গনাড়ি, আমার একমাত্র পরিচয় আমি একটি অন্ধপুরির মেজবৌ, আমার মন আচে বুদ্ধি আচে, মস্তিষ্ক আচে, আত্মা আচে, কিন্তু কেহ আমার সত্মাকে শীকার করে...না।'*[৪১]

এই মুদ্রণ বিকৃতিও কিন্তু একটি অন্ধকূপে গুমরে ওঠা নারীর আত্মানুসন্ধানের দীর্ঘশ্বাসকে ম্লান করতে পারে না। এখানে যেন খুব প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রী-র পত্র'-র মৃণালের কথা। মৃণাল তার মেজবৌ-এর খোলস ভেঙে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত সামাজিক বন্ধনের পরোয়া না-করেই তার নারী-অভিজ্ঞানের প্রকৃত অভিধার স্বীকৃতি দিতে সমর্থ হয়েছিলেন। আশাপূর্ণার উপন্যাস বিশেষ করে নারীর কলমে নারীর বয়ান কিন্তু অন্য সুরে কথা বলে। সত্যবতীর পরবর্তী প্রজন্ম হিসেবে সুবর্ণলতার পাঠক প্রগতির আর এক ধাপ এগিয়ে থাকার চিত্রটিই আশা করত, কিন্তু সুবর্ণলতার লেখিকার কাছে সুবর্ণের আত্মপ্রতিষ্ঠার চেয়েও আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামের কাহিনিকথাই বেশি গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়েছে সময়ের পারম্পর্যসূত্রে। ছকে ফেলে ছক ভেঙে ফেলার মতো দুঃসাহস তাঁর ত্রয়ী উপন্যাসের নায়িকাদের ছিল, কিন্তু কোনো-এক অজ্ঞাত রক্ষণশীল দোটানায় কিংবা অস্তমিত উনিশ শতকের আভিজাত্যহীন অহংকারের শেষ রেশটুকু ধরে সেই গণ্ডিতে নারীর প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জনের মরণপণ লড়াই-এর করুণ দৃশ্য পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা লেখিকার অভিপ্রেত ছিল।

সুবর্ণলতার নিবিড় পাঠ যখন মননের গভীর দর্শনে বিশ্লেষিত হয়, তখন সবচেয়ে

তীব্রভাবে সে-সত্যটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তা হল সামাজিক বলয়ে থেকেও তাকে অস্বীকার না-করে নারীর আত্মিক দিক দিয়ে মুক্ত নারী হয়ে ওঠার বাসনার অকুণ্ঠ স্বীকৃতি অর্জনের ইচ্ছা। নয় বছরের ছোট সুবর্ণলতা যেদিন মায়ের দেওয়া নাগরিক সংস্কৃতির পাঠ চুকিয়ে বাবার নির্বুদ্ধিতায় ঠাকুমা এলাকেশীর পরামর্শে আইবুড়োর ছাপ মুছে দিয়ে মুক্তকেশীর যৌথ পরিবারের মেজবৌ-এর পরিচয়ে দীক্ষিত হল, সেদিন থেকেই তার জীবনের সংগ্রামের অধ্যায়ের শুরু। নয় থেকে চৌদ্দ—এই ছয় বছরের তিক্ত অভিজ্ঞতায় সুবর্ণলতার স্মৃতি-বিস্মৃতির ভাণ্ডার ভরে আছে কিছু চাওয়া না-পাওয়া অপমান-অভিমানের খুচরো কথায়। নয় বছরের সুবর্ণকে তার দ্বিতীয় গৃহে (শ্বশুরবাড়ি) বরণ করেছিল 'মায়ে তাড়ানো বাপে খেদানো' বিশ্লেষণে। সেই ছয় বছরের অভিজ্ঞতা যেন সুবর্ণকে আর ভালোভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিল শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে তার ভাবনা-মানসিকতার স্বতন্ত্রভাবটা। তাই সুবর্ণলতা যেখানে দক্ষিণ বারান্দার খোলা পথে সভ্যতা-সংস্কৃতির মুক্ত প্রবাহের কথা ভেবে পুলকিত হয়, নিজের মনেই একখানা নিজস্ব ঘরের কল্পনায় রোমাঞ্চিত হয়, সেখানে সুবর্ণলতার শ্বশুরবাড়ির লোকেদের কাছে বাসের অনাবশ্যকটুকু শুধু বাহুল্যের স্বীকৃতি। তাই মুক্তকেশী এবং তার অন্যান্য কন্যা-পুত্রবধূদের কাছে সেই বাড়তি চাওয়াটুকুই আদিখ্যেতা। তাদের উপনিবেশীকৃত মন নিজস্ব বলে কিছু ভাবতেও অক্ষম। কেননা তাদের কাছে 'নিজস্ব'-র পরিচিত সংজ্ঞা হচ্ছে স্বামী-সন্তান-পরিবারের গণ্ডিবদ্ধ নিরাপদ আশ্রয়, তাদের নিজের ধর্ম হচ্ছে পরিবারের সুখ-ইচ্ছার জন্য নিজের বেঁচে থাকা। আর তাই সুবর্ণলতার সামান্য চাওয়ার আস্বাদটুকুও উপলব্ধি করতে পারে না প্রবোধ। সুবর্ণলতার নিজস্ব গৃহকোনটুকুর প্রয়োজন আত্মআবিষ্কারের জন্য যা মুক্তকেশীর পরিবারের পিতৃতান্ত্রিক পরিকাঠামোয় বাস-করা কোনো সদস্যের কাছে অনভিপ্রেত। তাই দর্জিপাড়ায় যে-বাড়িটিতে সুদীর্ঘ ত্রিশ বছরের বিবর্ণ দিনযাপনের অমূল্য স্মৃতি কাটিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল সুবর্ণলতা, প্রথম প্রবেশেই সে তার এই শূন্যতাবোধের অদৃশ্য পিঞ্জরকে আবিষ্কার করেছিল অবিশ্বাসী প্রেমের দীনতায়। সুবর্ণের কল্পিত বাস্তবে ছিল নিতান্তই সাজানো একটু স্বস্তির গৃহকোন কিন্তু রূঢ় বাস্তব তাকে উপহার দিয়েছিল :

> *'খান চারেক ঘর, মাঝখানে টানা দালান, এদিকে ওদিকে খোঁচা খোঁচা একটু একটু ঘরের মতো, এরই মাঝখানে দিশেহারা হয়ে ঘুরপাক খায় সুবর্ণ, এ দরজা ও দরজা পার হয়ে একই ঘরে বারবার আসে বিমূঢ়ের মতো, বুঝতে পারে না কোন্ দরজা দিয়ে বেরোতে পাবলে সেই গোপন রহস্যে ভরা পরম ঐশ্বর্যলোকের দরজাটি দেখতে পাবে।*
>
> *ঘুরে ফিরে তো শুধু দেয়াল*
> *রিক্ত শূন্য খাঁ খাঁ করা সাদা দেয়াল,*
> উগ্র নতুন চুনের গন্ধবাহী।'[৪২]

ভাবতেও অবাক লাগে বিংশ শতাব্দীর সাহিত্য চর্চায় যেখানে নারী-সাহিত্যিকের আনাগোনা খুবই বিরল, যেখানে নিতান্তই চার দেওয়ালের পারিপার্শ্বিকতায় অভ্যস্ত লেখিকা অনাড়ম্বর পরিবেশে তাঁর একান্ত ভাবনার নির্যাসেই গড়ে তোলেন এক নারীর স্বপ্নহারানো

অন্তর্দাহের ইতিহাস। এই ইতিহাসের অন্তঃস্বর জন্ম দেয় বহু অস্ফুট সম্ভাবনার সংকেতগর্ভ ব্যঞ্জনাকে। নারীর কাছে ঐশ্বর্যলোক মানেই তো তাকে জানানো হয়েছে তার স্বামী-সন্তান বেষ্টিত পরিবারের ছবি, এর চৌকাঠ নারীর জন্য এঁকে দিয়েছে আজন্মের লক্ষ্মণরেখা। এরই ভেতর দিনের পর দিন ধরে দগ্ধ হতে হতে ভস্মীভূত হয়ে গেছে কত অস্ফুট অঙ্কুরের সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ। বছরের পর বছর ধরে তার চারদিকে গড়ে উঠেছে সংস্কারের যক্ষ-পিঞ্জর। এই নেতিবোধের রিক্ততা নিয়েই নারী ভরে তুলেছে তার শূন্য বিবর। সেখানে সে সম্পূর্ণ একা এবং তার চারদিকে শুধুই নিঃসীম শূন্যতা। 'সাদা দেয়াল'—এই অভিধাটিও যেন লেখিকার বহু ভাবনার পরিণত পদক্ষেপ বলে ভাবতেই ইচ্ছে করে। নারীর জীবনও কি সেই সাদা পৃষ্ঠারই সমতুল্য নয়, যা অন্যের তুলির আঁচড়ে ভরে ওঠে সার্থকতার মিথ্যা আস্ফালন করে কিন্তু সে তার অন্তরের গভীর ক্ষত দিয়ে তাকে ভরিয়ে তুলতে পারে না। সুবর্ণলতাও তো তা-ই চেয়েছিল আর সে-জন্যই তো সে তার সারাজীবনের সঞ্চিত দুঃখকে গ্রন্থিবদ্ধ করতে চেয়েছিল যার সূচনাতেই উঠে আসে জীবনমথিত দুঃখের হীরকখণ্ডগুলি।

মুক্তকেশীর দর্জিপাড়ার সেই তিনতলা বাড়িটি যেন সব ধরনের প্রগতিরই পরিপন্থী। তাই ছাদের সিঁড়িটুকু যেমন খরচের অকুলান বলেই অপ্রয়োজনীয় তেমনি মুক্তকেশীর বাড়িতে কেরোসিনের নতুন আলো প্রবেশের অধিকার নেই। আলো-হাওয়ার মুক্তপ্রবেশে বাধা সৃষ্টি করেই যেন সেই বাড়ি সংস্কারের বদ্ধ রূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুবর্ণলতা প্রকৃত অর্থেই তা থেকে মুক্তি চেয়েছিল। নারীমুক্তি অর্থাৎ শুধু অন্দরের অবরোধ মোচনের মুক্তি নয়, অন্তরের অবরোধ থেকেও মুক্তি। সে যেদিন দর্জিপাড়ার এই বহির্বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্কহীন তিনমহলা বাড়িকেই তার অন্ধনিয়তি বলে জেনেছিল সে-দিনও কিন্তু তার ভেতরকার মুক্তি পিয়াসি মন মরে যায়নি, সে-সঙ্কল্প নিয়েছিল আরও কঠিন ব্রতের :

> *'...এদের মানুষ করে তুলতে ইচ্ছে করে সুবর্ণর। ইচ্ছে করে এরা শৌখিন হোক, সভ্য হোক, রুচি পছন্দের মানে বুঝুক। এদের নিয়ে সুন্দর করে সংসার করবে সুবর্ণ।'*[৪৩]

এখানেই যেন আশাপূর্ণার 'সুবর্ণলতা' আরও প্রবলভাবে মেয়েদের নিবিড়পাঠ্য হয়ে ওঠে। একটি মেয়ের সারাজীবনের সংগ্রামের মূল ভাববীজটি লুকিয়ে থাকে একটি সুপ্ত আদর্শের ভেতরে, যে-আদর্শে আদর্শায়িত সুবর্ণলতা সম্পূর্ণ একটি অভব্য অমার্জিত অপরিশীলিত পরিবারকে পরিশীলিত করে তুলতে চায় যেখানে মেয়েরা যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হবে। তাই অকুণ্ঠভাবে বলা যায় মেয়েলি পাঠের মূল সুর যে মানবিক মর্যাদার স্বাধীনতা সেটা কোনো পুরুষ বা পরিবারের বিরোধিতায় নয়। কারণ তার স্বভাব-বৈশিষ্ট্যই হল,

> *'সে ভালোবাসে অন্য মেয়েদের, ভালোবাসে মেয়েদের সংস্কৃতি, মেয়েদের আবেগ, এমনকী তার কান্নাকেও, সেইসঙ্গে তার সামর্থ্যকে। কখনো বা ব্যক্তিগতভাবে কোনো পুরুষকেও ভালোবাসে, সেই মেয়ে; আর সে দায়বদ্ধ নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের বেঁচে থাকার জন্য তাদের সম্পূর্ণতার জন্য। আর সে কখনো বিচ্ছিন্নতাবাদী নয়, সে-হল বিশ্বমানবিক।'*[৪৪]

কিন্তু সুবর্ণলতার বিশ্বাস বারবার তার নির্মিত প্রতিমাকে ভেঙে দিয়েছে, তাকে বিদ্রূপ করেছে। সুবর্ণলতা যেন তার নিজের অবস্থানগত উচ্চতা না-বুঝেই নীচতাকে মাপতে চেয়েছিল। তা না-হলে যাদের 'বোধের জগৎটা'[৪৫] ভেন্টিলেটারহীন ঘরের মতো সেখানে 'চলমান বাতাসের এক কণা ঢুকে পড়তে পারে'[৪৬] না, যাদের কাছে সংসারের প্রথম কন্যা-সন্তানকে বরণ করা হয় 'মাটির ঢিপি'-র[৪৭] মতো তুচ্ছতায়, তাদের কাছে সুবর্ণলতা কোনো মূল্যে ধার্য হবে না।

সুবর্ণলতার আত্মানুসন্ধানের প্রক্রিয়ায় বারবারই এ প্রশ্ন উঠে এসেছে কিংবা বলা যেতে পারে 'সুবর্ণলতা'-র দরদি লেখিকার আপসহীন কণ্ঠে যেন বারবারই সেই আত্মমূল্যের সংজ্ঞা নির্ণীত হতে চেয়েছে। যেখানে সব ভাবনা-ভালোবাসা-সম্ভ্রমকে তুচ্ছ করে দিয়ে বড় হয়ে উঠেছে নারী-জীবনের সবচেয়ে অবিসংবাদিত সত্যের এক ক্লেদাক্ত দিক, যেখানে সুবর্ণ শুধু এক অভ্যাসের মাধ্যম। কারণ :

> *'সুবর্ণের মূল্য ধার্য হয়েছে শুধু একটা অভ্যাস মলিন শয্যায়। সেখানে সুবর্ণর জন্যে আগ্রহের আহ্বান অপেক্ষা করে। কিন্তু সে-আগ্রহ কী প্রেমের? সে-আহ্বান কী পুরুষের? তা নয়। সে শুধু অভ্যাসের নেশা। তাই সে-আহ্বান সুবর্ণর চেতনাকে বিদ্রোহী করে, স্নায়ুদের পীড়িত করে, আত্মাকে জীর্ণ করে।'*[৪৮]

চেতনার বিদ্রোহ, স্নায়ুর পীড়ন এবং আত্মার জীর্ণতা প্রতিটি সংলাপের সঙ্গেই খুব সূক্ষ্ম মাত্রায় জড়িয়ে আছে যে-বোধের উত্তরাধিকার, তা হচ্ছে মন, ভালোবাসা। অনাকাঙ্ক্ষিত দাম্পত্য জীবনের যেখানে সুবর্ণের স্বামীর সামান্য মানবিক ভালোবাসা হয়তো বা তার বেঁচে থাকার ভাবনাকে জাগিয়ে রাখতে পারত, সেখানেও কামুক স্বামীর তিক্ত ক্লেদের শিকার সুবর্ণ প্রথম হারিয়ে ছিল তার স্বামীর প্রতি ভালোবাসার সম্ভ্রমবোধকে। যেখানে ভালোবাসার গ্রন্থিবন্ধন হয় না, সেখানে মনের বাঁধন সহজেই শিথিল হয়ে আসে। এই অবিশ্বাসী, অতৃপ্ত মনের আত্মকথনই হয়ে উঠেছে সুবর্ণলতার জীবনের দুঃসহ উপলব্ধি :

'ও আমায় বিশ্বাস করে না, আমিও ওকে বিশ্বাস করি না। ও নাকি আমায় ভালোবাসে, বলে তো তাই সবসময়, কিন্তু ভগবান, আমার অপরাধ নিও না, আমি ওকে ভালোবাসি না। ওকে ভালোবাসা আমার পক্ষে অসম্ভব। ওর সঙ্গে একবিন্দু মিল নেই আমার। তবু চিরদিন ওর সঙ্গে ঘর করতে হবে আমায়।'[৪৯]

মনের গরমিল, বোধের গরমিলই সুবর্ণকে ভিড়ের মধ্যে একা করে দিয়েছিল। লেখিকা যেন অন্তঃস্থলের গভীরে জমে-থাকা বহু প্রশ্নের মালা গাঁথতে চান সুবর্ণের আত্মসংগ্রামের কাহিনিকথায়। কারণ সত্যবতীর নেপথ্যে লুকিয়ে আছে যে লেখিকার ভাবনাপ্রসূত অন্তঃস্বর, সেই বিশ্বাসের উপলব্ধিকেও তো ভুলে থাকতে পারে না নিবিড় পাঠককুল। সুবর্ণলতার আখ্যানে আসলে মিশে আছে বঙ্গদেশের হাজারো নারীর খণ্ডকথা যারা পূর্ণতার উপলব্ধির অনেক আগেই বিলীন হয়ে গেছে 'অসার্থক জীবনের গ্লানির বোঝা নিয়ে।'[৫০]

সুবর্ণলতার চেতনা বিদ্রোহ করেছিল ভাবনার বিশ্বাসঘাতকতায়, স্নায়ু পীড়িত হয়েছিল অভ্যাসের কুশ্রীতায় আর আত্মা জীর্ণ হয়ে উঠেছিল প্রেমহীন জীবনের পৌরুষহীনতায়।

সুবর্ণলতা চেয়েছিল প্রেমের আহ্বানে জীবনের সাদা পৃষ্ঠাগুলিকে রঙিন করে তুলতে। সে তার স্বামীকে ভালোবাসতে চেয়েছিল। সে চেয়েছিল অভিমান-অপমানের আঘাতে স্বামীর অভ্যাসের নিশ্চেষ্টতাকে ভেঙে দিয়ে তার যথার্থ পৌরুষকে জাগিয়ে তুলতে। সুবর্ণ তার জীবনযুদ্ধে সর্বার্থেই চেয়েছিল এক সহযোদ্ধাকে, ভালোবাসার মানুষকে। কিন্তু সন্দেহপ্রবণ প্রবোধের কাছে স্ত্রী মানেই তো 'মেয়েমানুষ', সে মানুষ হতে পারেনি কখনো। আর তাই অবাধ্য জীবকে পোষ মানাতেই সে প্রতিরাতে ভোগের চাবুকে সুবর্ণলতাকে হার মানাবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছে, প্রেমের সৌরভে তাকে জিতে নিতে পারেনি। 'সম্বন্ধ যেখানে ভিতর থেকে সত্য, সেখানে বিবাহ না-থাকলেও সম্বন্ধ ভাঙে না; সম্বন্ধ যেখানে ভিতর থেকে মিথ্যে, সেখানে বিবাহ থাকলেও সম্বন্ধ থাকে না।'[৫১] হাল আমলের এই সমালোচকের মন্তব্যেরই যথার্থ প্রতিফলন ঘটতে দেখা গেছে আশাপূর্ণার ত্রয়ী উপন্যাসের দ্বিতীয় প্রজন্মের নারী সুবর্ণের জীবনে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে সব সত্যের মূল সত্য এটাই, ভালোবাসাই হচ্ছে জগতের সবচেয়ে কঠিনতম রহস্য এবং সবচেয়ে সহজতম সমাধানের পথ। ভালোবাসতে গেলে চাই মন এবং বিশ্বাসের একনিষ্ঠ বাঁধন। এখানেই ছিল সুবর্ণলতার সঙ্গে তার স্বামীর মনের অনতিক্রম্য ব্যবধান। সে না-চাইলেও বারবার তাকে আঁতুড়ঘরের মলিন শয্যায় যেতে হয়েছে প্রবোধের অভ্যাসের নেশাকে চরিতার্থ করতে। প্রবোধ যতই গায়ের জোরে সুবর্ণের ওপর সন্তানের বৈধ সম্পর্ক চাপিয়ে দিয়ে তার মতো করে এ সম্পর্ককে ভালোবাসার সংজ্ঞা দিতে চেয়েছে, সুবর্ণের দিক থেকে আত্মিক গ্রন্থি ততটাই শিথিল হয়ে গেছে। এভাবেই সমাজের নিয়ন্ত্রণ, পরিবারের রীতি এবং স্বামীর সুখ ভোগের ইচ্ছা মেটাতে গিয়ে বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে কত নারীর আত্মিক ইচ্ছার শেষ রেশটুকুও। দাম্পত্য জীবনের প্রেমহীনতার ছবি—যেখানে খুব সূক্ষ্মভাবেই জড়িয়ে আছে শরীরী মিলনের সত্যটিও, আশাপূর্ণা ত্রয়ী উপন্যাসে এ দিকটা খুব স্পষ্ট না-হলেও প্রচ্ছন্ন রাখেননি। কিন্তু ত্রয়ী উপন্যাসের পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী অন্য উপন্যাসগুলোর দিকে দৃষ্টি ফেরালে খুব স্পষ্টভাবেই ধরা পড়ে যে নারীর জীবনের সার্থকতা-ব্যর্থতা কিংবা বলা ভালো নারীমুক্তির অনেকটাই জুড়ে আছে যে বিবাহোত্তর নারী-জীবনের যৌনতার বাদী-বিবাদী সম্পর্ক, তাকে প্রায় এড়িয়ে গেছেন লেখিকা। 'সুবর্ণলতা'র পরে লিখিত উপন্যাসে নারী চরিত্রের এবং উত্তরোত্তর বিকাশের মধ্য দিয়ে সহজেই নারী-প্রগতির স্পষ্ট রূপরেখা অঙ্কন করা যেত কিন্তু কোনো অজ্ঞাত কারণে হয়তো বা মধ্যযুগীয় শুচিতা রক্ষার দায়ে কিংবা রক্ষণশীল মনোভাবের জন্য সেটা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। আত্মিক বিশ্বাসের আত্মনির্ভরতায় সুবর্ণলতা নিজের মনকে সায় দিয়েই উচ্চারণ করে এই দুঃসাহসিক সংলাপ :

> *'আমার ইচ্ছে হয় কেউ আমায় ভালোবাসুক, আমি কাউকে ভালোবাসি। জানি এসব কথা খুব নিন্দের কথা তবু চুপি চুপি না-বলে পারছি না—প্রেমে পড়তে ইচ্ছে হয় আমার। যে প্রেমের মধ্যে কবিরা জগতের সমস্ত সৌন্দর্য দেখতে পান, যে প্রেমকে নিয়ে জগতের এত কাব্য গান নাটক...একটা শিশুকে ধরে জোর করে বিয়ে দিয়ে দিলে, আর একটা বালিকাকে ধরে জোর করে 'মা' করে দিলেই তার মনের সব দরজা বন্ধ হয়ে যাবে? যেতে বাধ্য?'*[৫২]

এখানে খুব স্পষ্টতই আশাপূর্ণা যেন সামাজিক নিন্দের পরোয়া না-করেই পাঠকের কাছে ফরমান জারি করে বসেন তার বাধ্যতা-অবাধ্যতা বিচারের। আত্মপক্ষকে জোরালো করতেই যেন সমর্থন আশা করেন বাল্যবিবাহ এবং অপরিণত মাতৃত্বের প্রসঙ্গ তুলে ধরে। সুবর্ণলতার জীবনে এই অসম্পূর্ণতাগুলো আর প্রকট হয়ে ধরা পড়েছিল জয়াবতীর বর্ণাঢ্য দাম্পত্য সম্পর্ক, সুবালার সুখী সংসারের ছবি এবং অম্বিকার ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যে এসেই। প্রবোধের সুশ্রী দেহের অন্তরালে লুকিয়ে-থাকা ভয়ানক কুশ্রীতাকে সুবর্ণ ঘৃণা করেছে আর 'রোদে পোড়া তক্ষ কালো শীর্ণ'[৫৩] অম্বিকাকে দেখে তার মনে হয়েছে 'উঁচুস্তরের মানুষ'[৫৪] তার সঙ্গে কথা বলে মনে হয়েছে 'তার মতো মানুষের ধারে কাছে থাকতে থাকতে আপনিই বিশুদ্ধ হয়ে যায় মানুষ।'[৫৫]

এভাবে মনের অমিলকেই একমাত্র ভরসা করে এগিয়ে গেছে সুবর্ণলতা। পথ চলতে চলতে হয়তো নুয়ে পড়েছে কিন্তু ভেঙে পড়েনি। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অনমনীয় ব্যক্তিত্বকেই আশ্রয় করে বেঁচে গেছে। চলে যেতে যেতেই যেন পরবর্তী প্রজন্মের উদ্দেশ্যে বলে গেছে সেই কঠিন ব্রতের সহজ সমধানটি 'হেরেছি, কিন্তু হার মানিনি।'[৫৬]

সুবর্ণলতার এই অপূর্ণ আখ্যান জন্ম দিয়ে গেছে অনেক সম্ভাব্য প্রশ্নের। লেখিকার বলিষ্ঠ এবং মর্মদরদি লেখনী সুবর্ণলতার আত্মবলিদানের ভাষায় যেন নারীর নিজস্ব নির্মিতির এক একান্ত অবস্থানটুকু তৈরি করে নেওয়ার জন্যে ছক ভাঙার প্রয়াসী হয়ে উঠেছে। সুবর্ণলতার পূর্বপ্রজন্ম অর্থাৎ সত্যবতী অবিশ্বাস্য দাম্পত্যজীবনের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের বেদনা নিয়ে সংসার ত্যাগী হয়েছিল, সেই সংসারত্যাগী মায়ের জীবনাদর্শ সুবর্ণের জীবনতরীকেও ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। আপাত-অর্থে যদিও জীবন-পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে দুটো জীবনের মধ্যে একটা অবস্থানগত বৈষম্য লক্ষ করা যায়, এই পার্থক্যও কিন্তু দুই প্রজন্মের মুক্তির আদর্শকে বিলুপ্ত করতে পারেনি। সত্যবতীর প্রেরিত চিঠি সুবর্ণের কাছে নারী-জীবনের এক অমোঘ সত্য বিবাহ-প্রতিষ্ঠানের যৌক্তিকতাকে তুলে ধরেছিল প্রথাগত নীতির বিরোধিতায়। আর সুবর্ণ সেই প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি বিধিবিধানের সক্রিয় অভিজ্ঞতার বাহক ছিল। সুবর্ণলতা স্বামী সহবাসে আবিষ্কার করেছিল তার যন্ত্রণাব তীব্রতাকে, পরিচিত মহলের চেনা নৈকট্যের মধ্যে থেকেও অনুভব করেছিল শূন্যতাবোধের হাহাকারকে। একই ছাদের নিচে একই শয্যার আশ্রয়ে শুয়েও সে খুঁজে পেয়েছিল স্বামী সন্তানদের থেকে পৃথক মননের গভীরতার স্বাদকে। আর এই দীর্ঘ বৈপরীত্যের ডালি নিয়েই একদিন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল তার না-পাওয়াকে পাওয়ার অভিযান। তাই সুবর্ণলতার চিতার লেলিহান শিখাও যেন অপূর্ণতার আর্তনাদে জ্বল জ্বল করে উঠেছে। এই শিখার আভার উজ্জ্বলতাকে বঙ্গদেশের হাজারো সুবর্ণের জীবনে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে সঙ্কল্পবদ্ধ হয় সুবর্ণের শেষ জীবনের সন্তান বকুল।

তাই সুবর্ণের এই আখ্যান যেন নারীর নিজস্ব অভিজ্ঞানের পরিধিটিকে আরও স্পষ্ট করে তোলে। স্ত্রী-শিক্ষা স্বাধীনতা অর্থাৎ নারী-প্রগতির জোয়াবে যখন শিক্ষিত ব্রাহ্ম পরিবারের মধ্যেও মাঝে মাঝে বিরোধিতার তরঙ্গ উঠেছিল তখনও কিন্তু গ্রাম বাংলার হাজারো অন্দরমহল অমানিশায় আচ্ছন্ন হয়েছিল। ঠিক তখনই সুবর্ণলতার আত্মনির্মিতির ইতিহাস লেখিকার জাগ্রত চেতনার আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। আভিজাত্যহীন অহংকারের

ধবজাধারী রক্ষণশীল বাড়ির মেজবৌ-এর জাগ্রত চেতনা যেন পরবর্তী প্রজন্মের কাছে আলোকবর্তিকা হয়ে উঠেছে। সুবর্ণলতার স্রষ্টা আশাপূর্ণার কাছে নারী-প্রগতির পরবর্তী অধ্যায়কে জানার আগ্রহ উদ্বিগ্ন পাঠককুলকে মোহাবিষ্ট করে রাখে। সুবর্ণের চিতার সামনে দাঁড়িয়ে নবজন্ম লাভ করে বকুল যে নারী-ইতিহাস লেখার প্রতিশ্রুতি জানিয়ে বসে, কেমন হবে সেই প্রগতির ইতিহাস, লেখিকা আরোহণের কোন শীর্ষবিন্দুতে নিয়ে যাবেন, সেটাই পরবর্তী অংশে লক্ষ্যবিন্দুকে ধার্য করবে।

বকুলকথা

'প্রথম প্রতিশ্রুতি'. 'সুবর্ণলতা'-র সংগ্রামমুখর জীবনের মধ্য দিয়ে যে নারীর বিকল্পহীন সাহিত্য-ঐতিহ্যের সন্ধানযাত্রায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন আশাপূর্ণা, 'বকুলকথা'য় এসে এর রেশ টানার পালা। দীর্ঘকালীন সঞ্চিত অভিজ্ঞতার রূপায়নে নারী-পাঠকৃতির যে বিশেষ বিশ্লেষণী দলিল গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন তিনি, 'বকুলকথা'-র বকুল তার শেষ সংযোজন। চিতাগ্নিকে সাক্ষী রেখে যে-বকুল সঙ্কল্প করেছিল মায়ের জীবনের অব্যক্ত যন্ত্রণার ইতিহাসকে বহির্বিশ্বে উত্তর-প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেবে, সেই বকুলেরই পরিণত, পরিশীলিত রূপ অনামিকা দেবী। একজন প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক হিসেবেই 'বকুলকথা'-য় তার আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। আর সেই সঙ্গে সুবর্ণলতার পরবর্তী প্রজন্মের জীবনেতিহাসের প্রতিটি অধ্যায়ের হাল-হকিকত জানতে পাঠকও যেন চরম আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকেন। সুবর্ণলতার উত্তর-প্রজন্ম হিসেবে বকুলের রূপায়নে কি লেখিকা নারী-পাঠকৃতির সার্থক সম্ভাবনার পথ তৈরি করে দিতে সমর্থ হয়েছিলেন! বকুলের পাঠকৃতির বিশ্লেষণী দৃষ্টি কিন্তু সেই ভাবনায় অন্তর্ঘাত করে। আশাপূর্ণা অধরা সময়ের কথা বলতে গিয়ে যা বলে বসেন, তা সব অবস্থাতেই যেন এক 'না-সময়ের' কথা হয়ে ওঠে। 'না-সময়' বলছি কারণ আধুনিকতা শব্দটিই আপেক্ষিক। তাই প্রতিটি সময় তার নতুন দিক দিয়ে আধুনিক হয়ে উঠতে পারে। তবে আধুনিকতার প্রাক্‌শর্তরূপে যে-সূচকটি সবচেয়ে বেশি মান্যতা প্রত্যাশী, তা হল ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের অধিকার। শিল্পায়ন, নগরায়ন এর সহায়ক প্রেক্ষিত প্রস্তুত করে মাত্র। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উত্তরণ বলতে নারী-ব্যক্তিত্বের উত্তরণকেই বোঝানো হয়েছে। কেননা নারী-শিক্ষার দ্বারা নারীর নিজস্ব অভিজ্ঞান গড়ে তোলার প্রয়াস সে-সময়ের সামাজিক উন্নতির পথে অন্যতম সোপান ছিল। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য, বিকৃত রুচির আধার হতে পারে না। তাই 'বকুলকথা'য় শম্পার আদর্শায়িত প্রেমের আদলে রুচিবোধহীনতা কিংবা সত্যভামার মধ্যে আরোপিত আধুনিকতার যে-বিকৃত ছবি ফুটে ওঠে, তাকে আর যে-কোনোভাবে আখ্যায়িত করা হলেও একে খাঁটি আধুনিকতা বলা যায় না। কারণ প্রতিটি মতবাদেরই একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যসূচক দিক আছে, আবার ঠিক একটি আপাত-বিরোধী দিকও আছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এর দ্বিতীয় দিকটিকেই এর যথার্থ স্বরূপ বলে মান্যতা দেওয়ার ভুল করা হয়। তা না-হলে 'বেপরোয়া ভঙ্গি' মানেই যে আধুনিক নয়—এ কথাকে স্বীকার করে নিয়েও যেন লেখিকা দোলাচল ভাবনার যাথার্থ্য নিরূপণে তৎপর হন শম্পা কিংবা সত্যভামার মতো চরিত্র সৃষ্টি করে। এবং এক অস্থির ভাবাদর্শকে রক্ষণশীলতার নিরাপদ মোড়কে নিশ্ছিদ্র দূরত্বে দেখাতে গিয়ে বলেন :

'তবে আগের দিনে সমাজে এবং সাহিত্যে এ দুইয়ের মধ্যেই রক্ষণশীলতার প্রভাব একটু থাকতই। তাই চট্ করে ঐ 'অতিক্রম'টি তেমন দুরন্ত চেহারা নিত না। একালে রক্ষণশীলতার মনোভাব কমে যাচ্ছে এবং অনেক ক্ষেত্রে আবার 'বেপরোয়া' ভঙ্গিটাকেই আধুনিক বলে গণ্য করা হচ্ছে।'[৫৭]

তাই বিবর্তিত সময় এবং মানসিকতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে কোনো ব্যক্তিসত্তার যথার্থ নির্মিতি গড়ে ওঠে না 'বকুলকথায়'। বকুল কিংবা অনামিকা দেবী, যাকে স্বয়ং লেখিকার আত্মজৈবনিক সত্তা বললে ভুল হয় না, তাঁর রচনায় পূর্ব-ভাবনার কোনো আলোকিত বিকাশ দেখা যায় না। বরং বকুলের আত্মজবানিতে যা বললেন লেখিকা, তাতে যেন ভাবনার ক্ষেত্রে কেন্দ্রবিচ্যুতি ঘটেছে। আশাপূর্ণাও সে-দায় কিছুটা স্বীকার করে নিয়েছিলেন বলেই তাঁর আক্ষেপ ছিল, 'শুধু বকুলের কথাটা আর লেখা হল না।'

'প্রথম প্রতিশ্রুতি'-র সত্যবতী কিংবা 'সুবর্ণলতা'-য় নারীর আত্মদহনের মধ্য দিয়ে আত্মঅভিজ্ঞান নির্মাণ পরম্পরার যে-সূচনা হয়েছিল বিংশ শতকের নারীদরদি এই লেখিকার হাতে, 'বকুলকথা'-য় এসে তাতে কোনো শৈল্পিক উত্তরণের বার্তা উপলব্ধি করা যায় কি বিবর্তিত সময়ের পাঠক প্রতিক্রিয়ায়! বকুলকথার নিবিড় পাঠ কিন্তু সে-ইঙ্গিত বহন করে না। পরিবর্তনই হচ্ছে বিবর্তনের স্বাভাবিক শর্ত। এই পরিবর্তনের দায়কে সাহিত্যিক, শিল্পী, পাঠক, শ্রোতা—কারো পক্ষেই এড়িয়ে চলা সম্ভব নয়। কিন্তু বিবর্তিত সময়ের সঙ্গে যুগগত চাহিদার রূপবদল ঘটতে পারে। বলা ভালো লেখক বা লেখিকারা নতুন নতুন রীতিতে এই জিজ্ঞাসাকে তুলে ধরতে পারেন কিন্তু অন্তর্নিহিত জিজ্ঞাসার বিকেন্দ্রায়ন ঘটলে ভাবনার পারম্পর্যসূত্রটুকু অটুট থাকে না। 'বকুলকথা'-য় লেখিকা বকুলের জবানিতে শম্পা কিংবা সত্যভামার চরিত্রায়নে যে-সময়ের কথকতাকে ব্যক্ত করেন, সেখানে বকুলের ইতিহাস চাপা পড়ে গেছে। বকুল যেন একনিষ্ঠ দর্শকের ভূমিকায় শুধু সময়ের দ্রুত গতিতে পৌঁছবার ব্যর্থ প্রয়াস করেছে। কিন্তু এটা কোনো অবস্থাতেই অভিপ্রেত ছিল না। কেননা শেষ বলে কিছু নেই। সেই আপাত-সমাপ্তির ব্যঞ্জনাতেই উত্তরণ বা অবতরণের শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছে যান লেখক-লেখিকারা। আশাপূর্ণার ক্ষেত্রেও সেটা আশা করা অনভিপ্রেত ছিল না। কেননা সত্যবতী, সুবর্ণলতাদের মধ্য দিয়ে নারীর অনুভূতি উপলব্ধি প্রকাশের একটি নিজস্ব গৃহকোন তৈরি করে দিতে পেরেছিলেন তিনি। সেখানেই নারীর অন্তরের চরমতম উপলব্ধিকে নিজস্ব ভাষায় ব্যক্ত করার মধ্য দিয়ে যেন তিনি উত্তরণের শিখরে পৌঁছানোর প্রয়াস করেছিলেন। ফলে 'বকুলকথা' তার শীর্ষবিন্দু হতে পারত। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, ত্রয়ী উপন্যাসের প্রথম দুটিতে লেখিকার অবস্থান ছিল ঘটনা পরম্পরায় অনেকটাই নিরাপদ দূরত্বে। সেখানে বয়ানের পারম্পর্য অনেকটাই বাস্তবোচিত হয়েছে। কিন্তু যেখানে লেখিকা নিজেই সময়ের বার্তাকে তুলে ধরার কঠিন দায়িত্ব নিয়েছেন, সেখানে সময়ের বাস্তবতায় নারীর অবস্থানটুকু স্পষ্ট না-হয়ে যেন তা আধুনিক বাস্তবের অগভীর বিশ্লেষণের দলিল হয়ে উঠেছে। তা হলে কি আধুনিকতা বা প্রগতির পরিপন্থী ছিলেন লেখিকা! তাই আধুনিকতার বিকৃত রূপায়নে সময়ের উল্টোরথের সারথী হয়ে বসলেন! আশাপূর্ণা বলেছিলেন 'বকুলের ভূমিকা নায়িকার

নয়, দর্শকের। সে তার ঘরোয়া লেখিকা জীবনের মধ্যে আজকের সমাজকে যতটুকু দেখতে পেয়েছে, যতটুকু ধরতে পেরেছে, তারই কথা।'[৫৯] কিন্তু তা হলেও যদি দর্শনের কথা বলা হয়, তা হলে একজন সাধারণ ব্যক্তির দেখা এবং সাহিত্যিকের দেখার মধ্যে পার্থক্য থেকে যায়। সাহিত্যে শুধু দেখা বাস্তবকেই সত্য বলে স্বীকার করে না। সেই সঙ্গে একজন সাহিত্যিকের প্রজ্ঞাপূর্ণ গভীর দর্শনে ধরা পড়ে সমাজের সে-সত্য, যা যথাপ্রাপ্ত অবস্থানের পাশাপাশি সম্ভাব্য অবস্থানকেও তুলে ধরে। কিন্তু 'বকুলকথা'-য় যে-সত্যের অবতারণা করেন লেখিকা তাতে 'রঙচঙে রাঙ্‌তা মোড়া'[৬০] আধুনিকতার একপেশে দিকটিই মুখ্য হয়ে ওঠে। যদি এটা ধরেও নেওয়া যায় যে শম্পা সত্যভামাদের বাইরের চাকচিক্য আধুনিকতার একটা দিককে নির্দেশ করছে কিন্তু এটাই একমাত্র সত্য নয়, মননে বা বোধে আধুনিক ভাবনা-চিন্তার প্রসার ঘটানোই যথার্থ আধুনিকতার মাপকাঠি। এই প্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে সত্যবতী-সুবর্ণলতার উত্তরসূরিরূপে বকুলের প্রকৃত অবস্থানটুকু কোথায়! বকুল যেন এক দেখা ঘটনার বিবরণ দিয়ে যায় কিন্তু তাতে তার নিজস্ব অভিমত বা অবস্থানটুকু প্রচ্ছন্ন থেকে যায়। অনামিকা দেবী যখন শম্পার দিকে তাকিয়ে ভাবেন :

> *'আজ পৃথিবী তোদের পায়ের তলায়, আকাশ তোদের মুঠোয়, তোরা নিজের জীবনকে নিজের হাতে পাচ্ছিস, আর তার আগে সেটা গড়ে দিচ্ছে তোদের গার্জেনরা।'*
> *তোরা কী বুঝবি গড়নের বালাইহীন একতাল কাদার জীবনটা কেমন? তাও সেই বাঁকাচোরা অসমান ডেলাটাও অন্যের হাতে!*
> *সেই অন্যের হাতের চাপে বিকৃত অসমান কাদার জীবনকে দেখেছি আমরা, তাই ভাবি তোরা কত পেয়েছিস! কত পাচ্ছিস!...বকুলের ছবিটা একবার ভেসে এসেছিল বহু যুগের ওপার থেকে, কিন্তু তার খাতাটা? সেটা যে কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছেন না অনামিকা দেবী। খোঁজবার জায়গাটাই খুঁজে পাচ্ছেন না।'*[৬১]

তখন মনে হয় বকুলের প্রজন্ম থেকে শম্পার প্রজন্মের মধ্যে একটি ব্যবধান রয়ে গেছে যে-ব্যবধানটুকু উপন্যাসের কোথাও উন্মোচিত হয়নি। নাকি লেখিকা সচেতনভাবে সেটাকে অর্থাৎ বকুলের কালকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেন? সত্যবতী-সুবর্ণলতার যুগ পেরিয়ে বকুলের (তৃতীয়) প্রজন্ম যেন অনুচ্চারিতই থেকে গেল, স্পষ্ট হয়ে ওঠে আর এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে চতুর্থ প্রজন্মের কথা। তা হলে কি অনামিকা দেবীর লেখায় বকুলের নিজস্ব কাল বলে কোনো কালের উল্লেখ নেই! বকুলের অনামিকা দেবী হয়ে ওঠার কোনো ইতিহাস কোথাও নেই! পারুলের মধ্য দিয়ে যদিও বা সেই অনুসন্ধিৎসু মনের প্রতিক্রিয়াটুকু ব্যক্ত হয়েছে।

> *'...ভেবেছি আমাদের 'কাল' আসতে বুঝি বাকি আছে এখনো। সেই আসার পদধ্বনির আশায় কান পেতে বসে থাকতে থাকতে দেখেছি আমরা কখন যেন বাতিলের ঘরে আশ্রয় পেয়ে গেছি। সে কালটা তবে গেল কোথায়?'*[৬২]

তবু অনামিকার নেপথ্য বকুলের আত্ম-অভিজ্ঞানে কিন্তু সে-জিজ্ঞাসার সুরটুকুও আশ্চর্যভাবে অনুপস্থিত থাকে।

তাই বিশ্লেষণের নিরিখে এরকম একটি সত্যে পৌঁছানো যেতে পারে যে 'বকুলকথা'-য় এসে যেন লেখিকার স্ববিরোধিতার ছাপটি স্পষ্ট। সুবর্ণলতার স্বপ্নের প্রতিমাকে বকুলে সাকার করে তুলতে গিয়ে তার জায়গায় তিনি সম্পূর্ণ নতুন ভাবনার ছক কষে বসেন। বলা যায় অনেকটাই যেন শেকড়হীন ভাবনার গভীরে তলিয়ে যান, ফলে তা যুগের প্রেক্ষিতে নারীত্বের অগভীর বিশ্লেষণ হয়ে ওঠে। উপন্যাসের শেষে কিন্তু আশাপূর্ণা আধুনিকতার নামে সেই উগ্র মতবাদেরই সমর্থন করে বসেন পরিবর্তিত যুগের স্বাভাবিক রীতির নিরিখে, পাপ-পুণ্যের বিচার না-করে শম্পাদের মতো আগামী প্রজন্মের 'প্রত্যক্ষে যারা জিতেছে'[৬৩] তাদের কথাই বলেন। কিন্তু প্রত্যক্ষ জয়ও কি সবসময় প্রকৃত জয়ের কথা বলে যায়! তা হলে তো সুবর্ণলতার আখ্যানকে বাতিলের খাতায় রাখতে হত।

তাই বকুলকথায় লেখিকা এবং কথকের অন্তর্বয়নে অসামঞ্জস্য লক্ষ করা যায়। আশাপূর্ণার আত্মজৈবনিক সত্তা হিসেবেও যদি অনামিকা দেবীর নাম করা যায়, সেখানেও কিন্তু একটা গরমিলই ফুটে ওঠে। যে অনামিকা দেবী বকুলেরই পোষাকি নাম, সেই অনামিকা দেবীর লেখায় কিন্তু বকুলের আত্মকথা গড়ে ওঠে না। বরং বকুলের ভাবনার শরিক হয়ে পারুলই আমাদের প্রত্যাশা পূরণে এগিয়ে আসে। তাই পারুলকেই যেন গত দুই প্রজন্মের ধারার পরবর্তী ধাপের ভাষ্যকার বলে মনে হয়। নারীর ক্রমিক অবস্থানের চিত্রকে তুলে ধরার যে-সঙ্কল্প গ্রহণ করেছিলেন লেখিকা, তৃতীয় পর্বে এসে তাঁর সেই ভাবনার শীর্ষবিন্দু থেকে অবরোহণ ঘটে। দায়সারাভাবে বকুলও যেন পারম্পর্য রক্ষার দায়কে গ্রহণ না-করেই নিজেদের কালকে অতীতের পাতায় ঠেলে দিয়ে শম্পাদের কালের কথা বলে যায়। এতে পাঠকের ধারাবাহিক পঠন প্রক্রিয়া থেকে কিন্তু বকুলের অতীতটি হারিয়ে যায়। সেই বিচ্ছিন্নতা ত্রয়ী উপন্যাসের ক্ষেত্রে এক শৈল্পিক অবনমনের ক্ষেত্রটিকে চিহ্নিত করে।

সূত্র নির্দেশ

১. পৃ. ২১, 'আম্রপালী', 'স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ', মল্লিকা সেনগুপ্ত।
২. পৃ. ২১, তদেব।
৩. পৃ. ২১, তদেব।
৪. পৃ. ১০, ভূমিকা, 'উনিশ শতকে নারী মুক্তি আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য', রণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়।
৫. পৃ. ৪১, 'অলংকার না Badge of slavery', রোকেয়া সাখওয়াত হোসেন।
৬. পৃ. ৯১, 'নারী-প্রগতি : আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণী', গোলাম মুর্শিদ।
৭. তদেব
৮. পৃ. ৮৯, 'নারীমুক্তি আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়', 'মেয়েলি পাঠ', সুতপা ভট্টাচার্য।
৯. পৃ. ৮৮, তদেব।
১০. পৃ. ৯৩, তদেব।
১১. পৃ. ৯, 'খেলা থেকে লেখা', 'আর এক আশাপূর্ণা', আশাপূর্ণা দেবী।

১২. পৃ. ১০, তদেব।
১৩. পৃ. ৪, 'প্রথম প্রতিশ্রুতি', আশাপূর্ণা দেবী।
১৪. পৃ. ৪, তদেব।
১৫. পৃ. ৪, তদেব।
১৬. পৃ. ১২, তদেব।
১৭. পৃ ১২, তদেব।
১৮. পৃ. ৯, তদেব।
১৯. পৃ. ১৩, তদেব।
২০. পৃ. ২০, তদেব।
২১. পৃ. ২১, তদেব।
২২. পৃ. ৪২, তদেব।
২৩. পৃ. ৬৩, তদেব।
২৪. পৃ. ২৭, 'কথাসাহিত্যে নারী চরিত্রের নতুন মাত্রা বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ, মেয়েদের লেখালেখি', সুতপা ভট্টাচার্য।
২৫. পৃ. ৬০, 'প্রথম প্রতিশ্রুতি', আশাপূর্ণা দেবী।
২৬. পৃ. ৬১, তদেব।
২৭. পৃ. ১৪৯, 'এম্পাওয়ারমেন্ট', 'নৈতিকতা ও নারীবাদ', শেফালী মৈত্র।
২৮. পৃ. ৬০, 'প্রথম প্রতিশ্রুতি', আশাপূর্ণা দেবী।
২৯. পৃ. ১০৯, তদেব।
৩০. পৃ. ১২৭, তদেব।
৩১. পৃ. ২৪৫, তদেব।
৩২. পৃ. ১২৮, তদেব।
৩৩. পৃ. ১২৮, তদেব।
৩৪. পৃ. ১৭, 'নারীবাদী দর্শন ও তার প্রেক্ষাপট', 'নৈতিকতা ও নারীবাদ', শেফালী মৈত্র।
৩৫. পৃ. ৪৪৫, 'প্রথম প্রতিশ্রুতি', আশাপূর্ণা দেবী।
৩৬. পৃ. ৪৪৬, তদেব।
৩৭. কথামুখ, লেখিকার কথা, সুবর্ণলতা, আশাপূর্ণা দেবী।
৩৮. তদেব।
৩৯. পৃ. ১, 'সুবর্ণলতা', আশাপূর্ণা দেবী।
৪০. পৃ. ৪, তদেব।
৪১. পৃ. ৩৩১, তদেব।
৪২. পৃ. ৯, তদেব।
৪৩. পৃ. ৭, তদেব।
৪৪. পৃ. ৯৮, বিকল্প সাহিত্য ঐতিহ্যের সন্ধানে, 'মেয়েলি সংলাপ', সুতপা ভট্টাচার্য।
৪৫. পৃ. ৩১, 'সুবর্ণলতা', আশাপূর্ণা দেবী।

৪৬. তদেব।
৪৭. পৃ. ৩৫, তদেব।
৪৮. পৃ. ১২৮, ১২৯, তদেব।
৪৯. পৃ.
৫০. পৃ. ২, তদেব।
৫১. পৃ. ২৮, বিবাহের বিরুদ্ধে, 'মেয়েলি সংলাপ', সুতপা ভট্টাচার্য।
৫২. পৃ. ৩১৭, 'সুবর্ণলতা', আশাপূর্ণা দেবী।
৫৩. পৃ. ১৫৮, তদেব।
৫৪ তদেব।
৫৫. তদেব।
৫৬. পৃ. ৩৬২, তদেব।
৫৭. পৃ. ১৮, 'যা দেখি তাই লিখি', 'আর এক আশাপূর্ণা'।
৫৮ পৃ. ৩১২, 'বকুলকথা', আশাপূর্ণা দেবী।
৫৯. পৃ. ১১, 'খেলা থেকে লেখা', 'আর এক আশাপূর্ণা'।
৬০. পৃ. ১২, তদেব।
৬১. পৃ. ১৯, 'বকুলকথা', আশাপূর্ণা দেবী।
৬২. পৃ. ২৬, তদেব।
৬৩. পৃ. ৩১২, তদেব।

প্রথম প্রতিশ্রুতি, সুবর্ণলতা, বকুলকথা : নারীজীবনের কালান্তর

অনসূয়া হালদার

রাজনৈতিক ভাঙাগড়া, জাতির উত্থানপতন, কিংবা সমাজের বিচিত্র বহুমুখী পরিবর্তন সময়ের তালে তাল মিলিয়ে চলে। সময়-গতির সেই অনন্ত পরিক্রমাই ইতিহাস। কিন্তু অতি প্রত্যক্ষভাবে কালের যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া তাকেই কি বলব ইতিহাস-রচনার একমাত্র উপাদান? জীবনের যে গোপন কুঠুরিতে অপ্রত্যক্ষভাবে চলে সময়ধারা সে-ও কি ইতিহাস নয়? সে-ও ইতিহাসই। জীবনের ইতিহাস। সেই জীবন-ইতিহাসেরই এক অখণ্ড ব্যাপ্ত রূপ প্রত্যক্ষ করি আশাপূর্ণা দেবীর (৮/১/১৯০৯-১৩/৭/১৯৯৫) প্রখ্যাত ত্রয়ী উপন্যাসে—'প্রথম প্রতিশ্রুতি', 'সুবর্ণলতা' এবং 'বকুলকথা'-তে।

এই ত্রয়ী উপন্যাস নিছক উপন্যাস মাত্র নয়। একই সঙ্গে তা প্রত্যক্ষ করায় কালের এক ভিন্নতর রূপকে, ইতিহাসকে, এক নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামকে। এই ইতিহাস, এই সংগ্রাম অন্তঃপুরের নারীজীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পুরুষের কর্ম-কোলাহলমুখর বহির্জগৎ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এই ভিন্নতর জগতের কালান্তরের ছবি সর্বপ্রথম ব্যক্তরূপে প্রকাশ পেল আশাপূর্ণা দেবীর লেখনীতেই। সময়ের এই অজ্ঞাত দলিল তিনিই প্রথম পেশ করলেন জীবনের দরবারে। ধূসর অতীত ভেদ করে নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অর্জনের অতিদীর্ঘ সংগ্রাম-কাহিনি হয়ে উঠল প্রত্যক্ষ। প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল কালের এই পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপটে নারীর রূপান্তরশীল অবস্থান এবং এই অবস্থানের পশ্চাতে-থাকা আর্থ-সামাজিক প্রভাব। এই পথেই আধুনিক নারী-চেতনার আত্মপ্রতিষ্ঠার ভিত্তিভূমির যথার্থ ইতিহাস হল আবিষ্কৃত।

সুদীর্ঘকালব্যাপী তিন প্রজন্মের জীবন-চেতনার কাহিনিই ত্রয়ী উপন্যাসের উপজীব্য। বকুল, বকুলের মা সুবর্ণলতা এবং মাতামহী সত্যবতী তিন পর্বের তিন কেন্দ্রীয় চরিত্র। মাতামহী থেকে দৌহিত্রী · তাদের স্বতন্ত্র জীবনদৃষ্টি, সংগ্রাম এবং ভিন্নতর বোধ ধাপে ধাপে উন্মোচিত হয়েছে উপন্যাসের মধ্যে। শুধু এই-ই নয় কেন্দ্রীয় চরিত্রগুলির সূত্রে অন্তঃপুরের সেই অজানা মহাদেশ, সমাজের সেই অজানা ইতিহাস তার সমস্ত বেদনা, বঞ্চনা, হাহাকার, সুখদুঃখ এবং অপরিসীম নিরুপায়তা নিয়ে ধীরে ধীরে রূপ পেয়ে উঠেছে। এবং পাঠকের উপলব্ধিতে ধরা দিয়েছে সময়ের এই অনাবিষ্কৃত মূর্তি।

বস্তুতপক্ষে সত্যবতী, সুবর্ণলতা এবং বকুলকে একই চেতনার তিন ভিন্নরূপ বলা যায়। সত্যবতীর প্রথা-বিরোধী জীবনদৃষ্টিই সুবর্ণলতার মধ্য দিয়ে পূর্ণতর রূপ লাভ করেছে বকুলের মধ্যে। এই সূত্রেই উপন্যাস তিনটি পৃথক হয়েও পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত। কারণ একটিই জীবন-চেতনা এখানে তিনটি কালের মধ্য দিয়ে তিনটি রূপে ব্যক্ত হয়েছে। সেই চেতনা হল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধে উজ্জ্বল নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার চেতনা, নিছক মেয়েমানুষ পরিচয়ের খোলস ভেঙে পূর্ণ মনুষ্যত্বে প্রতিষ্ঠিত হবার চেতনা। সত্যবতীর কাল সেই সুদুর উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বকুলের কাল পর্যন্ত প্রায় এক শতাব্দীরও বেশি সময় জুড়ে প্রকাশিত হয়েছে একটিই চেতনার কথা, কালান্তরে তার রূপ শুধু পরিবর্তিত হয়েছে।

এই কারণেই বকুলের সূত্রে প্রথমেই উঠে আসে সত্যবতী-কথা। সেইটিই উপন্যাস ত্রয়ী

ব্যাপী জীবনভাবনার মূলসূত্র। উনিশ শতকীয় পটভূমিকায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় সত্যবতীকে। আট-হাতি বৃন্দাবনি শাড়ি, মুড়কি মাদুলি আর ঝাঁঝর মল পায়ে নিতান্ত বালিকা এই সত্যবতীই বকুলের মাতামহী। সেকালের বিখ্যাত কবিরাজ রামকালীর একমাত্র সন্তান সত্যবতীর মনের গড়ন প্রথমাবধিই ভিন্ন প্রকৃতির। তারই সংবেদনশীল মনের আয়নায় ধীরে ধীরে প্রতিবিম্বিত হয় উনিশ শতকীয় গ্রাম-সমাজ, যে-সমাজ বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ প্রভৃতি বিবিধ অসঙ্গতিতে ভরা, সংস্কারাচ্ছন্ন এবং সম্পূর্ণভাবে পুরুষতান্ত্রিক। তাই আবহমান কাল ধরে চলে-আসা চিরাভ্যস্ত এবং সনাতন রীতিনীতি কেবলই সত্যবতীর মনে প্রশ্ন জাগায়। বিশেষত অন্তঃপুরের সংস্কারাচ্ছন্ন বিচিত্র মানসিকতা তাকে ক্ষুব্ধ করে তোলে, পীড়া দেয়। অজস্র জিজ্ঞাসা নিরন্তর জেগে থাকে তার চেতনায় যা তাকে করে তোলে আশ্চর্যরকম দুঃসাহসী। সেই দুঃসাহস ভরে সে উত্তর খোঁজে, বালিকাসুলভ প্রতিবাদ করে। পরিবর্তে নিন্দা ভর্ৎসনাই জোটে বেশি। তবু সত্যবতীর মন পিছিয়ে আসে না। বরঞ্চ চতুর্দিকের এই বিরুদ্ধতাই এই ছোট্ট মেয়েটির অবচেতনে নিয়ে আসে স্বাতন্ত্র্যের পথে এগিয়ে চলার প্রেরণা। সহস্র বিধি-নিষেধের শৃঙ্খল-বাঁধা উনিশ শতকীয় নারীজীবনের সীমাবদ্ধ ভাবনার জগতে একটি সম্পূর্ণ বিপরীত জীবন-চেতনার চোরাস্রোত বইতে শুরু করে। কালান্তরে এই স্রোতই তার বিপুল বিস্তার নিয়ে জীবনের মহাসমুদ্রে যুক্ত হয়ে যায়।

সত্যবতীর এই মানসিক বলিষ্ঠতা, আপসহীন সংগ্রামী ব্যক্তিত্ব সর্বোপরি প্রখর আত্ম-মর্যাদাবোধ অনেকটাই তার পিতৃসূত্রে প্রাপ্ত। আগুনের মতন ব্যক্তিত্ব এবং বিচিত্র মানবিক গুণাবলির সমন্বয়ে রামকালী ছিলেন পুরুষের আদর্শ-স্থল। সত্যবতীর জীবনে তার প্রভাব সর্বাধিক হলেও সত্যবতীর নিজস্বতাও ছিল অনেকখানি। কারণ অনেক গুরুতর সামাজিক প্রশ্ন রামকালীর দৃষ্টি এড়িয়ে গেলেও সত্যবতীর চেতনায় তা ঝড় তুলে তাকে বিচলিত করেছে। বিশেষত নারী-পুরুষের অবস্থানগত বৈষম্যের চিত্র নিতান্ত বাল্যকাল থেকেই তাকে পীড়িত করেছে।

ছোট্ট সত্যবতীর হাত ধরে আমরা উনিশ শতকের এক বর্ধিষ্ণু গ্রামীণ অন্তঃপুরের মাঝখানে এসে দাঁড়াই। বাইরের মুক্ত জীবন থেকে চিরনির্বাসিত এই অন্তঃপুরের এক বিচিত্র ইতিহাস উন্মোচিত হয়। দীর্ঘকালের ব্যবধানে দাঁড়িয়ে-থাকা অতীত জীবনের এই রূপ যথার্থভাবে উঠে আসে উপন্যাসের পাতায়। সেই কালটিকে খুঁটিনাটি সমেত সামগ্রিকভাবে তুলে ধরেন আশাপূর্ণা দেবী এবং এখানেই তাঁর অনন্যতা। পাঠক দেখেন ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের অন্তঃপুরকে। সেখানে শিক্ষা নেই, বহির্জগতের সঙ্গে কোনো যোগসূত্র নেই, আছে শুধু পিতামহী-প্রপিতামহীদের সূত্রে প্রাপ্ত বিচিত্র সংস্কার আর বদ্ধ মানসিকতা। নারী-পুরুষের কী নিদারুণ বৈষম্য সেখানে প্রকাশিত। সুখ, সম্পদ, স্বাস্থ্য সমস্তই সেখানে পুরুষের প্রাপ্য। কারণ সমস্ত অর্থনীতির রাশ পুরুষের হাতে। নারী সর্বতোভাবে পরাধীন। সময়গতি তাই স্থির হয়ে থাকে অন্তঃপুরে। অথচ ঐ নিস্তরঙ্গ সময়ধারার বুকে কেবলই ঢেউ তোলে সত্যবতী। বিধবা ঠাকুমাদের বিচিত্র কুসংস্কার আর বদ্ধ মানসিকতাকে কঠোরভাবে সমালোচনা করে সে। তাদের আচারসর্বস্ব জীবনের অন্তঃসারশূন্যতা তাকে বিচলিত করে। অন্যদিকে স্বামীর হাতে ভয়াবহভাবে নির্যাতিতা জটার বউ-এর পক্ষ অবলম্বন করে বসে

সে। এমনকী সমস্ত বিধি-নিষেধ তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে জটাকে ব্যঙ্গ করে ছড়া বেঁধে ফেলে। সে-কালের সমাজব্যবস্থায় জটা তার পুরুষের অধিকার-বলে স্ত্রীকে অত্যাচারে মৃতপ্রায় করে ফেললেও কেউ বিশেষ বিচলিত হয় না। কিন্তু জটাকে নিয়ে সত্যবতীর স্পর্ধা ঘরে-বাইরে বিশেষ সমালোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। কারণ একে তো পুরুষের সমালোচনাই ভয়ানক গর্হিত অপরাধ, তার ওপর মেয়েমানুষের পক্ষে ছড়া বাঁধা তো চোদ্দ পুরুষ নরকস্থ করার সামিল। কিন্তু কোনো ভর্ৎসনাই সত্যবতীকে টলাতে পারে না। কারণ একে তো সত্যবতীর মানসিকতাই ভিন্ন ধাতুতে গড়া, তার ওপর রামকালীর একটি সস্নেহ প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয়। কারণ তিনি যথার্থ উপলব্ধি করেছিলেন কন্যার স্বাতন্ত্র্যকে। সে যে 'ঝাঁকের কৈ' হতে আসেনি তা তিনি জানতেন। এই সত্যবতীই আবার জটার বৌকে অত্যাচারী স্বামীর সঙ্গে হাস্য-পরিহাস করতে দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। কারণ নারীর চিরপ্রচলিত স্বামীসংস্কার এবং এহেন আত্ম-অবমাননা তাকে ক্ষুব্ধ করে, ব্যথিত করে তোলে। বস্তুতপক্ষে সেই সমাজে নারীর আত্মমর্যাদার কোনো স্থান ছিল না। না-ছিল পুরুষের মনে, না সমস্ত দিক থেকে বঞ্চিত নারীর চেতনায়। তাই যে-পুরুষ ভরণপোষণের দায়িত্ব নেয়, তার হাতে লাঞ্ছনা খুব স্বাভাবিক বিষয় ছিল মেয়েদের কাছে। জটার বৌ এর ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু আত্মমর্যাদার প্রশ্নে অনড় সত্যবতীর কাছে জটার বৌ 'মেয়ে জাতের কলঙ্ক'। কারণ সে অবলীলায় সত্যবতীকে বলতে পারে—'আমার সোয়ামী আমায় মেরেছে, তোমায় তো মারতে যায়নি ঠাকুরঝি? তোমার এত গায়ে জ্বালা কেন যে ছড়া বেঁধে গালমন্দ করতে আসো?'

সত্যিই সেকালের পক্ষে অযৌক্তিক, অদ্ভুত, সত্যবতীর মনের এই দাহ। তাই রামকালী তার মনের বিরাট অংশ অধিকার করে থাকলেও ন্যায়ের প্রশ্নে, সত্যের প্রশ্নে, সে তাঁর কার্যকলাপকেও সমালোচনা করতে ছাড়ে না। বড় ভাই রাসুর আকস্মাৎ দ্বিতীয় বিবাহের উদযোগকর্তা রামকালীকেই সত্যবতী নির্দ্বিধায় কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দেয়। এই অসাধারণ পুরুষটির অন্তরেও যে মেয়েদের সম্পর্কে একটা চিরাচরিত অবজ্ঞা এবং অবহেলা রয়েছে তা যেন হঠাৎ প্রকাশ হয়ে পড়ে সত্যবতীর তীক্ষ্ণ মন্তব্যে। একটা খুব নিদারুণ সত্যি কথা উচ্চারণ করে সে—'বেটা ছেলেরা তো আর সতিনের মর্ম বোঝে না!'

আসলে সমাজের কাঠামোটাই এমন ছিল যে রামকালীর মতন স্থিতধী এবং আদর্শ পুরুষের পক্ষেও মেয়েদের সুখদুঃখ এবং নিরুপায়তা নিয়ে ভাবতে বসা ছিল বাহুল্যমাত্র। কিন্তু তাঁর কন্যাটির বলিষ্ঠ জীবন-বোধ যে তাঁকে ক্রমশ বিচলিত করে তুলছিল সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

উনিশ শতকের গ্রাম-সমাজে বাল্যবিবাহ এবং বহুবিবাহ ছিল বহুল-প্রচলিত। উভয় ব্যবস্থাতেই মেয়েদের দুর্দশার অন্ত ছিল না। লক্ষণীয় যে ঐ বালিকা বয়সেই সত্যবতী ছিল বিবাহিতা, আর রাসুর দ্বিতীয় বিবাহ ছিল খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। সতিন নিয়ে সংসার করা অধিকাংশ মেয়ের ছিল ভবিতব্য। কারণ পুরুষতান্ত্রিক সমাজের ইচ্ছে-অনিচ্ছের খুঁটিতে বাঁধা মেয়েদের জীবন। প্রতিবাদের চেতনা এবং পথ কোনোটাই ছিল না তাদের। সত্যবতী আশৈশব এই প্রথা দেখে এলেও রাসুর প্রথমা স্ত্রীর সারদার মর্মান্তিক যন্ত্রণা তাকে নাড়া দিয়ে যায়। তার অসাধারণ বোধশক্তি এবং এক ভিন্নতর চেতনার বলে নিতান্ত বালিকা বয়সেই

সে এই প্রথার ভিতরকার নিষ্ঠুর অন্যায়টুকু বুঝতে পারে। মেয়েরাও যে সম্পূর্ণ ব্যক্তি, তাদেরও যে হৃদয় আছে, সর্বোপরি তারা যে একটি গোটা মানুষ—এই চেতনাই সত্যবতীর মনকে ধীকে ধীরে অধিকার করে। নারী সম্পর্কিত এই নিগূঢ় সত্যই তাকে প্রতিবাদী করে তোলে।

চরম দুঃসাহসকে ভর করে সত্যবতীকে ক্রমাগত এগিয়ে যেতে দেখি। সেই পথেই, সেই সমাজব্যবস্থায় মেয়েমানুষের পক্ষে মারাত্মক অপরাধের সামিল লেখাপড়ার চেষ্টা করে সত্যবতী। এই বিষয়ে অবশ্য রামকালী তাকে উৎসাহিতই করেন, আর সত্যবতীও যুগযুগান্তরের কুসংস্কার এক নিমেষে অগ্রাহ্য করে বলতে পারে—

> *মেয়েমানুষরা রাতদিন ঝগড়া করছে, কোঁদল করছে, যাকে তাকে গালমন্দ শাপমান্যি করছে, তাতে পাপ হয় না, আর বিদ্যে শিখলে পাপ হবে? বলি স্বয়ং মা সরস্বতী নিজে মেয়েমানুষ নয়? সকল শাস্তরের সার শাস্তর চার বেদ মা-সরস্বতীর হাতে থাকে না?*

সত্যবতী সৃষ্টিছাড়া, সত্যবতী একক। গ্রাম-সমাজ এবং বাড়ির অভিভাবিকাদের চোখে অভূতপূর্ব তার কীর্তিকলাপ। দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত কুসংস্কার আর অজ্ঞতার বিপরীতে তার এই একক বিরুদ্ধতা ছিল এক সুকঠিন কাজ। কারণ শুধু সমকাল বা সমসমাজই নয় স্বয়ং মেয়েরাই ছিল মেয়েদের প্রগতির পথে প্রধান বাধা। আত্মঅবমাননা আর আত্মবঞ্চনাই ছিল তাদের ধর্ম। কারণ পুরুষশাসিত সমাজ তাদের বুঝিয়েছিল যে এ ধরনের আত্মত্যাগেই তাদের পরম চরিতার্থতা। সমাজ আরও বুঝিয়েছিল যে ভালোভাবে বাঁচাটা শুধু পুরুষের পক্ষে প্রযোজ্য। মেয়েমানুষ কোনোক্রমে টিঁকে থাকতে পারলেই হল। এবং, সর্বতোপ্রকারে পুরুষের ইচ্ছাধীন থাকাতেই সেই টিঁকে থাকার পরম গৌরব। তাই মেয়েরা বিনা প্রতিবাদে মেনে নিয়েছে তাদের বাল্যবিবাহ, সপত্নী-কন্টকিত সংসার আর অকালবৈধব্যের যন্ত্রণা। সত্যবতীর চারপাশে যে নারীচরিত্রগুলি ভিড় করে এসেছে তাদের দ্বারাই এ কথা প্রমাণ হয়। সত্যবতী যেন একটি ছোট্ট প্রদীপ হাতে সেই চিরান্ধকার অবরোধে প্রবেশ করে। সেই একটু আলো একে একে অবগুণ্ঠনবতীদের মুখে পড়ে—তার মা ভুবনেশ্বরী, রাসুর প্রথমা স্ত্রী সারদা, আরও অনেকে। এরা অশিক্ষিত, বঞ্চিত, অনেক ক্ষেত্রে সামাজিক নির্যাতনের শিকার এবং সম্পূর্ণরূপে পুরুষদ্বারা নিয়ন্ত্রিত এদের ভাগ্য। অপরদিকে দীনতারিণী, কাশীশ্বরী, মোক্ষদা প্রভৃতি বিধবারা জীবনের সমস্ত দিক থেকে বঞ্চিত। পরমা-সুন্দরী বালবিধবা মোক্ষদা মনের তাড়নাতেই শুচিবাই করেন অথচ ভাবেন সেইটিই তাঁর ধর্ম। তরুণী বিধবা শঙ্করী একটু বাঁচার আশায় গৃহত্যাগ করে আর করুণতর পরিণতি পায়। উল্লেখ্য যে বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত আন্দোলন তখন সম্ভবত শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু গ্রাম-সমাজে তার কোনো সার্থক প্রতিফলন দেখি না। সেখানে তখনও পুরুষের বহুবিবাহ স্বাভাবিক। যেমন করেছে রাসু। অপর পক্ষে 'বিধবা-বিবাহ'-কে কোনো কোনো পুরুষ প্রলোভন হিসেবে ব্যবহার করেছে। ফলস্বরূপ শঙ্করীর মতো মেয়েরা হয় চূড়ান্ত অসহায়তার শিকার। মৃত্যু-কামনা করা ছাড়া এই দুর্বিষহ অবস্থা থেকে উত্তরণের কোনো পথ ছিল না মেয়েদের। সত্যবতীর মুখ দিয়েই উচ্চারিত হয়েছে এই অমোঘ সত্যটি—"সব

মেয়েমানুষের মুখে দেখি এক রা, 'মরব' 'মরছি', 'মরণ হয় তো বাঁচি!' এ তো আচ্ছা ফ্যাসাদ।"

পরবর্তীকালে মেয়েদের জীবনের এই নিরুপায়তা, নারী-পুরুষের এমন নির্লজ্জ বৈষম্য এবং সমাজের এই গভীর অসুখের মূলগত কারণ সত্যবতী সারাজীবন ধরে অন্বেষণ করেছে এবং এর যথার্থ উত্তর রেখে গেছে কন্যা সুবর্ণলতার হাতে।

একটা সময় সেকালের প্রথামতো সত্যবতীকে শ্বশুরবাড়ি যেতে হয়। সেখানে গিয়েই তার সত্যিকারের একক লড়াই শুরু হয়। কারণ এখানে তার উদার পিতৃহৃদয়ের সেই আশ্রয়টুকু নেই। প্রখর আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী সত্যবতী অন্যান্য গৃহবধূদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে না। সমস্ত কিছু নীরবে সহ্য করার পরিবর্তে সে প্রবল দাপুটে শাশুড়ি এলোকেশীর অন্যায়-অত্যাচারের সমুচিত জবাব দেয়। সর্বোপরি দুশ্চরিত্র শ্বশুরমশাইকে সে যে শ্রদ্ধা করতে অপারগ—এ-ও মুক্তকণ্ঠে জানাতে দ্বিধা করে না। সে-যুগের প্রেক্ষাপটে পুত্রবধূর পক্ষে এ ধরনের প্রতিবাদ ছিল ধারণাতীত। ফলত সমাজ এবং সংসারের যাবতীয় লাঞ্ছনার মধ্যে পড়তে হয় সত্যবতীকে। তার স্বামী নবকুমার এবং পিসতুতো ননদ সৌদামিনী তার প্রতি তদ্গত প্রাণ এবং একান্ত স্নেহশীল হলেও সত্যবতীর পাশে দাঁড়াবার মতো নির্ভীকতা এবং বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব তাদের কোথায়?

দৃঢ়চেতা সত্যবতী সংকীর্ণ এবং সংস্কারাচ্ছন্ন সমাজব্যবস্থার একটার পর একটা আগল ভাঙতেই থাকে। নবকুমারের মরণাপন্ন অসুখে তারই উদ্যোগে গ্রামে প্রথম ইংরেজ ডাক্তারের আগমন ঘটে। এবং, সেকালের নিতান্ত পল্লিবধূ হিসেবে সম্ভবত সেই প্রথম শ্বশুর-শাশুড়ির চৌহদ্দি ডিঙিয়ে, সমাজের অজস্র নিন্দাবাদকে উপেক্ষা করে, স্বামী-পুত্রকে নিয়ে কলকাতার বাসাবাড়িতে চলে আসে। সে-কালে শ্বশুর দূর অস্ত, শাশুড়িঠাকরুনের সামনেই পুত্রবধূরা একগলা ঘোমটা দিয়ে থাকত। মুখ-দেখানো কিংবা কথা বলা ছিল মহা-অশোভনতা। সেই কালে সত্যবতীর এই অভূতপূর্ব পদক্ষেপ যে কী আন্দোলনের সৃষ্টি করেছিল তা বলাই বাহুল্য। একই সঙ্গে সত্যবতী সৌদামিনীর মতো বঞ্চিত এবং নিরুপায় নারীদের কাছে প্রেরণাস্বরূপ হয়ে যায়। সৌদামিনীর স্বামী দ্বিতীয় বিবাহ করে সৌদামিনীকে নিষ্ঠুরভাবে ত্যাগ করে যায়। পরবর্তীকালে লোকটির দ্বিতীয় পক্ষ যখন তারই আট-নটি সন্তানের জন্ম দিতে দিতে সূতিকায় মরণাপন্ন হয় তখন আবার সৌদামিনী স্বামীর সংসারে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয়বার স্বামীর সঙ্গে যোগাযোগের মূল উদ্যোক্তা অবশ্য সৌদামিনীই স্বয়ং। আসলে অসহায় মেয়েদের এধরনের আত্মঅবমাননা পরিস্থিতির চাপেই স্বীকার করে নিতে হত। কারণ প্রশ্নটা কিছু অর্থনৈতিক বিষয় এবং বাকিটা বঞ্চিত নারীজীবনের অচরিতার্থ জীবন-বাসনার সঙ্গে জড়িত। যাই হোক, সত্যবতীকে কেন্দ্র করে গ্রাম-সমাজ এবং পরিবারের মেয়েদের মনে একটা চিন্তার ঢেউ ওঠে যা অভূতপূর্ব। চূড়ান্তভাবে অসহায় মেয়েরা বাইরে সমালোচনা করলেও মনে-মনে সত্যবতীর এই দুঃসাহসকে সমর্থন জানাতে দ্বিধা করে না।

কলকাতায় এসে সত্যবতী জীবনের মুক্তচেহারা যথার্থভাবে অনুধাবন করতে পারে। এই উপলব্ধি তার আসে নিজের লেখাপড়া এবং পরবর্তীকালে মেয়েদের পড়ানোর সূত্রে।

মেয়েদের দূরবস্থার মূলে যে আছে শিক্ষার অভাব এ-কথা সে অনুধাবন করে। তাই এই মুক্তজীবনের ক্ষেত্রে সে সার্থকভাবে পৌঁছিয়ে দেয় গৃহত্যাগিনী বিধবা শঙ্করীর অবৈধ সন্তান সুহাসকে। শঙ্করীকে সে রক্ষা করতে পারেনি। কিন্তু সুহাসের জীবনের এই সার্থকতাই যেন সময়বদলের একটা ইঙ্গিত এনে দেয়। সত্যবতীর কলকাতায় আসার কারণই ছিল সন্তানদের যথার্থ শিক্ষিত করে তোলা। নিজের একমাত্র বালিকা কন্যা সুবর্ণলতাকে ঘিরেও সম্ভবত সত্যবতীর ঐরকম কোনো স্বপ্ন ছিল। কিন্তু শাশুড়ি এলোকেশীর সংস্কারাচ্ছন্ন মানসিকতা এবং নবকুমারের নির্বোধ বিশ্বাসঘাতকতা সুবর্ণের জীবনে দুর্ঘটনাস্বরূপ হয়ে আসে। অকস্মাৎ একটা বাল্যবিবাহ সুবর্ণলতা ও সত্যবতীর মধ্যে চিরবিচ্ছেদ এনে দেয়। চিরকালের আপসহীন সত্যবতী প্রতিবাদস্বরূপ স্বামী-সন্তান-সংসার সমস্ত কিছুকে ত্যাগ করে কাশী চলে যায় বাবার কাছে। নারীজীবনের প্রকৃত সার্থকতা তার মনে অজস্র প্রশ্ন জাগায়। নারী-পুরুষের বিবাহ-বন্ধন, যা তাব সুবর্ণের জীবনকে ব্যর্থ করে দিল ফুরিয়ে দিল সমস্ত সম্ভাবনাকে, সনাতন হিন্দু মতে যে-বন্ধন অক্ষয়, সেই বিবাহ-বন্ধনের মূলগত সত্যটি সে খুঁজতে চায়। তাই যাবার বেলা সৌদামিনীকে বলে যায়—'সব বিয়েতেই নারায়ণ এসে দাঁড়ান কিনা, সব গাঁটছড়াই জন্মজন্মান্তরের বাঁধন কিনা, এই প্রশ্ন নিয়েই বাবার কাছে যাচ্ছি ঠাকুরঝি।'

মুক্তজীবনের জন্য মেয়েদের আকাঙ্ক্ষার ক্ষেত্রে প্রথম প্রতিশ্রুতির বাণী বহন করে আনে সত্যবতী। তুচ্ছ মেয়েমানুষ যে তাদের একমাত্র পরিচয় নয়, সম্পূর্ণ ব্যক্তিরূপে তারা যে তাদের যথার্থ স্থান দাবি করতে পারে —এই সত্যটি সত্যবতীর সামনে ছিল। কিন্তু এই লক্ষ্যে তার সংগ্রাম ছিল সুকঠিন। কারণ তার নিজের সংসারে স্বামী বা দুই পুত্রসন্তান সাধন-সরল কেউই তার যথার্থ মূল্য বুঝে সত্যবতীর পাশে এসে দাঁড়াতে পারেনি। তাই ভাবিনীর বালিকা বোনের শোচনীয় মৃত্যুর (এই মৃত্যু ছিল পুরুষের লালসাজনিত নির্যাতন এবং এক ভয়াবহ বধূহত্যার নজির বিশেষ) প্রতিকার চেয়ে সত্যবতী ইংরেজ পুলিশের সাহায্য প্রার্থনা করলে তার স্বামী-পুত্র দ্বিগুণ অসন্তুষ্ট হয়।

সেকালের পুরুষতান্ত্রিক সমাজভাবনা খুব স্বাভাবিকভাবেই সত্যবতীর বিরুদ্ধে দাঁড়ালেও এমন পুরুষ-চরিত্রও উপন্যাসে এসেছে যারা তার লড়াইয়ে শক্তি জুগিয়েছে। যেমন তার বাবা রামকালী অথবা নবকুমারের মাস্টারমশাই ভবতোষ। রামকালীর পরে ভবতোষই সম্ভবত একমাত্র পুরুষ যে সত্যবতীর ভিতরের আগুনকে উপলব্ধি করতে পেরেছিল। এই ভবতোষই তার সামনে খুলে দিয়েছিল জ্ঞানের সিংহদুয়ার। আসলে সকল যুগে বা সকল সমাজেই কিছু পুরুষ মেয়েদের সমানাধিকার লাভের লড়াইয়ে সামিল হয়ে যান। কারণ তাঁরা অনুভব করেন নারী বা পুরুষ প্রশ্নটা এ ক্ষেত্রে বড় নয়, মানুষ হিসেবে প্রাপ্য মর্যাদার প্রশ্ন এখানে বড়। ভবতোষ ছিলেন সেই দলেরই লোক।

সত্যবতীর মধ্যে আমরা মনুষ্যত্বের একটা পূর্ণরূপ দেখি। তাই বোধ করি নারীজীবনের পূর্ণতার প্রতি তার এত আকাঙ্ক্ষা ছিল। লক্ষণীয় যে তার লড়াই ছিল একটা অন্ধ সমাজব্যবস্থার সঙ্গে। তাই সে বিরুদ্ধাচরণ করেছে নীতির প্রশ্নে, মর্যাদার প্রশ্নে। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে সে কোনো চরিত্রের সঙ্গে তীব্র ঘৃণা বা আক্রোশের সম্পর্কে বদ্ধ হয়নি। তাই

যে-শ্বশুরের চারিত্রিক ত্রুটি সে বিন্দুমাত্র সহ্য করেনি, তারই মৃত্যুকালে সত্যবতী তাঁর একনিষ্ঠ সেবা করেছে। সংসারে কোথাও সে অকর্তব্য করেনি। আবার কোথাও আত্মমর্যাদাকে বিসর্জন দেয়নি। প্রখর আত্মমর্যাদাবোধ তাকে বারবার সিদ্ধান্ত গ্রহণে দ্বিধাহীন করেছে। এর জন্য তাকে মর্মান্তিক বেদনা এবং নিষ্ঠুর অপমান সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু নিজের ভিতরকার পূর্ণতার আদর্শ তাকে হার মানতে দেয়নি। তাই সেই উনবিংশ শতকে দাঁড়িয়ে সত্যবতী সমাজ-সংসারকে পরিত্যাগ করতে পেরেছিল। ব্যক্তিগত জীবনে ব্যক্তিত্বহীন নবকুমার-এর পক্ষে সত্যবতীকে অনুভব করতে পারা ছিল সুকঠিন। সেই দিক থেকে সত্যবতীর জীবনে একটা শূন্যতার তীব্র দাহ ছিল যা পরবর্তীকালে সুবর্ণলতাও অনুভব করেছিল। দুই পুত্রসন্তান হয়েছিল নিতান্ত সাধারণ এবং গতানুগতিক। পরবর্তীকালে এল সুবর্ণের বিবাহসংক্রান্ত দুর্ঘটনা, যা সত্যবতীকে সীমাবদ্ধ সংসারের বাইরে এনে ফেলে। সমাজ-সংসারের বাইরে কাশীতে বাবার কাছে গিয়েও সত্যবতী অর্থনৈতিকভাবে পরমুখাপেক্ষী হয় না। নিজের জীবিকা সে নিজেই বহন করে এবং জীবনব্যাপী অমীমাংসিত প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণ করে ফেরে।

সত্যবতী চলে যায়, আর তার নয় বছরের বালিকা কন্যা সুবর্ণলতা সংসারের যুদ্ধক্ষেত্রে একেবারে এককভাবে পদার্পণ করে। প্রশ্ন জাগতে পারে যে মা হিসেবে সত্যবতীর সুবর্ণকেও ত্যাগ করাটা কতটা সমীচীন ছিল। কারণ সুবর্ণ তো সম্পূর্ণ নির্দোষ এবং পরিস্থিতির শিকার হয়েছিল। বস্তুতপক্ষে সত্যবতী অনুধাবন করেছিল যে শিক্ষা, পরিবেশ এবং পরিস্থিতির একটা বিরাট প্রভাব থাকলেও মানুষ মূলত এগিয়ে যায় তার অন্তর্নিহিত চেতনা ও বলিষ্ঠতার সাহায্যে। অনেক সময় অনুকূল পরিস্থিতিতেও মানুষ এগোতে পারে না শুধু তার অন্তর্নিহিত শক্তির অভাবে। প্রমাণ তার দুই পুত্র সাধন এবং সরল। তারা তো আশৈশব সুশিক্ষা, সুপরিবেশ এবং সর্বোপরি সত্যবতীকে পেয়েছে। কিন্তু তারা কি তাদের মায়ের অচরিতার্থ স্বপ্নকে সাকার করতে পেরেছিল? না, তারা পারেনি। সেক্ষেত্রে তারা অনেকটাই নবকুমারের মানসিকতার উত্তরসূরি হয়েছিল। সরল কিছুটা অন্যরকম হলেও এবং পরবর্তীকালে তার মায়ের স্বাতন্ত্র্যকে উপলব্ধি করলেও তখনও পর্যন্ত সে-ও কিন্তু সত্যবতীকে সম্পূর্ণরূপে বুঝতে পারেনি। আর এই নিগূঢ় সত্যটি জানার জন্যই সত্যবতী সুবর্ণলতা সম্পর্কে বলে যায়—

> *'সুবর্ণ যদি মানুষের মালমশলা নিয়ে জন্মে থাকে ঠাকুরঝি, সে মানুষ হলে নিজের জোরেই হবে। তার মাকে বুঝবে। নইলে...ভাবতে বসবে, মা ওর মহানিষ্ঠুর, সে ভাবনা বন্ধ করি ও উপায় আমার হাতে নেই।'*

প্রকৃতপক্ষে শুধু তার সুবর্ণলতার জন্য নয়, বাংলাদেশের, বাঙালি সমাজের শত সহস্র সুবর্ণলতাদের কথা ভেবে, তাদের জীবনের প্রকৃত তাৎপর্য এবং সার্থকতাকে খুঁজতেই সত্যবতী সমাজ-সংসারকে অতিক্রম করে চলে যায়।

সুবর্ণলতা মানুষের মালমশলা নিয়েই জন্মেছিল। তাই সংস্কারাচ্ছন্ন এবং সমস্ত দিক থেকে সম্পূর্ণ অন্ধ একটি বৃহৎ পরিবারের পুত্রবধূ হয়েও তার আকাঙ্ক্ষা ছিল আলোর দিকে, মুক্তির দিকে। শিক্ষা, সংস্কৃতি, সভ্যতা এবং রুচি ছিল এই পরিবারের কাছে এক বিরাট

প্রহসনমাত্র। এরা সেই বাঙালি সমাজের প্রতিভূ যারা শহর কলকাতার বাসিন্দা হয়েও সমস্ত রকম প্রগতির দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে সংস্কারকে আঁকড়ে থাকাই পরম গর্বের বিষয় বলে মনে করে। শিক্ষা নয়, জীবনের কোনো মূল্যবোধ নয়, মনুষ্যত্বের বিকাশ নয়, শুধু স্থূল ভোগ, সুবিধা এবং সর্বতোপ্রকারে নিরাপদ জীবন যাপন করাই এদের একমাত্র কাম্য। তাই এদের জীবনের কেন্দ্রীয় বিষয় হল অর্থ এবং প্রভূত পরিমাণে অর্থ উপার্জন। স্বাভাবিকভাবেই মেয়েরা এদের কাছে ভোগসুখ ও সমস্তরকম দৈহিক আরামের মাধ্যম এবং নিতান্ত অবজ্ঞার পাত্রী। এদের চোখে—

> *'মেয়েমানুষ পরচর্চা করবে, কোঁদল করবে, ছেলে ঠেঙাবে, ভাত রাঁধবে আর হাঁটু মুড়ে বসে এক কাঁসি চচ্চরি দিয়ে একগামলা ভাত খাবে। এই তো জানা কথা। ভাত বাড়া দেখে ঘরের পুরুষরা পাছে মুচকি হেসে প্রশ্ন করে বেড়াল ডিঙোতে পারবে কিনা, তাই পুরুষের চোখের সামনে কখনো ভাত বাড়বে না নিজেদের। এসবই তো চিরাচরিত।'*

এর ব্যতিক্রম শুধু পরিবারের পুরুষরাই নয়, প্রধানা মহিলারাও ভাবতে পারেন না। তাই স্বামী প্রবোধ, দেবররা এবং শাশুড়ি মুক্তকেশীর কাছে মেজবৌ সুবর্ণলতা এক উৎপাত বিশেষ। কারণ সে এদের থেকে সম্পূর্ণরূপে আলাদা এক ব্যক্তিত্ব। সুবর্ণলতার যুদ্ধও ছিল তাই ভয়াবহ কঠিন। কারণ তার সংসার, তার পরিবেশ, তার পরিস্থিতি, সর্বোপরি তাকে ঘিরে-থাকা মানুষগুলি সর্বতোভাবে তার বিরুদ্ধতা করেছে। জীবনের একবারে ঊষালগ্নে সে হারিয়েছে সত্যবতীকে। তবু দেখি সবার অলক্ষ্যে ধীরে ধীরে সুবর্ণলতার চেতনায় জ্বলে উঠেছে সেই অনির্বাণ শিখা, যে-অনির্বাণ আগুন তার মা সত্যবতী সারা জীবন নিজের মধ্যে বহন করেছে।

সত্যবতী চলে যায় নেপথ্যে। কিন্তু তার সংগ্রামী চেতনা শেষ হয়ে যায় না। কালান্তরে তা ফুটে ওঠে সুবর্ণলতার মধ্যে। মেয়েদের চারপাশে বিলম্বিত লয়ে বয়ে-চলা সময়-স্রোতকে পুনরায় সে গতি দেয়। তাই দেখি চতুর্দশী কিশোরী বধূ সুবর্ণ নতুন বাড়িতে একটা বারান্দার জন্য ব্যাকুল হচ্ছে। কারণ এই বারান্দার আকাঙ্ক্ষা তো শুধু ইঁট-কাঠ-পাথরের বারান্দার জন্য নয়, এই আকাঙ্ক্ষা একটু অবকাশের, একটু মুক্তির জন্য, যা তার সীমাবদ্ধ জীবনে এনে দেবে একটু খোলা হাওয়া। সুবর্ণর বোধে ঐ বারান্দা তাই বহির্বিশ্বের সঙ্গে একটা সংযোগ-সেতু হয়ে আসে। কিন্তু একটা তুচ্ছ বারান্দা তার মেলে না। সুবর্ণের সন্দেহবাতিকগ্রস্ত স্বামী এবং মূঢ়-দাম্ভিক শাশুড়ির কাছে এই আবদার অপরিসীম স্পর্ধারই নামান্তর।

সুবর্ণলতার পরিস্থিতি এবং সেই পরিস্থিতির বিপরীতে দাঁড়ানোর ভয়াবহ দুরূহতা ছিল সত্যবতীর চাইতেও কঠিন। কারণ সুবর্ণ তার শ্বশুরবাড়ির মানুষদের চেতনার পরিবর্তন চেয়েছিল। এ ছাড়া তার সামনে আর কোনো পথ ছিল না। অবরুদ্ধ মনকে মুক্তি দেবার যে উদার প্রশস্ত ক্ষেত্র তার আজীবন কাম্য ছিল, সেই ক্ষেত্র সে কোথাও পায়নি। সুবর্ণের রামকালীর মতো কোনো বলিষ্ঠ আশ্রয় ছিল না, ছিল না কোনো পিতৃগৃহ। বহির্জগতের দিকে সমস্ত দুয়ার ছিল বন্ধ। নয় বছরে বিয়ে হওয়া অবধি তার স্থিতি ঐ শ্বশুরবাড়িতেই। তাই

শুধু বেঁচে থাকার জন্য সুবর্ণ সেই অবকাশ এবং সেই মুক্তি রচনা করে নিতে চেয়েছিল। ফলত তার সংগ্রাম হয়ে উঠেছিল আত্মবিধ্বংসী। কারণ অন্তঃসারশূন্য মানসিকতা, পর্বত-প্রমাণ মূঢ়তা, কুসংস্কার, কুশিক্ষা, সর্বোপরি এইধরনের নেতিবাচক ভাবনাগুলি নিয়ে দম্ভ আর আত্মতুষ্টি ছিল সুবর্ণের শ্বশুরবাড়ির ধর্ম। তারা ছিল সেই বৃহৎ মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজের অংশ যারা নগরবাসী এবং বাইরের দিক থেকে কিছুটা শিক্ষিত হলেও মানসিকতায় সম্পূর্ণরূপে প্রাচীনপন্থী এবং ঘোর সংস্কারাচ্ছন্ন। ব্রিটিশ শাসন এবং ইংরেজি শিক্ষা এদের কাছে অর্থনীতিকে আরও একটু মজবুত করার মাধ্যম মাত্র। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রগতিশীলতা, মুক্ত চিন্তা এবং সংস্কারহীনতা এদের কাছে সম্পূর্ণরূপে বর্জনীয় ছিল। এর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে গিয়ে, এদের মানসিকতার পরিবর্তন আনতে গিয়ে প্রতি মুহূর্তে সুবর্ণ ক্ষয় করেছে নিজেকে। নিজেকে নিঃশেষ করেছে সুস্থ, সুন্দর এবং আদর্শ জীবন গড়তে গিয়ে। লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, ব্যঙ্গ, উপহাস ছিল তার প্রতিদিনের প্রাপ্য। তবু সুবর্ণ নীরব থাকতে পারেনি, নিশ্চেষ্ট থাকতে পারেনি। তার প্রকৃতি, তার চেতনা এবং তার সুস্থ জীবনাকাঙ্ক্ষা তাকে বারবার এইসব বাধার সামনে দাঁড়াতে প্ররোচিত কবেছে।

একটু শ্বাস ফেলার জন্য একটা ছোট্ট খিড়কি-জানালা সুবর্ণলতা খুলে নিতে পেরেছিল নিজের জন্য; সেটি হল বই পড়া। সেক্ষেত্রে এই পরিবারের বাই'রের কিছু সহমর্মী মানুষ সে পেয়েছিল, যারা গোপনে যোগাত বই। যেমন জয়াবতী বা দুলো। এই বইয়ের পাতাই ছিল তার যথার্থ অবসর, মানসিক বিশ্রাম এবং নূতন নূতন চিন্তা-চেতনায় অবগাহন করার ক্ষেত্র। আর বাইরে মুক্তির সেই রূপ উপলব্ধি করার জন্য কখনো সে স্বপ্ন দেখেছে শ্রীক্ষেত্রেব সমুদ্র দেখার, কখনো বা দর্জিপাড়ার গলির ঐ অন্তঃসারশূন্য বিধি-বিধানগুলি ভাঙতে চেয়েছে।

সত্যবতীব কাল থেকে তখন কিছুটা এগিয়ে এসেছে সময়। 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'-তে আমরা পেয়েছি বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নাম। সমাজচেতনা এবং মেয়েদের সম্পর্কিত চিন্তা-ভাবনায় এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করে আনে এই যুগ-পুরুষদের নামগুলি। ব্রাহ্মধর্ম সম্পর্কিত নূতন জোয়ারের কলধ্বনিও শোনা গেছে সেই সময়ে। এককথায় উনিশ শতকীয় নবজাগরণের চেতনা সত্যবতীকে প্রভাবিত করেছিল। অবশ্য এটি সম্ভব হয়েছিল কলকাতায় আসার পর। কলকাতায় আসার পর সত্যবতী দেখেছিল নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার সূচনা হিসেবে সমাজে নারী-শিক্ষার প্রারম্ভ। কিন্তু সুদূর গ্রাম-সমাজে যে এই ধরনের ভাবনা-চিন্তা পৌঁছাতে পারেনি, এ-ও একটি লক্ষণীয় তথ্য। কারণ সত্যবতীর লড়াই অনেক বেশি কঠিন ছিল গ্রামে থাকাকালীন। আর শহরের সমাজের একটা ছোটো অংশে শিক্ষিত কুমারীদের বিবাহের বয়স কিছুটা বিলম্বিত হলেও সমাজের একটা বড় অংশে এবং গ্রাম-সমাজে তখনও পর্যন্ত বাল্যবিবাহ ছিল আদর্শ। সুশিক্ষিতা সুহাসের উপযুক্ত বয়সের বিবাহ এবং সুবর্ণলতার বাল্যবিবাহই এর প্রমাণ।

সত্যবতীর পরবর্তীকালে সুবর্ণলতার প্রেক্ষাপটে দেখি স্বাধীনতা-পূর্ব সেই উত্তেজনাপূর্ণ দিনগুলি। স্বদেশি আন্দোলনের চাপা আগুন চতুর্দিকে ধিকি ধিকি জ্বলছে। সুবর্ণ-এর উপর

এর প্রভাব ছিল অপরিসীম।'কারণ মেয়েদের পরাধীনতার নিষ্ঠুর যন্ত্রণায় সে উপলব্ধি করেছিল যথার্থ স্বাধীনতার প্রয়োজন। অবশ্য স্বদেশি কার্যকলাপের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তার যোগ ছিল পরোক্ষে, বই মারফত। সর্বোপরি তার মুক্তিকামী বলিষ্ঠ চেতনা সেই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির উত্তাপ পেয়েছিল আলোবাতাসহীন অন্তঃপুরে বসেও।

সে-কালের সমাজের একটা কৌতূহলোদ্দীপক ছবি আমরা দেখি এই উপন্যাসটিতে। একদিকে দেশকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছে মৃত্যুভয়হীন তরুণের দল। 'বন্দেমাতরম্'—এই অগ্নিমন্ত্র অভূতপূর্ব অনুপ্রেরণা জাগিয়েছে সমাজের নিচু স্তরেও। যার জন্য সুবর্ণ-এর শ্বশুরবাড়ির বাসন-মাজা কাজের মানুষটিও বিলিতি কাপড় ফিরিয়ে দিয়ে যায়। এমনকী গ্রামে গিয়েও পৌঁছেছে তার ঢেউ। প্রমাণ সুবর্ণলতার মেজননদ সুবালা এবং তার পরিবার, যারা দেশভক্ত অম্বিকার প্রেরণায় স্বদেশি-ভাবনায় প্রভাবিত। অপরদিকে সুবর্ণলতার শ্বশুরবাড়ির মানুষদের মতো মধ্যবিত্ত সমাজের একটা বিরাট অংশ। বাংলাদেশের প্রগতিশীলতার প্রাণকেন্দ্র কলকাতার বাসিন্দা হযেও দেশের স্বাধীনতা নিয়ে বিন্দুমাত্র আগ্রহী নয়। বস্তুতপক্ষে স্বাধীনতার প্রয়োজনটাই এরা বোঝে না। অর্থোপার্জন এবং চিরাচরিত সংস্কারগুলি রক্ষা করে চলতে পারাতেই এদের জীবনের সার্থকতা। সুবর্ণ এর পরিজনরা তাই নারী-শিক্ষা, সমস্ত রকম প্রগতিশীলতা এবং স্বাদেশিকতার ঘোর বিরোধী।

তাই সত্যবতীর সময় থেকে সুবর্ণলতার সময় কিছুটা এগিয়ে এলেও মধ্যবিত্ত সমাজের মেয়েদের অবস্থার পরিবর্তন হয়েছিল সামান্যই। অন্তত তখনও পর্যন্ত। পরিবর্তন যা কিছু হয়েছিল তা সমস্তই বাহ্যিক। অন্তত বাঙালি হিন্দু পরিবারের অন্তঃপুরের ক্ষেত্রে তো বটেই। সুবর্ণলতার জীবনের প্রথম পর্বে তাই দেখি ঘোমটার বহর হয়তো একটু খাটো হয়েছে, হয়তো বা দিনদুপুরেই স্বামীর সঙ্গে কথা বলা যায় (সকলের সাক্ষাতে না-হলেও)—এই পর্যন্তই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কতটা মুক্তি মেয়েরা পেয়েছিল বা তাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অধিকার কতটা দেওয়া হয়েছিল, সেই প্রশ্ন থেকেই যায়। অথচ সুবর্ণ-এর বালিকা বয়সেই আমরা বিবাহিতা সুহাসকে দেখি স্বনির্ভর নারী রূপে, যে কিনা সুবর্ণদের ইস্কুলেরই শিক্ষয়িত্রী হয়ে আসে। অবশ্য এ-ও সত্য যে সুহাস সম্ভবত একটি ব্রাহ্ম পরিবারের বধূ বলেই (সে ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী ভবতোষকে বিবাহ করেছিল) এটি সম্ভব হয়েছিল। লক্ষণীয় যে, যে-কালে ব্রাহ্ম সমাজের মানুষ সুহাস এবং বাঙালি সমাজের বাইরে-থাকা সত্যবতী খুঁজে পেয়েছে স্বনির্ভরতা এবং নিজস্ব মুক্তি, সেই কালেই একটা বৃহৎ মধ্যবিত্ত হিন্দু বাঙালি সমাজের বধূ সুবর্ণলতার সামনের সমস্ত পথগুলি বন্ধ। মেয়েদের আর্থিক স্বনির্ভরতার যে-ছবি আমরা সুবর্ণ-এর জীবনের শেষ পর্বে অথবা 'বকুলকথা'-তে গিয়ে পাব তখন পর্যন্ত ব্যাপকভাবে সমাজে তার দেখা মেলে না। তাই পরাধীনতার যন্ত্রণায় সুবর্ণলতারা বিধ্বস্ত হয়ে যায়, প্রবল পুরুষের দৈহিক ক্ষুধা মেটাতে গিয়ে একান্ত অনিচ্ছায় বারবার মা হতে হয়। কোথাও তাদের এতটুকু স্বাধীনতা থাকে না। সুবর্ণ-এর প্রতি তার স্বামী প্রবোধের কোনো প্রেম ছিল না, ছিল প্রচণ্ড সন্দেহাকুল একটা স্থূল আসক্তি, যাব কাছে চূড়ান্ত অনিচ্ছায় সুবর্ণলতাকে বারবার আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে। স্বামিত্বের অধিকার বলে তখন ঘরে ঘরে অনিচ্ছুক মেয়েদের

ওপর এ ধরনের অত্যাচার চলত। ফলত ভাবিনীর বালিকা বোনটির মতো মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটত কত শত বালিকাবধূদের।

সুবর্ণলতার প্রখর আত্মমর্যাদাবোধকে ধাক্কা খেতে হয় প্রতিপদে। গৃহত্যাগিনী মায়ের জন্য মুক্তকেশী সুবর্ণ-এর পিতৃগৃহের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করেছিলেন। ফলত সুবর্ণ-এর কোনো পিতৃগৃহ ছিল না। কিন্তু একদিন সহসা নিজেদের কিছু স্বার্থ রক্ষার্থে মুক্তকেশী সুবর্ণলতাকে পুনরায় বাপের বাড়ি যাবার হুকুম করে বসেন। স্বভাবতই আত্মাভিমানী সুবর্ণ এই নির্লজ্জ স্বার্থপরতার তীব্র প্রতিবাদ করে। ফলস্বরূপ নিদারুণ লাঞ্ছনা এবং গঞ্জনার মধ্যে একবস্ত্রে তাকে বাপের বাড়িতে নির্বাসন দেওয়া হয়। অথচ নিজের শৈশবের শত স্নেহস্মৃতিবিজড়িত গৃহে তার স্থান হয় না। কারণ চিরকালের মেরুদণ্ডহীন নবকুমার এবং স্বভাবভীরু বড় ভাই সাধন এই সংসার পরিত্যাগিনী মেয়েটিকে তাদের নিরাপদ জীবনে উৎপাতবিশেষ বলে মনে করে। সুবর্ণলতার আহত মর্যাদা এবং অসহায়তার চাইতেও তাদের কাছে বড় হয়ে ওঠে সামাজিক লজ্জা। অথচ সাধন সত্যবতীরই সন্তান। সুবর্ণলতার নিষ্ফল ক্ষোভ তাই মাথা কুটে মরে। এই অন্ধ সংস্কারসর্বস্ব সমাজব্যবস্থায় মেয়েদের মুক্তি কোথায়! বাপের বাড়িতে জলগ্রহণ মাত্র না-করে সুবর্ণকে ফিরে আসতে হয় অপমানের পঙ্ককুণ্ডে। প্রবল আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন অথচ অর্থনৈতিক দিক থেকে, সামাজিক দিক থেকে সম্পূর্ণ অসহায় নারীর চূড়ান্ত অবমাননার ছবি আশাপূর্ণা দেবী এঁকে যান।

সুবর্ণলতা মর্মান্তিক যন্ত্রণায় অনুভব করে যে তার চারপাশে আগুন, কোথায় যাবে সে? এ-সময় গভীর অভিমানে মায়ের কথাও মনে পড়ে তার। মনে হয় মা হতে পারত তার সমস্ত দাহের শীতল শান্তি। রামকালীর মতো কোনো বলিষ্ঠ আশ্রয় প্রথমাবধিই না-থাকায় সুবর্ণ সত্যবতীর মতো সংসারকে ত্যাগও করে যেতে পারে না।

বাইরের দিক থেকে তখন দেশব্যাপী স্বদেশি আন্দোলনের জোয়ার। দেশকে পরাধীনতার বন্ধন থেকে মুক্ত করার আপ্রাণ প্রয়াস চলেছে। অপরদিকে সনাতন হিন্দু সমাজের ভয়াবহ চিত্র, যেখানে সুবর্ণলতার মতো নারীকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় কেবলই আত্মহননের পথ খুঁজতে হয়। যে-আত্মহনন সত্যবতীর কাছে সর্বতোভাবে বর্জনীয় ছিল, সুবর্ণ সেই আত্মহত্যার ভাবনার মধ্যে খুঁজে পায় তার কাম্য মুক্তি এবং চিরপ্রশান্তি।

সুবর্ণলতার একদিকে সত্যবতী অন্যদিকে বকুল। সত্যবতীর প্রেক্ষাপটে দেখি নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সুচনা। 'বকুল'-এ এসে দেখি নারীর সেই রূপ সমাজে স্বীকৃত। স্বাধীনতা-উত্তর কাল সেটা। মধ্যিখানে আছে সুবর্ণলতা। সেই সময় সমাজের একটা নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ অংশে মেয়েদের মধ্যে এসেছে প্রগতিশীলতা। এই মেয়েরা স্বনির্ভরতার পথে এগিয়েছে, সুশিক্ষিত হয়েছে এবং দেশকে স্বাধীন করার কাজে পুরুষের সহযোদ্ধা হয়েছে। কিন্তু সুবর্ণ-এর শ্বশুরবাড়ির মতো মধ্যবিত্ত সমাজের একটা বিরাট অংশ তখনও অন্ধকারে। উপন্যাসের পাতায় উঠে আসে সামাজিক ইতিহাসের এই মূল্যবান ছবি। দেখা যায় নারীজীবনের কালান্তর আসার ধাপগুলি ছিল কত বন্ধুর। আর সেই যাত্রাপথের সর্বাপেক্ষা সুকঠিন স্তরকে অতিক্রম করতে হয় সুবর্ণলতাকে। কারণ সত্যবতী এবং বকুল থেকে তার

জীবনের পরিস্থিতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। বকুল এগিয়ে গেছে সংসারজীবনকে অতিক্রম করে। অন্যদিকে সত্যবতীর ছোট্ট সংসারের নিয়ন্ত্রণ ছিল নিজের হাতে এবং স্বামী নবকুমার তাকে খুব বুঝে উঠতে না-পারলেও কখনো বিপুল বিরুদ্ধতার সৃষ্টি করেনি। সেই ক্ষেত্রে একমাত্র সুবর্ণলতাকেই সমস্ত দিক থেকে ক্রমাগত ধাক্কা খেতে হয়েছে।

এই উপন্যাসে দেশের পরাধীনতার বেদনা নারীর চিরবন্ধনদশার বেদনার সঙ্গে এক হয়ে গেছে। সুবর্ণ দেশের এই পরিস্থিতি এবং এর বলিষ্ঠ প্রতিবাদস্বরূপ স্বদেশি কার্যকলাপের কেন্দ্রীয় ভাবনাকে তাই তার সমস্ত সত্তা দিয়ে অনুভব করে। এই মানসিকতার সূত্রেই সুদূর পল্লিগ্রামে ননদ সুবালার জ্ঞাতি দেবর অম্বিকা ঠাকুরপোর সঙ্গে তার যোগ হয় গভীর। এই ছেলেটির গভীর স্বদেশপ্রীতি, দেশের জন্য সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন, তার কবিতার প্রতি অনুরাগ সুবর্ণলতার মনে এক বিরাট বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। অম্বিকার মধ্যে সে প্রত্যক্ষ করে যথার্থ মনুষ্যত্বকে। তার এতদিনকার মৃতপ্রায় জীবনে যেন প্রাণের প্রতীক হয়ে আসে অম্বিকা। তার স্বামী প্রবোধের অন্যায় সন্দেহের জেরে খুব অল্পকালের জন্য ছিল এই সাক্ষাৎকার। কিন্তু সুবর্ণলতার মনে অম্বিকার উপস্থিতি হয়ে যায় চিরকালীন। স্নেহে, প্রীতিতে এবং গভীর শ্রদ্ধায় সুবর্ণ অম্বিকাকে মনে রাখে। আর এই একটিমাত্র পুরুষই সম্ভবত সম্পূর্ণভাবে এবং যথার্থভাবে সুবর্ণলতাকে বুঝতে পেরেছিল।

সময়ধারার অগ্রগতির সঙ্গে সুবর্ণ-এর জীবনের কিছু বাহ্যিক পরিবর্তন দেখা যায় উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বে। মুক্তকেশীর বিদ্বেষপূর্ণ গালমন্দ ও অন্যদের ঈর্ষাকাতর আক্ষেপের মধ্য দিয়েই সুবর্ণ এতদিন পরে দর্জিপাড়ার ঐ সংকীর্ণ গলি ছাড়তে সক্ষম হয়। বিরাট বারান্দাওয়ালা তার এক নিজস্ব বাড়ি এবং সংসার হয়। কিন্তু সম্পূর্ণরূপে নিজস্ব রুচিতে গড়ে তোলা সংসারে দাঁড়িয়ে কিছুদিনের মধ্যেই সুবর্ণ আবিষ্কার করে এক ভয়াবহ সত্যকে। সে দেখে বাইরের দিক থেকেই তার সংসারের কাঠামোটি বদলেছে কিন্তু সংসারের কেন্দ্রভূমি থেকে সে ঐ দর্জিপাড়ার গলিকে মুছে দিতে পারেনি। তার বয়স্থ সন্তানেরা এখনও নিজেদের রক্তের মধ্যে লালন করছে সেই উত্তরাধিকার। তারা রীতিমতো উচ্চশিক্ষিত হলেও সেই মূঢ় দম্ভ, কুসংস্কার আর কাপুরুষতা তাদের মজ্জাগত। জীবনযুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত সুবর্ণ যখন ভেবেছে তার অচরিতার্থ স্বপ্নকে সাকার করবে তার সন্তানেরা, সেখানেই সে চরম আঘাত পেয়েছে। আশৈশব সুবর্ণলতার প্রতিবাদী মূর্তি এবং এর বিপরীতে অপরিসীম লাঞ্ছনা সুবর্ণ-এর সন্তানদের শিখিয়েছিল তাকে বিদ্বেষ করতে। অন্তত তার প্রথম চার সন্তান চাঁপা, চন্দন, ভানু এবং কানুর ক্ষেত্রে তো বটেই। তাই তারা হয়তো মাকে ভয় করেছে কিন্তু উপলব্ধি করতে পারেনি। আর সমস্ত কালেই এই সমাজের মধ্যেই থাকে একটা পিছিয়ে-পড়া অন্ধকার অংশ। সুবর্ণলতার শ্বশুরবাড়ি এবং সন্তানেরা ছিল সেই সমাজেরই ধারক। বকুল-পারুল তখন কিছুটা বড়। এরা যে ওদের মতো নয় এই সত্যটি সুবর্ণলতা অনুধাবন করলেও মেয়েদের, বিশেষত বকুলের উপলব্ধি সে জেনে যেতে পারেনি। জীবনের যে-রূপ ছিল তার ধ্যানের সামগ্রী তাই-ই যে তার কনিষ্ঠা কন্যাটির মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়ে উঠবে, তা বোধহয় সুবর্ণ কল্পনাও করেনি।

লক্ষণীয় যে সুবর্ণলতার জীবনের প্রথম পর্বের লড়াই ছিল তার স্বামী, শাশুড়ির বিরুদ্ধে।

আর দ্বিতীয় পর্বে তার মানসিকতার বিপরীতে দাঁড়ায় সুবর্ণ-এর আপন গর্ভের সন্তানরা। ঘর এবং বার তো বটেই কখনো কখনো নিজের রক্তের তৈরি সম্পর্কও যে প্রগতির পথে কত বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তাই-ই দেখিয়েছেন আশাপূর্ণা দেবী। সুবর্ণলতার জীবনে আর একটি ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি করেছে সত্যবতীর চিঠি এবং তার মৃত্যুসংবাদ। এই চিঠি কন্যার হাতে তুলে দিয়ে অতি অল্পকালের মধ্যে নবকুমারও মারা যান। সুবর্ণলতাকে লেখা এই চিঠিতে প্রকাশ পায় সেই চরম সত্য—নারী-পুরুষের সমানাধিকার। পুরুষের মতো নারীরও প্রাপ্য সমমর্যাদা, সমঅবস্থান, সর্বোপরি মানুষের অধিকার। সংসার-জীবনকে অতিক্রম করে বাংলাদেশের সমাজের বাইরে গিয়ে সত্যবতী তার আজীবন অনুসন্ধানের ফলটি কন্যার হাতে দিয়ে যায়। এ-ও বলে যায় যে সেই অধিকার অর্জন করে নিতে হবে মেয়েদেরই। তার জন্য যেমন চাই সংগ্রাম তেমনই চাই ধৈর্য, স্থৈর্য এবং তপস্যা। এই চিঠি সুবর্ণ-এর মনে প্রগাঢ় ছাপ এবং হাহাকার রেখে যায়। কারণ তার মা নিজেকে জানিয়ে গেলেন কিন্তু জেনে গেলেন না সুবর্ণকে। উপলব্ধি করে গেলেন না তার আত্মবিধ্বংসী সংগ্রামকে, মরণাধিক যন্ত্রণাকে।

পাশাপাশি দেখি সমাজচেতনার মধ্যেও বড় ধরনের পরিবর্তনের ইঙ্গিত। একে তো স্বদেশি আন্দোলন মেয়েদের অনেকটাই বাইরে নিয়ে এসেছে দ্বিতীয়ত শুধুমাত্র নিজ পরিচয়ে ভাস্বর নারীদের নাম পাওয়া যাচ্ছে। সুবর্ণ-এর মুখ দিয়েই উচ্চারিত হয়েছে স্বর্ণকুমারী দেবী, সরলা দেবী, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, এবং কামিনী রায় প্রভৃতির নাম। এই নামগুলি সূচিত করে এক পৃথক সমাজ-ভাবনাকে যেখানে নারীরা যথার্থ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত এবং নিজ মহিমায় দীপ্যমান, এবং এ-ও সূচিত করে যে এই মুক্ত জীবনচিত্র সমাজের উচ্চবিত্ত এবং উচ্চশিক্ষিত মহলেই আবদ্ধ। তখনও তা সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়েনি এবং ছড়িয়ে পড়েনি বলেই জেলফেরত অম্বিকাকে সুবর্ণ-এর সামনে তারই স্বামী-পুত্রের হাতে অপমানিত হয়ে ফিরে যেতে হয়। অন্যদিকে নিজের জীবনের স্বপ্ন, আদর্শ, সার্থকতা বিনষ্ট হওয়ার গভীর বেদনায় সুবর্ণ নিজেকে নিজের প্রেতাত্মা বলে অভিহিত করে। যখন সে অম্বিকাকে প্রশ্ন করে যে, এ শ্মশানপুরীতে সে কেন এসেছে, তখন সুবর্ণলতার অন্তরের হাহাকার মনকে বিষণ্ন করে তোলে।

এত বিপুল বাধা, এত বিপরীত পরিস্থিতি, তবু সুবর্ণলতার ভিতরের আগুনকে তা নেভাতে পারে না। কারণ তার ব্যক্তিত্বের মূলেই রয়েছে চিরাচরিতের বিপরীতে যাবার প্রেরণা। তাই সুবর্ণলতা সকলের অজানতে আত্মজীবনী রচনায় হাত দেয়। ভাবে যে-যন্ত্রণা অব্যক্ত, যা সন্তানরা পর্যন্ত বুঝল না তাকেই সে প্রকাশের আলোয় নিয়ে আসবে। আত্ম-উন্মোচনের এই সুযোগ, আত্মপ্রকাশের এই অবকাশ বহুদিন পরে সুবর্ণলতার চেতনাকে প্রশান্তির আনন্দে ভরিয়ে দেয়। নারীর রচনা তখন সমাজে নূতন নয়। স্বনামধন্যা অনেক নারীই তখন লিখেছেন। কিন্তু অনিচ্ছাকৃত মুদ্রণপ্রমাদে ভরা সুবর্ণলতার আত্মজীবনীকে এক নিদারুণ ব্যঙ্গের সম্মুখীন হতে হয়। ব্যঙ্গ করে প্রবোধ এবং তার তথাকথিত উচ্চশিক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত ছেলেরা। এদের সীমাহীন নিষ্ঠুরতা সুবর্ণকে স্তম্ভিত এবং মর্মান্তিকভাবে ক্ষুব্ধ করে তোলে। অথচ এই রচনার প্রকাশক সুবর্ণ-এর জ্ঞাতি ভাসুর

জগন্নাথ বা জগু সুবর্ণ-এর এহেন গুণপনায় বিস্ময়ে-আনন্দে হতবাক হয়ে যায়। কিন্তু জগু, মেজননদ সুবালা, জয়াবতী বা বড় ননদ সুশীলা এবং তার স্বামী কেদারনাথ—এই শ্বশুরবাড়ি সম্পর্কিত আত্মীয়রা সুবর্ণকে বুঝলেও তার জন্য বেদনাবোধ করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারেনি। চিরদিনই সম্পূর্ণ এককভাবে সুবর্ণকে এগিয়ে যেতে হয়েছে। সেই এগিয়ে চলার জন্য যে পারিবারিক ঝড় উঠেছে, প্রতিবারই তার কেন্দ্রে সে একাকী বিরাজ করেছে, সহ্য করেছে যাবতীয় আঘাত। এবং সত্যবতীর মতো নারীপুরুষের সমানাধিকারের প্রশ্নে ক্রমশই আবিষ্কার করেছে এক চরম সত্যকে। সত্যবতী অনুভব করেছিল যে, বিবাহসম্পর্কিত জন্মজন্মান্তরের বন্ধন-ভাবনা কত অন্তঃসারশূন্য, কত মিথ্যা। পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় উদ্দেশ্য-প্রণোদিত এই চিন্তা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে মেয়েদের ওপর। কারণ সে দেখেছে যে, যে-বন্ধন নারীর পক্ষে অক্ষয়, অচ্ছেদ্য—পুরুষের পক্ষে তা একান্তই ক্ষীণ এবং মূল্যহীন। সত্যবতী তার সারাজীবনের সংগ্রামের মূল্যে সমাজের এই অন্তর্নিহিত সত্যটি উদ্‌ঘাটন করে দিয়ে যায়। আর প্রায় ত্রিশ থেকে চল্লিশ বছরের ব্যবধানে দ্বিতীয় প্রজন্ম সুবর্ণলতা আবিষ্কার করে এই বৈষম্যের মূল কারণটি। এই কারণটি হল—'মেয়েরা রোজগার করে না। তারা পরের ভাত খায়'। আর স্বার্থপর পুরুষজাত এই অবস্থাকে টিঁকিয়ে রাখতে মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ দেয় না, চোখ-কান ফুটতে দেয় না। দিলে, তারা জানে যে মেয়েদের আর এভাবে আয়ত্তে রাখা যাবে না, দাবিয়ে রাখা যাবে না। হয়তো তারা পুরুষের সমানাধিকার দাবি করবে। পুরুষরা সর্বদা এ কাজ যে খুব সচেতনভাবে করে তা-ও নয়। আসলে বহুকাল ধরে এই ভাবনা-চিন্তা পোষণ করতে করতে এ তাদের মজ্জাগত হয়ে গেছে। তাই কখনো গায়ের জোরে রাখে দাসী করে, কখনো বা ছলনার আশ্রয়ে রানি সাজিয়ে তোলে। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই মেয়েদের অবস্থা এক। রানি অথবা দাসী দুই-ই হওয়া পুরুষদের জন্য, তাদের প্রয়োজনে। মেয়েদের নিজেদের জন্য হয়ে ওঠার অবকাশ সেখানে কোথায়? এর মূলে আছে অর্থনৈতিক এক বৈষম্য। তৃতীয় প্রজন্ম বকুলে গিয়ে দেখব নারীর সেই প্রার্থিত অবস্থান সমাজে প্রতিষ্ঠিত।

এই কারণেই সত্যবতী সুবর্ণলতার জীবনের ঊষালগ্নে যথার্থ শিক্ষা এবং পূর্ণরূপে শিক্ষিত হওয়ার প্রেরণা জাগিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। তাই সারাজীবন ধরে সুবর্ণ অতিসংগোপনে তার বালিকা বয়সের থমকে-যাওয়া লেখাপড়ার পথ খুলে রাখতে চেয়েছে। ঐ অবরোধে বসেও বাড়ির শিশুদের বিশেষত মেয়েদের জন্য সেই পথ খুলে দিতে চেয়েছে। তাই এ নিয়ে শত যন্ত্রণার মধ্যেও সে দেখি আকুল হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের বধূ কবিতাটি পড়ে। এই প্রচেষ্টাই চূড়ান্ত রূপ পায় তার আত্মজীবনী রচনায়। কিন্তু স্বশিক্ষিত নারীর এই অভূতপূর্ব উদ্যম দুঃসহভাবে অপমানিত হয়। মর্মাহত সুবর্ণ সেই বিপুল পরিমাণ গ্রন্থরাজি, সেই অব্যক্ত যন্ত্রণার ইতিহাসকে লেলিহান শিখায় ছাই করে ফেলে। আহত আত্মমর্যাদা এই পথেই খোঁজে তার চরম সান্ত্বনা।

জীবনের প্রান্তে পৌঁছে চিরদিনের বন্ধন-ক্লিষ্ট সুবর্ণলতা কেদারবদরী যাবার পরিকল্পনা করে। কিন্তু স্বপ্নের সেই মুক্তি-যাত্রায় পা বাড়িয়েও তাকে ফিরে আসতে হয় প্রবোধের এক ঘৃণ্য চক্রান্ত এবং সন্তানদের প্ররোচনায়। শেষ পর্যন্ত তৃতীয় পুত্র মানুর বিবাহের ক্ষেত্রেও

সে দেখে যে তার পছন্দ-করা কন্যাটিকে অনায়াসে অবহেলা করে মানু তার ঊর্ধ্বতন কর্তার কন্যাকে বিবাহ করে বৈষয়িক লাভের আশায়। প্রকৃত মানবতার ভাবনাকে এভাবে বারবার ক্লিষ্ট হতে দেখে সুবর্ণ। ক্লিষ্ট হয় তার অন্তরাত্মা, তার মর্যাদাবোধ। সুবর্ণ নির্লিপ্ত হয়ে যায় সংসার-জীবন থেকে, যেমন একটা সময় সত্যবতীও কিছুটা নির্লিপ্ত হয়ে গিয়েছিল সংসার থেকে। প্রাণের যে-ক্ষয় ছিল গোপন, এতদিনে সুবর্ণ-এর দেহে তা প্রকট হয়ে ওঠে।

অপর দিকে দেখি যার জন্য সত্যবতী-সুবর্ণলতার সাধনা, যার জন্য এই দুঃসহ আত্মদান—সেই প্রগতি বিস্তার করেছে তার আপন বাহু। তাই সুবর্ণ-এরই পুত্র যে কিনা এতদিন সর্বতোপ্রকারে নারী-শিক্ষার বিরোধী ছিল, যে কিনা বকুল-পারুলের ইস্কুলে পড়া নিয়ে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গে বিঁধেছে তার মাকে, সেই পুত্রই কোনো বিদূষীর 'মাস্টারণী' হওয়া নিয়ে গর্ববোধ করে। মুক্তকেশীর বংশধরদের মানসিকতাতেও যেন প্রগতির হাওয়া এসে লাগে। বস্তুত পক্ষে এই বিস্ময়কর পরিবর্তনের কারণ হল এতদিনে মধ্যবিত্ত সমাজে এসে আঘাত করেছে এগিয়ে চলার ঢেউ। তাই চিরাচরিত সংস্কারের খুঁটি উপড়ে ফেলে এই যাত্রার শুরু। সুবর্ণলতা যার জন্য জীবনভর লড়াই করেছে সেই প্রগতির পদসঞ্চার শুনে যায় সে। কিন্তু তার পূর্ণচিত্র দেখার আগেই শেষ হয়ে আসে তার চরম আত্মদান। প্রখর আত্ম-মর্যাদা বোধ সম্পন্না চির একাকী সুবর্ণলতা, সুস্থ জীবনাকাঙ্ক্ষায় লাঞ্ছিত সুবর্ণলতা, চিরদিনের আপসহীন সুবর্ণলতা ইতিহাস হয়ে যায়। মানুষের মাল-মশলা নিয়েই জন্মেছিল সুবর্ণ। তাই এই সমাজের কাছ থেকে মেয়েমানুষ হিসেবে নয়, শুধু মানুষের প্রাপ্য মর্যাদা আদায় করতেই সে আজীবন সংগ্রাম করে গেছে। তার এই নীরব লড়াই যে যথার্থ অনুভব করেছিল সে হল বকুল এবং তার সঙ্গে পারুলও। তাই পরবর্তী তৃতীয় প্রজন্মে দেখি কালান্তরের ইতিকথা এই দুই ভগিনী বিশেষত বকুলের উপলব্ধিতে পড়েছে ধরা।

বকুল যে-কালকে প্রত্যক্ষ করে, অনুভব করে সেই কাল হল আধুনিক কাল। দেশ এখন স্বাধীন। সমাজচেতনায় বিশেষ করে মেয়েদের সম্পর্কে ভাবনায় ঘটে গেছে বহু পরিবর্তন। মেয়েদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অধিকার সমাজে প্রতিষ্ঠিত। উচ্চশিক্ষিত এবং অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন স্বচ্ছন্দ মেয়েরা এখন পথে ঘাটে দৃশ্যমান। সত্যবতী এবং সুবর্ণলতার কালকে অনেক পিছনে ফেলে এসে গেছে আধুনিক সময় তার পরিবর্তিত চিন্তা-চেতনা নিয়ে। বকুল তার সাক্ষী। বকুলের নিজের জীবনও তো প্রচলিত পথের বাইরে বেরিয়ে গেছে। প্রথম জীবনে বকুলও প্রেমের স্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু দুপক্ষেরই কঠোর অভিভাবকদের আপত্তি (একমাত্র সুবর্ণলতার এই সম্পর্কে পূর্ণ সমর্থন ছিল) এবং কিছুটা পরিস্থিতির চাপে সেই প্রেম বিবাহের পূর্ণতা পেল না। আর সেইটেই বকুলকে দিল মুক্তপথের সন্ধান। ব্যক্তিগত প্রেম এবং ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ সংসারজীবনকে অতিক্রম করে গেল চিরঅবিবাহিত বকুল। প্রথম প্রথম একটু সমালোচনার ঝড় উঠলেও মুক্তকেশীর পরিবারে বয়স্থা কন্যার চিরকুমারী হয়ে থাকাও সম্ভব হল। সম্ভব হল স্বনামধন্যা লেখিকা হয়ে ওঠবাব। 'অনামিকা দেবী' এই ছদ্মনামে লেখে বকুল। দ্রুত পরিবর্তনশীল ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে স্থিতধী এই নারী প্রত্যক্ষ করে সমসময় এবং সমসমাজকে। তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখে সত্যবতী এবং সুবর্ণলতার বন্ধনমুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে। প্রত্যক্ষ করে দুই সুপ্রতিষ্ঠিত পুত্রের জননী বিধবা পারুলও যে আজ সংসারজীবনকে সরিয়ে

ফেলে নীরব সমাহিত অনুভবের মধ্যে নূতন করে আবিষ্কার করে সুবর্ণলতার চাওয়া-পাওয়াকে।

উপন্যাস ত্রয়ীর এই শেষ পর্বে তৃতীয় প্রজন্ম বকুল-পারুল শুধু নিজেদের জীবনকেই দেখে না, একই সঙ্গে দেখে তাদের চতুর্থ প্রজন্মের আশা-নিরাশাকে। বকুলের লেখক সত্তার মানস-দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয় আধুনিকা নারীর সার্থকতা এবং ব্যর্থতার কাহিনি। বকুল যেন এক নজরে দেখতে পায় সত্যবতী থেকে সত্যভামা বা শম্পা—কালের সুদীর্ঘ যাত্রাপথটিকে। সত্যবতীর কালে মেয়েমানুষের পক্ষে পুস্তকে হাত দেওয়া ছিল মহাপাপের সামিল। সুবর্ণলতার সময়ে মধ্যবিত্ত সমাজের মেয়েরা একটু-আধটু লেখাপড়া শিখলেও উচ্চশিক্ষা এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতার পথ ছিল বহুদূর। বকুলের আমলে দেখি উচ্চশিক্ষা এবং স্বোপার্জন আর গর্হিত নয় মেয়েদের পক্ষে। আর চতুর্থ প্রজন্মের বেলা বিষয়টি কৌতুহলোদ্দীপক। একালে অভিভাবকরাই উৎসাহী মেয়েদের অর্থ উপার্জনে।

সত্যবতীব কাল থেকে বকুলের সমকাল পর্যন্ত নারীসম্পর্কিত সমাজচেতনার একটা ক্রমপরিবর্তনের ছবি আমরা দেখি উপন্যাস ত্রয়ীর পাতায়। এই পরিবর্তনের পেছনে কালানুক্রমে পরিবর্তিত অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণেরও একটা প্রভাব সম্ভবত খুঁজে পাওয়া যাবে। সত্যবতীর কালপর্ব আনুমানিক ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে দেখি মধ্যবিত্তের গ্রামনির্ভর অর্থনীতিকে। যেমন সত্যবতীর বাবা রামকালী অথবা শ্বশুরমশাই। এরা গ্রামীণ মধ্যবিত্ত এবং সম্পন্ন গৃহস্থ। এই সময়ে সমাজ এবং সংসারের অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণরূপে পুরুষের হাতে। নারীর ভাগ্যের নিয়ন্ত্রক তাই পুরুষ। সেখানে নারীর শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাই বা কোথায়? কারণ সে তো আর উপার্জন করতে যাচ্ছে না। সত্যবতী এর দ্রষ্টা। সে দেখেছে তার মা ভুবনেশ্বরী, সারদা, শঙ্করী, ননদ সৌদামিনীর মতো অগণিত মেয়েদের নিরুপায়তা।

সময় যত এগিয়েছে উপন্যাসে, দেখেছি ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালির নগরের আকর্ষণে গ্রাম ছাড়ার পর্ব। যেমন নবকুমার গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় চলে আসে। কলকাতায় সত্যবতী নবজাগরণের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়। কিন্তু তখনও পর্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের সীমাবদ্ধ গণ্ডিতে মেয়েদের উচ্চশিক্ষা এবং স্বনির্ভরতা স্বীকৃত হলেও বৃহৎ সনাতন হিন্দুসমাজে বিশেষত মধ্যবিত্ত সমাজে তখনও মেয়েরা পরাধীন। উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বে আমরা সুবর্ণলতাকে যে-পরিবারের বধূরূপে দেখি তারা ব্যবসায়জীবী, চাকুরিজীবী নগরবাসী মধ্যবিত্ত। সময় কিছুটা এগিয়েছে এবং কলকাতার বাসিন্দা বলেও হয়তো বা এদের অন্তঃপুরিকারা সত্যবতীর কালের গ্রামসমাজের অবরোধবাসিনীদের মতো অসূর্যম্পশ্যা নয়। বাড়ির পুরুষদের তত্ত্বাবধানে কদাচিৎ পালাপার্বণে থিয়েটার বা জাদুঘরে যাওয়া চলে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। বৃহত্তর হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজের অর্থনৈতিক রাশটা তখনও কিন্তু পুরুষেরই হাতে। সুতরাং মেয়েদের শিক্ষিত করে তোলারও কোনো আয়োজন নেই। ফলত ব্যাপকাকারে নারী-প্রগতির ছবিও মেলে না। সুবর্ণলতার মতো অর্থনৈতিকভাবে পরনির্ভর নারীর দুর্দশার চিত্রই তখন সর্বত্র সুলভ। সুবর্ণও সক্ষোভে মেয়েদের নিরুপায়তার এই মূলগত কারণটিই নির্দেশ করেছে।

সময় আরও এগিয়েছে, এসেছে স্বদেশি আন্দোলন, দেশ স্বাধীন হবার কালপর্ব। কালের এই বিক্ষুব্ধ চেহারা মধ্যবিত্ত সমাজের মেয়েদেরও অন্তঃপুর থেকে কিছুটা বের করে এনেছে।

এই সময় থেকেই সমাজে মেয়েদের অবস্থানের পালাবদল ঘটতে থাকে। সুবর্ণলতার জীবনের শেষপর্বে এই পরিবর্তনের ইঙ্গিত পাই। এই পরিবর্তনের পেছনে স্বাভাবিকভাবেই সময়গতির যেমন একটা বড় ভূমিকা আছে তেমনই সমাজের ক্রম-পরিবর্তিত অর্থনীতিরও একটা ভূমিকা আছে বলে মনে হয়। লক্ষণীয় যে, বকুলপর্বের আগেই সম্ভবত ঘটে গেছে দু-দুটি বিশ্বযুদ্ধ। ১৯১৪-১৯১৮ খ্রিঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আর ১৯৩৯ খ্রিঃ- ১৯৪১ খ্রিঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। এই বিশ্বযুদ্ধগুলি মধ্যবিত্ত বাঙালির অর্থনৈতিক ভিত্তিকে টলিয়ে দিয়েছিল। সেই সময় গ্রামের সঙ্গে সম্পর্কহীন চাকরিজীবী মধ্যবিত্ত অর্থনৈতিকভাবে বিপন্ন হয়ে পড়ে। আর এরই প্রচণ্ড প্রভাব পড়ে মেয়েদের জীবনে। সমাজের অর্থনৈতিক দুরবস্থা হেতু মেয়েদের বিবাহের বয়স হয়ে যায় বিলম্বিত। ফলস্বরূপ মেয়েরা বেরিয়ে আসে অন্তঃপুর থেকে, উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয় এবং অনিবার্যভাবেই পুরুষের পাশাপাশি চাকরির ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। বকুলের কাল স্বাধীনতা-উত্তর কাল। তার আগেই বিশ্বযুদ্ধের পর্ব শেষ হয়েছে। বকুলের কালে তাই মেয়েরা চাকরিতে অভ্যস্ত, অভ্যস্ত উপার্জনে। আর অর্থনৈতিক কারণবশত মেয়েরা ঘরের বাইরে পা রাখতেই নারী-পুরুষের সম্পর্ক অথবা হিন্দু নারীর সতীত্ব-সম্পর্কিত চিরাচরিত ধারণাকে পাল্টাতে বাধ্য হল সমাজ। এ ছাড়া মেয়েদের সম্পর্কে পশ্চিমি ভাবনাগুলিও তখন মধ্যবিত্ত মানসে প্রতিফলিত হতে শুরু করেছে। ফলত এই পরিবর্তন। চতুর্থ প্রজন্মের ক্ষেত্রে বকুল তাই প্রত্যক্ষ করে যে মুক্তকেশীর প্রপৌত্রীকে ম্যাজিকের দলে ঢোকাতে চায় তারই অভিভাবক। মেয়েটির বিবাহ সম্পর্কে অভিভাবকের মত—

> *'ঘরের কড়ি যেখানে যা আছে খরচা করে বিয়ে না হয় দিলাম, তাতে আমার কী লাভ হল? উনি মহারানি রাজ্যপাটে গিয়ে বসলেন, আমার হাঁড়ির হাল আরও হাঁড়ি হল। না না, এটি তোমায় করে দিতেই হবে বকুল, খুব আশা নিয়ে এসেছি। ওরা না কী মাইনে পত্তর ভালো দেয়।'*

অর্থনৈতিক পরিকাঠামো যে-সমাজকে অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করে এই-ই তার প্রমাণ। একটা সময় অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রক হিসেবে পুরুষ নারীর ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। পরবর্তীকালে সেই অর্থনীতির পরোক্ষ প্রভাবেই মেয়েদেরকে উপার্জনের ক্ষেত্রে এগিয়ে দিয়েছে পুরুষ অভিভাবকরাই। বস্তুতপক্ষে অধিকাংশ মানুষই পরিচালিত হয় সমাজের দ্বারা আর সমাজ অনেকটাই পরিচালিত হয় অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে। তাই উপন্যাস-ত্রয়ী ব্যাপী নারীজীবনের কালান্তরের পেছনে আর্থ-সামাজিক কারণ একটা বড় কারণ হিসেবে রয়েছে বলে দেখা যায়।

বকুল তার তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি এবং শান্ত জিজ্ঞাসার দ্বারা বিশ্লেষণ করে আধুনিক জীবনকে। আধুনিক নারীজীবনের দুই ধারার প্রতিনিধি হয়ে যেন তার সামনে আসে শম্পা আর সত্যভামা। সুবর্ণলতার পৌত্রী শম্পা বারবার তার প্রেমিক বদল করে যাকে প্রচ্ছন্নভাবে সমর্থন করে বকুল। কারণ সে অনুভব করে প্রেমের পরিপূর্ণ এবং যথার্থ রূপ আবিষ্কারেই শম্পা এমন অনুসন্ধিৎসু। শেষ পর্যন্ত এই তরুণী তার একনিষ্ঠ প্রেমের জন্য সত্যিই সমাজ, সংসার, পারিবারিক মর্যাদা সমস্ত কিছুকে উপেক্ষা করতে পারে আপন বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের

জোরে। সে সার্থক করে তোলে তার ভালোবাসাকে। এই শম্পারই পিতামহী সুবর্ণলতা জীবনের অপরাহ্ন বেলায় প্রেমকে কামনা করেছিল। তার বিদ্রোহী মন ভেবেছিল একটি শিশুকন্যাকে জোর করে বিবাহবন্ধনে বেঁধে, একটি বালিকাকে জোর করে মাতৃত্বের দায় দিয়ে তার জীবনের সমস্ত সার্থকতাকে কেড়ে নিয়েছে সমাজ। সেই বেদনার্ত আকাঙ্ক্ষারই যেন মুক্ত রূপ শম্পার মধ্যে দেখি।

অপরদিকে সুবর্ণলতারই প্রপৌত্রী সত্যভামা উচ্চাশার রঙিন নেশায় পারিবারিক এবং সামাজিক সমস্ত সুষ্ঠু শৃঙ্খলাগুলি ভাঙতে-ভাঙতে দিশাহারা হয়ে শেষ হয়ে যায়। সত্যভামার এই করুণতম পরিণতি বকুলের মনে নিরন্তর প্রশ্ন তোলে—

> *'মা, তুমি কী অহরহ এই মুক্তিই চেয়েছিলে, এই শৃঙ্খলমুক্তি? তোমার প্রাণ কুটে চাওয়ার ফল কী এই?'*

বকুল দেখে নারীজীবনের কালান্তর এসেছে। নারী মুক্ত হয়েছে সুদীর্ঘকালের অশিক্ষা আর অসম্মানের বন্ধন থেকে। কিন্তু আধুনিক নারীজীবনে ঘনিয়েছে অন্য এক সংকট। এ জীবনে আছে বন্ধনহীনতা, আছে অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা জনিত প্রাচুর্য কিন্তু সেই সঙ্গেই আছে লক্ষ্যহীনতা, বিপথগামিতা এবং বিলাসসর্বস্ব জীবনের নিরর্থকতা। কর্মকোলাহলমুখর সংসারের বাইরে নিভৃতে-থাকা পারুলও প্রত্যক্ষ করে কালবদলের ছবিকে। সম্ভবত বকুলের প্রভাবেই সে নূতন করে আবিষ্কার করে তার মা সুবর্ণলতার অপরিসীম নিরুপায়তাকে। মুক্ত জীবনের বিস্তৃতির মধ্যে দাঁড়িয়ে সুবর্ণেরই সন্তান পারুল ভাবে—

> *'মা যদি খুব অল্পবয়সে বিধবা হয়ে যেত, তা হলে হয়তো মা বেঁচে যেত।'*

দীর্ঘকাল একটা স্থূল পুরুষচিত্তের ক্লেদাক্ত আসক্তির ফাঁদে আটকে-পড়া সুবর্ণ নিজেও কতবার এ-কথা স্বামীকে বলেছে।

পারুল আবও দেখে যে তার মাতামহী সত্যবতী যে বিবাহবন্ধন সম্পর্কে একটা অমোঘ প্রশ্ন তুলেছিল এবং সেইকালে যে-প্রশ্ন ছিল ভয়ানক গর্হিত, আজ পরিবর্তিত সময়ে তারই পুত্র ও পুত্রবধূর সেই বিবাহবন্ধন বিনা প্রশ্নে ছিন্ন হয়ে গেল। কালের এই পরিবর্তন ভাবায় বকুলকে এবং পারুলকে। সত্যবতীর কাল তারপর তাদের মা সুবর্ণলতাব কাল—দীর্ঘসময়ের অবরোধের জ্বালাময় যন্ত্রণার ইতিহাস উপলব্ধি করে তারা। উপলব্ধি করে কারণ নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যে-রূপ সত্যবতী-সুবর্ণলতার আকাঙ্ক্ষিত ছিল, বকুল-পারুল বিশেষত বকুলের মধ্যে সেই রূপটিই দেখা যায়। শুধু তাই নয়, এই পর্বে সমাজের মধ্যেও নারীর অবস্থান ভিন্নতর। নারী-পুরুষ এখন অনেকটাই পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। বকুল প্রত্যক্ষ করে যে সত্যবতীর মানসলোকে যে বিপরীত ভাবনার স্রোত বইতে শুরু করেছিল, আজ কালান্তরে সত্যিই তা বিপুল বিস্তার নিয়ে মুক্ত জীবনের মহাসমুদ্রে মিশে গেছে। তার প্রমাণ বকুল, বকুলের জীবন এবং তার নিজস্ব মুক্তি; সর্বোপরি শম্পার জীবন। নারীর মুক্ত জীবনাকাঙ্ক্ষার এক রূপ বকুল-পারুলের মধ্যে, আরেক রূপ শম্পার মধ্যে। যে-অন্তরশায়ী মুক্তিচেতনা বকুলের মনকে প্রশান্তিতে ভরে রাখে, তারই স্বতঃস্ফূর্ত বেগবান মূর্তি দেখি শম্পার মধ্যে।

তাই সত্যবতীর চতুর্থ প্রজন্ম তার জীবন গড়ে তুলেছে তার নিজের মুক্ত ভাবনার ছাঁচে। সুবর্ণলতার রুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা যথার্থ রূপ পেয়েছে শম্পার মধ্যে। এই নারীর জীবন, তার প্রেম সমস্তই তার ব্যক্তিত্ব এবং ভাবনার ছন্দে গড়া। সমাজ-সংসার তুচ্ছ সেখানে। সবচেয়ে বড় কথা, এই জীবনকে পূর্ণরূপ দেবার জন্য তার ধৈর্য, সংযম, তপস্যা এবং কৃচ্ছ্রসাধনারও অন্ত নেই। সত্যবতী, সুবর্ণলতা যে-আগুন নিজেদের মধ্যে সারাজীবন বহন করেছে তা শিখারূপে জ্বলে উঠতে দেখি শম্পার মধ্যে।

প্রথম প্রতিশ্রুতি, সুবর্ণলতা এবং বকুলকথা—উপন্যাস ত্রয়ীর মধ্য দিয়ে এভাবেই পর্যায়ক্রমে প্রকাশিত হয়েছে নারীজীবনের কালান্তরের ইতিবৃত্ত। উপন্যাস তিনটির কেন্দ্রীয় চরিত্রগুলির ভিন্নতর জীবনচেতনার পাশাপাশি অনুপুঙ্খভাবে উঠে এসেছে সেই কাল এবং সমাজের ছবি। তাই এই রচনার সূত্রে প্রকাশ পেয়েছে মহামূল্যবান এক সামাজিক ইতিহাস এবং তার কালানুক্রিমক বিবর্তনের রূপ। এই সমাজে মেয়েদের অবস্থানের চেহারা তার অন্তরঙ্গ এবং বহিরঙ্গ রূপ দশকের পর দশক ধরে আশাপূর্ণা দেবী লক্ষ করেছেন। তাঁর স্বাতন্ত্র্য এখানেই। যে-সামাজিক ইতিবৃত্ত পর্যায়ক্রমে অবরোধের জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়েছিল, তারই সুস্পষ্ট ছবিটি পাওয়া গেল এই রচনার মধ্যে। বলা হয় উপন্যাস জীবনের সমগ্রতাকে তুলে ধরে। এই উপন্যাসগুলি জুড়ে সেই ভাবনাটিকেই সার্থক হয়ে উঠতে দেখি। সমকাল, সমসমাজ এবং সেই সমাজের বিচিত্র পরিস্থিতির সঙ্গে ঘাত-প্রতিঘাতে উজ্জ্বল হয়ে-ওঠা মানব-চৈতন্য—জীবনের এই সম্পূর্ণ রূপটি ধরা পড়েছে এর পাতায় পাতায়।

নারীজীবনের কালান্তরের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধে বলিষ্ঠ নারীচেতনা মূলত এগিয়ে গেছে পূর্ণ মানবতার পথে। সেই যাত্রাপথের দিক্-নির্দেশনাতেই এই উপন্যাস ত্রয়ীর মহিমাময় পরিসমাপ্তি।

পিতৃতন্ত্রের প্রহরী : নারী

রূপা ভট্টাচার্য

তোমাকে ভালোবাসি, তোমার গান গাই
তোমার কথা শুনে আমরা চমকাই
তোমার জন্যই হৃদয় ভরা ব্যথা
তোমার জন্যই পাঁচালি ব্রতকথা

সমাজের প্রতিচ্ছবিই তো সাহিত্যে প্রাণ পায়। তবে লিঙ্গ-বৈষম্য যেহেতু বিকল সমাজেরই মুখ্য ফসল বা বলা ভালো সমাজ-আরোপিত, তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই একটি বিভাজনের পরিখা তৈরি হয়ে যায় সাহিত্যের লেখক ও পাঠকের মধ্যে। অনেকটা ফারাক সৃষ্টি হয়ে যায় নাবী এবং পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে। কেননা মেয়েদের বেঁচে থাকার ভিন্ন ধরনই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে স্বতন্ত্রতার রূপরেখা টেনে দেয়। কিন্তু এখানে প্রশ্ন জাগে, শিল্পসৃষ্টি তা হলে কি লিঙ্গভিত্তিক? না কি স্রষ্টার সৃষ্টিশীলতাই শুধুমাত্র বিচার্য! আর এই দৃষ্টিকোন থেকে দেখলে নারী ও পুরুষের বিশ্ববীক্ষার মধ্যে বিভেদের দেয়াল তৈরির অবকাশটা বোধহয় অনেকটা ক্ষীণ হয়ে যায়। কিন্তু নারীর কলমে যখন নারীর ভাষা রূপ পেতে চায় তখনও তো ইতিহাসের মূলস্রোত অর্থাৎ পুরুষ স্রোতের অনুগামী সেইসব লেখাতে বিসর্জন দেওয়া হয় মেয়েলি অস্তিত্বকে। বলাই বাহুল্য নারী-সত্তার নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির শরিক হয়ে উঠতে পারে একমাত্র নারীরাই। আবহমান পুরুষক্ষেত্রের কাছে ক্রমাগত প্রশ্নের বীজ বপন করে অভিজ্ঞতার সম্প্রসারণ করে চলেছে নারী। তবে প্রশ্ন ওঠে, তা কি নিছকই অভিজ্ঞতা নাকি বেঁচে ওঠার অনন্য সোপান? এই একপেশে অভ্যেসের বিপরীতে গিয়ে যদি কোনো মেয়ে যন্ত্রণার বর্ণমালাকে লিপিবদ্ধ করতে চায়, তখন স্বাভাবিকভাবেই এক স্বতন্ত্রতার বার্তা নিয়ে আসে তার মেয়েলি বয়ান। এমনই মেয়েলি বয়ানের এক অসামান্য সুদক্ষ কারিগর হচ্ছেন আশাপূর্ণা দেবী।

বিশ শতকের টালমাটাল পরিস্থিতি সভ্যতার বুকে দুর্বহ ক্ষতের সৃষ্টি করেছিল। শিকড়-হীন হয়ে উঠেছিল চারপাশের জনজীবন ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। খান খান হয়ে ভেঙে যাচ্ছিল যৌথ পরিবারগুলি। এক কথায় বাঁক বদল ঘটছিল সমাজ-মনস্তাত্ত্বিক পরিস্থিতির। কালো ঘোমটার আড়াল সরিয়ে যদিও মেয়েরা বহির্জগতে পা রেখেছিল, কিন্তু তাদের বাস্তব পরিস্থিতিতে কতটা পরিবর্তনের হাওয়া লেগেছিল, সে-ব্যাপারে অবশ্যই প্রশ্ন দেখা দেয়। তাই স্বপ্ন-দেখা থেকে স্বপ্ন-ভাঙা পর্যন্ত আহত রক্তাক্ত উচ্চারণ যেমন সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে, তেমনি আবার কোথাও যেন নূতন পথ সন্ধানের কণ্ঠস্বরও মননকে সমৃদ্ধ করে যায়। এমনই ঘুনেধরা সময়ে আশাপূর্ণা দেবী 'অসূর্যম্পশ্যা, অন্তঃপুরচারিণী'দের জীবনকথাকে সাহিত্যের পটভূমিতে দাঁড় করিয়ে এক নূতন ইতিহাস রচনা করেছিলেন। 'প্রেম ও প্রয়োজন' যদিও তাঁর প্রথম উপন্যাস, তবে পরবর্তী কালে 'অগ্নিপরীক্ষা', 'উন্মোচন', 'উত্তরণ', 'জহুরি' ইত্যাদি একের পর এক উপন্যাস তাঁর লেখার মধ্যে একদিকে যেমন নূতন দিগন্ত সঞ্চার করেছে, তেমনি আবার চিরঅবদমিত, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, শোষিত, পীড়িত মেয়েদের

হাহাকারকে হৃদয়ের তন্ত্রীতে জাগিয়ে রেখে অসুস্থ সমাজ-সভ্যতার কাছে পৌঁছে দিয়েছেন বিস্ময়ের বার্তা।

> *'আমার লেখার উপজীব্য কেবলমাত্র মানুষ। প্রকৃতি প্রেমিক লেখকের বর্ণাঢ্য রচনা আমায় আকৃষ্ট করে, আনন্দ আর বিস্ময়ের স্বাদ এনে দেয়, কিন্তু আমার সাধ্যের বাইরে। সাধ্যের মধ্যে শুধুই মানুষ। মধ্যবিত্ত ঘরোয়া মানুষ, যে আমার একান্ত চেনা জানা। আমি আমার জানা জগতের বাইরে কখনো হাত বাড়াতে যাই না।'*

অন্দরেই যাদের জীবন সীমাবদ্ধ, সেই অন্দর-মহলের মেয়েদের জীবন-পরিস্থিতির বেদনাময় দিকগুলি অর্থাৎ বঞ্চনার ইতিহাস লেখিকার কলমে প্রাণবন্ত রূপে ফুটে উঠেছে। কিন্তু তা কি শুধু চার দেওয়ালেই সীমাবদ্ধ ছিল, না কি কোথাও একটা আত্মিক দ্বিরালাপের মূর্ছনাও গ্রথিত হয়ে যায়! তবে বলাটা আবশ্যক, আশাপূর্ণা দেবীর অফুরান সৃষ্টি-সম্ভারে 'বিন্দুতে সিন্ধুর স্বাদ' এনে দেয় তাঁর ত্রয়ী উপন্যাস, 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' 'সুবর্ণলতা', 'বকুলকথা'—এই তিন প্রজন্মের তিন নারীর জীবন-চর্চার রূপ-বিন্যাস।

লেখিকার পরিব্যাপ্ত সাহিত্যাকাশের মুখ্য রত্নটি অবশ্যই 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র সত্যবতী। তাঁর জবানিতেই এই সত্যটুকু স্পষ্ট :

> *'যখন আমার খুব কম বয়েস তখন থেকেই দেখতাম পারিবারিক জীবনে আত্মীয়স্বজনের মধ্যে—আমাদের মধ্যবিত্ত জীবনের কথাই বলছি—ছেলে এবং মেয়ের মধ্যে মূল্যবোধের বড় বেশি তফাৎ। মেয়েরা যেন কিছুই নয় আর ছেলেরাই পরম মানিক, এই রকম ব্যাপার। এটা আমাকে খুব বিদ্ধ করত। কিন্তু আমাদের আমলে তো এমন সাহস ছিল না যে প্রতিবাদ করি। ...তাই মনের মধ্যে দুঃখ জ্বালাটা জমত। আমার সেই নিরুচ্চার প্রতিবাদগুলোই যেন একটি প্রতিবাদের প্রতিমূর্তি হয়ে আমার কাহিনির নায়িকারূপে দেখা দিয়েছে। যেমন প্রথম প্রতিশ্রুতির 'সত্যবতী'।'*

যে-সমাজে সময়-বদলের সঙ্গে শুধু শাসকেরই বদল ঘটছিল, কিন্তু পীড়নের কোনো হেরফের হচ্ছিল না, অর্থাৎ 'মেনে নেওয়া ও মানিয়ে নেওয়া-'র দর্শনেই সাহিত্য-সংস্কৃতির ভাবাদর্শ স্থায়িত্ব খুঁজছিল, এমনই এক পটভূমিতে দাঁড়িয়ে খেলার সাথিকে উদ্দেশ্য করে নয় বছরের সত্যের মুখে শোনা যায় স্পর্ধিত উচ্চারণ, 'মেয়ে মানুষ। মেয়ে-মানুষ মেয়ে-মানুষ যেন মায়ের পেটে জন্মায় না, বানের জলে ভেসে আসে। অত যদি মেয়ে-মানুষ করবি তো আমার সঙ্গে খেলতে আসিসনে।' যে-সমাজে মেয়েলি বাক্‌ভঙ্গি পুরুষতন্ত্র কর্তৃক আক্রান্ত, সেই পরিবেশে সত্য যেন এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। পথ চলার অদম্য স্পৃহাই তার জীবন-প্রণালিতে এক ভিন্নতার মাত্রা নিয়ে এসেছিল। যদিও ব্যতিক্রমী পিতা রামকালীর স্বচ্ছ দৃষ্টিই সত্যকে পুরুষালি ভালোত্বকে পেরিয়ে যাওয়ার প্রেরণা জুগিয়েছিল, কিন্তু বলা ভালো সত্য ছিল নিজস্বতায় আস্থাবান। রাসুর প্রথম স্ত্রী থাকা অবস্থায় দ্বিতীয় বিবাহের সংঘটক এবং শঙ্করীর কুলত্যাগে উপযুক্ত প্রতিক্রিয়ার সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে দোদুল্যমান রামকালী,

পুরুষতান্ত্রিক সভ্যতার বজ্রকঠিন প্রতিষ্ঠানেরই প্রতিনিধি তবে সত্যবতীর সত্যজ্ঞানই তার জীবনে তৈরি করে এক মৌলিক বিবর্তনের প্রবাহ। পুরুষসর্বস্ব ঐতিহ্যের একমুখিনতার বিপরীতে গিয়ে যদি কোনো মেয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, তখন তাকে আচ্ছন্ন করে জীবন্ত দগ্ধ হওয়ার ইতিহাস। আর সত্যবতীর ইতিহাস এই দহনেরই ইতিহাস।

বালিকা থেকে পূর্ণাঙ্গ মানবীতে উত্তরণের সময়সীমায় যদিও সত্যকে অনেক ঝড়-হাওয়াকে সঙ্গী করে নিয়েই এগোতে হয়েছে, তার মধ্যে ক্রিয়াশীল ছিল নিজেকে নিজেই নির্মাণ করে তোলার প্রক্রিয়া। আর এই আত্মনির্মাণের যন্ত্রণাময় তীব্রতাই সত্যকে পুরুষশক্তির প্রতিষ্ঠানের বিরোধিতা করে নারীর কথা বলার নিজস্ব পরিসর গড়ে তুলতে প্ররোচিত করেছিল। যেহেতু নারী-পুরুষের জীবন-নির্বাহের প্রণালিতে চিরদিনই রয়েছে বিভেদের কাঠামো, পিতৃতন্ত্রের ক্ষমতার চাপে কর্মক্ষেত্রেও মেয়েরা ছিল অন্তেবাসী। অন্তঃপুরেই আবদ্ধ তাদের অস্তিত্ব। কর্ম বলতে একমাত্র স্বামীসেবা, শিক্ষা বলতে একমাত্র স্বামীসেবার শিক্ষা। এমনই নিরেট পটভূমির বিরুদ্ধে মূর্তিমতী প্রতিবাদ যেন সত্যবতী। অক্ষরজ্ঞান তাকে মুক্তমনের পথিক করে তোলার পাশাপাশি দিয়েছিল আলোর পথের সন্ধান। তবে নারী-শিক্ষা যেহেতু ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধী, তাই এই অভ্যাসে রপ্ত মেয়েদের মুখেও বাদ পড়ে না স্বাধীনচেতা সত্যের প্রতি বিদ্রূপোক্তি। কিন্তু সত্যবতী 'খোলা হাওয়া লাগিয়ে পালে' পথ চলাকে রাখে অব্যাহত। তাই আত্ম-নির্ভরতার উপর ভিত্তি করেই বোধে-বুদ্ধিতে ম্রিয়মাণ স্বামী নবকুমারকে নিয়ে পাড়ি দিতে সক্ষম হয়েছিল নবজাগৃতির আলোকদীপ্ত কলকাতা শহরে। নারী নামক যে-আগুন ইতিহাসের রাজপথে পাথরচাপা হয়ে পড়েছিল, সেই আগুনেরই ভাষ্যকার যেন সত্যবতী। সমাজ-সচেতন আশাপূর্ণা দেবী যেন এখানে গ্রাম ও শহরের মেলবন্ধনের মধ্য দিয়ে সত্যের আধুনিক মনের সাক্ষ্যকে এক নতুন রীতিতে উন্মোচন করেছেন। তবে সত্যের এই জীবনজিজ্ঞাসা পুরুষতন্ত্রের সংস্কৃতিতে কী হৃদয়াবেগেরই অন্য নাম? হয়তো এই প্রশ্নের আবর্ত অটুটই থেকে যায়।

> 'আমি শুধু ভালোবাসার মধ্যে একটি
> সরল অদ্ভুত মোমবাতি জ্বেলেছি স্বভাবে,
> সেই নরম আলোর কাছে কেউ তো বসেনি যথার্থ মায়ায়।
> সকলেই হিসেব বুঝেছে খুব এই উপনিবেশের দেশে...'

লড়াকু সত্যবতীর জীবনে শেষ আশার প্রদীপ ছিল সুবর্ণলতা, তবে বলা ভালো সত্যের বহুস্বরিক যাপন-প্রণালির প্রতিতুলনায় সুবর্ণের জীবন ছিল অনেকটা একরৈখিক। মেয়ে নিজস্ব স্বরভঙ্গি নির্মাণ করবে, গড়ে তুলবে নিজস্ব বিশ্ব, অবসান ঘটবে অস্বস্তিকর দিনের : এই ছিল সত্যের স্বপ্ন। তাই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করেছিল স্বামীকে, ষোল বছর না-হলে সুবর্ণের বিয়ে না-দেওযার জন্য। কিন্তু নারীর আকাঙ্ক্ষা তো পুরুষসর্বস্ব জগতে নিষ্ঠুর আঘাতে চূর্ণ হয়ে যাবেই। সত্যবতীর কামনাটিও সমাজ-নির্দিষ্ট সীমায় মান্যতা পায়নি। 'সত্তার স্বাক্ষর' এই বোধ সুবর্ণের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও খাঁচায় আবদ্ধ পাখির মতো শেখানো বুলির মধ্যে নিজের সুর খুঁজে নিতে তাকে মাশুল দিতে হয়েছে অনেকটাই। অহরহ পিতৃতন্ত্রের জাঁতাকলে পিষ্ট সুবর্ণের সত্তা ও মূল্যবোধ প্রতিনিয়ত ধূলিসাৎ হয়ে গেছে, তার

স্বপ্ন ও প্রাণের লাঞ্ছনা যেন নেতিবাচক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। 'আমার মন আছে, বুদ্ধি আছে, মস্তিষ্ক আছে, আত্মা আছে, কিন্তু কেহ আমার সত্তাকে স্বীকার করে না।' তা হলে প্রশ্ন জাগে, লিঙ্গভেদ কি শরীরের সঙ্গে সত্তার উপরও আধিপত্যবাদের অধিকার স্থাপন করে? আর হয়তো সেজন্যই নারী-সত্তাকে আচ্ছন্ন করে দেয় ক্ষমতায়নের আঁধি ও অন্ধকার। এই দৃষ্টিকোন থেকে বলা যায়, নারীর নারীত্ব এবং, বলা ভালো, মাতৃত্বও পুরুষতান্ত্রিক সমাজের স্বার্থ পূরণের মাধ্যম মাত্র। মায়ের সঙ্গে যেখানে সন্তানের অচ্ছেদ্য বন্ধন, সেখানেও পুরুষকেন্দ্রিক সংস্কৃতির হিংস্র দাঁত, নখ থাকে সম্পূর্ণ ক্রিয়াশীল। মা থাকবে শুধুমাত্র মায়ের ভূমিকায়, এই তো সন্তানের অভিলাষ। তাই কলম-হাতে সুবর্ণকে দেখে সন্তানের মুখেও অভাব হয়নি কটূক্তির। 'ব্যাপারটা কি? কোনো থিসিসটিসিস লেখা হচ্ছে নাকি? ... মা কী রান্নাঘরটা একদম ছেড়ে দিলেন না কী রে বকুল? ...মহাভারত লিখতে বেদব্যাসের কতদিন লেগেছিল জানিস সে খবর?' নারীত্বকে যৌনতার মাত্রায় উন্নীত করে নিজের মতো করে উপভোগ করতেও ত্রুটি রাখে না ভোগবাদী পুরুষতন্ত্র। 'নারী মনোহীনা তাই শরীর বসতি।' বলাই বাহুল্য, বিবাহ তো সেখানে ক্ষমতা প্রয়োগেরই অন্যতম প্রধান মাধ্যম। আর, এই ক্ষমতা-তন্ত্রের চাপই সুবর্ণকে ঠেলে নিয়ে যায় সর্বনাশা খাদের দিকে। কিন্তু সুবর্ণলতা যেন তার নিঃসঙ্গতা নিয়েই ধরতে পেরেছিল নিঃসঙ্গতাবোধের প্রাণচিত্রকে। তার উক্তিতেই তা স্পষ্ট। 'তোমার রূপবতী মূর্তির কাছে আমি মুগ্ধ ভক্ত, তোমার ভোগবতী মূর্তির কাছে আমি বশংবদ, তোমাব সেবাময়ী মূর্তির কাছে আত্মবিক্রীত, তোমার মাতৃমূর্তির কাছে আমি শিশুমাত্র। ...কিন্তু এগুলি একান্তই আমার জন্যে হওয়া আবশ্যক। হ্যাঁ, আমাকে অবলম্বন করে যে 'তুমি' সেই তুমিটিকেই মাত্র বরদাস্ত করতে পারি আমি। তার বাইরে 'তুমি' হচ্ছো বিধাতার একটি হাস্যকর সৃষ্টি।'

'অনামিকা দেবী' ছদ্মনামের অন্তরালে যে-মেয়েটি নিছকই দর্শকের ভূমিকায় দিনবদলের স্বপ্ন দেখে দিনাতিপাত করেছে, সে হচ্ছে সুবর্ণের শেষ সন্তান বকুল। পুরুষালি পরম্পরায় যে-আত্মআবিষ্কারের বোধ সত্যবতীকে করে তুলেছিল ভিড়ের মধ্যে একা, যে-প্রত্যাশা সুবর্ণের হৃদয়েও থেকেছিল পিপাসার্ত, বকুলের 'অনামিকা দেবী'র পরিচয়ে তা কতটুকু কার্যকরী হয়েছে, সেখানে একটি প্রশ্ন থেকেই যায়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ-সচেতনতায় যেখানে নারী মূলত পণ্য ও সম্ভোগের সামগ্রী, সেই পরিসরে তার বয়ানও তো হবে প্রতিষ্ঠান দ্বারা সংজ্ঞায়িত। আবার তা বিবর্তিতও হতে পারে ক্ষমতার চাহিদা অনুযায়ী। ক্ষমতা-ব্যবস্থার চাপিয়ে-দেওয়া শেকলকে মোচন করে যদি কোনো নারী জেগে উঠতে চায়, তখন তাকে আঁকড়ে ধরে দহনের ইতিকথা। 'বকুলকথা'র বকুল-পারুলও যেন সেই দহনেরই স্ফুলিঙ্গ। পারুলের লেখা চিঠিতেই রয়েছে এর গুঞ্জন, 'এইটাই কী চেয়েছিলাম আমরা? আমি, তুমি, আমাদের মা দিদিমা, দেশের অসংখ্য বন্দিনী মেয়ে? এটাই কী সেই স্বাধীনতার রূপ? যে স্বাধীনতার জন্যে একদা পরাধীন মেয়েরা পাথরে মাথা কুটেছে, নিরুচ্চার আর্তনাদে বিধাতাকে অভিসম্পাত করেছে? এ কী সেই মুক্তির আলো, যে মুক্তির আশায় লোহার কারাগারে শৃঙ্খলিত মেয়েরা তপস্যা করেছে, প্রতীক্ষা করেছে? ...না বকুল, এ আমরা চাইনি।'

'অস্তিত্ব'গত মূল্যবোধকে প্রত্যক্ষভাবে হারানোর পর আক্ষরিক অর্থে যদিও স্বাধীনতা এসেছে, মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে পরাধীনতা পেরিয়ে আসা নিশ্চিতভাবেই সম্ভব হয়নি; কারণ প্রকৃত স্বাধীনতা যদি সম্পূর্ণ মানবতার মুক্তিতে বিশ্বাসী হয়ে থাকে তবে সেখানে তো নারীমুক্তি অবশ্যই একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কেননা নারীকেন্দ্রিক নান্দনিকতাকে বাদ দিয়ে মানবকেন্দ্রিক নান্দনিকতা তো স্বয়ংসম্পূর্ণ হতেই পারে না। তবে পুরুষতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের বিরোধিতা করে ক্ষমতা-তন্ত্রের ঐ ধ্বংসস্তূপের উপরই লিঙ্গ-পরিচয়ের বিনির্মাণ হোক। একমাত্র তবেই চিরাগত অচলায়তনকে ভেঙে দিতে সক্ষম হবে নারী। আর তখনই নবায়মান 'জিজ্ঞাসা খুঁজে পাবে তার উপযুক্ত বাচন।

প্রথম প্রতিশ্রুতি : সামাজিক প্রেক্ষিত

প্রসাদ রায়

রাসসুন্দরী দেবীর (১২১৬) প্রায় ঠিক একশ বছর পরে আশাপূর্ণা দেবী (১৩১৫) জন্মেছিলেন বটে, কিন্তু বাইরের পৃথিবীটা এই একশ বছরে যতটা বদলেছিল বাঙালির অন্দরমহলের বদল ততটা হয়নি। দুই নারীই অপেক্ষাকৃত সচ্ছল পরিবারে জন্মেও প্রথাগত বিদ্যাশিক্ষা রহিত ছিলেন। তবে দুই নারীই আপন প্রতিভা বলে বিদ্যা অর্জন করেছিলেন আর তারই ফলে তাঁরা তুলে নিলেন কলম। একজন আত্মজীবনের কথা লিখে সময়কে বোঝালেন, আর একজন সেই সময়কে ধরে গড়ে তুললেন উপন্যাস। দুজনের কলমেই পাওয়া গেল অভিজ্ঞতা, অনুভব আর উপলব্ধির জগৎ। সে-জগৎ পুরুষের অভিজ্ঞতার বাইরে—কেননা পুরুষ সে-অভিজ্ঞতা অর্জন করতে চায়নি—ফলে সেই অনুভব পুরুষের হৃদয়কে স্পর্শ করতে পারেনি। উপলব্ধির এই অভাব তাই পুরুষের কলমে এমনভাবে স্থানও পায়নি।

রাসসুন্দরীর 'আমার জীবন' উনিশ শতকের নারীর আত্মকথন। উনিশ শতকের নারীর আত্ম-উন্মোচনের কাহিনিকে আশাপূর্ণা রূপ দিলেন তাঁর 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'তে। তবে এ কোনো বানানো অলীক ঘটনা নয়। মহাশ্বেতা দেবী তাঁর 'কবি বন্দ্যঘটী গাঞীর জীবন ও মৃত্যু' উপন্যাসে 'লেখকের কথা'য় লিখেছেন—'ইতিহাসের মুখ্য কাজই হচ্ছে মানুষের অন্তর্মুখী পুরুষার্থকে বাইরের গোলমাল, সংগ্রাম ও সমারোহের আবর্জনা এবং ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে অন্বেষণ করা, অর্থ ও তাৎপর্য দেওয়া।' এ-কথা 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' সম্পর্কেও প্রযোজ্য। তিনি 'ইতিহাসের রোমান্স'কে অবলম্বন করলেন না। সমাজ-পরিবারের বদলের সময়টির চিত্রমালা তৈরি করলেন। কালের এবং সেইসঙ্গে অন্তঃপুরের পরিবর্তনকে দেখাতে গিয়ে আশাপূর্ণা সমাজ-দলিল তৈরি করে ফেললেন। কাল হিসাবে উনিশ শতক আরও অন্য উপন্যাসকারের কলমেও উঠে এসেছে; কিন্তু তা ভিন্ন বিষয়কে নিয়ে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তো বটেই। 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র সত্যবতীর গল্প তো কোনো পুরুষের লেখা নয়, কলমে তা আশাপূর্ণার আর গঠনে তা বকুলের লেখা। উনিশ শতকের নারী এভাবে বিষয় হয়ে পুরুষ তো নয়ই নারীর কলমেও উঠে আসেনি। একটি কালের কথা বলতে গেলে ইতিহাসের সাক্ষ্য প্রয়োজন। কিন্তু ইতিহাস তো বাইরের পৃথিবীর আর আশাপূর্ণা লিখলেন অন্দরমহলের কথা। এ কারণেই কোনো ঐতিহাসিক গবেষণার প্রয়োজন হয়ে পড়েনি। 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' নিজেই হয়ে উঠেছে ইতিহাসের উপাদান। অর্থাৎ এ কাহিনি যেমন কল্পনায় রঙিন নয়, তেমনি প্রথাগত ইতিহাস নয়। ইতিহাস কবে অন্দরের-অন্তরের কথা বলেছে? 'সুবর্ণলতা'র ভূমিকায় তিনি জানিয়েছেন—'সমাজ বিজ্ঞানীরা লিখে রাখেন সমাজ বিবর্তনের ইতিহাস, আমি একটি কাহিনির মধ্যে সেই বিবর্তনের একটি রেখাঙ্কনের সামান্য চেষ্টা করেছি মাত্র।'

'প্রথম প্রতিশ্রুতি'তে আশাপূর্ণা উনিশ শতকের বাঙালির অন্তঃপুরের যে কাহিনি রচনা করেছেন তা উচ্চবর্ণের এবং বিত্তের হিন্দু পরিবারের। সমাজ-রাষ্ট্রব্যবস্থা বদলের সঙ্গে সঙ্গে কীভাবে বাঙালি পরিবারেও পবিবর্তনের পালা শুরু হল তাই তাঁর উপজীব্য। 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র ভূমিকাতেও তিনি জানান সে-কথা—'বহির্বিশ্বের ভাঙাগড়ার কাহিনি নিয়ে

রচিত হয় বিগত কালের ইতিহাস! আলো আর অন্ধকারের পৃষ্টপটে উচ্চকিত সেই ধ্বনিমুখর ইতিহাস পরবর্তীকালের জন্য সঞ্চিত রাখে প্রেরণা, উন্মাদনা, রোমাঞ্চ। কিন্তু স্তিমিত অন্তঃপুরের অন্তরালেও কি চলে না ভাঙাগড়ার কাজ? যেখান থেকে রং বদল হয় সমাজের, যুগের, সমাজ-মানুষের মানসিকতার। চোখ ফেললে দেখা যায় সেখানেও অনেক সঞ্চয়। তবু রচিত ইতিহাসগুলি চিরদিনই এই অন্তঃপুরের ভাঙাগড়ার প্রতি উদাসীন। অন্তঃপুর চিরদিনই অবহেলিত। বাংলাদেশের সেই অবজ্ঞাত অন্তঃপুরের নিভৃতে প্রথম যাঁরা বহন করে এনেছেন প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর, এ গ্রন্থ সেই অনামী মেয়েদের একজনের কাহিনি।' অন্তঃপুরের কাহিনি হলেও সত্যবতীর কারণেই বাইরের জগৎ এসে পড়েছে। কেননা সত্যবতী তো তাঁর পৌগন্ড পর্ব থেকে বাইরে পা ফেলার জন্য উদগ্রীব। 'পিঞ্জরবদ্ধ বিহঙ্গী'তো খাঁচা ভাঙার অপেক্ষাতেই থাকে! রাসসুন্দরীর ভাষায়—'...আমি যদি পুত্রসন্তান হইতাম, আর মার আসন্ন কালের সংবাদ পাইতাম, তবে আমি যেখানে থাকিতাম, পাখির মতো উড়িয়া যাইতাম। কী করিব, আমি পিঞ্জর-বদ্ধ বিহঙ্গী'। এ উপন্যাস 'ভদ্রলোক' বর্গের নারীর গণ্ডির বাইরে পদক্ষেপের কাহিনিও বটে। বাইরের জগতে উঁকি দেওয়া বাইরের আলোর ভিতরে প্রবেশের মধ্যেই তো 'ভাঙাগড়ার কাজ'। দিগন্তে আলোর বিচ্ছুরণ দেখা দিলে অন্তঃপুরের মতো কেন্দ্রেও তার দেখা মেলে। কপাট যতই রুদ্ধ হোক ভোরের পাখির কলরব ঘরে গিয়ে পৌঁছয়। ঢেউ্ দুর্বল হলেও তা নাড়া দেয় অন্দরমহলে। তৈরি হয় দ্বন্দ্ব। যে-দ্বান্দ্বিকতা উপন্যাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য, 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'তে সেই দ্বন্দ্ব সমগ্র উপন্যাস জুড়ে। অসামান্য কুশলতায় আশাপূর্ণা দ্বন্দ্বগুলি এনেছেন। কখনও তা ব্যক্তি-চরিত্রের আত্মদ্বন্দ্ব, কখনও ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির, কখনও বা ব্যক্তির সঙ্গে পরিবারের এবং ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের। আত্মসংকট বা শ্রেণি-সংকট তো কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, এর সঙ্গে পরিবার, সমাজব্যবস্থা বা রাষ্ট্রযন্ত্রও যুক্ত। এই উপন্যাসে সেই প্রসঙ্গগুলি এসেছে। প্রসঙ্গগুলি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে আশাপূর্ণা শিল্পিত করেছেন সমাজব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে। এ যেন একটি ছোট বৃত্ত ভেঙে আর একটু বড় বৃত্তে পদার্পণ, তারপর সেই বৃত্ত ভেঙে আরও বড় বৃত্তে; এভাবে ব্যক্তির বা শ্রেণির আত্মদ্বন্দ্ব ভেঙে পরিবারে পৌঁছায়, পরিবার থেকে সমাজ এবং সমাজ-সংকট থেকে রাষ্ট্রীয়বৃত্তে তা পৌঁছয়। তবে কোনো বৃত্তই সম্পূর্ণ মুছে যায় না, কিন্তু অপর বৃহত্তর বৃত্তে পৌঁছানোর পথ তৈরি করে। এভাবেই সত্যবতীর জিজ্ঞাসা যা নারী-শ্রেণির জিজ্ঞাসারই নামান্তর তা পরিবারের সঙ্গে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়। এভাবেই নারীর অবরোধ ভাঙার চেষ্টায় তা সমাজ এবং রাষ্ট্রযন্ত্রকেই আঘাত হানে। বিষয়টিকে নিচের চিত্রের মতো করে ভাবা যেতে পারে—

এ উপন্যাস আশাপূর্ণার ভাষায় 'সত্যবতীর গল্প' কিংবা 'গল্প বলতে চাও গল্প সত্যি বলতে চাও সত্যি'। সত্যবতী কিংবা এ উপন্যাসের আরও আটাশটির বেশি নারী চরিত্রকে উনিশ শতকের সাময়িক পত্রিকা বা সামাজিক ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া সম্ভব। কিন্তু একে তো আমরা ইচ্ছাপূরণের ঐতিহাসিক কথা বলতে পারি না। সচেতনভাবেই আশাপূর্ণা গ্রন্থের উৎসর্গপত্রে এবং মুখবন্ধে বহুবচন শব্দই ব্যবহার করেছেন। তাই সত্যবতী তাদের প্রতিনিধি মাত্র, সেখানে ইতিহাস উপেক্ষিত নয়। আবার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যেও উজ্জ্বল হয়ে এটি সত্যবতীর

কাহিনিও বটে। সত্যবতী রোমান্সের নারী নয়, তার বিকাশেরও একটি প্রেক্ষাপট আছে। তবে সে-চালচিত্র এমন রঙিনোজ্জ্বল নয় যাতে ব্যক্তি-চরিত্রটি হারিয়ে যায়। এই প্রেক্ষাপটটি অতি সুচারুরূপে নির্মাণ করেছেন আশাপূর্ণা। কোনো সমাজেই হঠাৎ করে এমন ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হয় না যাতে তাকে ভূঁইফোড় বা আকাশ-থেকে-পড়া মনে হয়। সমাজের মধ্যেই সত্যবতীর অঙ্কুরোদ্গমের আবহাওয়া তৈরি হচ্ছিল। যে-কোনো সমাজ-বিদ্রোহ বা শুভ-আন্দোলনে একজন হোতা থাকে ঠিকই কিন্তু তারা সমিধ সংগ্রহ করে সমাজ থেকেই। সত্যবতীর 'সত্যবতী হয়ে ওঠা'র মধ্যেও সমাজের ফল্গু অনুভব ছিল। সত্যবতী তাকে বিগ্রহ রূপ দিয়েছে। যদিও অগ্রণীদের ক্ষেত্রে প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম নিতান্ত সহজ হয় না, সবক্ষেত্রে তা সহজও হয় না। সত্যবতীর মানস গঠনে তার বাবা রামকালীর দার্ঢ্য চরিত্র বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। তার মানস জগৎ মোক্ষদা, শিবজায়া, দীনতারিণীদের পুরুষের গড়া জগৎ থেকে যোজন যোজন দূরের। পরিবারে সমাজে নারীর ভূমিকা সম্পর্কে রামকালীর মনোভাবের সঙ্গে মোক্ষদাদের কোনো পার্থক্য ছিল না। রামকালীর মানসিকতা গড়ে উঠেছে যুগেরই প্রভাবে, বোধের থেকে প্রথা সেখানে বড় হয়ে উঠেছে। 'যে জাতটার ভূমিকা হচ্ছে শুধু ভাত সেদ্ধ করবার, ছেলে ঠেঙাবার, পাড়া বেড়াবার, পরচর্চা করবার, কোন্দল করে অকথ্য আশ্রাব্য গালিগালাজ করবার, দুঃখে কেঁদে মাটি ভেজাবার আর শোকে উন্মাদ হয়ে বুক চাপড়াবার, তাদের প্রতি প্রচ্ছন্ন একটা অবজ্ঞা ছাড়া আর কিছু আসে না রামকালীর।' রামকালীর মতো পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গিই যদি এমন হয় তবে সমাজ থেকে প্রেরণা বা আদর্শ গ্রহণ সম্ভব হয় না। তবু সুপ্তভাবেও কিছু অনুভব, উপলব্ধি নারীসমাজেও জেগে উঠেছিল। যাদের চিন্তাব অধিকার, প্রশ্নের অধিকারকেই শৈশবে ভেঙে দেওয়া হয় তাদের আত্ম-উন্মোচন হবে কেমনভাবে? তবু সত্যবতীর যুক্তির তীক্ষ্ণতা আর প্রশ্নাতুব মন সহজেই বলতে পারে, 'গামছা দিয়ে ধরলে দোষ হয় না। ছিপ দিয়ে ধরলেই দোষ। চুনোপুঁটি ধরলে দোষ হয় না, বড় মাছ ধরলেই দোষ! তোমাদের এসব শাস্তর কে লিখেছে গা?' সমাজে এ প্রশ্ন সর্বত্র দেখা দেয়নি, দেখা সম্ভব নয়। প্রশ্ন কবলেই যেখানে 'অত বাক্যি কেন লা' বলে থামিয়ে দেওয়ার রেওয়াজ সেখানে নারীর চোখের জল বা হিরণ্ময় নীরবতাই প্রতিবাদ। তবে কখনও বা হঠাৎ করেই বিস্ফারিত কিছু মন্তব্য আগ্নেয়গিরির ভেতরের লাভার খবর জানান দেয়। রাসুর দ্বিতীয় বিয়ের সময় রামকালী সারদার অবস্থার কথা ভাবেনি। কেননা তা যে ভাবার বিষয় এ কথা পিতৃতান্ত্রিক বোধে আচ্ছন্ন রামকালীর ভাবনার বাইরে। কিন্তু শিবজায়া এটি উপলব্ধি করেছিল। সবচেয়ে বড়কথা রামকালীর বিরুদ্ধে সে প্রকাশ্যেই মন্তব্য করে এবং বিতর্ক উসকে দেয়। এই বিতর্কই সত্যবতীকে একদিকে সংবেদনশীল করে আবার যুক্তির শাসনে কঠোর করে গড়ে তোলে। ফলে বাবার কর্মের বিরুদ্ধেও সত্যবতী মত প্রকাশে দ্বিধা করে না। তার এই দ্রোহ নারী-সত্তারই নির্মাণ। আর এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে শিবজায়া, সারদাদের যে অর্ধস্ফুট প্রতিবাদ—তার মধ্য দিয়েই অন্তঃপুরের ভাঙাগড়া চলতে থাকে। শুধু তো অন্তঃপুরের ভাঙাগড়াই নয়, প্রতিপক্ষ যে পুরুষ তার মনের ভাঙাগড়াও চলতে থাকে। রাসুর দ্বিতীয় বিয়ের বিষয়কে ঔপন্যাসিক বিস্তারিত করেছেন রামকালীন মানসিকতাকে বোঝানোর জন্য। বর্ণিত হয় 'সেজুতি বত্ত', প্রকাশ পায় রামকালীর ব্রত

সম্পর্কে অজ্ঞতা। রামকালীর মননে তৈরি হয় দ্বন্দ্ব। যে রামকালীর "সমগ্র 'মেয়ে মানুষ' জাতটার প্রতি নেই তেমন সম্ভ্রমবোধ, নেই সম্যক মূল্যবোধ", তার উদ্বেলিত মনটিই সামাজিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত। তার পিতৃতান্ত্রিক মন সতিনের পক্ষে প্রতিরোধী যুক্তি খোঁজে, কিন্তু 'চেষ্টা করে আনা যুক্তি ভেসে যাচ্ছে হৃদয় তরঙ্গের ওঠাপড়ায়। কিছুতেই উড়িয়ে দিতে পারছেন না একফোঁটা একটা মেয়ের কথাগুলোকে।' পুরুষের হৃদয়-তরঙ্গের এই উদ্বোধনই উনিশ শতকের বাংলার একটি বড় দিক যা নারীসত্তার বিকাশ-প্রতিষ্ঠায় বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। লেখক একচোখা হয়ে এটিকে অস্বীকার না-করে আরও দু-একটি বিষয়ের অবতারণা করেছেন।

আগেই বলেছি শুধু সত্যবতী নয় এই উপন্যাসে অন্য নারী চরিত্রের মধ্যেও অনুভূতির উদ্ভাসন লেখক রচনা করেছেন, প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নারীসত্তা। লোকসমক্ষে নীরবতাই সারদার প্রতিবাদ। তবে সে অস্ফুট নয়, ছুরির মতো তীক্ষ্ণ বাক্যে পুরুষের জগৎকে খানখান করে দেয়। 'মেয়েমানুষের অবস্থার সঙ্গে একবার নিজের অবস্থা মিলিয়ে দেখনা! পরিবার যদি একবার পরপুরুষের দিকে তাকায়, তা হলে তো মহাপুরুষদের মাথায় খুন চাপে।' এই পর্যবেক্ষণের পর আসে যুক্তি, সিদ্ধান্ত। 'তা দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ যত ইচ্ছে পক্ষ জুটলে আর পরস্ত্রীতে দরকার? মেয়েমানুষের তো আর সে সুবিধা নেই।' এ উচ্চারণ কোনো ঐহিক সুখের দাবির কারণে নয়। একটা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, পুরুষ নয় পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। অশ্লীল বাক্য নয়, পটলিব চোখের জল সারদার মনকে দ্রবীভূত করে। পটলি বা সারদা পরস্পর সতিন হয়েও পারস্পবিক সংঘাতে যায় না, এ এক আশ্চর্য দিক। লড়াই নয় আবার 'সংসার সুদ্ধ সকলের দযার পাত্র' হয়েও থাকতে চায় না পটলি, সতিনের সঙ্গে স্বামী-ধরার ইঁদুর দৌড়ে নামতে চায় না সে। অপর দিকে সারদার মধ্যেও অভূতপূর্ব রূপ, বিষয়-সম্পত্তির মোহ ত্যাগ করে সে হতে চায় তীর্থযাত্রী—সংসারত্যাগী। (উপন্যাসে বেশ কয়েকটি চরিত্র সংসার ত্যাগ করেছে, কী তাদের লক্ষ্য সবসময় তা স্পষ্ট নয়। সবার উদ্দেশ্যও এক নয়। রামকালী, নেড়ু, সত্যবতী, শংকরী প্রমুখ চরিত্রের সংসার-বন্ধন মোচন কি ছোটবৃত্ত থেকে আরও বড়বৃত্তে পদার্পণ?) সারদার এই আচরণ রামকালীকে ভাবায়। শুধু সারদার জন্য নয়—'রান্না-ভাঁড়ার ঘরের জীবগুলো সম্পর্কে এত বেশি করে কখনও ভাবেনি রামকালী।'

রামকালীর এই ভাবনা সত্যবতীর প্রশ্নের মধ্য দিয়ে তার আত্মদ্বন্দ্ব জাগিয়ে তোলে। কিন্তু সত্যবতীর ভাবনা বা তার জিজ্ঞাসা কোনো ব্যক্তির আত্মদ্বন্দ্ব নয়। যে-কোনো সমাজ-আন্দোলনের পুরোধা পুরুষদের সমাজের সঙ্গেই দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হতে হয়। এই উপন্যাসে সত্যবতী ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠার তাগিদে সংগ্রামী নয়। সত্যবতীর কামনায় ছিল সমগ্র নারীকুলের সত্তার উন্মোচন। তার লড়াই তাই সমাজের সঙ্গে, এখানে ব্যক্তির আত্মদ্বন্দ্ব বা ব্যক্তির সঙ্গে পরিবারের দ্বন্দ্ব প্রকট নয়। নতুন ব্যবস্থা বা পুরোনো মূল্যবোধের ভাঙন সর্বপ্রথম সমাজেই শুরু হয়, সমাজ তা আত্মস্থ করলেই পরিবারে সেই ঢেউ এসে লাগে। পরিবারের পর ব্যক্তির আত্ম-জিজ্ঞাসার মধ্য দিয়ে তার মূলে কুঠারাঘাত করে। সত্যবতী নারী-সত্তার সামাজিক প্রতিষ্ঠা চেয়েছিল বলেই সে একক নয়, সে অপরের সঙ্গী, তার বা

তাদের বিদ্রোহ সমাজব্যবস্থার প্রতি। সত্যবতীদের কাল উত্তরণের পর সুবর্ণলতার কালপর্বে তা পরিবারে আছড়ে পড়ে। সুবর্ণলতার কালে নারীর অবস্থান যে-উচ্চতায় ছিল তার পরিবারে সেই আলোকবার্তা তখনও পৌঁছায়নি। সুবর্ণকে অনবরত তার পরিবারের সঙ্গেই সংগ্রামশীল থাকতে হয়েছে। তারও পরের কালের বকুলের মধ্যে আত্মদ্বন্দ্বই প্রধান। নারীর সত্তার যে-প্রতিষ্ঠা সমাজে, পরিবারে হয়েছে, ব্যক্তি বকুলের মধ্যে তা কোনরূপে বিকশিত হবে সেই দ্বন্দ্বই সেখানে প্রকট হয়েছে। (এ ক্ষেত্রে অন্য উদাহরণে বলা যায় যে বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলন সামাজিকরূপেই প্রথমে বিগ্রহ পায়। এরপর বঙ্কিমের কলমে তা পরিবারে প্রবিষ্ট হবে কি না সেই দ্বন্দ্ব দেখা গেল। আরও পরে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'মহাশ্বেতা' গল্পের মধ্যে আমরা দেখি ব্যক্তির আত্মদ্বন্দ্ব।)

উনিশ শতকে নারী-শিক্ষা এবং ইংরেজি শিক্ষা সামাজিকভাবে প্রবল আলোড়ন তোলে। নারীশিক্ষা নিয়ে সামাজিক কুসংস্কার কীভাবে প্রতিরোধ তৈরি করে তার পাশাপাশি শিক্ষা নিয়ে নারীর অবদমিত বাসনাটিকে আশাপূর্ণা তুলে ধরেছেন। বিষয়টি ব্যক্তির মধ্যে আবদ্ধ না-রেখে সামাজিক সংঘাত সমন্বয়কেই দেখিয়েছেন। ফলে প্রথম পর্বের নারীশিক্ষার বিবর্তনের একটি রেখাঙ্কন ধরা পড়েছে। লেখাপড়া নিয়ে সত্যর আগ্রহ হঠাৎ উদ্ভূত নয়। নারীসমাজে সেই চাহিদা অনুভূত হচ্ছিল নিশ্চয়, কিন্তু এতদিনের কুসংস্কারের অচলায়তনটি নারীমানসে এমনভাবে আঁকড়ে ছিল যে সেখানেও তৈরি হয় দ্বন্দ্ব। সত্যবতীর যুক্তিশীল মন আর 'কলকেতা নামক অদৃষ্ট' দেশ-থেকে-আসা কিছু খবর গ্রামজীবনেও তর্ক তোলে। লেখাপড়ার জন্য তালপাতায় হাত দিলে যে মেয়েমানুষ কানা হয় নেড়ু এটা বিশ্বাস করে। কিন্তু নারীকুলও তো এ বিশ্বাস সহজে ভাঙতে পারেনি। ভুবনেশ্বরী কন্যার লেখাপড়ায় গর্বিত হবার চাইতে আশঙ্কিত হয় বেশি। একদিকে বাৎসল্য আর একদিকে সমাজ, এমনকী পরিবারেও সে-সত্যর লেখাপড়া নিয়ে ভয়ে কাঁটা। অথচ সত্যর লেখাপড়ায় বাদ সাধতে মন চায় না তার। মানসিক দ্বন্দ্বেই ভুবনেশ্বরী 'ব্যাকুল হয় কৌতূহলে, ব্যাকুল হয় আশঙ্কায়'। কিন্তু অন্যত্র বিষয়টি এমন দোলাচলের হয়ে থাকেনি। সত্যর মামাবাড়িতে স্পষ্টত দুটি মেরু। একদিকে ছোটমামি সুকুমারীর লেখাপড়া জানা এবং এর সঙ্গে আশাপূর্ণা যুক্ত করে দিয়েছেন সুকুমারীর শিল্পরুচিকে। অপরদিকে বড়বউ নিভাননী বিগতকালের প্রতিনিধি স্বরূপ। সমাজ-আন্দোলনের রক্ষণশীল আর সংস্কারবাদী দুই প্রতিনিধির সহাবস্থানের মধ্য দিয়ে লেখক সমাজ-আন্দোলনটিকে অন্যমাত্রা দেন। 'জন্ম জন্ম যেন অন্ধই থাকি বাবা...' নিভাননী বিষমুখে বলে, 'যে জাতের দশহাত কাপড়ে কাছা নেই, তাদের আবার এত চোখকান ফোটার দরকার কি?' ...নিভাননী পুরুষতান্ত্রিকতার নারী প্রতিনিধি।

সত্যবতীকে একটি বৃহৎ সন্ধিপর্বের অগ্রণী পুরুষ রূপেই লেখক উপস্থাপিত করেছেন। ফলে তার বিদ্যাচর্চা ত্রিপদীতে দেবীবন্দনা রচনায় শেষ হতে পারে না। বিশেষত নারীশিক্ষার পাশাপাশি নতুন শিক্ষাব্যবস্থায় ইংরেজি শিক্ষাও চালু হয়েছে। রাসসুন্দরী দেবীদের লুকিয়ে পড়তে হত, কিন্তু অনতিকালের মধ্যে কৃষ্ণভাবিনী দাসের মতো ব্যক্তিত্বও তো সমাজে এসেছেন। আশাপূর্ণা শিক্ষাপ্রসারের বিষয়টিকে গ্রাম থেকে শহরে এনেছেন। নারীশিক্ষা গ্রামাঞ্চলে তখনও চালু হয়নি, কিন্তু কোথাও কোথাও ভবতোষ মাস্টারের মতো চরিত্রের

কারণে গ্রামেও পুরুষের ইংরেজি-শিক্ষা শুরু হয়ে গিয়েছিল। বারুইপুর পর্বে শ্বশুরবাড়িতে সত্যবতীর সে-যাত্রায় অংশ গ্রহণ সম্ভব ছিল না। কিন্তু কলকাতায় তা সম্ভব। তবে গ্রামীণ মানসেও চেতনা আসছিল, শিক্ষাগ্রহণের পটভূমি তৈরি হচ্ছিল। যে-মোক্ষদা নিয়মের প্রবলতন্ত্রে অপর বিধবাদেরও সম্ভ্রমের কারণ সেই মোক্ষদাও স্বীকার করে—'চিরটাকাল তোকে মুখ করেছি, ভেবেছি হাঁড়ির হাল হবে তোর। এখন দেখছি তুই টেক্কা মারলি! তুইই দেখালি! বেশ করেছিস এ মতলব করেছিস। এখন সবাই বলছে ইংরিজি বিদ্যের জয়জয়াকার। ছেলেদুটোকে যদি কলকেতায় ইংরেজি ইস্কুলে দিতে পারিস—'। শিবজায়া-মোক্ষদার বির্তকের বিষয় হয়ে ওঠে ভাষা। বাংলা-সংস্কৃত থেকে ফার্সি আর ফার্সি থেকে ইংরেজি শিক্ষা বাংলার অন্তঃপুরকেও আলোড়িত করে। ইংরেজির মতো ফার্সিও যে 'মেলেচ্ছ ভাষা' নারীসমাজে এই জ্ঞান ভাঙা-গড়ার ইঙ্গিত নিয়ে আসে।

সত্যবতী শুধু স্বশিক্ষিত হয়নি, সে চেয়েছে নারীশিক্ষার বিস্তার, ফলে সুহাসকে গড়ে তুলতে চেয়েছে, নারীশিক্ষার বিস্তারে নিজে স্কুলে পাঠদানের কাজ করেছে। বাইরের এই আলোকটিকে গৃহেও স্থান দিতে চেয়েছে। ফলে ছেলের বিয়ের সময়েও পাত্রীর শিক্ষা বিবেচ্য হয়ে উঠেছে। বিষয়টি নবকুমারকেও উত্তেজিত করে। সত্যর স্পষ্ট কথা—'ক-অক্ষর যে না চিনল সে অন্ধেরই সামিল! চোখ থাকতে অন্ধ!' সত্যর এ ব্যাখ্যা হাসিতামাশার পর্যায়ে পৌঁছলেও সদুই একমাত্র উপলব্ধি করে কথাটার গুরুত্ব—'এই তোর সদুদিরই যদি একখানা পত্তর লেখার জ্ঞান থাকত, তা হলে হয়তো সারাজীবনটা তার বরবাদ হতনা।'

সত্যবতী আত্মসর্বস্ব ছিল না। তার চাওয়া-পাওয়া ব্যক্তি বা পরিবার-কেন্দ্রিকতায় আবদ্ধ থাকেনি। সামাজিকভাবেই সে সংগ্রামশীল। নবকুমারের চিকিৎসায় সাহেব ডাক্তারের আবাহন যতটা নবকুমারের মঙ্গল কামনায়, ঠিক ততটাই বা তার চেয়ে বেশি বিষযটি গ্রহণযোগ্য বলেই। এক্ষেত্রে তার যুক্তিবাদী মন আর সহানুভূতিই কাজ করেছে। সামাজিক কাজে মানুষ একা থাকে না, সত্যবতীর প্রতিটি কর্মকাণ্ডে সহায়ক জুটেছে, আবার বাধাও এসেছে। সাহেব ডাক্তারের আগমনে নবকুমারের মনেও চিন্তার পরিবর্তন দেখি। সুহাসের জন্য সত্যবতীর সহানুভূতি যেমন ছিল, সেইসঙ্গে সামাজিকভাবেও বিষয়টিকে সে দেখতে চেয়েছে। এক্ষেত্রে ব্যক্তি সুহাস মুখ্য হয়ে ওঠেনি, তার মনের মধ্যে অনবরত প্রশ্ন এসেছে জীবন সম্পর্কে। রামকালী সুহাস সম্পর্কে যে-মত দেয় তা এতদিনকার লালিত সংস্কার থেকে উঠে আসা—'মানুষের জীবন শুধু ভোগেই সার্থক নয় সত্য, ত্যাগেও সার্থকতা আছে। ও তো জানে ও বিধবা, বালবিধবার যেমনভাবে জীবন কাটে।'

'কীভাবে আর তাদের কাটে বাবা?' 'চিরদুঃখেই কাটে। পিসঠাকুমার মতন আর কজন হয়? তাও তিনিও মনের দাহয় শুচিবাই করে বিশ্বসুদ্ধ লোককে অতিষ্ট করছেন—'।

সত্যর এই উপলব্ধি সমাজকেন্দ্রিক, শ্রেণিকেন্দ্রিক। সামাজিক স্বীকৃতি না-পেলে কোনো আন্দোলনই সফল হয় না। সমাজে ঢেউ উঠলে পরিবারে তা পৌঁছবেই। একজন সুহাসের ত্যাগ বা বৈধব্য সেখানে বড় নয়। বহু সুহাসের নারীসত্তার বিকাশ এবং প্রতিষ্ঠাই সত্যর লক্ষ্য হয়ে ওঠে। এ কারণেই ব্রাহ্ম হয়েও ভবতোষ মাস্টার ত্যাজ্য নয়। শাক্ত কি বৈষ্ণব

এমন ছোট গোষ্ঠীর চাইতেও বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীই বড় হয়ে ওঠে।

আগেই বলেছি এই উপন্যাস ব্যক্তি, পরিবার, সমাজের বৃত্ত ভেঙে রাষ্ট্রীয় বৃত্তে পৌঁছেছে। কেননা নারীশ্রেণির বিকাশ-প্রতিষ্ঠায় কিংবা পুরুষতান্ত্রিকতার অবরোধ ভাঙতে বা অবদমন রুখতে রাষ্ট্রযন্ত্রেরও প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

ভাবিনীর বোনের হত্যা নবকুমারকেও উত্তেজিত করে, কিন্তু তা ওই মাত্রই। কিন্তু সত্য ভাবিনীর মৃত্যুকে 'অদৃষ্ট' মানতে রাজি নয়। 'সবই অদৃষ্ট বৈকি! এই হতচ্ছাড়া দেশে মেয়েমানুষ হয়ে জন্মানই এক দূরদৃষ্টি! চোখের ওপর একখানা করে পুরু পর্দা ঝুলিয়ে বসে থাকবো আর অদৃষ্টকে দোষ দেবো!' প্রতিবাদ জানাতে সত্য তাই রাষ্ট্রযন্ত্রকেও সহায় মানে। নারী-মৃত্যুর শোকের পরিমাণ যে-দেশে শকুনের মৃত্যু-তুল্য সেখানে শুধু পুরুষের সহায়তা বা সহানুভূতিই একমাত্র কাম্য হতে পারে না। সাহেব পুলিশকে সত্য যে-ভাষায় কথা বলেছে তা হয়তো ঘোষণার ভঙ্গি, কিন্তু সমগ্র উপন্যাস জুড়ে সত্যর এই উক্তির পটভূমি তৈরি কবেছেন লেখক। 'বলো তবে কী জন্য আদালত খুলে বসে আছো তোমরা? সতীদাহ করে মেয়েমানুষগুলোকে পুড়িয়ে মারতো আমাদের দেশে, তোমরাই সে পাপ থেকে উদ্ধার করেছো আমাদের। তবু এখনো অনেক কিছুই হয়নি। এখনো অনেক অনেক পাপ জমানো আছে। চারযুগ ধরে জমেছে সেই পাপের বোঝা। এই পাপ দূর করতে পারো, তবেই বলি শাসন কর্তা সেজে বসে থাকা শোভা পাচ্ছে। নচেৎ পরের দেশে রাজগিরি কিসের? জাহাজ বোঝাই হয়ে ফিরে যাওনা?' প্রান্তিকায়িত নারীব আত্মপ্রতিষ্ঠার এ হল ভূমি-সন্ধান। পৌগন্ড পর্ব থেকে প্রাক্‌প্রবীণ পর্ব পর্যন্ত সত্যবতীর যে-কার্যাবলি তা নাবীর পরিসর সন্ধানেই ব্যাপ্ত হয়েছে, পুরুষ-নারীর জন্য কোনো কালেই এতটুকু জমি ছাড়েনি। বরং নারীকেই তৈরি করেছে পুরুষ চিন্তার প্রতিভূ হিসাবে। দেহগত চেতনা ছাড়া নারীর পৃথিবীর কোনো বিষয় তো দূরস্থান নিজেকে নিয়েও যে চিন্তার অধিকার নেই! নিজের শরীরটির প্রতিও নেই তার অধিকার, বা তার রক্ষার। ভাবিনীর বোনের মৃত্যুর প্রতিক্রিয়ায় নারীকণ্ঠ তাই বোধশূন্যতায় বলতে পারে—'যেমন ন্যাকা করে তৈরি করা, হবেনা শাস্তি? বিয়ে হয়েছে বরের ঘরে যাবনা। আহ্লাদ' দোজপক্ষের বর, শুধু তোকে পুতুল খেলনা কিনে দিতে বে' করেছে!' সত্যবতী চেয়েছিল নবকুমার শপথ করে বলুক সুবর্ণর বিয়ে ষোলো বছরের আগে দেবে না। নিজ সন্তানের ক্ষেত্রেই নবকুমার শপথ গ্রহণে সাহস পায়নি। কিন্তু সত্যবতী তো শুধু ব্যক্তিনারীর সুখের চিন্তা করেনি। সে তো চেয়েছে নারী-সত্তার জাগরণ, শৈশবেই বিয়ের যূপকাষ্ঠে তাকে বলি দিতে চায়নি। নবকুমারকে সে স্মরণ করায়—'সুবর্ণকে মেরে ফেলো না। ওকে বাঁচাতে হবে হাজার হাজার সুবর্ণকে বাঁচাতে হবে।' নবকুমারের কাছে সত্যর এই উচ্চারণ বিকার 'ঘোর বিকার'। সত্য নিজের বিয়ের সম্পর্কে কিছু বুঝতে পারেনি। শৈশবের বিয়েতে তার ইচ্ছা-অনিচ্ছা মূল্যহীন হয়ে পড়ে কিন্তু আত্মজার বিয়েতেও তার মতামত নেই! সংসার বন্ধন মোচন কি ছোটবৃত্ত থেকে আরও বড়বৃত্তে পদার্পণ? সারদার এই 'আগে এলে বিয়েতে বাধা দিত' এ কারণে নিজ সন্তানের বিয়ের খবর পর্যন্ত জানার অধিকার নারীর নেই। সত্যর কাছে সুবর্ণর বিয়ে পুতুল খেলার তুল্য। কিন্তু অদৃষ্টকে মেনে নেওয়া সদুর কাছে তা হয়ে ওঠে 'নারায়ণ সাক্ষীর বিয়ে'। সত্যবতী তো শালগ্রাম শিলা নয়, 'শোয়াবসা তার

সকলি সমান'ও নয়। সে প্রবহমান, তার মুখ ভবিষ্যকালের দিকে, আরও বড় লক্ষ্যের দিকে সেখানে সে সমঝোতা করতে পারেনি, নারীসত্তার অধিকার অর্জনে তাই সে প্রশ্নমুখর। এ শুধু সুবর্ণর বিয়ে নয় তার নিজের বিয়েও পর্যন্ত। 'সব বিয়েতেই নারায়ণ এসে দাঁড়ান কিনা, সব গাঁটছড়াই জন্ম-জন্মান্তরের বাঁধন কিনা, 'এই প্রশ্ন নিয়ে বাবার কাছে যাচ্ছি ঠাকুরঝি!'

ব্যক্তিত্বের উজ্জ্বলতায় 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' শেষ পর্যন্ত 'সত্যবতীর গল্প' হয়ে উঠলেও তা কখনোই সত্যবতীর আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামের কাহিনি হয়ে ওঠেনি। নারী-শ্রেণির সম্মান প্রতিষ্ঠাই তার লক্ষ্য। এ কারণেই সত্যবতী শব্দটি বহুবচনের দ্যোতক। বহুল মানুষের বহু মৌন কণ্ঠের মুখরতায় সে শেষ পর্যন্ত একক থাকেনি, থাকতে চায়নি। তার দাবি শ্রেণি-চরিত্র হিসাবে, তার অভিশাপ গ্রহণও গোষ্ঠীগতভাবেই; নবকুমারের অভিশাপকে হাসিমুখেই গ্রহণ করে বলে—'তাইতো দিয়ে আসছো তোমরা আবহমান কাল থেকে, স্বামী হয়ে বাপ হয়ে, ভাই হয়ে, ছেলে হয়ে। ওটা নতুন নয়। অভিশাপেরই জীবন আমাদের।' সর্বনাম প্রয়োগের মধ্যেও সেই শ্রেণিচেতনার প্রকাশ, আর এই সর্বনামও বহুবচন। সমাজ তো বহুমানুষের কণ্ঠস্বরে মুখরিত। এতদিন একটি শ্রেণি সেখানে মৌনী ছিল মাত্র। আজ তারা আপন ভূমি-সন্ধানী, আপন উচ্চারণে উদগ্রীব।

প্রথম প্রতিশ্রুতি : সময়ান্তরের ব্যঞ্জনায়

অনন্যা বড়ুয়া

'প্রথম প্রতিশ্রুতি' উপন্যাসটিকে ঘিরে পাঠকদের কৌতূহল ছিল তাই উপন্যাসটি নিয়ে বিস্তর আলোচনা চলেছে। কথনের বিশিষ্ট ভূমিকা উপন্যাসটিকে জনপ্রিয় করেছে। ফলে কৌতূহলের মাত্রাভেদ ঘটেছে সময় থেকে সময়ান্তরের ব্যঞ্জনায়। আশাপূর্ণা হয়তো বা সাধারণ পারিবারিক জীবনকে ছুঁতে চেয়েছেন কিন্তু লেখনীর গুণে তা আর সাধারণ থাকেনি। ফলে অনিবার্যভাবেই উপন্যাসটিকে নিয়ে তৈরি হয়েছে একাধিক পাঠ। সমালোচকদের চোখে ধরা পড়েছে আলোচনার নতুন নতুন দিগন্ত। নিতান্ত সাধারণ, ঘরোয়া জীবনে অভ্যস্ত আশাপূর্ণা তাঁর সময় ও সমাজকে যেভাবে দেখেছেন প্রায় অনুরূপভাবেই উপন্যাসে চিত্রিত করেছেন। ফর্ম নিয়ে ভাবেননি বলেই হয়তো গল্পের প্যাটার্ন, ভাষা নিয়ে পাঠকের মনে চিন্তাজাল ছড়ায় না। অন্তঃপুরের লেখিকাদের মতো করেই নিজস্ব বয়নরীতিতেই ছড়িয়ে চলেন আপন বক্তব্যকে। ফলে পাঠকমনে ঝড় তোলে হাজারো প্রশ্ন। আধুনিক পাঠক উত্তর খোঁজে তাই সময় থেকে সময়ের দূরত্বে। উপন্যাসটির অন্তরালে সময়ের এই নিবিড় চলাচলতার প্রসঙ্গটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। Culler তাঁর গ্রন্থের 'Narrative Contracts' অধ্যায়ে বলেছিলেন, "If the basic convention governing the novel is the expectation that readers will, through their contact with the text, be able to recognize a world which it produce or to which it refers, it ought to be possible to identify at least some, elements of the text..." 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' পাঠ করে পাঠকের এরকমই এক অনুভূতি হয় এ তো আসলে তোমার-আমারই গল্প। এ হয়তো বা সময়েরই প্রভাব। সময়কে বাঁধতে পারার নৈপুণ্য উপন্যাসের পাতায় পাতায় ছড়ানো বলেই হযতো সমালোচনার ধারাস্রোতে এ উপন্যাস এত বিক্ষত। আধুনিক তাত্ত্বিকেরা সম্প্রতি উপন্যাসটিকে ঘিরে প্রশ্ন তুলেছেন একে Women's Literature বলব না Feminist Literature বলব? দ্বিধা আছে, থাকবে। কারণ এ দ্বিধা নির্মাণ করেন আশাপূর্ণা নিজেই। সময়ের দূরত্বে দাঁড়িয়ে-থাকা আমরা যারা ঐ সময়ের নয়, তারাও কোনো না কোনোভাবে যুক্ত হয়ে যাই ঐ একই বিন্দুতে। তাত্ত্বিকেরা বলেন, Detachment-এর কথা। বিযুক্তি না-থাকলে নাকি লেখনীর যথাযোগ্যতা বজায় থাকে না। অথচ বিস্ময়করভাবে উপন্যাসটির মধ্যে আছে Attachment অর্থাৎ সংযুক্তি। লেখিকা জীবনেরই বিভিন্ন সময়ের অনুভবকে মেলে ধরেছেন যেমন, তেমনিভাবেই কথনের ঘরোয়া, অন্তরঙ্গ ভঙ্গিটিই পাঠকমনে রচনা করে চলে অন্য একটি সংযোগ। ফলে কোনোভাবেই Detachment -এর তত্ত্বটি সত্য হয়ে ওঠে না। Reader Response Theory-র সূক্ষ্ম আলোটি ফেললেও মনে হয় এ কোনো একটি মেয়ের গল্প নয়, বাংলার এক বিশেষ সময়, সমাজ-পরিস্থিতিই যেন নিজেকে মেলে ধরার জন্য ব্যাকুল। নারীবাদী পাঠের অভ্যস্ত ছক থেকে বের করে এনে উপন্যাসে সময়কে ব্যবহার করায় লেখক- মানসিকতাকে যদি খুঁজি তা হলে সে পাঠটি কেমন হতে পারে, আলোচ্য প্রবন্ধটি যেন তারই এক অনুশীলন।

'প্রথম প্রতিশ্রুতি' (১৯৬৪), খুব দূরবর্তী সময়ের রচনা নয়, তবে উপন্যাসটিতে যে সময় ও সমাজের বর্ণনা রয়েছে তা অনেকদিন হল বিগত। কিন্তু এ সময় যে ছিল তার সত্যতা নিয়ে পাঠকমনে কোনো প্রশ্ন নেই। কিন্তু প্রশ্ন অন্যখানে। আশাপূর্ণা সময়কে ছুঁয়েছেন কি সত্যবতীর জীবনব্যাখ্যায়? সুবর্ণ, বকুলের জীবনে কি সময়ের ছাপ নেই? সময় তো এক দুর্লঙ্ঘ্য নিয়তির মতো কাজ করে চলেছে চরিত্রের গভীরে। ফলে তিনটি text-কে যদি একইভাবে মূল্য দিয়ে জোড়া যায় তা হলে মনে হয় শিরোনামটির তাৎপর্য আরও গভীর হয়। 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'-র দ্বিতীয় অংশটি বের হয় 'সুবর্ণলতা' নামে ১৯৬৭ সালে; তৃতীয় অংশ 'বকুলকথা' ১৯৭৪-এ। উপন্যাসটির কথক বকুল তার দিদিমা সত্যবতীকে দেখেনি, দেখেছে মা সুবর্ণলতাকে। সুবর্ণলতার কনিষ্ঠা বকুল শৈশব থেকেই বাবা, ভাইদের কাছে উপেক্ষিত। যা কিছু প্রশ্রয় পেয়েছে তা মায়ের কাছেই। আর এই প্রশ্রয়ই তাকে দিয়েছে নিজের মাথা তুলে দাঁড়াবার স্পর্ধা। সবার রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে নিজের পরিচয়টিকে সফল করে তোলার সযত্ন প্রয়াস ছিল তার মনে। জনপ্রিয় লেখিকা হিসাবে আত্ম-প্রতিষ্ঠা পাবার পর পাঠকদের অনুরোধে নিজের কথা লিখবার বাসনা জেগে ওঠে। ঠিক এই চরম মুহূর্তে মনে হয় যাঁদের দীর্ঘ পথ-পরিক্রমা তাকে এই পূর্ণতা দিল তাদের কথা না-লিখলে তো তার কথা শুরু করা যায় না—ফলে কতগুলো কথা দিয়ে শুরু করতে হয় নিটোল আখ্যানটিকে। সত্যবতী-সুবর্ণের জীবন ঘুরে তা একসময়ে হয়ে ওঠে বকুলের জীবনের অঙ্গীকার বা Commitment। 'প্রথম প্রতিশ্রুতি', 'সুবর্ণলতা'-তে সেই অঙ্গীকারেরই প্রতিফলন ফিরে ফিরে দেখি। কাহিনির শুরুতেই থেকে যায় কতগুলো বাক্য যা কিনা বকুলের অঙ্গীকারেরই প্রতিধ্বনি করে চলে—"এ গল্প বকুলের খাতা থেকে নেওয়া। যে খাতায় বকুল বলছে, আমার গল্প যদি লিখতেই হয় তো সে আজ নয়। পরে। জীবনের দীর্ঘপথ পার হয়ে এসে বুঝতে শিখেছে বকুল, পিতামহী প্রপিতামহীর ঋণশোধ না-করে নিজের কথা বলতে নেই।" স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে কেন এই Commitment বকুলের। কেন কুরে কুরে খায় এ যন্ত্রণাবোধ? কারণ বকুল জানে,..."বাংলাদেশের অজস্র বকুল-পারুলদের পিছনে রয়েছে অনেক বছরের সংগ্রামের ইতিহাস। . শুধু তো পায়ে চলার পথ হলেই, কাজ শেষ হল না। রথ চলার পথ চাই যে।" সত্যবতী-সুবর্ণেরা সেই রথ চলার পথটাকেই প্রস্তুত করে চলে অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায়। উপন্যাসের প্রথম অংশে সত্যবতীকে যেভাবে পাই, উপন্যাসে অন্যান্য অংশে সত্যবতীর সেই ইমেজ সর্বাংশে অনুপস্থিত। "নাকে নোলক, কানে মার মাকড়ি, পায়ে ঝাঁকর মল, বৃন্দাবনী ছাপের আটহাতি শাড়িপরা আট বছরের সত্যবতী।" এই ছবিটার পাশাপাশি পাঠকমনে আবশ্যিকভাবে আসা উচিত যে প্রসঙ্গগুলো : কলকাতা শহর থেকে অনেকদূরের এক গ্রাম নিত্যেনন্দপুর। অসহায় বাবা-মার কন্যাসন্তান, গ্রামীণ সমাজ, গৌরীদান এর সবটাই। উপন্যাসটি ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত হলেও বিধৃত সময় উনিশ শতকের মধ্যভাগ। ব্রিটিশ উপনিবেশ যখন গ্রামীণ ব্যবস্থায় থাবা বসায়নি। নিত্যেনন্দপুরের মতো অখ্যাত গ্রামগুলো তখনও পর্যন্ত উনিশ শতকের সামাজিক ব্যাধিগুলোকে লালন করে চলেছে। ব্রাহ্মণ্যশাসিত সমাজ চলে যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে আছে। রামকালী চাটুয্যে সেই পরিবারেরই সন্তান।

একদিন নিষ্ঠাভরে পূজা দেবার পর দেবতাকে তেষ্টার জল দিতে ভুলে যাবার অপরাধে রামকালীর যে-শাস্তি হয় তাকে যুক্তি দিয়ে বিচার করতে যাওয়াটা ভুল হবে। কিন্তু একে যদি সমাজব্যবস্থার প্যাটার্ন বলে ধরে নিই, সময় তা তৈরি করেছিল বলে মনে করি.. । ইতিহাস তো তারই সাক্ষ্য দেয়। আচারনিষ্ঠ জয়কালীর কাছে বড় নয় তার সন্তান, সব কিছু ছাপিয়ে বড় হয়ে ওঠে ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতি। খড়ম মেরেই তিনি তৃপ্ত নন, বাড়ি থেকে বের করে দেন রামকালীকে। তার যুক্তি ছিল যদি জেনেই থাক দেবতা খেতে পারে না, তা হলে বৃথা কেন এই শাস্ত্রাচার। কিন্তু রক্ষণশীল জয়কালীর মনে অজানা আশঙ্কা জেগে ওঠে, "ফুল তুলসীর ভুল নয়, একেবারে তেষ্টার জল।' রামকালীকে বাড়ি ছাড়তে হয়, আশ্রয় নিতে হয় আয়ুর্বেদ শাস্ত্রজ্ঞ গোবিন্দ গুপ্তের বাড়িতে। এ সময়টি কিন্তু খুবই সংকটের। কারণ কৌলীন্যের দোহাই দিয়ে কুলগৌরব, বংশগৌরবের মিথ্যে অজুহাতে সমাজ-পরিস্থিতিকে কোনোমতেই আর ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না। ব্যক্তিগত কৃতিত্ব তখন নিজের পরিচয় তৈরি করার মানদণ্ড হিসাবে কাজ করে চলেছে। Self Identity খুঁজছে। মুর্শিদাবাদের পরিস্থিতি টলায়মান। দেশ ছেড়ে সবাই চলে যাচ্ছে। ঘোর সংকটের মাঝে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি। এহেন সংশয়ের মাঝে রামকালী আশ্রয় নিয়েছেন বদ্যিবাড়িতে। গোবিন্দ গুপ্ত সজ্জন ব্যক্তি হওয়ায় গ্রামে এক ব্রাহ্মণবাড়িতে রামকালীব আহারের ব্যবস্থা করে দেন। কিন্তু সকলের চোখে এ অনন্য কারণ "চাটুয্যে বামুনের ঘরের ছেলে হয়েও ব্রাহ্মণজনোচিত পেশা তাঁর নয়। অন্য শাস্ত্রপালা বেদ-বেদান্ত বাদ দিয়ে তিনি বেছে নিয়েছেন আয়ুর্বেদ।" নিত্যেনন্দপুরে এ ঘটনা সত্যিই আলোড়ন তুলল। পিতা জয়কালীর মনে হল, "ছেলে বদ্যিবাড়িব ভাত খাচ্ছে, বদ্যিবাড়ির আশ্রয় গ্রহণ করেছে, এ তো মৃত্যুসংবাদেরই সামিল।" রামকালী অল্পদিনেব মধ্যেই প্রভূত জ্ঞানলাভ করে বাড়ি ফেরা মনস্থ করেন কারণ 'গোবিন্দ গুপ্ত পরামর্শ দিয়েছেন, তোমার আব রাজবদ্যি হয়ে কাজ নেই বাপু। রাজ্যে এখন ভেতরে ভেতরে ঘুণ ধরতে বসেছে, নবাবের নবাবী শিকেয় উঠেছে।" রামকালীর হাতে ধনসম্পত্তি সঁপে দিয়ে গোবিন্দ গুপ্ত স্ত্রীসহ চলে যান। ততদিনে রামকালীর পসার হয়েছে। পিতা জয়কালীকে নিজের প্রতিপত্তি দেখাবার মানসে দেশে ফিরলে জানতে পারে পিতা মৃত। এ যেন লেখিকার সচেতন প্রয়োগ। জয়কালী কি পিতার কর্তব্য পালন করতে পারতেন, রামকালীকে টেনে নিতে পারতেন কাছে? আচারনিষ্ঠ জয়কালীর পক্ষে সেটা কতদূর সম্ভব হত সে প্রশ্ন তো সময়েব কাছে। তবু রামকালী ফিরলেন।

রামকালীর ফেরাটা অন্যসব ফেরার মতো নয়। লেখিকা অনবদ্য ভাষায় তা বর্ণনা করেছেন, "গঞ্জে মেলায় যেমন লোক দল বেঁধে পাঁচপেয়ে গরু দেখতে ছোটে, তেমনি করে দেশের সমস্ত লোক আসতে লাগল রামকালীকে দেখতে।" রামকালী সেই মানুষ যে নিত্যেনন্দপুরের নিস্তরঙ্গ পরিবেশে ঝড় তুলেছে। কিন্তু গ্রামীণ সমাজ কী সহজেই রামকালীকে জায়গা করে দিল, "কিছুদিন একটু জাতে ঠেলা জাতে ঠেলা হয়ে থাকতে হয়েছিল বৈকি রামকালীকে। বারবাড়িতে শুত, খেত, বাড়ির ছোট ছেলেপুলে দৈবাৎ কেউ রামকালীকে ছুঁয়ে ফেললে তাকে কাপড় ছাড়ানো হত।" বেশিদিন এ ব্যবস্থা চলতে পারে না কারণ রামকালীর অর্থের ঔজ্জ্বল্যে এ দূরত্ব টিকতে পারল না, "রামকালী পুনশ্চ সমাজে

প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল, অনুমতি পেলে বাড়ির মধ্যে খাবার শোবার।" রামকালী সকলকে যথাসাধ্য তুষ্ট করে বিবাহিত হলেন, তারই কন্যা সত্যবতী। নিত্যেনন্দপুরের সংকীর্ণ গণ্ডিটাকে পেরিয়ে রামকালী অন্য এক মানুষ হয়ে ফিরে এসে সময় ও সমাজকে করেছিলেন বিদ্রূপ। সম্পূর্ণভাবে মানসিকতা থেকে মুছে দিতে পেরেছিলেন কি সময়ের চিহ্ন? গৌরীদানের পুণ্যের লোভ সামলাতে না পেরে বিয়ে দিয়েছিলেন একমাত্র কন্যাকে মাত্র আট বছর বয়সে। অনেক সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছিলেন ঐ একরত্তি মেয়েটার মধ্যে। সরল যুক্তিতে খানখান করে দিত এতদিনকার প্রচলিত ধ্যানধারণাকে। সমবয়সি নেড়ু, পুণ্যিদের দল মুগ্ধ বিস্ময়ে সত্যবতীর কাছে হার মানত। বড় মানুষেরা আশ্চর্য হত, কিছু বলতে পারত না কারণ, "উপায়ী ছেলের মেয়ে সত্যবতী।" সবসময়ে নিজের কাজের সপক্ষে ছিল তার অকাট্য যুক্তি। ছেলেরা মাছ ধরতে পারবে মেয়েরা ধরলেই দোষ এ-কথা মেনে নিতে পারেনি ছোট সত্যবতী, "গামছা দিয়ে ধরলে দোষ হয় না, ছিপ দিয়ে ধরলেই দোষ। চুনোপুটি ধরলে দোষ হয় না, বড় মাছ ধরলেই দোষ। তোমাদের এসব শাস্তর কে লিখেছে গা?" ঠিক যেন চাবুকের মতন আঘাত করে সমাজের বুকে। মেয়ে-সমাজের চোখে সে ফেলনা নয়, শৈশব থেকে শিখিয়ে-তোলা এই বৈষম্যকে মেনে নিতে মন চায়নি। সক্রোধে প্রতিবাদ করে ওঠে, "মেয়েমানুষ! মেয়েমানুষ যেন মায়ের পেটে জন্মায় না, বানের জলে ভেসে আসে। অত যদি মেয়েমানুষ-মেয়েমানুষ করবি তো আমার সঙ্গে খেলতে আসিস নে।" সামাজিক বিধি-নিষেধগুলো বেঁধে ফেলেছিল সমাজকে সহস্র পাকে। মেয়েদের বিদ্যাগ্রহণ করলে পাপ হয়, বৈধব্য অনিবার্য এসব নিয়মে সমাজের বিশেষ অংশকে অন্ধকারে রাখা হয়েছিল। সমবয়সি নেড়ুর তালপাতে হাত দেবার অধিকার আছে আর তার নেই, সমাজের এই নিয়মকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে সত্যবতী, "কেন, মেয়েমানুষ তালপাতে হাত দিলে কী হয়? কলকেতায় তো কত মেয়েমানুষ লেখাপড়া করে?" কী আশ্চর্যভাবে গ্রামের একটি মেয়ে পরিচিত হয়ে উঠছে শহর কলকাতা সম্পর্কে! কলকাতা এক আজব শহর যেখানে ঘটে চলে নিত্য সব অবাক-করা ঘটনা। সত্যবতীর কাছে এ ঘটনা সত্য হলে নেড়ুর মনে হয় স্বপ্ন। সত্যবতীর কথায় ব্যঙ্গ করে বলে, "তোকে বলেছে করে। পড়লে চোখ কানা হয়ে যায় তা জানিস?" সত্য নেড়ুর কথা বিশ্বাস করতে চায় না, "কক্ষনো না, মিছে কথা। বড্ড তুই জানিস! যারা পড়ছে তারা সব অমনি কানা হয়ে যাচ্ছে।"

'কলকেতা' সম্পর্কে সত্যবতীর উচ্চাশা, অন্যদিকে নেড়ুর কাছে পরম বিশ্বাস। একান্ত অবসরে মায়ের কাছে সত্যবতী পণ করে কলকাতা সে যাবেই অথচ নেড়ু, "কলকেতা নামক অদৃষ্ট সেই দেশটায়, কদাচ কখনও সেখানের নাম কানে আসে, সেখানে সত্যিই কোনো মেয়েমানুষ লেখাপড়া করে কি না এবং করলে তাদের চক্ষুযুগলকে দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন রাখতে পারে কী না, এ সম্পর্কে নেড়ুর স্পষ্ট কিছু জানা নেই, তবু নিজের অভিমতকে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রাণপণ চেষ্টা করে সে, এখন না যাক—আসছে জন্মে যাবে।" কিন্তু সত্যবতী এ জন্মেই সব হিসেব মেলাতে চায়। লেখাপড়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত থেকে মানসিক বিকাশকে পঙ্গু করে রাখার বিরুদ্ধে ধিক্কার জানিয়ে বলে, "মেয়েমানুষরা যে রাতদিন ঝগড়া কোঁদল করছে, যাকে তাকে গালমন্দ শাপমন্যি করছে, তাতে পাপ হয় না, আর বিদ্যে শিখলে

পাপ হবে? বলি স্বয়ং মা সরস্বতী নিজে মেয়েমানুষ নয়? সকল শাস্তরের সার শাস্তর চার বেদ মা সরস্বতীর হাতে থাকে না।"

এরই মধ্যে আকস্মিকভাবে খবর আসে সত্যবতীর শ্বশুরবাড়ি থেকে। খুব দ্রুত অনেকটা সময় অতিক্রম করে যায় সত্যবতী। সব কষ্ট মুখ বুজে সয়ে যাত্রা করে শ্বশুরবাড়ির উদ্দেশ্যে। অনেক অভিমান, অভিযোগকে সঙ্গী করে শ্বশুরবাড়িতে মন বসাতে চেষ্টা করে। একসময় মন বসেও যায়। কিন্তু বারুইপুরের গ্রামীণ জীবনের সংকীর্ণতার সঙ্গে সত্যবতীর প্রতিবাদী মন দীর্ঘদিন তাল মিলিয়ে চলতে পারে না। সব কিছু ছেড়ে কলকাতায় যাবার পাগলামিটা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। ব্রিটিশ রাজশক্তি তখন কলকাতার বুকে দাপিয়ে শাসন করছে। ঔপনিবেশিক লক্ষণগুলো ছাপ ফেলছে শহরকেন্দ্রিক মানুষের জীবনাচরণে। ইংরেজি শিক্ষার চল হয়েছে, যুবকেরা ইংরেজি ভাষা সাহেবি ভাষা শিখবার জন্য কৌতূহলী হয়ে উঠেছে। বারুইপুরে সে-হাওয়াকে বয়ে এনেছেন ভবতোষ বিশ্বাস। গ্রামের দুই যুবক ভবতোষ বিশ্বাসের কাছে পাঠ নিতে অতি উৎসাহী—নিতাই ও অপরজন সত্যবতীর স্বামী নবকুমার। নবকুমারের বাবা-মা নীলাম্বর বাড়ুয্যে ও এলোকেশী দেবী পুত্রের এহেন আচরণে অত্যন্ত কষ্ট। নীলাম্বর বাড়ুয্যে এ কারণে ভবতোষ বিশ্বাসকেই দোষারোপ করেন, "আসল নষ্টের গোড়া তো ওই ভবতোষ বিশ্বাসটা। কলকেতা থেকে ইংরিজি শিখে এসে গাঁয়ে এখন ইস্কুল খোলা হয়েছে বাবুর। সকাল-বিকেল দুবেলা ইস্কুল বসায়। গাঁয়ের ছোঁড়াগুলোকে ক্ষ্যাপানোর গুরু। কানে মন্তর দিচ্ছে, ইংরিজি না শিখলে নাকি উন্নতি নেই, শিখে কলকাতায় গিয়ে হাজির হতে পারলে সাহেবের অফিসে মোটা মাইনের চাকরি অবধারিত। ছুটছে সবাই ওর ইস্কুলে। চালাকের রাজা ভবতোষ ফাস্ট বুক, সেকেন বুক, কতসব শক্ত বই কিনে এনেছে কলকাতা থেকে, তাই থেকে পড়িযে পড়িয়ে বিদ্যে দিগ্‌গজ করছে সবাইকে।" এর ফলে সমাজে ভাঙনকে যে আর ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না, নীলাম্বর বাড়ুয্যের জবানিতে তারই প্রতিধ্বনি : "বামুনের ঘরের ছেলেগুলো যাচ্ছে শুদ্দুরের কাছে বিদ্যে নিতে। কলি পূর্ণ হতে আর কতই বা বাকি।" নবকুমারের ইংরেজি জানাটাই যেন সত্যবতীর হাতে স্বর্গ। সত্যবতী নবকুমারকে সাহস যোগায় কলকাতায় যাবার। নবকুমার সত্যবতীর স্পর্ধায় বিস্মিত। ইংরেজি সে আয়ত্ত করতে চেয়েছিল স্বাভাবিক কৌতূহলে, এর পেছনে কলকাতায় যাবার কোনো উদ্দেশ্য তো ছিল না। বারুইপুরের পরিবেশ যখন ক্রমশ বিষাক্ত হয়ে উঠছিল সত্যবতীর কাছে, তখনই সে প্রস্তাব দেয় নবকুমারের কাছে কলকাতা যাওয়ার। এ জায়গায় সত্যবতী ও নবকুমারের কথোপকথনটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ—

"তোমার সঙ্গে সঙ্গে আমি তো উন্মাদ হইনি। মা-বাপ দেশ-ভিটে ছেড়ে যাব কিনা কলকাতায় বাসা করতে? কেন শুনি?

কেন তা শুনবে? দেখতে যাবে তোমাদের এই বারুইপুরের বাইরেও আরও জগৎ আছে।

দেখে আমার দরকার?

সত্য চরম ধিক্কারের স্বরে বলে, "দরকার? কী দরকার, তাও তোমাদের এই বারুইপুরের গর্তয় পড়ে থেকে বোঝার ক্ষ্যামতা হবে না।"

উপহাসের হাসি হেসে ওঠে নবকুমার, "আমি যাব কলকাতায় চাকরি করতে?"

"কেন নয়? তুমি যত ইংরেজি শিখেছ, এ তল্লাটে আর কেউ শিখেছে?"

নবকুমার : শুধু বিদ্যে থাকলেই তো হবে না—

সত্য : তা আর কী দরকার?

বিপদের মুখে ফস্ করে সত্যি কথাই বলে বসে নবু, "দরকার সাহসের।"

নবকুমার ক্রুদ্ধ প্রশ্ন করল, "পরের চাকরি করতে যাবই বা কেন? ঘরে আমার ভাতের অভাব? দেখেশুনে চালাতে পারলে পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে কাটিয়ে দিতে পারি তা জানো? কী জন্য করবো দাসত্ব?"

সত্য গম্ভীরভাবে উত্তর দিলে, "বসে খাবো এ বাসনা ঘোচাবার শিক্ষা পেতেই যাওয়া দরকার।"

দীর্ঘ কথোপকথন যার ছত্রে ছত্রে লুকিয়ে আছে দুর্বার আকাঙ্ক্ষার বীজ। নারীর প্রচলিত ছকের বাইরে বেরিয়ে আসার মূর্তি। গুণ্ঠনের আড়াল ভেঙে নিজের ছবি নিজেই রচনা করবার দায়িত্ব নিতে সে দ্বিধান্বিত নয়। ঔপনিবেশিকতার আঁচে সে-ও নিজেকে তপ্ত করতে চায়। সত্যবতীর আচরণে পরিবর্তনগুলো সহজেই ধরা পড়তে থাকে। নবকুমারের প্রবল অসুখের সমস্ত চিকিৎসা ব্যর্থ হওয়ায় একটুও ভেঙে পড়েনি সত্য। গ্রামীণ চিকিৎসা পদ্ধতিকে ধূলিসাৎ করে গলার হার বন্ধক দিয়ে নিতাইকে দিয়ে ডেকে এনেছে সাহেব ডাক্তারকে। ডাক্তারেব ওষুধে নবকুমার প্রাণ ফিরে পেয়ে স্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। অন্যদিকের পরিবর্তনটি অবিশ্বাস্য, সত্যবতী ভেবেছে, "ম্লেচ্ছকে দেবতা ভাবলে কী পাপ হয়?" মরিয়া হয়ে নবকুমারকে বুঝিয়েছে সময় দ্রুত বদলে যাচ্ছে, "গ্রামে পড়ে থেকে জমিজমার উপস্বত্বে জীবন কাটানোর ইচ্ছেটা এযুগে অচল হচ্ছে।" সত্যর জেদের কাছে হার মানতে হয় নবকুমারকে। ইংরেজি শিক্ষার গুণে সরকারি দপ্তরে যোগ্য চাকরি হয় যদিও সবটার পেছনে রয়েছে ভবতোষ বিশ্বাসের সক্রিয় উদ্যোগ। সত্যবতী যাবে বলেই মেসের পরিবর্তে খুঁজতে হল বাসা। লেখিকা খুব মজা করেই লিখছেন, "ভবতোষ তাদের জন্যে একটা বাসাও ঠিক করে রেখেছেন নাকি' নিজে তিনি মেসে থাকেন, কিন্তু নবকুমারের তো তা চলবে না। সে যখন ফ্যামিলি নিয়ে যাচ্ছে।" সময়ের দ্রুততার সঙ্গে সঙ্গে বদলে যাচ্ছে ধারণাও। যৌথ পরিবারগুলো হারিয়ে ফেলছে তার চরিত্র। স্বামী, সন্তান নিয়ে ছোট্ট বৃত্তে ধরা পড়ছে একসময়ের বৃহৎ পরিবারগুলো, সমাজের মানসিকতা দ্রুত বদলে যাচ্ছে। অনেকদিন আগে তাদের পরিবার থেকে হারিয়ে যাওয়া আশ্রিতা শঙ্করীকে খুঁজে পায় সত্যবতী দত্তগিন্নির নাতির অন্নপ্রাশনে গিয়ে। পানসাজুনি মেয়েটিকে ভীষণ চেনা বলে মনে হয়। মনে পড়ে যায় সেদিনের ঘটনা যেদিন রাসুর বৌভাতের নিমন্ত্রণে আসা হাজারো লোকের সামনে শঙ্করীকে চূড়ান্ত অপমান করে বাড়ির বড়রা। ফলস্বরূপ শঙ্করী ঘর ছাড়ে। অন্তর্ধানের পর জানা যায় শঙ্করীর কলঙ্কিত ইতিহাস। সে মেয়ের এধরনের শোচনীয় পরিণাম হবে এ যেন জানা কথা। শঙ্করী তার কলঙ্কিত জীবন থেকে অব্যাহতি পেতে মেয়ে সুহাসিনীর ভার তুলে দিতে চায় সত্যবতীর হাতে। ঔপনিবেশিক শাসন জনসমাজে কতগুলো স্বচ্ছ ধারণা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। মেয়েদের জন্য স্কুল তৈরি হয়েছে,

প্রতিস্পর্ধী অন্য এক ধর্মধারা সাড়া ফেলে দিয়েছে—ব্রাহ্মধর্ম। ভবতোষ মাস্টার ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেছেন। একদা যে ছাত্রদের তিনি শিক্ষার আলো দেখিয়েছিলেন আজ তারাই এ সিদ্ধান্তের জন্য তাকে বর্জন করেছে। সত্যবতী ভবতোষ মাস্টারকে এড়াতে পারেনি। হয়তো এসব ঘটনা তার মানসিক জগতে আলোড়ন ফেলেছিল বলেই সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছিল সুহাসিনীকে বেথুন স্কুলে ভর্তি করার।

পরিবর্তন আসছে, দেশীয় রীতি-নীতি বদলে যাচ্ছে। শহরবাসী মানুষ যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে এসব রীতিকে টিকিয়ে রাখার বিরোধিতা করছে। এরই সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা। গরুর গাড়ির বদলে রাস্তায় দেখা যাচ্ছে ট্রামগাড়ি। সত্যবতীর ছেলে সরল রাস্তায় গাড়ি দেখে প্রবল উৎসাহে মাকে জানায়—"বুঝলে মা, আজ রাস্তায় এক তাজ্জব গাড়ি বেরিয়েছে। গাড়িও অনাসৃষ্টি, নামও অনাসৃষ্টি—ট্রামগাড়ি। ঘোড়ায় টানছে। উঃ সেই ট্রামগাড়ি দেখবার জন্যই কী ভিড়টাই হয়েছে। রাস্তায় দুধারে কাতারে কাতারে লোক দাঁড়িয়ে পড়েছে।" প্রশ্ন জাগে ঔপনিবেশিক শাসন যে চিন্তার মুক্তি ঘটিয়েছে তাকে তো সত্যবতী স্বাগত জানিয়েছে তবু কেন জেগে ওঠে স্বাধীনতার স্পৃহা? পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী জেনে পরিবর্তনটাকে মেনে নিলেও পরাধীনতার গ্লানি সত্যবতীকে স্পর্শ করেছিল। তবে তা হিংস্রতার পথ ধরে নয়, অনুভবের পথ ধরে। নিতান্ত সরল, মামার সংসারে আশ্রিতা সদু সরল-সাধনকে জিজ্ঞাসা করে সত্যবতীর কথা। সরলের মুখে স্বাধীনতা সম্পর্কিত জবাব শুনে স্তম্ভিত সদু এসব কথার অর্থ উদ্ধার করতে পারে না, "মা আবার একলা একলা কী স্বাধীন হল? আমাদের দেশের কেউই তো স্বাধীন নয়, ভারতবর্ষটাই তো পরাধীন।

পরাধীন, পরাধীন। গোরা সাহেবেরা রাজা নয়? সদু সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে, "ওমা? শোন কথা ওদের রাজ্য ওরা রাজা হবে না?

বাঃ ওদের রাজ্য কী করে হবে? ওবা কী আমাদের এ দেশের লোক?

মা তো সাহেবদেব নিন্দে করেন না, শুধু বলেন, সব ছেলেরই মনে এই চিন্তা নিয়ে মানুষ হওয়া দরকার, পৃথিবীর মধ্যে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হবে। তা দেশটাই যাদের পরাধীন, তারা আর মাথা উঁচু করবে কী করে?" সদু কী করে বুঝবে সত্যবতীর গভীর উপলব্ধির কথা। নবকুমারের পরিবর্তনও লক্ষ করার মতো। নীলাম্বর বাড়ুয্যের অসুস্থতার কথা শুনে সাময়িক উদ্বেগ প্রকাশ করলেও নানান অজুহাত খুঁজতে থাকে। কারণ "নবকুমার পর্যন্ত এখন শহর-জীবনের সুবিধে-স্বাচ্ছন্দ্যে এমনই অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে দেশে যাবার নাম করে না।" ছেলেদের ও মেয়েকে নিয়ে অনেক আশা সত্যবতীর মনে। অনেক অপমান সহ্য করেও ছেলে-মেয়ের উন্নতির কথা ভেবে কলকাতা আঁকড়ে পড়ে থাকা—"দুই ছেলে সত্যবতীর দুই দিকপাল হবে. দেশ থেকে যত অনাচার কুসংস্কার আর কুপ্রথা দূর করবার চেষ্টায় লাগবে একজন, আর একজন দেশ স্বাধীন করবার কাজে আত্মনিবেদন করবে। তবে সকলের আগে বিদ্যার্জন।" যদিও ছেলেরা কেউই সত্যবতীর মনের তল খুঁজে পায়নি। মেয়ে সুবর্ণকে ঘিরে ছিল অনেক স্বপ্ন। এক মুহূর্তে সে স্বপ্ন ভেঙে পড়ে যখন আট বছরের সুবর্ণের রাঙা চেলি পরা মুখটা সে দেখে। শ্বশুরবাড়িতে পা রাখার দিন থেকেই কেন জানি না শাশুড়ির সঙ্গে বনিবনা হয়নি সত্যবতীর। দাদার বিয়ে উপলক্ষে নবকুমারের সঙ্গে সুবর্ণ ঠাকুমা এলোকেশী

দেবীর কাছে এলে সুবর্ণের বাড়ন্ত গড়ন দেখে তিনি বিশ্বাসই করতে পারেন না এ মেয়ে আট বছরের। ছেলের বিয়ে দেবার আগে মেয়ের বিয়ে দেওয়াটা অনেক জরুরি সে-বিষয়ে বিস্তর জ্ঞানদানের পর সইয়ের ছেলের সঙ্গে সুবর্ণর বিয়ে দিয়ে দেন। সত্যবতী জানতেও পারে না, শুধু তার বুকে অমঙ্গল আশঙ্কা হু হু করে জ্বলতে থাকে। নবকুমারের সংবাদে সদুদি, সরল-সাধনকে নিয়ে গরুর গাড়িতে বারুইপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। সুবর্ণকে নতুন বউয়ের বেশে দেখে সত্যবতী বিস্ময়-বিমূঢ় হয়ে ওঠে। ফিরিয়ে নেয় তার গরুর গাড়ি। দূরন্ত অভিমানে সকলের সব অনুরোধ অস্বীকার করে সংসার ত্যাগ করার দৃঢ় সংকল্পে অটুট থাকে। তাই বলে, "গরুর গাড়ির মেয়াদ ফুরিয়ে আসছে, আকাশের দিক থেকে তাই চোখ ফেরাতে ইচ্ছে করছে না। সমস্ত পশ্চিম আকাশটা জুড়ে লালের সোনা...। আকাশের ওপারে কী সত্যই আছে আর এক জগৎ?" আশাহত হয়ে ব্যর্থতাকে স্বীকার করেই আর একদিনের নতুন সূর্যকে দেখতে পায় সত্যবতী। গল্পটা শেষ হতে পারত চূড়ান্ত ব্যর্থতাবোধের মধ্যে। কিন্তু এ গল্প কোনো মেয়ের নিছক চাওয়া-পাওয়ার গল্প নয়। নিঁখুত সময় বিশ্লেষণেও এ গল্প থেমে থাকে না। আগামী দিন তাই দায়িত্ব তুলে নেয়, সুবর্ণের হাত ধরে গল্প এগোতে থাকে। ক্লান্ত, শ্রান্ত সত্যবতীর বিশ্বাস সুবর্ণ সে-গল্প এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হবে। সত্যবতী জানে সুবর্ণ এই গল্পকে নতুন মাত্রা দেবে।

সদু-র অনুরোধের জবাবে সত্যবতী শুধু জানায়, "সুবর্ণ যদি মানুষ হবার মালমশলা নিয়ে জন্মে থাকে ঠাকুরঝি, হবে মানুষ। নিজের জোরেই হবে।" সত্যবতীকে তো থামতেই হবে। তাই, "সহসা স্তব্ধতা নামে। গাড়ি ধীরে ধীরে হাটতলায় এসে থামে। গরুর গাড়ির পথ শেষ হয়।" এরপর শুধুই সুবর্ণের গল্প। এ গল্প তৈরি না-হলে সত্যবতীর পরিক্রমা শেষ হবে না। সত্যবতীকে জানতে হবে সুবর্ণ-বকুল এদের সবাইকে জড়িয়ে। আত্মজাদের মধ্যেই জীবিত থাকবে সত্যবতী। সুবর্ণ সে-কথা লিখে রেখে দিতে চায়, জগু ঠাকুরপোর প্রেসে ছাপানো হয়ে যা আসে তার ভাষা, মুদ্রণপ্রমাদ সব মিলিয়ে সুবর্ণ ছেলেদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের শিকার হয়ে ওঠে। রাগে-দুঃখে-অপমানে পাঁচশ বই ছাদে নিযে গিয়ে পুড়িয়ে দেয়। নিমেষে ছাই হয়ে যায় অনেক সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার ইতিহাস। বকুল অনেক খুঁজেও পায় না, জগু জ্যাঠামশায়ের প্রেসে গিয়েও মেলে না কোনো হদিশ। বকুল আবারও অঙ্গীকার পালনের জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠে, "মা, মাগো। তোমার পুড়ে যাওয়া, হারিয়ে যাওয়া লেখা, না লেখা সব আমি খুঁজে বার করবো, সব কথা আমি নতুন করে লিখবো। দিনের আলোর পৃথিবীরে জানিয়ে যাব অন্ধকারের বোবা যন্ত্রণার ইতিহাস। ...যদি সে পৃথিবী সেই ইতিহাস শুনতে না চায়, যদি অবজ্ঞাব চোখে তাকায়, বুঝবো আলোটা তার আলো নয়, মিথ্যে জৌলুসের ছলনা। ঋণশোধের শিক্ষা হয়নি তার এখনো! সামনের রাস্তা ধরে সোজা এগিয়ে যায় বকুল, পিছু পিছু আসা দেহরক্ষিণীটার কথা ভুলে গিয়ে!" সুবর্ণ মানেই যেন পরিবর্তিত সময়, সমাজ, পরিস্থিতি, পরিপার্শ্ব অনেক কিছুই। সমালোচকেরা বলেন সুবর্ণের কাহিনির মধ্যে একঘেয়েমি আছে। লড়াই করতে-করতে ক্ষয়-হয়ে-যাওয়া এক জীবনের গল্প। এ কারণেই গল্পের শুরুতেই লিখতে হয় ভূমিকা, যে-ভূমিকা হয়তো সাহায্য করবে পাঠককে গল্পটির সঠিক বিশ্লেষণ করতে—"আপাতদৃষ্টিতে 'সুবর্ণলতা' একটি জীবনকাহিনি, কিন্তু সেইটুকুই

এই গ্রন্থের শেষ কথা নয়। 'সুবর্ণলতা' একটি বিশেষ কালের আলেখ্য। যে কাল সদ্যবিগত, যে কাল হয়তো বা আজও সমাজের এখানে সেখানে তার ছায়া ফেলে রেখেছে। 'সুবর্ণলতা' সেই বন্ধন জর্জরিত কালের মুক্তিকামী আত্মার ব্যাকুল যন্ত্রণার প্রতীক। আর একটি কথা বলা আবশ্যক। আমার 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' গ্রন্থের সঙ্গে এর একটি যোগসূত্র আছে। সে যোগসূত্র কাহিনির প্রয়োজনে নয়, একটি ভাবকে পরবর্তী কালের ভাবধারার সঙ্গে যুক্ত করার প্রয়োজনে। সমাজবিজ্ঞানীরা লিখে রাখেন সমাজ-বিবর্তনেব ইতিহাস, আমি একটি কাহিনির মধ্যে সেই বিবর্তনের একটি রেখাঙ্কনের সামান্য চেষ্টা করেছি মাত্র।" সত্যর জীবনের থেকে সুবর্ণের জীবনে সংঘাত অনেক বেশি। একটানা লড়াই, প্রতারণা, স্বামীর কাছ থেকে বারবার উপেক্ষা, ছেলেমেয়েদের ঠাট্টা-বিদ্রূপে জর্জরিত সুবর্ণের জীবন। শাশুড়ির নিত্য লাঞ্ছনা, পরিবারের সকলের কাছে উপেক্ষা পেয়েই হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো এমন কিছু ঘটনা এসেছে যা সুবর্ণের মধ্যে নতুন করে শক্তি যুগিয়েছে। ননদ সুবলার কাছে বেড়াতে গিয়ে পরিচয় হয়েছে পাড়াতুতো দেওর অমূল্যর সঙ্গে। চারদিক নিষেধের বাণীতে মোড়া শ্বশুরবাড়িতে আধুনিকতার হাওয়া প্রবেশ করার পথ পায়নি। তারই মধ্যে সুবর্ণ দুপুরবেলায় সকলে ঘুমিয়ে পড়লে নিভৃতে পড়ার অভ্যাস বজায় রেখেছে, নিত্য ডায়েরি লিখেছে। বাড়ির বাচ্চাগুলোর পড়ার অভ্যাস তৈরি করেছে। দেশেব বোধ জাগিয়ে তোলার জন্য মুখস্থ করিয়েছে—

"বল বল বল সবে
শত বীণা বেণু রবে
ভারত আবার জগৎসভায়
শ্রেষ্ঠ আসন লবে।"

সকলের মাঝে দাঁড়িয়ে পরিবর্তনের আঁচটুকু গায়ে মাখার প্রবল বাসনায় দক্ষিণের বারান্দা ঘিরে ছিল আকাঙ্ক্ষা। কোথাও কোনো নতুন খবর পেলেই নিঃশেষে পান করে নিত সংবাদের উষ্ণতাটুকু। লেখিকা স্বতঃসিদ্ধ ভঙ্গিতেই জানান, "স্বদেশি হুজুগের সময় যখন কোনো বিদঘুটে খবর বেবোতো, তখনই সুবর্ণর মুখে আলো জ্বলতো। আলো জ্বলতো যখন নতুন কোনো বই হাতে পেত—আলো জ্বলতো যখন বাড়িব ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলোকে একত্রে বসিয়ে পাঠশালা পাঠশালা খেলা ফেঁদে তাবস্বরে তাদের দিয়ে পদ্য মুখস্ত করাতো—আলো জ্বলতো যদি কোনোখান থেকে বেড়িয়ে বা তীর্থ করে এসে গল্প জুড়তো।" স্বদেশি আন্দোলন ঘিরে তার নিজের মধ্যে গড়ে উঠেছিল পৃথক ধারণা। কংগ্রেসের ভূমিকা কী হবে এই নিয়ে যখন দলের নীতিনির্ধাবকদের মধ্যে তুমুল লড়াই চলছে, কংগ্রেস নরমপন্থী ও চরমপন্থী দুদলে ভাগ হয়ে যাচ্ছে, ঠিক তখনই সুবর্ণর মনে হয়, "এই তো ইদানীং আবার স্বরাজ স্বরাজ হুজুগ উঠেছে, তাতে তো কোনো আগ্রহ দেখা যায় না। বরং যেন অগ্রাহ্য। বলে, অহিংসা করে শত্রু তাড়ানো যাবে এ আমার বিশ্বাস হয় না...বলে দেশশুদ্ধ লোক বসে বসে চরকা কাটলে স্বরাজ আসবে? তা হলে আর পৃথিবীতে আদি-অন্ত কাল এত অস্ত্রশস্ত্র তৈরি হত না।" সমালোচকের মন্তব্য যেন বকুল খণ্ডন করছে। শুধু যে জীবনের বৃত্তে সুবর্ণ ঘুরপাক খায়নি, শত বঞ্চনার মাঝে নিজের অস্তিত্বটুকু নিজেই খুঁজে পেয়েছে।

রাজনৈতিক উন্মাদনা অনেক ভাবনার জন্ম দিচ্ছে। এক কাহিনি থেকে ক্রমান্বয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে অনেক কাহিনি। "শহরের মুহূর্তে মুহূর্তে পরিবর্তনশীল উত্তাল জীবনতরঙ্গের মধ্যেই সাহিত্যের তীব্র তপ্ত জীবনরস। শহরের অফুরন্ত বৈচিত্র্যের মধ্যেই সাহিত্যের অফুরন্ত উপাদান।" এভাবেই শুরু হয় বকুলের গল্প। বাবা-ভাইদের উপেক্ষা ছিলই কিন্তু পরিবর্তনের হাওয়া পারিবারিক গঠনকে অনেক শিথিল করে দিয়েছে। ভাইপো—ভাইঝিদের উদ্দাম জীবনযাত্রার পাশাপাশি বকুলের আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াই সব মিলেমিশে পথটা এখন অনেকটাই মসৃণ। তবু বকুলের সাহস হয় না ভালোবাসাকে পরিণতি দেবার। নিজের গল্প আর লেখা হয় না। পারুলের জীবনটাকে মনে হয় একটা বিরাট অপচয়। সময়ের থাবা পুরোনো যা কিছু তার বুকে আঘাত করে নতুন করে সব কিছু তৈরি করার আহ্বান জানাচ্ছে। মূল্যবোধ, বিবেক এসব যেন একটা জাতির ইতিহাস থেকে বিদায় নিয়েছে। "এইভাবেই এই অনন্তকালের পৃথিবীর অফুরন্ত জীবজগৎ মহাকালের খাজনা যুগিয়ে যাচ্ছে। তারা ভাবছে চেষ্টা করছে, তপস্যা করছে, লড়াই করছে, তারপর কোথায় বিলীন হয়ে যাচ্ছে। তাই এক যুগে যা নির্ভুল ছাঁচ—পরবর্তী যুগে তা ভুলে ভর্তি।" তবু বকুল পথ কেটে যায়, সবই যে বিফল হবে এটা মানতে চায় না। হাজারো বদলের মাঝে কিছু মেয়ে তো কোনো লক্ষ্যকে সামনে রেখে এগিয়ে যায়—ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে না-গিয়ে কোনো কোনো শম্পা টিকে থাকে আগামী দিনটাকে আলো দেখাবার জন্য। কোনো হতাশা নয়, ব্যর্থতা নয়, এ যেন পরীক্ষা, টিকে থাকার লড়াই। অনন্তকাল ধরে এই যেন চলে আসে—"বহু চিন্তাবিদের চিন্তার ফল, বহু কল্যাণকামীর কল্যাণ চেষ্টা, আর বহু তাপসের তপস্যার ফল যে সমাজব্যবস্থা, তাকে দেখে দেখে পরবর্তীকাল ব্যঙ্গ করে, বিদ্রূপ করে, অবজ্ঞা করে।

ভাবে কী বোকা ছিল ওরা! কী মুখ্যু!

তবু সমাজ চিরদিনই "জীবন" নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়ে যাবে। কারুর চাওয়ার ধার ধারবে না।"

তবু আশায় বুক বাঁধতে হয়। সর্বময় কর্তা যেন এসে তৈরি করে দেয় সে-সময় যে আশ্বাস দেয় "তা বলে কী কোথাও কিছু নেই।

আছে।

তবু কোথাও কিছু আছে।

তবু কোথাও কিছু থাকে।

থাকবে।"

লেখিকার একান্ত সাক্ষাৎকারে পাই তিনি নিজেও ছিলেন চরম আশাবাদী। খুব কাছ থেকে পরিবর্তনগুলো দেখার কারণে ভাবনাগুলো এত নিরেট হয়ে উঠেছে। ফাঁকগুলোকে কল্পনাপ্রবণতা দিয়ে ভরাট করেননি। টালমাটাল পবিস্থিতির মধ্যেও নিজের আবেগকে সংযত রেখেছেন। কোনো চরিত্রের প্রতি ছিল না অকারণ পক্ষপাত। প্রায় স্বগতোক্তির মতো বলে ওঠেন, "কখনো কখনো মনে হয় পৃথিবীর কাছে বুঝি আর আশা করবার কিছু নেই, সে ফুরিয়ে গেছে, আবার কখনো অফুরন্ত প্রাণময়ী সুন্দরী পৃথিবী তার মমতার সঞ্চয় নিয়ে এসে ধরা দেয়, ফিরে আসে বিশ্বাস, ফিরে আসে আশা। তারই টানে বারবার কলম ধরতে

হয়। বকুলেব মতো আশাপূর্ণাবও অঙ্গীকাব ভেসে আসে তাঁব সব সৃষ্টিব মধ্যে, "আমাব মধ্যে যে কথাব আলোড়ন, সে তো শোনাতেই হবে অন্যজনকে, আমাব চোখে যা ধবা পড়ে গেছে, অন্যেব চোখে তা ধরে দিতে না পাবলে আমার শান্তি কোথায়?" এ কি সময়েব কাছে সময়েব অঙ্গীকাব না ব্যক্তিব কাছে ব্যক্তির অঙ্গীকাব?

তথ্যসূত্র

১ প্রথম প্রতিশ্রুতি—আশাপূর্ণা দেবী—প্রথম প্রকাশ, ফাল্গুন ১৩৭১-মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা লি।

২ সুবর্ণলতা—আশাপূর্ণা দেবী—প্রথম প্রকাশ, চৈত্র ১৩৭৩-মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা লি।

৩ বকুলকথা—আশাপূর্ণা দেবী—প্রথম প্রকাশ, চৈত্র ১৩৮০-মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা লি।

৪ Structuralist Poetics –Jonathan Culler–First Published 1975, London

'পৃথিবী দেখুক, এই তীব্র সূর্যের সামনে তুমি'

রাহুল দাস

"আপাতদৃষ্টিতে 'সুবর্ণলতা' একটি জীবনকাহিনি, কিন্তু সেইটুকুই এই গ্রন্থের শেষ কথা নয়। সুবর্ণলতা একটি বিশেষ কালের আলেখ্য। যে কাল সদ্যবিগত, যে কাল হয়তো বা আজও সমাজের এখানে সেখানে তার ছায়া ফেলে রেখেছে।"[১] ১৯৬৬ সালে প্রকাশিত 'সুবর্ণলতা' উপন্যাসের ছোট্ট ভূমিকায় এই ছিল রচনাকার আশাপূর্ণা দেবী'র বক্তব্য। সমগ্র উপন্যাসটি জুড়ে বহমান সময়ের যে-খণ্ডকে স্পর্শ করতে চেয়েছেন আশাপূর্ণা, তা নিঃসন্দেহে বিগত হয়েছে বেশ কয়েক দশক আগেই—সমাজের খোলা হাওয়া তখনও পৌঁছয়নি সংস্কার-আচ্ছন্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের ভেতরমহল অব্দি। যে-সব পরিবারের কর্তাদের বদ্ধমূল বিশ্বাস ছিল—"মাকে ভক্তি কবতে হয়, স্ত্রীকে শাসন করতে হয় এবং সর্ব বিষয়ে মেয়েমানুষ জাতটাকে তাঁবে রাখতে হয়"[২] কারণ, "সুযোগ পেলেই যে মেয়েমানুষগুলো খারাপ হয়ে যায়।"[৩] দর্জিপাড়ার গলির তেমনই এক আলো-হাওয়া-অনুভূতিহীন পারিবারিক ঘেরাটোপে জীবনের অনেকগুলো বছর কাটিয়েছে সুবর্ণলতা, কিন্তু হারিয়ে যায়নি, ফুরিয়ে যায়নি।

সুবর্ণলতাদের সময় না হয় এখন শুধুই ইতিহাসের উপাদান, কিন্তু আজ এই একুশ শতকেও কি সাবেকি চালচিত্রের খুব একটা বদল হয়েছে? প্রযুক্তি আর শিক্ষার আলোয় আলোকিত 'হাইপ্রোফাইল' একুশ শতকেও নারীর প্রতি সমাজের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির বোধ করি খুব একটা ইতরবিশেষ ঘটেনি। প্রগতিশীলতার 'সিন্থেটিক' পর্দার আড়ালে এখনও সীমাহীন অবদমন, মেয়েমানুষকে তাঁবে রাখার নির্লজ্জ ষড়যন্ত্র! কিছুদিন আগেই সর্বভারতীয় এক সাপ্তাহিক পত্রিকায় বেরিয়েছে চাঞ্চল্যকর একটি তথ্য : আমাদের দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য মধ্যপ্রদেশে গড়ে প্রতি তিন ঘন্টায় একজন করে মহিলা ধর্ষণের শিকার হচ্ছেন। ২০০৫ সালে এই রাজ্যে ২,৭৬০ টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে—এই তথ্যটি সমর্থন করেছেন এমনকী সরকারি কর্তাব্যক্তিরাও। আর এত দূরেই বা যাব কেন? প্রতিবেশী মণিপুরে আসুন না। সেই কলঙ্কিত তারিখ—১১ জুলাই, ২০০৪। ইম্ফল থেকে সাত-আট কিলোমিটার দূরে সুরক্ষা বাহিনীর জওয়ানরা তরুণী মনোরমাকে বিনা প্ররোচনায় ধর্ষণ করে হত্যা করেছিল। এমন আরও অজস্র ঘটনা প্রতিদিন, প্রতিনিয়ত সংবাদপত্রের পাতা থেকে স্রেফ 'খবর' হিসেবেই হারিয়ে যায়। কিন্তু 'খবর' হবার সৌভাগ্যও জোটে না যাদের কপালে, পরিবারের নিস্তরঙ্গ নিভৃতির আড়ালে চাপা পড়ে যায় বিষাদগাথা যাদের, সেই সত্যবতী, সুবর্ণলতাদের আঁতের হদিস আমরা রাখি না, রাখতে চাই-ও না। আশাপূর্ণা যথার্থই বলেছেন সদ্যবিগত সেই কাল 'আজও সমাজের এখানে সেখানে তার ছায়া ফেলে রেখেছে'। আমৃত্যু সুবর্ণলতার স্বাধীন ব্যক্তিত্ব, সমাজ-পরিবারের ধৃষ্টতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ নিছক সন-তারিখে নির্দিষ্ট কালপর্বে আবদ্ধ না-থেকে ছড়িয়ে পড়ে বারবার চিরদুঃখিনী নারীর ভাষা হয়ে...।

দুই

"সমাজ, মানুষের রীতিনীতি, চলন-বলন, এরাই ধরে রাখে কালের এক-এক টুকরোকে,

ইতিহাস নাম দেয় 'অমুক যুগ, তমুক যুগ'।

"কিন্তু কালকে অতিক্রম করতেও থাকে বৈকি কেউ কেউ, নইলে কারা এগিয়ে দেবে সেই প্রবহমান ধারাকে?"[৪] ৩৮৪ পৃষ্ঠার উপন্যাসে আশাপূর্ণা একমাত্র সুবর্ণ'র ওপরই অর্পণ করেন স্বকাল-অতিক্রমণের গুরু দায়িত্বখানি। মাত্র ন'বছর বয়সে শাশুড়ি মুক্তকেশী'র সংসারে এসে প্রবেশ করেছিল সুবর্ণলতা—তারপর, প্রতিদিন, প্রতি পলে তাকে লড়াই চালিয়ে যেতে হয়েছে স্থিতাবস্থার বিরুদ্ধে, পরিবারের মধ্যযুগীয় মানসিকতার বিরুদ্ধে। 'মেয়েমানুষ' সম্পর্কে যে-পরিবারের জনৈক পুরুষের নিস্পৃহ বক্তব্য "মেয়েমানুষ পরচর্চা করবে, কোঁদল করবে, ছেলে ঠেঙাবে, ভাত রাঁধবে, আর হাঁটু মুড়ে বসে এককাঁসি চচ্চড়ি দিয়ে এক গামলা ভাত খাবে, এই তো জানা কথা। ভাত বাড়া দেখে ঘরের পুরুষেরা পাছে মুচকে হেসে প্রশ্ন করে, 'বেড়াল ডিঙোতে পারবে কিনা' তাই পুরুষের চোখের সামনে কখনো ভাত বাড়বে না নিজেদের। এই সবই তো চিরাচরিত।"[৫]

সুবোধ, প্রবোধ, প্রভাস আর প্রকাশ—মুক্তকেশী'র এই চার পুত্রকে আশাপূর্ণা যেন একেবারে ইতিহাসের গর্ভ থেকে তুলে এনেছেন। তথাকথিত অর্থে শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও এঁদের অনুভূতি আর বোধের ভুবন যে কী তীব্রভাবে শূন্য তার উদাহরণ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে 'সুবর্ণলতা' উপন্যাসের পাতায় পাতায়। পুরুষতান্ত্রিক প্রতাপের নিরবচ্ছিন্ন বিন্যাসে নারী নিজেও ক্রীড়নক মাত্র। তাই তো দেখি, দর্জিপাড়ার গলির বাড়িতে অচলায়তনের প্রহরী হয়ে ওঠেন একা মুক্তকেশী। যিনি "বরাবব ভালোবাসার চেয়ে ভয়কেই মূল্য দিয়েছেন বেশি।"[৬] মুক্তকেশী'র প্রতি তাঁব পুত্রদের অন্ধ আনুগত্য দেখে মনে পড়ে যায় বেশ কয়েক বছর আগে প্রকাশিত একটি বইয়ের কথা। বইখানার নাম 'পিঞ্জরে বসিয়া'। লেখক পরম বিদুষী কল্যাণী দত্ত। 'পিঞ্জরে বসিয়া' গ্রন্থে সংকলিত একটি রচনায় বয়সে প্রবীণ এই লেখক অসীম সাহসের সঙ্গে তুলে ধরেছেন উনিশ শতকের একাধিক কৃতি পুরুষের নানা চারিত্রিক স্ববিরোধিতা। শোনা যাক তাঁর জবানিতেই

(ক) "ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মাতৃভক্তি তাঁর জীবনে একটি আলোকস্তম্ভেব মতো। ভগবতী দেবীই ঈশ্বরচন্দ্রকে বহু যত্নে এমন কারুণ্য আর কোমলতায় মণ্ডিত করেছিলেন বলে শোনা যায়।...কিন্তু পুত্রবধূ দিনময়ী দেবীর কোনো স্থান ঐ বৃহৎ সংসারে ছিল না। রান্না আর ভাঁড়ার, যেখানে মেয়েদের জীবন কেটে যেত বলা চলে সেখানে তিনি আজ্ঞাবাহী মাত্র ছিলেন।"[৭]

(খ) "এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যবিদ্যা বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা আর অতি প্রখ্যাত বৈদিক পণ্ডিত ড. ক্ষেত্রেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও তাঁর মায়ের নির্দেশে সুদীর্ঘকাল তাঁর স্ত্রীকে গ্রহণ করতে পারেননি।"[৮]

'সুবর্ণলতা' উপন্যাসে সুবর্ণ'র স্বামী প্রবোধচন্দ্রকে পিতৃতন্ত্রের স্থবিরতার প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করা যায় অনায়াসেই। 'নারীজাতি' সম্পর্কে প্রবোধবাবু'র সোজাসাপ্টা পাটিগণিতটুকু খেয়াল করুন "বিধাতা-পুরুষ যখন গোঁফদাড়ি দিয়ে পাঠায়নি, তখন রাঁধোবাড়ো, খাওদাও, স্বামীপুত্তুরের সেবা কর, নিদেন না হয় হরিনাম কর কিংবা পরচর্চা কর। চুকে গেল্ ল্যাটা।"[৯] সুলক্ষণ স্বামীরত্নটির তরফে একমাত্র প্রতারণা, তাচ্ছিল্য আর শারীরিক নির্যাতন ছাড়া প্রায়

কিছুই জমা পড়েনি সুবর্ণলতার ভাগ্যে। দর্জিপাড়ার নির্মীয়মান বাড়ির দোতলায় একখানি ঝোলা বারান্দার আব্দার জানিয়েছিল সুবর্ণ স্বামীর কাছে। মাতৃভক্ত 'পেবা' তক্ষুনি ছুটলেন মা'র অনুমতি প্রার্থনা করতে। এবং যথারীতি মুক্তকেশী'র সতর্কবাণী : "না না, ওর গোড়ে গোড় দিয়ে মরিসনি তুই পেবা! ঘরের ভেতর খেমটা নাচছে বৌ, আবার বারান্দায় গলা ঝোলালে আরও কত বাড় বাড়বে তা আন্দাজ করতে পারছিস?"[১০] অতএব ঝোলাবারান্দার ঠাঁই হল বাতিল স্বপ্নের চিরকালীন চিলেকোঠায়। এদিকে প্রবোধ 'বারান্দা হচ্ছে' এই মিথ্যা আশ্বাসটুকুর বিনিময়ে স্ত্রী'র শরীরটুকু দখল করে নিতে কুণ্ঠা বোধ করল না। তীব্র 'সন্দেহবাইগ্রস্ত' স্বামীর হাতে সুবর্ণকে প্রহৃত হতে হয়েছে একাধিকবার। আর শুধু তো প্রবোধ নয়, বাড়ির দুই দেবর প্রভাস এবং প্রকাশও কোনোভাবেই বরদাস্ত করতে পারেনি মেজগিন্নির সৃষ্টিছাড়া স্বভাবকে—কখনও নির্মম ব্যঙ্গ, কখনওবা অশালীন বিদ্রূপে জর্জরিত করতে চেয়েছে সুবর্ণর ব্যক্তিত্বকে। পান থেকে চুন খসলেই 'পাগল' বলে অপবাদ দিয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য! সুবর্ণকে কিছুতেই দমিয়ে রাখা যায়নি।

উপন্যাসটিতে খুব আলতোভাবে এসেছে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রসঙ্গ। আর সেই স্বদেশি হাওয়া এমনকী দর্জিপাড়ার তস্য গলিতেও এসে উঁকি দিয়েছে, উঁকি দিয়েছে মুক্তকেশীর বাড়ির মেজবৌমা'র মনেও। এবং খুব স্বাভাবিকভাবেই স্থিতাবস্থার সমর্থক পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়ায় এই আলোড়ন মেনে নিতে পারেনি। সমগ্র দেশ জুড়ে বিদেশি দ্রব্য বর্জনের বান ডেকেছে তখন। গৃহবন্দি সুবর্ণ পুজোর নতুন কাপড় পুড়িয়ে সেই আন্দোলনে সামিল হতে চেয়েছিল। কিন্তু বাকিরা তা মানবে কেন? প্রভাসচন্দ্রের হক্ কথা : "পলিটিক্সের চাষ হচ্ছে বাড়িতে?...তা বাড়িতে শাড়ি পরে বসে ঘোমটার মধ্যে খ্যামটা নাচ নেচে ছেলেগুলোর পরকাল ঝরঝরে করবার দরকার কি? কোঁচা কাছা এঁটে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেই হয়! ইংরেজরাজকে খবর পাঠাই।"[১১] নিছক জীবিকাঅর্জন, তাস-পাশা খেলে অবসর যাপন আর সন্তান-উৎপাদনের বাইরেও যে ছড়িয়ে আছে বিশাল পৃথিবী, আছে জীবনের অর্থময় চিত্রলতা—পরিবারের লোকেদের এই সামান্য কথাটিই বোঝাতে চেয়েছিল সুবর্ণলতা। পারেনি, বারবার মুখ থুবড়ে পড়েছে, কিন্তু হাল ছাড়েনি।

তিন

তারপর, সময় গড়িয়েছে ক্রমশ। গত হয়েছেন মুক্তকেশী। সুবর্ণরা দর্জিপাড়া থেকে উঠে গেছে নতুন বাড়িতে। কচিকাচাগুলো বয়স্ক হয়েছে, ছেলেরা একটার পর একটা 'পাশ্', দিয়ে বিজ্ঞ হয়েছে। কিন্তু সুবর্ণলতার মনখারাপ কেন? হবে না? সুবর্ণ'র যে বড় সাধ ছিল "যে তার ছেলেরা বাড়ির ঐ অকালবৃদ্ধ কর্তাদের ভাষা থেকে অন্য কোনো পৃথক ভাষায় কথা বলবে। যে কথার ভাষা হবে মার্জিত, সভ্য, সুন্দর। যাতে থাকবে তারুণ্যের ঔজ্জ্বল্য, কৈশোরের মাধুর্য, শৈশবেব লাবণ্য।"[১২] কিন্তু সেই সাধ তো অপূর্ণই রয়ে গেল। তীব্রভাবে আশাহত সুবর্ণ যেন প্রিয় সন্তান ভানু'র ব্যক্তিত্বে খুঁজে পায় দর্জিপাড়ার বাড়ির প্রভাসচন্দ্রের আদল—"ভানুর বিদ্রূপব্যঞ্জক মুখ ভঙ্গিমায়, চোখের পেশীর আকুঞ্চনে, আর ঠোঁটের বঙ্কিম রেখায় স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে সুবর্ণলতা, এদের বংশের প্রথম গ্র্যাজুয়েট প্রভাসচন্দ্রকে।

সুবর্ণলতাকে ব্যঙ্গ করাই ছিল যার প্রধানতম আনন্দ।"[১৩] এ-কথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে, সমসময় এবং সমাজের কিছু স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য নিয়েই সুবর্ণ'র সন্তানরা বেড়ে উঠেছিল। সুবর্ণ নিজেও কি জানত, একা তার পক্ষে সব কিছু পাল্টে ফেলা সম্ভব নয়। পরিবর্তনের জন্য প্রগতির জন্য আমাদের পথ চেয়ে থাকতে হয় দীর্ঘ কয়েক দশক। কিন্তু সময়ও কি পারে সমাজের সমস্ত দগ্‌দগে ঘা মুছে ফেলতে?

তবু গাঢ় অন্ধকারের বুকে একটুকরো আলোর মতোই আমরা পেয়েছি মুক্তকেশী'র ভাইপো অকৃতদার জগু'কে। আপনভোলা খানিকটা পাগলাটে জগুই আসলে, তার সীমিত ভূমিকা সত্ত্বেও, এ-উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ পুরুষ চরিত্র। সুবর্ণলতার প্রতি শ্রদ্ধায় যাকে বারবার আপ্লুত হতে দেখেছি আমরা।

'শেষ' বলে তো কিছু হয় না আদৌ, তাই 'শেষ' কথা বলারও দায় নেই কোনো। এ-মুহূর্তের মতো জানিয়ে রাখতে ইচ্ছে হয়—নারীকে অর্ধেক আকাশের প্রকৃত অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখার ষড়যন্ত্র চলবে যদ্দিন, ততদিনই আশাপূর্ণার মতো শিল্পীরা কলম তুলে নিতে বাধ্য হবেন। প্রতিবাদে। এবং হ্যাঁ, ঘৃণায়ও।

তথ্য নির্দেশ

১. আশাপূর্ণা দেবী, 'সুবর্ণলতা' (মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা· লি:, কলকাতা, পৌষ ১৪০৯)।
২. ঐ, পৃ. ১৪।
৩. ঐ, পৃ. ৮।
৪. ঐ, পৃ. ১।
৫. ঐ, পৃ. ১১২।
৬. ঐ, পৃ. ১০১।
৭. কল্যাণী দত্ত, "মাতৃভক্তি", 'পিঞ্জরে বসিয়া' (স্ত্রী, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০২), পৃ. ৪৬।
৮. ঐ, পৃ. ৪৭।
৯. আশাপূর্ণা দেবী, 'সুবর্ণলতা', পৃ. ২৩৮।
১০. ঐ, পৃ. ৬।
১১. ঐ, পৃ. ১০৮।
১২. ঐ, পৃ. ২২০।
১৩. ঐ, পৃ. ২২০।

প্রথম প্রতিশ্রুতি : সময় ও সমাজের বিন্যাস

বেলা দাস

সাহিত্য সমাজমানসের যেমন দর্পণ তেমনি সামাজিক দলিলও বটে। আর সমাজমানসের রুচিবোধই হচ্ছে সংস্কৃতির জনক। 'একটিমাত্র শব্দে সংস্কৃতি শব্দটির ব্যাখ্যা করতে হলে বলা যায় 'সুরুচি সঞ্জাত উৎকর্ষ।' জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই উৎকর্ষের বিকাশ হওয়া সম্ভব। জীবনযাত্রার রীতিপদ্ধতি, সমাজব্যবস্থার সুষ্ঠুনীতি, দৈনন্দিন আচার-আচরণ, এমনকী চলার ধরনটি, কথা বলার ভঙ্গিটি, সবকিছুই সংস্কৃতির অন্তর্গত। তবে বলা যায় 'শোভনতাই সংস্কৃতি, যা অশোভন অসুন্দর সেটাই সংস্কৃতির বিরোধী।'[১] তাই একটা সংস্কৃতি-সম্পন্ন জাতির প্রত্যেকটি লোকই সংস্কৃতির বাহক হয় না। কেননা প্রত্যেকেরই আচার-আচরণ শোভন হয় না। হওয়া সম্ভবও নয়। তবুও তাদেব রুচির একটা মান থাকে। অবশ্য সর্বদেশের বা সর্বকালের রুচিবোধ এক হয় না। ফলে দেশ ভেদে-কালভেদে তার সংস্কৃতির সংজ্ঞাও তাই ভিন্ন।

তবে যুগে যুগে ভিন্ন হলেও এক একটি দেশের বা এক একটি জাতির ঐতিহ্যে সংস্কৃতির একটি অব্যাহত ধারা প্রবহমান। সে-ধারা বহুমানুষের মানসরসধারায় পুষ্ট। একটি দেশের সংস্কৃতির ধারাকে বাঁচিয়ে রাখতে অনেক পরিমাণে সাহায্য করে তার সাহিত্য। কেননা সাহিত্যের মাধ্যমেই অতীতকে অবলোকন করা যায়। মানুষের উত্থান-পতনের ইতিহাস, পৃথিবীর ভাঙাগড়াব ইতিহাস সাহিত্যের রসধারায় পুষ্ট হয়েই ভবিষ্যৎ কালের দরবারে তার আবেদন পৌঁছে দেয়। পুরাণ, উপপুরাণ, প্রাচীন সাহিত্য, লোকসাহিত্য রচিত হয়েছে বলেই আজ আমরা জানতে পারি কোন যুগে কীভাবে পরিচালিত হয়েছে জাতির সমাজজীবন। কিংবা জানা যায় তার রাষ্ট্রজীবন, ধর্মজীবন, কর্মজীবন কোন পথে প্রবহমান। ফলে সাহিত্য হচ্ছে এমনই এক মহান বস্তু যা সংস্কৃতির ধারক এবং বাহক। সাহিত্যের শক্তি তাই অপরিসীম। সাহিত্য যেমন অতীত কালকে রক্ষা করে অর্থাৎ ধরে রাখে, তেমনি বর্তমান কালকেও বহন করে। আবার ভাবীকালেরও ইঙ্গিত দেয়। 'একমাত্র সাহিত্যই পারে অনতিক্রমনীয় কালকে অতিক্রম করতে, মৃত অতীতকে জীবন্ত করে তুলতে। সাহিত্যই পারে একটা জাতির জীবনের মোড় ফিরিয়ে দিতে। একটা জাতির মূলধন যদি হয় তার সংস্কৃতি, তো তার সম্পদ হচ্ছে তার সাহিত্য।'[২] আর সেজন্যই সাহিত্য ও সংস্কৃতির সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন। একে অন্যের পরিপূরক। বস্তুত সাহিত্য বহন করে আসছে মানুষের অন্তরের শাশ্বত বাণী। আর সংস্কৃতি বহন করে আসছে তার চিরন্তন উন্নতির চেতনা। আশাপূর্ণা দেবীর 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' সেরকমই একটি সমাজ-সংস্কৃতির বাহক—যাকে বলা যায় সমাজপ্রগতির ইতিবৃত্ত।

অনেক আগের গ্রামীণ সমাজের পটভূমিকায় 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' উপন্যাসটি লেখা। এখন অবশ্য সেই গ্রামীণ সমাজ নেই। যুগের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে অবসান ঘটেছে সমকালীন অবস্থারও। অথচ সেই সামাজিক অবস্থার সত্যরূপ আজকেও আমরা প্রত্যক্ষ করি 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' উপন্যাসে। বর্ণিত তথ্যের নিরিখে দেখা যাক এই উপন্যাসে কোন

সমাজ-সংস্কৃতির কথা বলা হয়েছে। উপন্যাসে বর্ণিত নানা ঘটনা থেকে এর কাল অর্থাৎ সময়টা অনুধাবন করতে পারলে সমাজভাবনাও স্পষ্ট হয়ে যাবে।

'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র রচনাকাল ১৩৭১ সাল অর্থাৎ ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দ। উপন্যাসটি সম্পর্কে স্বয়ং লেখিকার মন্তব্য : 'প্রায় শতবর্ষ পূর্বের গ্রামীণ সমাজের এক বিত্তবান ঘরের পটভূমিকায়'[৩] গ্রন্থটি লেখা। ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিতে তা হলে 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র সময়কাল দাঁড়ায় ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি। অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ। আমরা জানি উনিশ শতক বিশেষ করে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ বাঙালি জীবনে অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়কালেই আধুনিকতার অভিমুখে বাঙালির যাত্রা শুরু। সব মিলিয়ে বাঙালির শিক্ষা-দীক্ষা, ধর্ম-কর্ম, চাল-চলন, কথন-বলন, বিশ্বাস-অবিশ্বাস—বলা যায় সব কিছুতেই পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগে। বস্তুত ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতার দ্বন্দ্বে কিছু বাঙালি ছকবাঁধা গতানুগতিক রাস্তা ছেড়ে চলতে শুরু করে। প্রচলিত কিছু অস্বস্তিকর ও অমানবিক রীতিনীতি দূর করে কলুষমুক্ত এক সমাজ গড়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে। এই আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবায়িত করতে গিয়ে অনিবার্যভাবে দেখা দেয় নানা সংঘাত ও সংঘর্ষ। কোনোটি নাড়া দেয় গোটা সমাজকে। আবার কোনোটি শহুরে জীবনেই থাকে সীমাবদ্ধ। তবে আগের তুলনায় জীবন হয়ে ওঠে অনেক বেশি গতিময়। রেলের কল্যাণে গ্রাম-শহরের মধ্যে যোগাযোগও হয়ে ওঠে অনেক সহজসাধ্য।

এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল শিক্ষা। ছেলেদের ক্ষেত্রে শিক্ষা নির্বিবাদে শুরু হলেও মেয়েদের ক্ষেত্রে তা ছিল না। শাস্ত্রে যেহেতু স্ত্রী-শিক্ষার উল্লেখ নেই, কাজেই মেয়েদের জন্য বিদ্যাশিক্ষা প্রচলনের পথ মসৃণ ছিল না। বরং প্রতিষ্ঠিত ছিল নারীর বিদ্যালাভ সুষ্ঠু জীবন ও সমাজের পরিপন্থী। যেমন মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে ব্যভিচারিণী হবে এবং স্বামীসহ অন্যান্য গুরুজনদের অবজ্ঞা করতে শিখবে। সবচেয়ে বড় কথা অর্থ-উপার্জনের জন্যই বিদ্যাশিক্ষা। মেয়েদের যেহেতু অর্থ উপার্জন করতে হয় না, কাজেই বিদ্যাশিক্ষারও প্রয়োজন তাদের নেই। সর্বোপরি শিক্ষিত মহিলারা বিধবা হবে—এ ধারণাও সমাজে ছিল দৃঢ়বদ্ধ। তৎকালীন সমাজপতিদের এই সমস্ত যুক্তির ফলে বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়েই উনিশ শতকের প্রথম দিকে স্ত্রী-শিক্ষার জন্য আন্দোলন শুরু হয়। বলা বাহুল্য তার গতিবেগ ছিল অনেক ক্ষীণ। তবে দেশীয় ব্যক্তিদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা, দর্শন ও ভাবধারা প্রসারের ফলে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এই আন্দোলনের গতিবেগ অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়।

প্রথমদিকে লক্ষণীয় বিষয় হল সমাজে বাল্যবিবাহ প্রচলিত থাকায় মেয়েদের শিক্ষার হার ছিল অনেক কম। বিয়ের পর প্রকাশ্যে বাইরে বেরোনো মেয়েদের পক্ষে অপমানজনক ছিল। আবার পরিবার তথা সমাজ থেকে আলাদা করে মহিলাদের শিক্ষা দেওয়ার পরিকল্পনাও সম্ভব হত না। কারণ নিজের স্ত্রী ও কন্যাকে প্রকাশ্যে যে-কোনো পুরুষের সামনে বেরোবার অনুমতি দিয়ে সমাজের বিষনজরে পড়তে তথা সমাজে বিদ্বেষী হতে কেউই চায়নি। তবে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল একদিকে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন অন্যদিকে অন্তঃপুরের স্ত্রীলোকদের মধ্যেও শিক্ষা প্রচারের

প্রচেষ্টা শুরু হয়। এর ফলে দেশীয় ব্যক্তিদের অন্দরমহলে স্ত্রী-শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। আবার মিশনারি প্রতিষ্ঠান সেই সময়ে স্কুল স্থাপন করে। জেনানা মিশনের প্রচেষ্টা এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। তা ছাড়া শাসনকার্যের সুবিধের জন্যে তৎকালীন সরকারের পক্ষ থেকেও বিভিন্ন স্থানে স্কুল স্থাপিত হয়।[৪] সর্বোপরি লক্ষণীয় ব্রাহ্মসমাজের শিক্ষিত দেশীয় ব্যক্তিদের বিশেষ উদ্যম। শিক্ষার মাধ্যমে বিদূষী স্ত্রী, আদর্শ মা, ও ভগ্নী হিসেবে মহিলাদের গড়ে তোলাই ছিল তাদের মূল উদ্দেশ্য। এমনি উদ্দেশ্য ছিল মিশনারিদেরও। প্রসঙ্গত খ্রিস্ট ধর্মে আস্থাশীল রেভারেন্ড লালবিহারীর কথা উল্লেখ করা যায়। 'চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান' গ্রন্থে চন্দ্রমুখীর বাবা স্ত্রী-শিক্ষার সমর্থনে মুকুলচাঁদের বক্তব্য—'মা নিবেদন করি বালিকারা বিদ্যোপার্জনে যদি বিধবা হইত তবে শহরের যে সকল নারীগণ পড়িতে পারে তাহারা সধবা থাকিতনা, আর দেখ ইংরেজ কন্যামাত্রেই বিদ্যাশিক্ষা করে, কিন্তু তন্নিমিত্তে তাহারা স্বামীহীনা হয় না, স্ত্রীলোকেরা কিঞ্চিৎ বিদ্যোপার্জন করিলে স্বীয় স্বামির অনেক উপকার করিতে পারে। ...আর স্ত্রী-শিক্ষার এক বিশেষ উপকার এই যে বালকগণ স্বীয় প্রসূতির নিকট প্রথমপাঠ লইতে পারে।'[৫] বলা বাহুল্য মুকুলচাঁদের এই দৃষ্টিভঙ্গি মূলত লেখক রেভারেন্ড লালবিহারীরই অন্তর্দৃষ্টি।

তবে এত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও স্ত্রী-শিক্ষা আশানুরূপ প্রসারলাভ করেনি। এর বড় কারণ সে-সময়ে পরিবার ছিল একান্নবর্তী। যেখানে মা, সৎমা, জেঠিমা, কাকিমা, ঠাকুরমা, পিসঠাকুমা, ভাইদের বৌ'-এর সংখ্যা মিলিয়ে—পরিবারে ছিল নারীর সংখ্যাধিক্য। আর পরিবারের বয়স্কা মহিলারা যুবতি বৌ'দের মনে চিরাচরিত কুসংস্কারকে দৃঢ়বদ্ধ করত। এরমধ্যে অন্যতম হল মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে বিধবা হবে। সংসারে চরম বিপর্যয় ঘটবে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বৈধব্যজীবন যাপনের আকাঙ্ক্ষা কোনো মেয়েরই কাম্য নয়। আবার দিনের বেলায় স্বামীর সঙ্গে মেলামেশা অর্থাৎ কথাবার্তা বলা তৎকালীন সমাজে নিন্দনীয় ছিল। সমস্ত দিনের পরিশ্রম, আবার নানাপ্রকার ভীতিজনক কুসংস্কারমূলক উপদেশ শুনে স্ত্রীরা স্বামী সান্নিধ্যে এলেও তাদের মনে পাঠলাভে অনীহা থাকতই। এর ফলে স্ত্রীদের নতুন চিন্তার আলোকে আলোকিত করা তৎকালীন সমাজে খুব সহজ ছিল না। সর্বোপরি তৎকালীন মহিলাদের শিক্ষা দিতে পুরুষেরাও খুব ইচ্ছুক ছিল না। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় এদেশীয়দের মধ্যে বাবু কালীকৃষ্ণ মিত্র ও সহোদর নবীনকৃষ্ণ মিত্র প্রথম বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে। বারাসতে। এই দুঃসাহসিক কাজের জন্য এদের সামাজিক নির্যাতনের শিকার হতে হয়। একঘরে হতে হয়।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সহযোগিতায় ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দের ৭ মে কলকাতা নগরে ধর্মশিক্ষা-বিহীন-শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের কৃতিত্ব বেথুন সাহেবের।[৬] বেথুন বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকেই অবৈতনিক সম্পাদক হিসেবে কাজ করেন বিদ্যাসাগর। সম্পাদকের কর্তব্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ না-থেকে মেয়েদের সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারে উদ্যোগী হন। 'এর প্রথম পদক্ষেপ ১৫.৪.৫৭ খ্রিস্টাব্দে বর্ধমান জেলার জৌগ্রামে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৪ নভেম্বর থেকে ১৮৫৮ খ্রি: ১৫ মে পর্যন্ত বর্ধমান,

মেদিনীপুর, হুগলী, নদীয়া জেলার বিভিন্ন স্থানে মোট ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এরপরে আরও ১৫টি অর্থাৎ সর্বসাকুল্যে ৫০টি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। নিজের উপার্জিত অর্থ ও বন্ধু-বান্ধবের আর্থিক সাহায্যের ওপর নির্ভর করে কোনোরূপে বিদ্যালয়গুলির ব্যয়ভার চালিয়ে যান। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ভারত সরকার বিদ্যালয়গুলির প্রতিষ্ঠাবাবদ সমস্ত খরচ মঞ্জুর করেন। বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় বালিকা বিদ্যালয় সম্পর্কে ক্রমশ দেশবাসীর আগ্রহ জন্মে। বিদ্যালয় ও ছাত্রীর সংখ্যাও বেড়ে চলে। সরকার শেষ পর্যন্ত কিছু কিছু আর্থিক সাহায্য মঞ্জুর করেন।'[৭]

আগেই বলেছি স্ত্রী-শিক্ষা আন্দোলনের ইতিহাসে ব্রাহ্মদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। ব্রাহ্মরা চিরদিনই সংস্কার-আন্দোলন সমর্থন করেছেন। স্ত্রী-শিক্ষা আন্দোলনেরও পক্ষপাতিত্ব করেছেন। শিক্ষালাভে এই সম্প্রদায়ের মেয়েরাই এগিয়ে এসেছে। শিক্ষার হারও ছিল এদেরই বেশি। কেশবচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটন ফিমেল স্কুলে মেয়েদের সাহিত্য, বিজ্ঞান, অঙ্ক ইত্যাদির সঙ্গে বন্ধন ও সেলাই শিক্ষা দেওয়া হত। স্ত্রী-শিক্ষার সমর্থনে বলা হয়—স্ত্রী-শিক্ষা সমাজের সর্বাঙ্গীন মঙ্গলসাধন কববে। এর ফলে মেয়েদের হৃদয়ে দযা, মায়া, নম্রতা, সবলতা, লজ্জাশীলতা আরো বেশি বৃদ্ধি পাবে। তারা আরো মার্জিত হবে, সুন্দরকে আরো সুন্দর করবে। স্ত্রী-শিক্ষাই স্ত্রীকে স্বামীর সহায় ও উপযুক্ত ভার্যা কববে। শিক্ষিতা মায়ের সুরুচি সন্তানের মনকে আদর্শের সন্ধান দেবে। সর্বোপরি শিক্ষিতা মহিলাদের দৃষ্টান্ত দেখে রক্ষণশীল সমাজের আতঙ্ক দূর হবে—এ আশাও করেছিলেন অনেকে। কিন্তু লক্ষ করবার বিষয় 'স্ত্রী-শিক্ষার সমর্থনে ও প্রসারে বিভিন্ন পত্রপত্রিকাগুলো' (সুলভ পত্রিকা, রহস্য সন্দর্ভ, বঙ্গমহিলা, আর্যদর্শন, সাধারণী, বান্ধব, ভারতী ও বালক, সাহিত্য) যখন সরব হয়ে ওঠে তখন বক্ষণশীল হিন্দুরা স্ত্রীদের এই আধুনিক অগ্রগতিতে ক্ষুব্ধ হয়ে পড়েন। তাদের যুক্তি স্ত্রী-পুরুষকে একই ধরনের শিক্ষা দিলে নারী সমাজেব চরম অবনতি ঘটবে। ফলে প্রগতির নামে নৈতিক অধঃপতনের হাত থেকে নাবীসমাজকে রক্ষা কল্পে বিভিন্ন পত্রপত্রিকা (বেদব্যাস, জন্মভূমি, অনুসন্ধান, ধর্মপ্রচারক) দায়িত্বপালনে অগ্রসর হয়।'[৮] এই সময় থেকে ক্রমশ শহবের উচ্চপদস্থ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মেয়েরা বিদ্যালয়ে পড়তে যায়। স্ত্রী-শিক্ষাও সর্বজন-স্বীকৃত হয়। ফলে ক্রমশ লোকের মন থেকেও স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রাচীন সংস্কার অনেক পরিমাণে অপসারিত হয়। তবে এতে বিশেষ করে নগরবাসী শিক্ষিত উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত নানাভাবে উজ্জীবিত হয়। কিন্তু এইসব পরিবর্তনের ঢেউ গ্রামবাংলার জীবনে পৌছোতে পারেনি। ফলে গ্রামবাংলা তখনও থেকে গেছে গাঢ় অন্ধকারে। আশাপূর্ণার 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' এই সময়েরই অন্ধকারময় পটভূমিতে লেখা বাংলার গ্রাম-সংস্কৃতির জীবন্ত আলেখ্য।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে লক্ষণীয় বিষয় হল গ্রামীণ জীবনেও শিক্ষার প্রচলন দেখা দিয়েছে। তবে তা ছিল ছেলেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। মেয়েদের শিক্ষার অন্তরায় দীর্ঘদিনের প্রচলিত সংস্কার। সমাজে যে-সংস্কার প্রচলিত ছিল, সাহিত্যে তার প্রকাশ মেলে। প্রসঙ্গত রেভারেন্ড লালবিহারী দে'র লেখা, গ্রামীণ সমাজের পটভূমিতে 'চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান' (১৮৫৯) গ্রন্থেও তা লক্ষণীয়। গ্রাম্য সমাজে মেয়েদের লেখাপড়া শেখায় প্রবল বাধা ছিল

এ-কথা আগেই বলা হয়েছে। এই গ্রন্থে লক্ষণীয় চন্দ্রমুখীর বাবা মুকুলচাঁদের সক্রিয়তা। শিক্ষক নিতাই চন্দ্রমুখীকে শিক্ষা দেবার আগ্রহ দেখিয়ে মুকুলচাঁদের অনুমতি চাইলে, তিনি সোৎসাহে বলেছেন—'সে কী নিতাই এমন দিন কী হইবে? আমার অত্যন্ত ইচ্ছা বটে যে আমার বাটীর সকল স্ত্রীলোকেরাই কিঞ্চিৎ বিদ্যাশিক্ষা করে।'[৯] কিন্তু মুকুলচাঁদের মা এর ঘোর বিরোধিতা করেছেন—'একে তোর একটি মেয়ে, তাকে তুই রাঁড় করিতে চাস, লেখাপড়া শিখে কোন মেয়ে ভাগ্যবতী হয়েছে? না এমন কর্ম করো না। তোমার বেটাদিগকে ভাল শিখাও। চন্দ্রা তুই কাল অবধি আর পাঠশালে যাসনে।'[১০] সংস্কারাচ্ছন্ন গ্রাম্য বৃদ্ধার মনের ছবিটি এখানে দিবালোকের মতো স্পষ্ট—আর তা হল লেখাপড়া শিখলে মেয়েদের অনিবার্য পরিণতি বৈধব্য। এরকম অনেক কুসংস্কারে আচ্ছন্ন তখন বাংলার গ্রামজীবন। প্রায় একই সময়ের পটভূমিকায় রচিত 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'তেও এই সংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামজীবন তথা গ্রাম্য সংস্কৃতিকে প্রত্যক্ষ করা যায়। ঔপন্যাসিকের তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে গ্রামবাংলার সেই রূপের বাস্তবায়ন ঘটেছে এই উপন্যাসে।

নেড়ু পড়াশুনা করে। কিন্তু সে পড়াশুনায় মেয়েদের এক্তিয়ার নেই। তাই নেড়ুর লেখা তালপাতায় হাত ঠেকানো-মেয়ে বলেই সত্যবতীর অপরাধ। সত্যবতীর এই অপরাধ সবাইকে জানিয়ে দেবার ভয় দেখিয়ে নেড়ু তাকে জব্দ করতে চায়। নেড়ু জানায় ভগবানের নির্দেশেই লেখাপড়ার মতো ভালো কাজে মেয়েদের অধিকার নেই। যেমন নেই নারায়ণ পূজায়। এর অন্যথা হলে দৃষ্টিশক্তি হারাতে হয় মেয়েমানুষকে—এই কুসংস্কারটিও এখানে দৃঢ়। রক্ষণশীল ঘরে লালিত ঔপন্যাসিকের জীবনসত্য—'আমাদের ঠাকুমার সনাতন সংসারে মেয়েদেরও বর্ণপরিচয় করানোর মতো আধুনিকতার পাট ছিল না। ওসব ছেলেদের জন্য। ছেলেদের জন্য ইস্কুল, ছেলেদের জন্য মাস্টার।' এর ফলে আশাপূর্ণা বিদ্যাশিক্ষা করেছেন ঘরে। এই বৈষম্যের একটা জ্বালা তাঁর ছিলই। বালিকা বয়সে যে প্রতিবাদ তিনি জানাতে পারেননি, বস্তুত দীর্ঘদিনের সঞ্চিত সেই জ্বালাকে যুক্তিগ্রাহ্য করে তাঁরই সৃষ্ট বালিকা সত্যবতীর মাধ্যমে এখানে পরিবেশন করেছেন। সত্যবতী নেড়ুর ভয়ে একটুও বিচলিত নয়—বরং দৃঢ় প্রত্যয়ে গোপন সত্য জানিয়ে দেয়—সে লিখতেও জানে। নেড়ুর একটি তালপাতা টেনে তাতে সে-সত্য প্রতিষ্ঠিতও করে। সেই সত্য যা মেয়েমানুষের জন্য নির্ধারিত নিয়মের লক্ষ্মণরেখা অতিক্রমণ। কিন্তু হাজার হোক মেয়েমানুষ, এতে 'পাপ' হবার আশঙ্কা জাগে সাধারণের মনে। যদিও সত্যের যুক্তিনিষ্ঠতা শেষ পর্যন্ত সবাইকে স্তব্ধ করে দেয়—'বলি স্বয়ং মা সরস্বতী নিজে মেয়েমানুষ নয়? সকল শাস্তরের সার শাস্তর চার বেদ মা সরস্বতীর হাতে থাকে না?' এত বড় অকাট্য যুক্তির সামনে শুধু নেড়ু নয়, সবারই দৃষ্টির দরজা খুলে যায় চোখের সামনে। ঔপন্যাসিক এখানে সত্যবতীর মাধ্যমে বদ্ধতার আবেষ্টনী থেকে মুক্ত হবার মন্ত্র, সবাকার ভুলে থাকা অথচ পরম সত্য কথাটিকে স্পষ্ট করেন। এই সত্যদৃষ্টির উন্মোচনে নারী তার সীমিত অধিকারের অপ্রাপ্তি থেকে বেরিয়ে এসে সত্যবতীর সঙ্গে একাত্ম বোধ করে।

নিজের তীব্র ইচ্ছাশক্তিতে সত্যবতী নিজেই লিখতে শিখেছে। কেউ তাকে শেখায়নি। এই সত্য আবিষ্কারে রামকালীর অন্দরমহলে হুলুস্থুল পড়ে যায়। ছিছিক্কার পড়ে যায়

সত্যবতীর বুকের পাটার। আশঙ্কা শ্বশুরবাড়ি জেনে গেলে ত্যাগ দেবে এই বৌ-কে। সেজন্যই দীর্ঘদিনের সংস্কারাচ্ছন্ন পুরনারীরা তার কঠোর শাস্তির জন্য গৃহকর্তা রামকালীর কাছে এর যথোচিত বিচার প্রত্যাশা করে। কিন্তু পিতৃস্নেহে উদ্বেল রামকালী যুগযুগান্তরের বন্ধ দরজা খুলে ভাবীকালকে আহ্বান করেন। সত্যবতীর আগ্রহ দেখে তাকে বিদ্যালাভের সুযোগ দিতে চেয়েছেন—গ্রাম্য সংস্কৃতিতে পরিবর্তনের ঢেউটি আছড়ে পড়ার ক্ষেত্রে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। অন্যদিকে সত্যবতীর কলকাতাবাসকালীন জীবনে ব্রাহ্ম ভবতোষ মাস্টারের ভূমিকাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—যিনি মনে করেন শুধু ঘর সামলানোই মেয়েদের কাজ নয়। বরং 'অবকাশকালে ঘরে বসে বসে লেখাপড়ার চর্চা' করাও অনেক ভালো কাজ। মেয়েমানুষ হয়েও ভবতোষ মাস্টারের সঙ্গে সত্যবতী কথা বলতে পারে—এতে তার স্বামী রীতিমতো 'তাজ্জব'। গ্রাম্য পরিবেশে তার মায়ের সম্মুখে যে এটা সম্ভব হত না এটা অনুভব করলেও সত্যবতীর সাহসের বাহবা না-দিয়ে পারে না। অথচ সত্যবতী যখন অকপটে জানায় 'আমি তো ওনার কাছে ইংরিজি পড়া ঠিক করেছি', সত্যবতীর এ-কথা শুনে 'নবকুমার জ্যা-মুক্ত ধনুকের মতো ছিটকে ওঠে, "কি শিখবে?" ...পাগলামি করোনা। বেশি বাড়াবাড়ি ঠিক নয়। যা রয় সয় তাই ভালো। কলকেতায় এসেছ, বাসা সংসার করছ...যতই হোক হিন্দুর মেয়ে!" ইংরেজি শেখা অর্থাৎ 'মেলেচ্ছ অক্ষর' ছোঁয়া তো জাত যাবারই নামান্তর। অবশ্য 'বেটাছেলের কথা আলাদা'। গ্রামজীবন ভাঙছে, নাগরিক জীবনের সম্প্রসারণ ঘটছে অথচ শিক্ষা তখনো নারীজীবনে ব্যাপকতা লাভ করেনি। গ্রামজীবনের চিরাচরিত কুসংস্কারে তখনো তারা আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা।

আশাপূর্ণা নিজে ভীষণ রক্ষণশীল পরিবারে বড় হয়েছেন যে-পরিবারে মেয়েদের স্কুলে যাবার সুযোগ ছিল না। রীতি ছিল না বাড়ির আত্মীয়-স্বজন ছাড়া কারো সঙ্গে কথা বলার। এমনকী বাড়িতে আগত জ্ঞানীগুণীদের সঙ্গেও দেখা করার অনুমতি ছিল না। সর্বোপরি 'বারোবছর বয়স থেকে বাড়ির কঠোর নিয়মে বাইরে বেরোনো বন্ধ।' নানাভাবেই তিনি বুঝতে পেরেছেন ছেলে এবং মেয়েদের মধ্যে মূল্যবোধের বড় বেশি তফাত। নিজের বাড়ি ও আত্মীয়দের মধ্যেও দেখেছেন পুরুষের প্রবল প্রতাপ। এই প্রতাপ এবং মূল্যবোধের বৈষম্যকে তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর ট্রিলজিতে। আবার এটাও তিনি লক্ষ করেছেন—গিন্নি-বান্নি হয়ে যাওয়া মহিলাদেরও দারুণ প্রতাপ ছিল। লক্ষ করেছেন মেয়েদের নতজানু হয়ে থাকতে হত। তবে সবচেয়ে দুর্ভোগ ছিল অল্পবয়সি বৌদের। আশাপূর্ণার ট্রিলজিতে এ সমস্ত অবিচার, অসাম্যের কথাই এসেছে। বকুলকথায় বকুল অর্থাৎ অনামিকা দেবী যে আশাপূর্ণারই আত্মপ্রক্ষেপ এ-কথা অনেকেই স্বীকার করেছেন। সুবর্ণলতার কাল সম্পর্কে ঔপন্যাসিক বলেছেন—এর কাল তিনি স্বয়ং বাল্য-শৈশবে প্রত্যক্ষ করেছেন। বলা যায় সুবর্ণলতার কাল বস্তুত তার মায়ের কাল। খুব স্বাভাবিকভাবেই তাই 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'তে সুবর্ণলতার মা সত্যবতী আশাপূর্ণার ঠাকুমা বা দিদিমার কালের ইতিহাস। ট্রিলজিতে এই তিন নারীর মাধ্যমে তিন প্রজন্মের ধারাবাহিক কাহিনি, বলা যায় একটি কালের ভাবকে পরবর্তীকালের ভাবধারার সঙ্গে যুক্ত করে আশাপূর্ণা বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে ট্রিলজির প্রথম গ্রন্থ 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র সমাজ-সংস্কৃতিই আমার আলোচ্য বিষয়।

বামাবোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে। সামাজিক কুপ্রথার সমালোচনায় মুখর ছিল পত্রিকার একাধিক রচনা। তবে সব রচনার লক্ষ্য ছিল নারী এবং উদ্দেশ্য ছিল নারী-উন্নয়ন। সত্যবতীও সর্বমঙ্গলা বিদ্যাপীঠ-এ বয়স্ক শিক্ষার স্কুলে শিক্ষিকা ছিল, কিন্তু লেখার মধ্য দিয়ে তার প্রতিভার স্ফুরণ ঘটার সুযোগ হয়নি, তৃষ্ণার্ত হৃদয়ের আর্তি, অপ্রাপ্তির বেদনা তাকে বিদ্ধ করেছে বারবার। তাই নারীকেন্দ্রিক বিষয়ে তার তির্যক প্রশ্ন, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চিন্তা হৃদয়ের গভীরে সুরক্ষিত রাখার পেছনে ছিল তার বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয়। সুহাসের সঙ্গে কথাবার্তায় তা স্পষ্ট—'বুদ্ধি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এইটা বুঝেছি অবিরত লড়াইয়ে কেবল শক্তিক্ষয়। কাজের জন্যে যে শক্তি থাকা দরকার সে শক্তির অনেকটা যদি তর্কেই খরচ করে ফেলি, তবে কাজটায় যে ঝিমিয়ে যাব। ...' নারীসমস্যা নিয়ে বিচলিত সত্য নিজের তাগিদে সমাধান-সূত্র খুঁজতে সচেষ্টও হয়েছে। কিন্তু সমস্যার মোক্ষম স্থানে আঘাত করে আলোড়ন সৃষ্টির ইচ্ছে থাকলেও প্রকৃত সহানুভূতির অভাব, স্তুতির পরিবর্তে নিন্দার বাহুল্য বিলাসিতাই তাকে নীরব কর্মের জগতে এগিয়ে দিয়েছে। কর্মই তার প্রেরণা, একাগ্রতাই তার উদ্যম, সমস্যা সমাধানের একমাত্র সোপান। তার বিদ্রোহ অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অসঙ্গতির বিরুদ্ধে, অসাম্যের বিরুদ্ধে, সমাজ-মানসিকতার রন্ধ্রে রন্ধ্রে। আর এসমস্ত অন্যায় অসঙ্গতি অসাম্য প্রশ্নচিহ্ন হয়ে তার মনকে আলোড়িত করে তুলেছে বাববার। প্রশ্নগুলোর বিষয়ভিত্তিক বিভাজন এরকম

লৌকিক দেশাচার

'সবাইকে ভালোবেসে থাকাই যদি এত ধম্মো হয়, তা হলে সেঁজুতি বত্তটি করতে হয় কেন?'

ধর্মীয় সংস্কার

'সব বিয়েতেই নারায়ণ এসে দাঁড়ান কিনা, সব গাঁট ছড়াই জন্মজন্মান্তরের বাঁধন কিনা।'

বহুবিবাহ

'বত্তটা যদি অন্যায়, সতিন যদি ভালো বস্তু তা হলে বড়বৌয়ের এত কষ্ট কেন?'

বাল্যবিবাহ

'তুশ্চ ন্ন-হলে আর তাকে সাত-তাড়াতাড়ি 'পরগোত্তর' করে দিতে হয়?'

লিঙ্গবৈষম্য

'এত যদি না দরকারের কথা তো মেয়েমানুষের জন্মাবারই বা দরকার কি।'

নারীনির্যাতন

'এই হতভাগা দেশে মেয়েমানুষকে কী অপমানের মধ্যে, কী লাঞ্ছনার মধ্যে ফেলে রেখেছো? আইন করে বন্ধ করতে পারো না এসব।'

বধূহত্যা

'ওই খুনে মা বেটাকে ফাঁসিকাঠে ঝোলাবার চেষ্টা করবে না তোমরা?'

কিছু প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছে নিজের সত্তার কাছে, কখনো বা শরণাপন্ন হয়েছে চিরকালের ধ্রুবতারা পিতার কাছে। শুধু একটা প্রশ্নের উত্তর পায়নি, বা পেয়েও তার অন্তরাত্মা তৃপ্ত হতে পারেনি—মেয়েদের জীবন কি মানুষের জীবন নয়? বিয়েই কি মেয়েদের জীবনের একমাত্র এবং শেষকথা? বিবাহ-সংস্কারের বিরোধিতা করে কোনো বিদ্রোহের ছবি সত্যের অনুভব-আচরণে খুঁজে পাওয়া না-গেলেও বিবাহ-সংস্কারের জয়গানও তার কণ্ঠে শোনা যায়নি, যদিও সুহাসকে ব্রাহ্মসমাজের পরহিতৈষী ছেলের হাতে সমর্পণের গোপন ইচ্ছে তার ছিল। অবশ্য এর পেছনে তার যুক্তি 'মেয়ে বলেই কী 'তুচ্ছ' বাবা? একটা মানুষের জীবন তো?' মূলত মানুষ হিসেবে ব্যক্তি হিসেবে তার স্বতন্ত্র সত্তাকে স্বীকৃতি দেওয়া, তার অস্তিত্বকে মর্যাদা দেওয়া, তার প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, ইচ্ছে-অনিচ্ছে, কামনা-বাসনা, ভালোলাগা-মন্দলাগা, মূল্যবোধ-মানসিকতাকে প্রাধান্য দেওয়াই ছিল একমাত্র কারণ সেখানে বিবাহকে সে সংস্কার হিসেবে মনে করেনি, তার কাছে বিবাহ জীবনের তুচ্ছ-অতুচ্ছ হাজারো প্রাপ্তির মতোই একটা প্রাপ্তি। সত্য প্রগতিশীল, স্বাধীন, 'ঝাঁকের কৈ' হবার জন্যে সে জন্মায়নি। অথচ এই উদার মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিত্বের বিধবাবিবাহে অনীহার পেছনে কি সত্যিই কোনো কারণ ছিল না? সমকালীন সংস্কার- আন্দোলনের মধ্যে একমাত্র বিধবাবিবাহ সত্যবতীর সার্বিক সমর্থন পায়নি · 'বিধবা বিয়ে আমার চোখে অবশ্যি ভালো ঠেকে না, তবে মন্দের ভালো'। অন্যান্য বৈষম্য নিয়ে সে যতটুকু সরব বা উচ্চকিত, বিধবাবিবাহ প্রসঙ্গ সচেতনভাবে এড়িয়ে যাওয়ার পেছনে যুক্তি হল শাস্ত্রকারদের উপদেশ। যদি তাই হয় তা হলে শাস্ত্রকারদের অন্যান্য নির্দেশ নিয়ে তার কঠোর মনোভাব অব্যক্ত থাকেনি কখনো কোথাও। মনে হয়, বিধবাবিবাহের ক্ষেত্রে নারীর জীবনদাতা, নারীর পৃথক সত্তা ঘোষণার দাবিদার বিদ্যাসাগরের কথা তার চিন্তায় ছিল, তাই স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন না-করলেও বিরুদ্ধাচরণ করেনি সে।

সব আশাজাল যায় রে যখন উড়ে পুড়ে

সাধন, সরল, সুবর্ণ সত্যবতীর সন্তান। লেখাপড়া শিখিয়ে সত্যিকার মানুষ হিসেবে গড়ে তোলাই ছিল তার উদ্দেশ্য। তার বিশ্বাস 'চাকরির জন্যে পড়া নয়, মানুষ হওয়ার জন্য পড়া'। আর সুবর্ণর মধ্যে সত্য নিজের জীবনের অসম্পূর্ণতাকে পূর্ণ করে তোলার স্বপ্ন দেখে। বাড়িতে পড়াশুনার সঙ্গে সঙ্গে বেথুন স্কুলে ভর্তি হয় সুবর্ণ। গ্রামের বাড়িতে আসা অবধি ঠাকুমা এলোকেশী 'মেয়েমানুষের বিদ্যে শেখা যে কতদূর গর্হিত কাজ' তাই বোঝাতে চেষ্টা করেছেন সুবর্ণকে; এতে ব্যর্থ হলে সুবর্ণকে নিয়ে পাড়া বেড়ানোতে মনোযোগী হয়েছেন। মূলত মা সম্পর্কে সুবর্ণর বৈরীভাব গড়ে তুলতে উদ্যোগী ভূমিকা নেন এলোকেশী, সত্যবতীর শাশুড়ি। কারণ সত্যের নয় বছর বয়স থেকেই শাশুড়ি এলোকেশী পুত্রবধূর সঙ্গে যুক্তিতর্কে জয়লাভ করতে পারেননি। পুত্রকেও হাতছাড়া করতে হয়েছে, পুত্রবধূকে বশীকরণ মন্ত্রে, এমনকী শাসনদণ্ডের নাগপাশে শৃঙ্খলিত রাখার ব্রতেও হার মানতে হয়েছে তাকে। তাই তার ইচ্ছে ছিল 'মা যেমন কুকুর' সুবর্ণকে 'তার উপযুক্ত মুগুর' করে তোলা। কিন্তু সত্যের আকাঙ্ক্ষা তো অনেক উঁচু পর্দায় বাধা। সে চেয়েছিল মেয়ের মধ্যে নিজের অপ্রাপ্তিকে পূর্ণরূপ দিতে, একবার জ্বরের ঘোরে অর্ধচেতন অবস্থায় সত্যবতী স্বামী

নবকুমারকে দিয়ে শপথ করিয়েছিল · 'সুবর্ণকে মেরে ফেলো না। ওকে বাঁচাতে হবে, হাজার হাজার সুবর্ণকে বাঁচাতে হবে'—বাংলাদেশের অগণিত বালিকাকে দেখতে পায় সত্য সুবর্ণর মধ্যে। বাল্যবিবাহের অভিশাপ থেকে বাঁচাতেই সত্যর এই আকুতি-আবেদন। নবকুমার ভেবেছিল 'পাগলের সঙ্গে চাতুরিতে দোষ কি'—সত্য পাগল, অতএব পাগলের সঙ্গে ছলনাতে অপরাধ নেই। প্রচলিত নিয়ম-কানুনের বাইরে, অন্যায় পদ্ধতির সঙ্গে আপসে অনাগ্রহী, সমাজ-মানসিকতার মূল স্রোতের বিপরীতপন্থী জন শুধু উনিশ শতকের দৃষ্টিতেই পাগল নয়, প্রতিটি শতকেই পাগল হিসেবে চিহ্নিত। যুগে যুগে দেশে দেশে এরকম পাগল জন্ম নিয়েছে যারা পরবর্তী সময়ে আখ্যায়িত হয়েছে প্রাগ্রসর বিশেষণে। জীবিতকালে নিন্দাবাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতায় যাদের প্রাপ্তির খাতা পূর্ণ, মৃত্যু-পরবর্তী সময়ে তারাই হয় উচ্চ-প্রশংসিত, বিভিন্ন অভিধায় ভূষিত। সত্যকেও তার সময়, সমাজ, সৃজন কেউ বোঝেনি। তাই সত্যের আশা, স্বপ্ন বাস্তবায়িত হতে পারেনি। সবকিছু তাসের ঘরের মতো ভেঙে যায় এলোকেশীর চক্রান্তে আর ব্যক্তিত্বহীন অসাড় নবকুমারের সম্মতিতে। সুবর্ণর বাল্যবিবাহের মধ্য দিয়ে এলোকেশী পুত্রবধূর কাছে পরাজয়ের প্রতিশোধ নিয়ে পিতৃতন্ত্রের ধ্বজারই জয়গান করেন।

স্বামী, সন্তানের কাছে স্পষ্টবক্তা, আপসহীন, সত্যবাদী, ব্যক্তিত্বময়ী সত্যের পরিচয় 'প্রীতিকর নয়? ভীতিকর'। যে-সন্তানকে নিয়ে তার স্বপ্ন-পরিকল্পনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা—সে-ও তো পুরুষতন্ত্রের প্রহরী। তাই বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেবেলায় মায়ের প্রতি সহানুভূতি ভালোবাসার স্থান নেয় বিরক্তি, তাচ্ছিল্য, অবজ্ঞা। অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে মায়ের প্রতিবাদ বা বিদ্রোহ ঘোষণা সাধনের দৃষ্টিতে 'নির্লজ্জ কেলেঙ্কারিব' নামান্তর। কারণ পুত্রও তো পুরুষতন্ত্রের ধারক-বাহক, মায়ের আত্মস্বাতন্ত্র্য তার কাছে কখনোই স্বীকৃত হতে পারে না।

অন্যদিকে সত্যবতী যেখানে যুগচক্রের আবর্তনে আলোড়িত হয়, নবকুমার সেখানে ধীর, অচেতন। সত্যবতী সিদ্ধান্ত নেয়, সমাধানসূত্র বের করে, অন্যায়ের প্রতিবাদ করে, প্রতিরোধ চায়; সেখানে নবকুমার ভয়ে ভীত, সবকিছুর সঙ্গে সবার সঙ্গে আপসের বাজনীতিতে বিশ্বাসী। সমাজনির্দিষ্ট লিঙ্গ-ভূমিকার এক বিপবীত ছবি দেখা যায় সত্যবতীর মধ্যে। আর এখানেই সত্যবতী হয়ে ওঠে স্রষ্টাকেও অতিক্রম করে-যাওয়া এক মূর্তিমতী প্রতিবাদ, চেনা-অচেনার আলো-আঁধারিতে এক স্বতন্ত্র সত্তা। তাই পুত্রের অবহেলা, স্বামীর অভিশাপ ('অশেষ দুঃখু আছে তোমার কপালে। স্বামী হয়ে এই অভিশাপ দিচ্ছি তোমায় ..') বিচলিত করতে পারেনি তাকে। শ্লেষাত্মক সুরে স্বামীকে লক্ষ করে পিতৃতন্ত্রের উদ্দেশ্যে বলেছে—'তাই তো দিয়ে আসছো তোমরা আবহমান কাল থেকে। স্বামী হয়ে, বাপ হয়ে, ভাই হয়ে, ছেলে হয়ে। ওটা নতুন নয়। অভিশাপেরই জীবন আমাদের'।--এই অভিশাপের জীবন থেকে মুক্ত হবাব সংগ্রামই তার আজীবনের সঙ্কল্প, মেয়েমানুষের প্রত্যাশা, চাহিদাকে উত্তরণের পর্যায়ে চিহ্নিত করার প্রচেষ্টাই তার জীবনব্যাপী লড়াইয়ের কেন্দ্রবিন্দু।

আমি একলা চলেছি এ ভবে

উনিশ শতকে নারীরা জন্ম থেকেই স্বামীগৃহের জন্য বলিপ্রদত্ত, 'an inmate of this

active universe' হবার ভাবনা তাদের মধ্যে অঙ্কুরিত হবার অবকাশ নেই। কেউই হতে পারেনি, ইচ্ছে হলেও হতে দেওয়া হয়নি। সত্যবতী এখানেই ব্যতিক্রমী, শিশুবয়সে বিয়ে হলেও চিন্তাশক্তি তার প্রখর, আকাশচুম্বী। তাই সমাজ, সংসারের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে সে নিজের ইচ্ছেকে, নিজের অবস্থানকে পরিণত রূপ দেবার জন্য সচেষ্ট হয়েছে, পরিসরকে বুঝে নিজের অবস্থান তথা আসনকে নিজেই তৈরি করতে চেয়েছে। এক্ষেত্রে তার সহায়ক পুরোপুরি কোনো ব্যক্তিমানস নয়; উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত পিতার প্রখর ব্যক্তিত্ব, অনমনীয় দৃঢ়তা এবং নিজের যুক্তি-বুদ্ধির মধ্য দিয়ে প্রাপ্ত সিদ্ধান্ত। দুজনের প্রচ্ছন্ন সহানুভূতি অলক্ষ্যে ছিল, এক. পিতা রামকালী, দুই. মাস্টার ভবতোষ। তবে সমস্ত কিছুর পেছনেই ছিল হওয়া আর হয়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষা, এক নিরন্তর প্রক্রিয়া। জগতের কর্মযজ্ঞে মেয়েমানুষের অপরিহার্য উপস্থিতির কথা ঘোষণা, মেয়েমানুষ যে শুধু মেয়ে নয়, মানুষ; পুরুষশাসিত সমাজে সে যে শুধু নিয়তির অলঙ্ঘ্য অভিশাপ নয়, তার স্থান কলুর বলদের মতো একহাত ঘোমটা দেওয়া চারদেওয়ালের কূপমণ্ডুক জীবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, তারও যে মন বলে বস্তু আছে, সে-ও যে পুরুষের মতোই বহির্জগতে পদার্পণের অধিকারী, তাই শুধু সগর্বে, সতেজে, সঘোষে শুধু বলাই নয়, করে দেখাতে চেয়েছে ছোটবেলা থেকে। অসাধারণ হয়েই জন্মেছে সে, এরজন্যে শিশুবয়সে বাড়ির প্রবীণাদের কাছ থেকে কৈশোরে শাশুড়ির কাছ থেকে, যৌবনে পতি এবং পরিশেষে পুত্রের কাছ থেকে বিরূপ মন্তব্য শুনতে হয়েছে তাকে। কারণ সাধারণের মধ্যে জন্ম নিয়ে বেড়ে উঠেও সে ছিল অসাধারণ। নির্বাক গোষ্ঠীর প্রতিনিধি ভুবনেশ্বরী কন্যাকে অসাধারণ দেখতে না-চাইলেও বিরুদ্ধাচরণ করেননি, মৌনই থেকেছেন চিরকাল। তবে এক্ষেত্রে পিতা রামকালীর ছিল সস্নেহ প্রশ্রয়, কারণ সত্যকে সাধারণ গোত্রভুক্ত করতে তাঁর মন সায় দেয়নি। সত্য নিজেও তা জানত, তাই অসাধারণের চিন্তাচেতনা ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্বের ভাবনার মানদণ্ডে বিচারের আশায় রামকালীকেই নির্ভর করেছে—'আমার বিচার তুমি কর তব আপন করে'—জীবনের শেষ সিদ্ধান্তের কথা জানাতেও তার অন্য কারো কথা মনে আসেনি, রামকালীই তার একমাত্র ভরসা তথা শেষ আশ্রয়। স্বামীগৃহের বন্ধন ছিন্ন করে তার কাশীযাত্রা আশ্রয়ের জন্য নয়, তার সংকল্প তার শেষ সিদ্ধান্ত, তার উদ্দেশ্য তথা ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা পিতাকে জানানোর অভিপ্রায়ে। 'এত কামনা এত সাধনা কোথায় মেশে'—এই সংশয় থেকেই জীবনব্যাপী তার মুখরতা জীবনের শেষ পর্যায়ে স্তব্ধতায় পর্যবসিত।

'শতক আসে-শতক যায় সময় স্রোতের ডাঙ্গায়'—তাই উনিশ শতকের সত্যবতীর মতো বিশ শতকে বাণী বসুর বন্দনাকেও একান্ত নিজের ঘর খুঁজতে অজানা অচেনা অপরিচিত পথে দিশাহারাভাবে পা বাড়াতে হয়। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, শক্তির অবশিষ্টাংশ অবহেলিত জনকে সমর্পণের মধ্য দিয়ে পূর্ণ আনন্দপ্রাপ্তির প্রত্যাশাতেই তাদের এই ভূমিকা, এই উদ্যোগ, এই পদক্ষেপ। প্রশ্ন জাগে, তা হলে কি উনিশ শতকের মতো একুশ শতকেও সার্বিক বিচারে সত্যবতী যুগের তথা সময়ের তথা ভাবনার ক্ষেত্রে একইভাবে প্রাগ্রসর? তাই তার বৈপ্লবিক পদচারণার দৃপ্ত ঘোষণার মধ্যেও থেকে যায় এক না-বলা বাণীর সুর,

'সহস্র শূন্যের শীর্ষে ওড়ে এই ডানার নির্বাক উন্মাদনা ভাষার পালক থেকে ক্রমশ আকাশ

ঝরে যায় কয়েকটি সংকেতলিপি এখনো বুঝিনি ভালো, তাদের আবার পাঠ করি আমিও কিছুটা অসহায়। শুধু এক সর্বগ্রাসী উড়ে যাওয়া ছাড়া আর কী আছে আমার।'

যদিও ২১ শতকের চিন্তাচেতনার স্রোত ভিন্ন খাতে বাহিত তথাপি প্রকৃত চিত্র এখনো প্রচ্ছন্ন, তাই শনাক্তকরণ এ মুহূর্তে দুরূহ। সত্যভ্রমে আচ্ছন্ন চিত্রে স্বচ্ছতার জন্য আমাদের অপেক্ষা করে থাকতে হবে আরও কিছু সময়, পরিসরকে তুলে ধরা তো সময়েরই দায়। আমরা শুধু অশান্ত সময়ের মঞ্চে অবতীর্ণ কলাকুশলীমাত্র।

প্রথম প্রতিশ্রুতি : প্রতিবাদী কথকতার নির্মাণশৈলী

উদয়চাঁদ দাশ

'সত্যবতীর গল্প আমার লেখা নয়। এ-গল্প বকুলের খাতা থেকে নেওয়া'। কাহিনি-কথক তা হলে লেখিকা নন, আর কেউ। 'বকুলের খাতা থেকে নেওয়া'। —তাই বা কেমন করে হবে! বকুলের সে-খাতার খোঁজ মিলল কি? 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' থেকে 'বকুলকথা' পর্যন্ত দীর্ঘ পথ-পবিক্রমায় সে-খাতার তো সন্ধান মেলেনি! বরং 'বকুলকথা'-য় পারুলকে লেখা বকুলের চিঠিতে রয়েছে—'বকুলের খাতাটা কোথাও খুঁজে পেলাম না। মনে হচ্ছে হারিয়েই ফেলেছি।' তবে কি কাহিনি-কথক পারুল! কিন্তু আমরা তো জেনেছি—'লিখতে পারেন না সেজদি। কবিতা পারেন, গদ্য নয়।' আর খাতাই বা কেন। স্মৃতি যা-কিছু সঞ্চিত আছে, সে তো মনের খাতায়! বকুল যখন তার লেখিকা-সত্তা অনামিকা দেবীর সামনে এসে দাঁড়ায়, ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলে—'কী আশ্চর্য! আমাকে একেবারে ভুলে গেলে, স্রেফ বলে দিলে খাতাটা হারিয়ে ফেলেছ,' আর তখন মনের খাতায় সঞ্চিত পূর্বজীবনকে স্মরণ করে স্মৃতি-ভারাতুর অনামিকা দেবী বলে উঠেছেন—'না না! হঠাৎ দেখতে পাচ্ছি হারিয়ে ফেলিনি। রয়েছে, আমার কাছেই রয়েছে। তোমার সব ছবিগুলোই দেখতে পাচ্ছি।' এরপর স্মৃতিপটে ভিড় করে এসেছে ফেলে-আসা বকুলজীবনের কথা। কিন্তু সে তো বকুলের কথা! সত্যবতীর কাহিনি-কথক তবে কে? বকুল চিঠিতে লিখেছিল পারুলকে—'বকুলের খাতাটা আমি খুঁজে পাচ্ছি না, তুই খুঁজে দেখিস'। পারুল যেহেতু গদ্য-কথা লেখেন না, লিখতে পারেন না; তাই মনে মনে বলেন, 'আমি খুঁজে পেয়ে কী করবো,' তারপর বলেন, 'বকুল বলেছিল নিজেদের কথা আগে বলতে নেই। আগে পিতামহী প্রপিতামহীর ঋণ শোধ করতে হয়।' এবং তার পরই মনে ভাবেন, 'সে ঋণ তবে শোধ করছে না কেন বকুল? না কী করেছে কখন সে-ও আমার অসতর্কতায় চোখ এড়িয়ে গেছে?' 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'-রও সূচনা-পাঠে এ-কথার পূর্বধ্বনি শোনা গেছিল · জীবনের দীর্ঘপথ পার হয়ে এসে বুঝতে শিখেছে বকুল, পিতামহী প্রপিতামহীর ঋণ শোধ করতেই সত্যবতীর অবতারণা এবং সেই পথেই এসেছে সুবর্ণলতা। তবু, তা মা এবং মাতামহীর কথা। বকুলের পিতামহী মুক্তকেশীর কথা 'সুবর্ণলতা'-র আখ্যান বয়নের সূত্রে ন্যারেটিভের মধ্যে কিছুটা মিললেও প্রপিতামহীর দেখা মেলেনি নারীজীবনের কালান্তরের কথায়। নারীজীবনের তিন ভুবনের বিস্তারিত কথকতায় এমন ফাঁক আরও পড়েছে। 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র সূচনা-পাঠে যখন জানি এ-গল্প কাহিনি-কথকের নিজের লেখা নয়, তখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে, কে তিনি? যিনি বলেন :

> *বকুলকে আমি ছেলেবেলা থেকে দেখছি। বরাবরই বলি,*
> *'বকুল তোমাকে নিয়ে গল্প লেখা যায়।'*

'প্রথম প্রতিশ্রুতি' থেকে 'বকুলকথা'-র মধ্যে আখ্যান কিংবা বকুলের পরিচয়-বৃত্তে এমন কেউ দেখা দেননি, যিনি বকুলের খাতা থেকে এ কাহিনির কথক হয়ে উঠবেন।

আরও আছে। মুর্শিদাবাদের জীবন থেকে রামকালী বিচ্ছিন্ন হবার আগেই যে গোবিন্দ

গুপ্তের স্ত্রী, অর্থাৎ কবিরাজ-গৃহিণীর মৃত্যু ঘটেছিল, সে-কথা 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'-র প্রান্তিক পাঠে রামকালী কবিরাজের স্মৃতিচারণার সূত্রে নতুন করে জানি বটে; কিন্তু সূচনা-পাঠে ছিল গোবিন্দ গুপ্ত এবং তাঁর স্ত্রী উভয়ের কাশীবাসে মনস্থির করার কথা। গোবিন্দ গুপ্ত রামকালীকে পরামর্শ দিয়েছেন, 'তোমার আর রাজবদ্যি হয়ে কাজ নেই বাপু, রাজ্যে এখন ভেতরে ভেতরে ঘুণ ধরতে বসেছে, নবাবের নবাবী তো শিকেয় উঠেছে। আমার এই দীর্ঘকালের সঞ্চিত অর্থরাশি নিয়ে দেশে পালিয়ে গিয়ে নিজে নবাবী করো গে। আমরা স্ত্রী-পুরুষ উভয়ে কাশীবাসে মনঃস্থির করেছি।'

সত্যবতীর আখ্যান যদি বকুলের খাতা থেকে পাওয়া ধরেও নেওয়া যায়, তবু তা কল্পনার ছবি। বকুল তো নয়ই, সত্যবতীকে আশাপূর্ণা নিজেও দেখেননি। সত্যবতীর জীবনভূমি আশাপূর্ণার প্রত্যক্ষ জীবন-অভিজ্ঞতার বাইরে। যে-জীবনের পশ্চাদ্‌ভূমির কথায় এসেছে মুর্শিদাবাদ এবং নবাবি আমলের অপসৃয়মান জীবন। ইতিহাসের সন-তারিখ হাতড়ালে পিছিয়ে যেতে হয় ঔপন্যাসিকের জীবনবৃত্ত থেকে অন্তত শতাব্দীকাল পিছনে। সত্যবতীর পিতা রামকালী কবরেজ যে-জীবন থেকে উঠে এসেছেন ত্রিবেণীর কাছে নিত্যানন্দপুরে, নিজের গ্রাম দেশে।

'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র সূচনাপাঠে কাহিনি-কথককে নিয়ে কিছু দ্বিধা-সংশয়ের সূত্রপাত ঘটলেও এ আসলে আশাপূর্ণার জীবনের পশ্চাৎভূমির গল্প। তা বলবার পক্ষে দুটি পথ খোলা ছিল। আত্মজৈবনিক উপন্যাস-কাঠামোতে উত্তমপুরুষে সরাসরি বলা অথবা, এমনভাবে সর্বজ্ঞের দৃষ্টি থেকে জীবনের রূপকার এবং ব্যাখ্যাতা হয়ে বলা। 'সুবর্ণলতা হচ্ছে সেই যুগের, যে-যুগকে আমার শৈশববাল্যে প্রত্যক্ষ দেখেছি' কিংবা, 'সুবর্ণলতা'র কালটি আমার নিজের দেখা বলেই এই বইটির প্রতি আমার দুর্বলতা একটু বেশি'[১]—এই ধরনের কথায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে সত্যবতীর কাল ঔপন্যাসিকের জীবৎকালসীমাকে ডিঙিয়ে গেছে পিছনের দিকে। যদিও সত্যবতীর কালসমাজ ঔপন্যাসিকের জীবনসীমার পূর্ববর্তী হলেও অজানা নয়। আপন অভিজ্ঞতার জগৎ থেকেই রসদ সংগ্রহ করেছেন সে-জীবন বীক্ষণে :

> *সবাই উঠে এসেছে আমার জীবনের পারিপার্শ্বিক পটভূমি থেকে যা লিখেছি আমার দেখা মধ্যবিত্ত জীবনের গণ্ডি থেকেই দেখা।*[২]

সারেকভাবে সত্যবতীর গল্প তো তাঁরই গল্প। লেখিকার মতে সবার লেখাতেই তার নিজের 'আমি'-টা অন্তরালে কাজ করে।[৩] স্মৃতি হাতড়ে তাঁকে এ-ও বলতে শুনি :

> *যখন আমার খুব কম বয়েস তখন থেকেই দেখতাম পারিবারিক জীবনে আত্মীয়স্বজনের মধ্যে—আমাদের মধ্যবিত্ত জীবনের কথাই বলছি ছেলে এবং মেয়ের মধ্যে মূল্যবোধের বড় বেশি তফাৎ। মেয়েরা যেন কিছুই নয়, আর ছেলেরাই পরম মানিক, এই রকম ব্যাপার। এটা আমাকে খুব বিদ্ধ করত। কিন্তু আমাদের আমলে তো এমন সাহস ছিল না যে প্রতিবাদ করি, এমন কী গুরুজনের মুখের উপর একটি কথা বললেও তো ফাঁসির হুকুম হয়ে যাবে। তাই মনের মধ্যে রাগ-দুঃখ*

জ্বালাটা জমত। আমার সেই নিরুচ্চার প্রতিবাদগুলোই যেন এক একটি প্রতিবাদের প্রতিমূর্তি হয়ে আমার কাহিনির নায়িকারূপে দেখা দিয়েছে। যেমন 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র 'সত্যবতী'।[8]

প্রতিবাদী লেখিকার অবস্থানটিকে আরেকবার চিনে নিই 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র প্রসঙ্গে বলা অন্য একটি কথায় :

ছেলেবেলা থেকেই আমার প্রশ্নমুখর মন তখনকার প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার অসঙ্গতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে প্রখর হয়ে উঠেছে। মনে হয়েছে মানুষে মানুষে ব্যবস্থার এমন পার্থক্য কেন? অবস্থার এমন অসাম্য কেন? এমন অনেক 'কেন'ই আমায় পীড়িত করেছে। বেশি পীড়িত করেছে মেয়েদের অবস্থা। কেন তাদের সকল বিষয়ে এই অধিকারহীনতা? কেন তাদের জীবন কাটে অবরোধের অন্ধকারে? এই সব প্রশ্ন আমায় স্থির হতে দেয়নি, হয়তো এই প্রশ্নের ফলশ্রুতিই আমার 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'।

কথাবয়নের মধ্যে তাই সর্বজ্ঞের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে অতিরিক্ত যুক্ত হয়েছে আত্মজীবনের অভিজ্ঞতা। আর তাই সূচনাপাঠেই বকুলের স্বরন্যাসে শুনিয়ে দেন—'একে গল্প বলতে চাও গল্প, সত্যি বলতে চাও সত্যি।'

বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে জন্ম নিয়ে যে-সমাজটাকে লেখিকা দেখেছিলেন বাল্যে-শৈশবে, তার মধ্যে নারী-পুরুষের সামাজিক অবস্থানগত অসাম্য তাঁকে সব থেকে বেশি পীড়া দিয়েছে, আলোড়িত করেছে,—এ-কথা তাঁর কাছে বারে বারে শুনতে পাই। সর্বত্র দেখেছেন পুরুষের প্রবল প্রতাপ। মেয়েদের নতজানু, দুঃখ-নিরুপায় জীবন তাঁর মনকে দারুণ অস্থির করত। মনে প্রশ্ন জাগত—'কেন এমন অবিচার? কেন মেয়েদের এমন অধিকারহীনতা?' লেখার মধ্যে সেই প্রশ্নই দেখা দিয়েছে বারে বারে। প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে রবীন্দ্রসৃষ্টির কাছে গেছেন যখন, আপন জিজ্ঞাসার যে-উত্তর তিনি নিজে একরকম করে ভেবেছেন, তারই সমর্থন মিলেছে রবীন্দ্র চিন্তা-দর্শনে :

মেয়েদের ওপর অশ্রদ্ধা ও নিষ্ঠুরতার একটা কারণ আমাদের মনের বুদ্ধিগত বিকাশের কার্যে তাদের সাহায্য আমরা অল্পই পেয়েছি। কেবল আমাদের খাওয়ানো পরানো; কেবলমাত্র আমাদের দেহের প্রয়োজন সাধনে তাদের সেবা পাই বলেই একজায়গায় তাদের মূল্য আমাদের কাছে ভিতরে ভিতরে খুব কমে যায়।

আশাপূর্ণার মনে হয়েছে এটাই আসল কথা এবং বোধহয় শেষকথা। মেয়েদের কাছে পুরুষেরা পায় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, মানসিক সহায়তা তেমন পায় না। পেতে চায়ও না, পাবার চেষ্টাও করে না। উনিশ শতকের যুগ-পরিবেশ অনেক বদলেছে কিন্তু পুরুষতান্ত্রিক সমাজের মনোধর্মকে লেখিকা বদলাতে দেখেননি। তাঁর অনুভবে ধরা দিয়েছে—'মেয়েরা যত সহজে প্রেয়সী হতে পারে, তত সহজে শ্রেয়সী হয়ে উঠতে পারে না।' তাঁর মনে হয়েছে, সাহিত্যে

ব্যক্তিগত সমস্যাই প্রাধান্য পাচ্ছে। সমষ্টিগত সামাজিক সমস্যার কথা কেউ তেমন ভাবছে কই? সমষ্টির সমস্যা যেটুকু সাহিত্যের বিষয়ীভূত হচ্ছে তা মূলত অনগ্রসর সমাজের সমস্যা। পুরুষের কলমে নারীর সামাজিক সমস্যাগুলি তো তেমনভাবে আসছে না। এ-কথা ঠিক, নারীর কলমই নারীকে চিনিয়ে দিতে পারে ভিতর থেকে। প্রতাপের কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত পুরুষের পক্ষে কখনোই সে অন্তরতর ছবিটিকে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব ছিল না। জীবনে কিছু কিছু অভিজ্ঞতা-উপলব্ধির অংশীদার নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রায় সমান হলেও এমন বেশ কিছু অভিজ্ঞতা-উপলব্ধি আছে, যা কেবলমাত্র নারীর। 'সে বিষয়ে নারী যেভাবে প্রশ্ন তুলতে পারেন, প্রতিবাদ জানাতেও পারেন, কোনো পুরুষ সেভাবে পারবেন না; নারীর অভিজ্ঞতা-উপলব্ধির বর্ণমালা অনেকটাই পুরুষের অজানা থেকে যায় বলে।"[৫] 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' থেকে 'বকুলকথা' তাই নারীজীবনের কালান্তরের ছবিকে ফুটিয়ে তুলতে চায়।

আশাপূর্ণা জানেন তাঁর দায়বদ্ধতা আছে সমাজের কাছে। সাহিত্যিকের কাজ উত্তরণের পথ দেখানো। শুধু বানিয়ে তোলা নয়! কেবল সাজিয়ে লেখা নয়। কিন্তু তিনি এ-ও জানেন · প্রতিকারের চিন্তা করা সাহিত্যের কাজ নয়। সে-কাজ সমাজ-সংস্কারকের। তিনি তাই স্পষ্ট করেই জানান :

> *আমি কখনও 'এইটা হওয়া উচিত' এ-কথা মনে করে কিছু লিখিনি।*
> *জানি কী হয় সেটাই বলবার! কী উচিত বলবার আমি কে?*

লেখিকার এই আদর্শগত অবস্থানজনিত কারণে তাঁর উপন্যাসের কথাবয়নে এসেছে পরোক্ষতা। যে-পরোক্ষতাকে কখনো কখনো ভুল বুঝেছি আমরা। ভাবতে চেয়েছি, স্বরচিত সীমারেখাকে আশাপূর্ণা সাধারণত অতিক্রম করতে চাননি। অথচ অন্তরঙ্গ পাঠ-সমীক্ষায় তাঁর উপন্যাসের প্রতিবেদন জুড়ে আমরা লক্ষ করি উঠে আসছে বাচন ও প্রতিবাচনের গ্রন্থনার মধ্য দিয়ে বাচনাতিযায়ী তাৎপর্য। 'সাহিত্য ও সমাজ' চিন্তার মধ্যে আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি লেখিকার মানসবিশ্বে বারবার আলোড়ন তুলেছে এই ভাবনা যে, সাহিত্যে ব্যক্তিগত সমস্যাই প্রাধান্য পাচ্ছে; সমষ্টিগত সামাজিক সমস্যার কথা কেউ তেমন ভাবছেন না। কেন মেয়েদের এমন অধিকারহীনতা কিংবা পুরুষের সঙ্গে তুলনায় চূড়ান্ত সামাজিক অসাম্যের শিকার—নারীর সমস্যা নিয়ে পুরুষেরা কেউ তেমন আলোড়িত নন। আর সেই চেতনায় সমাজ-নির্দিষ্ট লিঙ্গভূমিকাকে অতিক্রম করে যেতেই আশাপূর্ণা তাঁর ত্রয়ী উপন্যাসের প্রতিবেদন গড়ে তোলেন ব্যক্তিস্বরকে সামাজিক উচ্চারণে রূপান্তরিত করতে চেয়ে। আশাপূর্ণাকে নারীবাদী লেখিকা কিংবা তাঁর সৃষ্ট জগৎ নারীবাদী দৃষ্টিকোন থেকেই ব্যাখ্যাত হবার অপেক্ষা রাখে—এমন কথা বলবার মতো যথেষ্ট উপকরণ যদি আমাদের হাতে না-ও জমে, তবু সৃষ্টিকর্মের পশ্চাদ্‌ভূমির উল্লেখ কিংবা তাঁর নিজস্ব জীবন-ব্যাপী অভিজ্ঞতা-অনুভবে ধরা পড়তে দেখি সেই সত্য, যে-সামাজিক ইতিহাসের গভীর পাঠ একদিন সিমোন দ্য বোভোয়াকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছিল : কেউ নারী হয়ে জন্মায় না, সমাজই তাকে একটু একটু করে নারী করে তোলে।

এদেশে নারী সম্পর্কে সাধারণ বোধটি পুরুষ-নিয়ন্ত্রিত হয়ে যে 'মেয়েছেলে' কিংবা 'মেয়েমানুষ' অভিধায় চিহ্নিত করে, তার আড়ালে লুকিয়ে থাকে যুগ যুগ ধরে বাহিত হয়ে

আসা গ্লানিকর সত্য,—এদেশে নারী প্রথমে মেয়ে, পরে মানুষ। লিঙ্গ অনুসারে বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে দেওয়া মূলত লিঙ্গ-রাজনীতিরই কৌশল, তাকে ধ্বস্ত করে দিয়ে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ-নির্দিষ্ট লিঙ্গভূমিকার সম্পূর্ণ বিপরীত এক ছবি উঠে এসেছে 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'-তে। এ-উপন্যাসের প্রতিবাদী আখ্যানে প্রতিটি সিদ্ধান্ত নেয় সত্যবতী, প্রতিটি অন্যায়ের সাধ্যমতো প্রতিবাদ করে সত্যবতী, প্রতিকারও চায়। অন্যদিকে তার স্বামী নবকুমারের ভীরুতা, সত্যবতীর উপর নির্ভরতা ঐ ছবিকে স্পষ্ট করে তোলে। আধিপত্যবাদী পুরুষসমাজ লালিত ধারণায় অনেককাল থেকে যে-সমস্ত গুণ কেবল পুরুষেরই একচেটিয়া বলে ভেবে আসা হয়েছে, সেই পারিপার্শ্বিক ব্যাপারে সচেতনতা, স্থিরবুদ্ধি, নিবিড় অনুভব এবং জীবনের ব্যাপারে প্রবল ঔৎসুক্যের প্রকাশে সত্যবতী নবকুমারকে ছাপিয়ে যায়। 'কখনো আধখানা বৈ পুরা দেখিলাম না'—উনিশ শতকীয় সামন্ততান্ত্রিক পুরুষ-আধিপত্যবাদী সামাজিক যুগদর্শন এমনি করেই মিথ্যে হয়ে যায়। Authorial Discourse-এর মধ্যে তাই এমন বয়ান উঠে আসে :

> *যুগচক্রের আবর্তনে সত্যবতী কেন এমন অধীর হয়, চঞ্চল হয়,*
> *আন্দোলিত হয় আর নবকুমার কেন সে আবর্তন টেরও পায় না।*

পুরুষশাসিত সমাজে যা-কিছু পুরুষের শোভা পায়, নারীর পক্ষে তাই বড় বেমানান, অশোভন। সমাজ-নির্দিষ্ট এই লিঙ্গভূমিকার বিরুদ্ধতা ঘটিয়ে সত্যবতী তাই উপন্যাসের সূচনা থেকে 'দজ্জাল', 'দস্যি', 'বেয়াড়া'—এইসব শিরোপা পেয়ে বসে আছে। 'পুড়বে মেয়ে উড়বে ছাই, তবেই মেয়ের গুণ গাই'—এই বানিয়ে-তোলা মেয়েমানুষের ছবি সত্যবতী ছিঁড়ে খান-খান করে দিয়েছে। 'মেয়েমানুষ' কথাটাতেই তার আপত্তি। 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'-র কথাবয়নে সত্যবতী তাই হয়ে ওঠে প্রতিবাদের প্রতীক। 'যে মেয়ে অচলায়তন ভাঙতে চেয়েছে, চেয়েছে মেয়েমানুষকেও মানুষের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত দেখতে'[৬]—হেরে যেতে তার একান্ত আপত্তি।

এক

শৈশবের খেলাঘর থেকেই 'মেয়েমানুষ'-এর ধিকৃত মূর্তিটিকে ভেঙে নতুন করে গড়তে চেয়েছে সত্যবতী। উপন্যাসের সূচনায় প্রথম আবির্ভাবেই সত্যবতী যখন ছিপ ফেলে মাছ ধরার আয়োজন করতে পান্তাভাতের খোঁজ করে ফেরে, তখন সত্যবতীর পিসঠাকুমা মোক্ষদা ছিপ দিয়ে মাছ ধরার প্রসঙ্গে 'ছিটপিটিয়ে' ওঠেন, বলেন : সাপের পাঁচ পা দেখেছিস? মেয়েমানুষ ছিপ ফেলে মাছ ধরবি? তখনই সত্যবতী পাল্টা মুখ নেড়ে, যুক্তিতে মোক্ষদাকে ধ্বস্ত করে দিয়ে বলে ওঠে :

> *গামছা দিয়ে ধরলে দোষ হয় না, ছিপ দিয়ে ধরলেই দোষ!*
> *চুনোপুঁটি ধরলে দোষ হয় না, বড় মাছ ধরলেই দোষ!*
> *তোমাদের এসব শাস্তর কে লিখেছে গা?*

চিলেকোঠার ছাদের ওপর খেলাঘরে সত্যবতী তার খেলুড়ে পুণ্যিপিসিকে জিজ্ঞেস করে, 'এই পুণ্যি ছড়া বাঁধতে পারিস?' পুণ্যবতী পাল্টা প্রশ্ন করে, 'খুব তো বললি, বলি

মেয়েমানুষকে আবার ছড়া বাঁধতে আছে নাকি?' সেই মেয়েমানুষ! খেলাঘরের খেলা ফেলে সত্যবতী অগ্নিমূর্তি হয়ে বলে, 'কে বলেছে তোকে নেই? মেয়েমানুষ! মেয়েমানুষ! মেয়েমানুষ যেন মায়ের পেটে জন্মায়না, বানের জলে ভেসে আসে! অত যদি মেয়েমানুষ-মেয়েমানুষ করবি তো আমার সঙ্গে খেলতে আসিস না।'

এই একই প্রতিরোধ এবং প্রতিবাদে তেতে উঠে লেখাপড়ার কথায় সত্যবতী আর এক আত্মীয়-খেলুড়ে নেড়ুকে বলে, 'কেন, মেয়েমানুষ তালপাতে হাত দিলে কী হয়? কলকেতায় তো কত মেয়েমানুষ লেখাপড়া করে?' নেড়ু ভগবানের বিধানের দোহাই দিলে সত্যবতী আরও ক্ষেপে উঠে বলে, 'ভগবান কখনো অমন একচোখো নয়। ওসব বেটাছেলেরাই সৃষ্টি করেছে।' পুরুষ-আধিপত্যবাদী সমাজে নিজেদের দামি করে তোলবার এবং আধিপত্যের জালকে আরও বিস্তৃত ও নিরঙ্কুশ করবার প্রক্রিয়াটিকে সত্যবতী ওই বয়সেই নিজের মতো করে বুঝে নিতে পেরেছে। আর তাই পুরুষনির্দিষ্ট লিঙ্গভূমিকার উজানে চলতে চাওয়ার ঝোঁক সত্যবতীর প্রথম থেকেই। নিজে নিজে লিখতে শিখেছে শুনে পুণ্যবতীরা যখন চোখ গোল-গোল করে, মেয়েমানুষের পাপের ভয় দেখায়; তখন সত্যবতী জোরের সঙ্গে বলে, 'মেয়েমানুষেরা যে রাতদিন ঝগড়া কোঁদল করছে, তাতে পাপ হয় না, আর বিদ্যে শিখলে পাপ হবে? বলি স্বয়ং মা সরস্বতী নিজে মেয়েমানুষ নয়? সকল শাস্তরের সার শাস্তর চার বেদ মা সরস্বতীর হাতে থাকে না?' উনিশ শতকের স্ত্রী- শিক্ষাবিরোধী সমাজ-পরিবেশের মধ্যে হাঁপিয়ে-ওঠা মানবী প্রাণের মুখ থেকে এ-কথা বলিয়ে নেন আশাপূর্ণা, একটি সহজ সত্যকে প্রতিষ্ঠা দেবার জন্য। অথচ যা অনেককাল ধরে প্রায় সবাই ভুলে থাকতে চেয়েছেন—শিক্ষার দেবী, জ্ঞানের দেবী মা-সরস্বতী স্বয়ং নারী, মেয়েমানুষ। উপন্যাসের কথাবয়নে আশাপূর্ণা প্রায়শ জুড়ে দিয়েছেন এরকম উদ্দেশ্যমূলক কথা-রূপ। সত্যবতীর কথার তোড়ে নেড়ুর যেমন আর বাক্যস্ফূর্তি হয় না, মানবীপ্রাণের প্রতি অকারণ বিরুদ্ধতাকেও এক নিমেষে ঔপন্যাসিক ভেঙে তছনছ করেছেন। আধিপত্যবাদী বর্গের মেয়েমানুষকে ঘিরে সমস্ত চিৎকার-চেঁচামেচি এক লহমায় থামিয়ে দিয়েছেন নেড়ুদের মতোই।

যাকে ঘিরে সত্যবতীর সমস্ত গর্ব, যাকে সে অভ্রান্ত বলে জানে, সেই রামকালী কোবরেজ, সত্যবতীর পিতা কিন্তু আধিপত্যবাদী বর্গ-প্রতিনিধি হয়েই দেখা দিয়েছেন উপন্যাসে। আর তাই রামকালী যখন লঘুভাবেও বলেন, 'মেয়েমানুষের লেখাপড়া শিখে লাভ কী? তারা কী নায়েব গোমস্তা হবে?'—তখনও সত্যবতী পিতা বলে রামকালীকে রেহাই দেয় না। ন্যারেটিভে আসে ঔপন্যাসিকের অভিপ্রেত কথাবয়ন, যার ভিতর দিয়ে তিনি বলে নেন স্ত্রী-শিক্ষার প্রয়োজন ও সুবিধের দিকটুকু। কিন্তু লঘুতা বজায় রেখে মেয়েকে আরও রাগিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে রামকালী যখন বলেন, 'মেয়েমানুষের এত বেদপুরাণ জানবার দরকারই বা কি?'—স্থান-কাল-পাত্র বিস্মৃত হয়ে সত্যবতী প্রবীণার মতো বলে ওঠে, 'এত যদি না-দরকারের কথা তো মেয়েমানুষের জন্মাবারই বা দরকার কি, তাই বলো তো বাবা শুনি একবার?'

জীবনের প্রান্তিক ভূমিতে দাঁড়িয়ে শৈশবের সেই সত্যবতীই যেন একদা ঘর ছেড়ে

যাওয়া 'কাটোয়ার বৌ' শঙ্করীকে বলে, 'মেয়েমানুষ যে মাটির পাত্তর এ-কথা বুঝি বিধাতাপুরুষ তার গায়ে দেগে দিয়ে ধরাভূমিতে পাঠিয়েছিল?'

'মেয়েমানুষ'-এর অসহনীয় অবস্থার প্রতি বিরূপতা ও বিরুদ্ধতা যত দিন গেছে, তত তীব্রতর হয়েছে; অনেক বেশি প্রতিবাদীও হয়ে উঠেছে সত্যবতী। উপন্যাসের কথাবয়নের মধ্যে তীব্রতার এই ক্রমোচ্চতাকে ধাপে-ধাপে সঞ্চার করে দিয়েছেন ঔপন্যাসিক। পুঁটির অকালমৃত্যু বা বলা ভালো পুঁটি-হত্যার বিশদ বিবরণ যখন সত্যবতী শুনেছে, চিৎকার করে উঠে বলেছে—'এ অন্যায়ের কোনো প্রতিকার করবে না?' নিতাইয়ের বৌ ভাবিনী সমস্ত অদৃষ্টের হাতে তুলে দিয়ে যখন বলে,—'মেয়েমানুষ তো পড়ে মার খেতেই জন্মেছে;' তখন সত্যবতী ব্যঙ্গ-ক্ষুরধার কণ্ঠে বলে : 'সবই অদেষ্ট বৈকি! এই হতচ্ছাড়া দেশে মেয়েমানুষ হয়ে জন্মানোই এক দূরদিষ্ট!' ভাবিনীর মতো অদৃষ্টকে মেনে না-নিয়ে সত্যবতী আরও বলেছে, সে হলে ওই 'মেয়েখাকী' জামাইয়ের মাথা 'ইটিয়ে গুঁড়ো' করে দিত, তারপর ফাঁসি কাঠে ঝুলত।

মেয়েমানুষকে মানুষের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত দেখতে চাওয়ার অভিপ্রায়-আকাঙ্ক্ষার সিদ্ধি 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র কথনবৃত্তের মধ্যে দেখা না-দিলেও প্রথম প্রতিশ্রুতিটুকু শোনা গেছে সত্যবতীর কাছ থেকেই। আর তাকে যুগ-সমাজের পক্ষে বাস্তবিক করে তুলতে, স্বাভাবিক করে তুলতে, পুরুষশাসিত সমাজে মেয়েমানুষের অনেককাল ধরে বানিয়ে-তোলা ছবিটাকে মুছে ফেলতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সত্যবতীর আপত্তি এবং প্রতিবাদের স্বরটিকে কুশলী আশাপূর্ণা ন্যারেটিভের মধ্যে এক ক্রমোচ্চ ভঙ্গি দান করেছেন।

এ ছাড়াও আরেকভাবে এই মেয়েমানুষের ছবিটাকে ধ্বস্ত করে দেবার ভঙ্গি দেখা দিয়েছে কথাবয়নে পরোক্ষতাকে অবলম্বন করে। প্রত্যক্ষতা অপেক্ষা এই পরোক্ষতার ওপরই যেন আশাপূর্ণার বেশি নির্ভর। অপ্রত্যক্ষ ওই কথনশৈলীকে নবনীতা দেবসেন যেভাবে দেখেন :

> *'সমাজের মেয়েদের কথাও যে এক দিক থেকে সমাজের নিম্নকোটিরই কথা। এক অদৃশ্য, নিঃশব্দ জীবনের প্রতিবেদন, আমাদের সে খেয়াল থাকে না। তার মধ্যে আশাপূর্ণার যে নির্মম দৃষ্টি ফুটে ওঠে, সেটাও একটু নজর করে দেখতে হয়। কেননা উনি বড় জটিল। একটি প্রতারক প্রচ্ছদের আড়ালে রাখেন নিষ্ঠুর সত্যটাকে। যেমন প্রতারক তাঁর ব্যক্তিত্ব—ঘরোয়া গিন্নিবান্নি আটপৌরে জীবনের আড়ালে লালন করেছেন তীব্র মননশীল ধীমতী একটি নারীকে।'*

'আরেক আশাপূর্ণা'-র কথায় এই পরোক্ষতার যে-উৎসভূমি, লেখিকার আদর্শগত অবস্থান এবং উপন্যাসিক বীক্ষণ আমরা আগেই দেখেছি। সেখানে তিনি এমন কথা বলেছেন :

> *আমি কখনও এইটা হওয়া উচিত এ-কথা মনে করে কিছু লিখিনি। জানি কী হয়, সেটাই বলবার। কী উচিত বলবার আমি কে?*

লেখিকা জানেন, শিল্পীর দায়বদ্ধতা আছে যেমন সমাজের কাছে, সাহিত্যিকের কাজ

উত্তরণের পথ দেখানো, তেমনি এ-ও জানেন, 'প্রতিকারের চিন্তা করাও সাহিত্যিকের কাজ নয়।' তাই উপন্যাসের প্রতিবেদনে প্রতিবাদের পাশাপাশি উঠে আসে আরেক ধরনের কথাবয়নের ভঙ্গিমা, যেখানে প্রতিবাদহীন আপাত-সরল কথাগ্রন্থনায় 'মেয়েমানুষ'-এর জীবন সম্পর্কে যে-বিশ্লেষণ উঠে আসে তাতে বিচার নেই, রায় দেওয়া নেই; কিন্তু আছে 'প্রতারক সরলতা'র আড়ালে সত্য উদ্‌ঘাটন। এই পথে কখনো এসেছে কেন্দ্রীয় সত্যের আপাতবিরোধী বক্তব্য, কখনো বা বক্তব্য তির্যক পথমুখী হয়ে উঠেছে। এমনি করে বাচন এবং প্রতিবাচনের কথাগ্রন্থনার মধ্য দিয়ে উপন্যাসে বাচনাতিযায়ী তাৎপর্য উঠে এসেছে, যা আশাপূর্ণার উপন্যাস-বিশ্বের অন্বিষ্ট।

দুই

সত্যবতীর পিসতুতো দাদা জটার সংসার। সংসার মানে সেই পরিচিত দৃশ্য। ঠেঙিয়ে মেয়েমানুষের বিষ ঝেড়ে দেওয়া। বিষ আর কী। জটার বউ স্বামীকে খাইয়ে-দাইয়ে দুটো খেতে বসেছে আর জটা পান চেয়েছে বউয়ের কাছে। পান নেই—বলাতেই বাবুর রাগ হয়ে গেছে; আর তাই বউয়ের পিঠের ওপর ক্যাঁৎ-ক্যাঁৎ করে লাথির ওপর লাথি। বৌ পড়েছে থালার ওপরেই মুখ থুবড়ে। আব সাড়া নেই। ধাক্কা দিয়ে সাড়া নিতে গিয়ে কুমড়ো গড়ান গড়িয়ে সোজা উঠোনে তুলসীতলায়। হতভাগিনী জটার বউযের খেতে বসে প্রায় বিনা দোষে মার খেয়ে গড়িয়ে পড়ে সাড় না-থাকার এই ছবি ঔপন্যাসিক এঁকেছেন আগাগোড়া প্রায় অনুত্তেজক ভঙ্গিতে। সেই সঙ্গে কিছু লঘু চালের ছাপ আছে কথাবয়নে যা আসলে ছদ্মকথনেব রূপ নিয়েছে। 'সমাজের মেয়েদের কথাও যে একদিক থেকে সমাজের নিম্নকোটিবই কথা, এক অদৃশ্য নিঃশব্দ জীবনের প্রতিবেদন'—সে-কথা আমাদের খেয়াল না-থাকলেও আশাপূর্ণার নির্মম দৃষ্টিতে সে-সত্য ফুটে ওঠে। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে ন্যারেটিভে লেখিকার আদর্শগত অবস্থানের আপাতবিরোধী এক বয়ানরূপকে ইচ্ছে করে গড়ে তোলা হয়েছে। একটি 'প্রতারক প্রচ্ছদের আড়ালে' রাখেন তিনি নিষ্ঠুর সত্যটাকে। আসলে প্রতিবাদের এ-ও এক অপূর্ব ভঙ্গি। বিচার নেই, রায় দেওয়া নেই, তবু নিরুচ্চাবিত সত্য বোধ এবং বোধির মিথস্ক্রিয়ায় ক্রমাগত পাঠকমনের অভ্যন্তরে বার্তা পাঠাতে থাকে তাকে বুঝে নেওয়ার জন্য। জটার বউয়ের গুরুভার পতনকে কেন্দ্র করে দৃশ্যসজ্জা তৈরি হয়েছে এইভাবে—সমস্ত পাড়ার মহিলাবৃন্দ ঝেঁটিয়ে এসেছে দেখতে। জটার বউয়ের প্রতি সহানুভূতি জানাতে? জটার করা কাজটাকে শুধুই ধিক্কার দিতে? তাদের কথাবার্তায় এমন ভাব অবশ্য দেখা গেছে যার অর্থ গোঁয়ার জটা তার মায়ের উপযুক্ত সন্তান, নিপাট ভালোমানুষ বৌটা বেঘোরে প্রাণ দিল! তবু, অনেক চাপান-উতোরের মধ্যেও কি কোথাও প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর শোনা গেল? যাবে কী করে! যারা এসেছে এ-ঘটনার সাক্ষী থাকতে, তাবা আসলে এসেছে বৈচিত্র্যহীন দৈনন্দিন গ্রামের জীবনে এমন একটা 'জোরালো রঙদার জীবন নাট্যের দৃশ্য দেখতে। শুধুই মজা দেখতে। আর এক দিক থেকে এ রকম দৃশ্য বড় গা-সওয়া, স্বাভাবিক তাদের কাছে। আর তাই উপন্যাসের কথাবয়নের মধ্যে ঔপন্যাসিকের স্বরন্যাসে ঢুকে পড়ে এমন সিন্‌থেসিস্ :

> *একটা মেয়েমানুষের জন্যে এর চাইতে আর কত বেশি দরদ আশা করা যায়?*

—বাক্যের অন্তর্বর্তী সংলাপ শব্দভেদী বাণ হয়ে 'মেয়েমানুষ'-এর হতশ্রী ছবিটিকে খান-খান করে দেয়। প্রতিবেশী মহিলাবৃন্দ বড় হতাশ হয় নাটকের শুরুতেই নাটক শেষ হয়ে যাওয়ায়। জটার বউ রামকালী কোবরেজের ওষুধে চোখ মেলে চেয়েছে। জটার বউয়ের এই আচরণ তাদের কাছে তাই ধাষ্টামোর চরম, ক্ষমার অযোগ্য। জটার মা'কে পেড়ে ফেলবার এত বড় সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় কিছুতেই তারা বৌটার ওপর প্রসন্ন হতে পারে না। শুধু কি তাই! ছি, ছি, কী ঘেন্না! মামাশ্বশুরের ছোঁয়াচ লাগিয়ে, তারই হাতের ওষুধ খেয়ে চোখ খোলা! অন্তত গোটা দুয়েক প্রায়শ্চিত্ত এবং দেহশুদ্ধি অচৈতন্য অপরাধিনীর অজ্ঞাতে তার জন্য স্থির হয়ে যায়।

দ্বিতীয় দৃশ্য, লক্ষ্মীকান্ত বাঁড়ুয্যের মেয়ে পটলীর বিবাহসভা। বিয়ের দিন যাত্রা-করা বর মৃত্যু-রোগ নিয়ে যাত্রাভঙ্গ করে বাড়ি ফিরে গেলে পটলী লগ্নভ্রষ্টা হতে বসেছে। সে-ছবিতে পটলী নামক প্রাণীটি চুপচাপ থম মেরে বসে আর মহিলার দল তাকে ধরে নাড়া দিয়ে তারস্বরে চেঁচিয়ে চলেছে যে-সমস্ত কথা বলে, তাকে আর যাই হোক, শুভকামনা বলে না। আর পটলীর মা বেহুলা কাঁদতে-কাঁদতে সরাসরি পটলীর মৃত্যু কামনা করে বলেন, "হে মা ওলাই বিবি, হে মা শেতলা, পটলীকে তোমরা নাও, ওর যেন এ ভিটেতে তেরাত্তির না পোহায়।" সহানুভূতি কিংবা সমবেদনাহীন এক নিষ্ঠুর বাচনের মধ্য দিয়ে যেন ঔপন্যাসিক পরিক্রমা করে চলেছেন; আর কোনো দায় নেই তাঁর। কিন্তু এই বয়নরূপের ভিতরে-ভিতরেই এক পরাবাচন নির্মিত হয়ে চলে। মেয়েমানুষের জীবনের চূড়ান্ত মূল্যহীনতার প্রকাশ ঘটে এভাবেই।

মূল্যহীনতার আরেক পরোক্ষ চেহারা প্রকাশ পায় পটলীকে লগ্নভ্রষ্টা হওয়া থেকে রক্ষা করে রাসু এসে যখন ঘরে ঢোকে। বিধবা মোক্ষদা শাঁখ হাতে করে দাঁড়িয়ে থাকেন বারবাড়ির উঠোনে। শাঁখ বাজিয়ে উলু দিয়ে বর-কনে তুলবেন বলে। আশাপূর্ণার সেই পুরোনো কৌশল, আপাতসরল অথচ ভয়ংকর বিদ্রূপতীক্ষ্ণ প্রচ্ছন্ন বাক্য ছিঁড়ে খান-খান করে দেয় পুরুষশাসিত, পুরুষনির্দিষ্ট সমাজবিধিকে :

> *শুভকর্মে বিধবারা সমস্ত কর্মে অনধিকারী হলেও, এই একটি কর্মে তাদের অধিকার আছে, সমাজ অথবা সমাজপতিরা বোধ করি এটুকু আর কেড়ে নেননি, ক্ষ্যামা ঘেন্না করে ছেড়ে দিয়েছেন। শাঁক আর উলু।*

কাশীশ্বরীর নাতবৌ শঙ্করী যখন ঘর ছাড়ল, তখন কাজের বাড়িতে তার অনুপস্থিতিকে সাময়িকভাবে গোপন করার জন্য বলা হল, তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। 'মেয়েমানুষকে খুঁজে না পাওয়ার অর্থই নির্ঘাত বড় পুকুরের কাকচক্ষু জল'—এমন বাচনও নির্দিষ্ট হয়ে ওঠে সেই মূল্যহীনতাকেই পরিমাপ করতে।

মেয়েমানুষকে না-মানুষের পর্যায়ে ফেলে দেওয়াতেই প্রতিবাদী ঔপন্যাসিকের প্রবল আপত্তি। প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ বাচনের মধ্যে তাই লেখিকা বারবার সেই অমোঘ সত্য উচ্চারণ করে চলেন : 'মেয়েমানুষও মানুষ'। অথচ নিষ্ঠুর বাস্তব হল, দুঃখ কিংবা শোক-প্রকাশের অধিকারও তার নেই। এমনকী মাতৃশোকও দেখানো চলে না! ভুবনেশ্বরী মারা যাবার পর সে-খবর যখন সত্যবতীর কাছে পৌছায় এলোকেশী মারফত, তখন

সত্যবতী আঁতুড় ঘরে। ছেলে কোলে করে সত্যবতী একসময় ডুকরে কেঁদে উঠতেই এলোকেশী ছুটে এসে চোখ পাকিয়েছেন। লিঙ্গনির্ধারিত সমাজের বিধি-বিধান এলোকেশীর মুখ থেকে বজ্র হয়ে সত্যবতীর বুকে এসে বিঁধেছে। প্রত্যেকটি কথা কেটে-কেটে বসেছে :

> *বলি মা-বাপ কী কারো চিরদিনের? তবু তো বিধাতাপুরুষের সুবিচার হয়েছে, বাপ না গিয়ে মা গিয়েছে। শাঁখা সিঁদুর নিয়ে এয়োসতী ভাগ্যবতী ড্যাং ডেঙিয়ে চলে গেল, দেখে আহ্লাদ কর, তা নয় মা-মা করে চিৎকার তুলছ!*

—একেই বলে সুবিচার! স্বয়ং বিধাতা 'পুরুষ' বলেই কি? আহ্লাদ করার মতো বিষয়ই বটে। আধিপত্যবাদী বর্গ স্ত্রী-শিক্ষার প্রসঙ্গে নবকুমারের মুখ দিয়ে বলে ওঠে :

> *শুনছ কেলেঙ্কারী? মেয়েমানুষ বিলেত যাচ্ছে! কিনা এম. এ. বি. এ পাস কবতে! বিদ্যের পাহাড়ের চূড়োয় ওঠা চাই! কালে কালে কতই হবে।*

অথচ পুরুষমানুষের হাতের মুঠোয় পৃথিবী। একদা ছেলেবেলার খেলুড়ে নেড়ুকে দেখে সে-কথাই মনে হয়েছে সত্যবতীর। এক ভবঘুরের জীবন স্বেচ্ছায় বেছে নিয়েছে নেড়ু। সত্যবতী সেই অধরা জীবনের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, —"ব্যাটাছেলে হয়ে জন্মেছিস, তাই যা খুশি কববার সুখ পেয়েছিস।" নেড়ুর ভবঘুরে জীবনকে পাবার উপায় হয়তো নেই, কিন্তু প্রতিবাদী সত্যবতী শেষ পর্যন্ত পুরুষনির্ধারিত চার-দেওয়ালের গণ্ডির মধ্য থেকে বাইরে চলে আসে আপসহীনভাবে। সারা জীবন ধরে 'মেয়েমানুষ' হবার জ্বালায় জ্বলতে-জ্বলতে অনেকগুলো প্রশ্ন নিয়ে সত্যবতী গিয়ে দাঁড়াতে চেয়েছে তার চোখে পুরুষতন্ত্রের প্রতিনিধি এবং অভিভাবক বাবার কাছে, কাশীতে। পিতা বামকালী সেই বর্গ প্রতিনিধি বলেই হয়তো সত্যবতী পিতার কাছে আশ্রয় চায় না, চায় নিজের পায়ে দাঁড়াতে। মেয়ে-ইস্কুল প্রতিষ্ঠা করে, শিক্ষকতা করে নিজের সংস্থান সে নিজেই করে নিতে চায়। নবকুমার যখন নরম কথায় সত্যবতীকে ফেরাতে পারে না তখন আধিপত্য ক্ষুণ্ণ হতে দেখে শ্লেষমিশ্রিত পুরোনো স্বরে বলে উঠেছে ·

> *এই জন্যই বলে মেয়েমানুষের বিষয়সম্পত্তি থাকতে নেই! বাপের দলিলের ভরসা রয়েছে তাই স্বামীর অন্ন ত্যাগ দিয়ে চলে যাবার সাহস! মেয়েমানুষের এত সাহস ভালো নয়। এই আমি বলে দিচ্ছি, অশেষ দুঃখু আছে তোমার কপালে। স্বামী হয়ে এই অভিশাপ দিচ্ছি তোমায় আমি।*

—অভিশাপের উৎসে যে রয়েছে নবকুমারের চূড়ান্ত দুর্বলতা, তা সত্যবতী বোঝে বলেই অত বড় অভিশাপেও বিচলিত না হয়ে প্রতিবাদী স্বরকে এক আশ্চর্য ধরনে ব্যবহার করে। বলবার আগে তার হেসে ফেলা এবং বলার পর গলায় আঁচল জড়িয়ে নবকুমারকে প্রণাম করা তার হয়তো বা সব থেকে বড় প্রতিবাদ। সমগ্র উপন্যাসের পরতে পরতে নানামাত্রিক

কথাবয়নে যে-সব প্রতিবাদ সত্যবতী করে এসেছে তাকে ছাপিয়ে যায় এই হাসি ও প্রণাম-মিশ্রিত অথচ দ্রোহাত্মক কণ্ঠস্বর :

> *তাই তো দিয়ে আসছো তোমরা আবহমান কাল থেকে। স্বামী হয়ে, বাপ হয়ে, ভাই হয়ে, ছেলে হয়ে। ওটা নতুন নয়। অভিশাপেরই জীবন আমাদের।*

সামাজিক মূল্যবোধের বৈষম্যই সত্যবতীর কাছে সব থেকে পীড়াদায়ক। সমাজনির্দিষ্ট লিঙ্গ-ভূমিকায় নারীর নিজস্বতা এবং মূল্যকে অস্বীকার করবার যে-নগ্ন চেহারা বারবার সত্যবতীর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, তাতে সত্যবতী দেখেছে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের সব থেকে বড় ভণ্ডামি হল পুরুষকে সমস্ত লৌকিক বিচারের উর্ধ্বে রাখা। পুরুষের করা কাজের সমালোচনা আর যাই হোক কোনো মেয়েমানুষ করতে পারবে না। একেবারে বাল্যাবস্থা থেকে মেয়েদের একটা বিধি-নিষেধের খাঁচার মধ্যে চেপেচুপে ঢুকিয়ে দেওয়াটাই পুরুষতন্ত্রের রাজনীতি। যেখানে নিষেধের পিছনে যুক্তি ধোপে টেঁকেনি, সেখানে পুরুষ বলেছে এটাই ভগবানের বিধান। সামাজিক বৈষম্যের এক শক্তপোক্ত জাল যা নারী-শিকারকে ধরতে পুরুষ-শিকারির বিছানো, তা জন্ম-জন্ম ধরে প্রায় সংস্কারের চেহারা নিলেও সত্যবতী শৈশব থেকেই এই জাল ছেঁড়ার আযোজন করেছে, তা আমরা দেখেছি। জটাকে নিয়ে ছড়া বাঁধায়, নষ্ট-চরিত্র শ্বশুরকে প্রণাম না-করার সিদ্ধান্তে, বিধবা শঙ্করীর অবৈধ সন্তান সুহাসের ভরণপোষণের দায়িত্ব নেওয়া, সুহাস-সুবর্ণকে বেথুনে পড়ানো—দ্রোহ ভাবেরই রকমফের। অচলায়তনকে ভাঙতে না-পারলেও হার মানেনি সত্যবতী। সংসারও ত্যাগ করে গেছে এক বালিকা বিদ্যালয় গড়ে মেয়েদের শিক্ষার আলোয় আনবার স্বপ্ন চোখে নিয়ে। যাবার আগে পিতৃদত্ত ধনও দিয়ে গেছে সংসারকে, মায়ের নামে ত্রিবেণীতে 'ভুবনেশ্বরী বালিকা বিদ্যালয়' স্থাপনের অনুরোধ জানিয়ে। এই পৃথিবীকে 'মেয়েমানুষ'-এর বাসযোগ্য করে যাবার সংকল্পে সমস্ত অনর্থের মূল অশিক্ষাকে প্রাণপণে দূর করার চেষ্টায় ব্রতী হয়েছে সত্যবতী। আধিপত্যবাদী পুরুষবর্গের চাপিয়ে দেওয়া বিধি-নিয়ম যা প্রায় সামাজিক সংস্কারের মতো জাঁকিয়ে বসেছে মেয়েমানুষের জীবনে, তাকে ধ্বস্ত করে দেবার প্রক্রিয়াটি কিন্তু বড়ই সদর্থক। আর তাকে ভালোভাবে না-বুঝলে কারো অমন ক্ষোভ জাগা স্বাভাবিক—'আশাপূর্ণা শেষ পর্যন্ত বিবাহ-সংস্কারকে অস্বীকার করতে পারেননি।' আজকের নারীবাদী সাহিত্যের ধারাটি কিংবা আলোচনার ধরনটি যেখানে এসে পৌঁছেছে-তাকে যে আশাপূর্ণা মেনে নিতে পারেননি, সে তো ঠিক। 'বকুলকথা'র মধ্যে তার সৃষ্টিধর্মী প্রমাণ যেমন রয়েছে, আলাপ-আলোচনায় আশাপূর্ণা বহুবার স্বীকার করেছেন সে-কথা। কিন্তু নারী পুরুষের প্রতিস্পর্ধী হয়ে উঠলে আরেক আধিপত্যবাদকেই প্রতিষ্ঠা দেওয়া হবে—এ-সত্য তাঁর জানা ছিল। আবার বিবাহ-সংস্কার কিংবা স্বামী-স্ত্রীর অচ্ছেদ্য বন্ধনকে প্রত্যাহ্বান জানানোর চেহারাও 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র কথাবয়ানের মধ্যে আছে। একবার শৈশবের সত্যবতীর মধ্যে, আরেকবার পরিণত বয়সে ঘর-সংসার ছেড়ে যাবার সময়ে। কিন্তু সে-ও বড় সদর্থক ভঙ্গি। শৈশবে খেলাঘরের খেলুড়েদের কাছে জটার বউয়ের আচরণে ব্যথিত হয়ে উঠে সত্য বলে উঠেছিল :

বামাবোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে। সামাজিক কুপ্রথার সমালোচনায় মুখর ছিল পত্রিকার একাধিক রচনা। তবে সব রচনার লক্ষ্য ছিল নারী এবং উদ্দেশ্য ছিল নারী-উন্নয়ন। সত্যবতীও সর্বমঙ্গলা বিদ্যাপীঠ-এ বয়স্ক শিক্ষার স্কুলে শিক্ষিকা ছিল, কিন্তু লেখার মধ্য দিয়ে তার প্রতিভার স্ফুরণ ঘটার সুযোগ হয়নি, তৃষ্ণার্ত হৃদয়ের আর্তি, অপ্রাপ্তির বেদনা তাকে বিদ্ধ করেছে বারবার। তাই নারীকেন্দ্রিক বিষয়ে তার তির্যক প্রশ্ন, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চিন্তা হৃদয়ের গভীরে সুরক্ষিত রাখার পেছনে ছিল তার বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয়। সুহাসের সঙ্গে কথাবার্তায় তা স্পষ্ট—'বুদ্ধি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এইটা বুঝেছি অবিরত লড়াইয়ে কেবল শক্তিক্ষয়। কাজের জন্যে যে শক্তি থাকা দরকার সে শক্তির অনেকটা যদি তর্কেই খরচ করে ফেলি, তবে কাজটায় যে ঝিমিয়ে যাব। ...' নারীসমস্যা নিয়ে বিচলিত সত্য নিজের তাগিদে সমাধান-সূত্র খুঁজতে সচেষ্টও হয়েছে। কিন্তু সমস্যার মোক্ষম স্থানে আঘাত করে আলোড়ন সৃষ্টির ইচ্ছে থাকলেও প্রকৃত সহানুভূতির অভাব, স্তুতির পরিবর্তে নিন্দার বাহুল্য বিলাসিতাই তাকে নীরব কর্মের জগতে এগিয়ে দিয়েছে। কর্মই তার প্রেরণা, একাগ্রতাই তার উদ্যম, সমস্যা সমাধানের একমাত্র সোপান। তার বিদ্রোহ অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অসঙ্গতির বিরুদ্ধে, অসাম্যের বিরুদ্ধে, সমাজ-মানসিকতার রন্ধ্রে রন্ধ্রে। আর এসমস্ত অন্যায় অসঙ্গতি অসাম্য প্রশ্নচিহ্ন হয়ে তার মনকে আলোড়িত করে তুলেছে বারবাব। প্রশ্নগুলোর বিষয়ভিত্তিক বিভাজন এরকম

লৌকিক দেশাচার

'সবাইকে ভালোবেসে থাকাই যদি এত ধম্মো হয়, তা হলে সেঁজুতি বত্তটি করতে হয় কেন?'

ধর্মীয় সংস্কার

'সব বিয়েতেই নারায়ণ এসে দাঁড়ান কিনা, সব গাঁট-ছড়াই জন্মজন্মান্তরের বাঁধন কিনা।'

'বত্তটা যদি অন্যায়, সতিন যদি ভালো বস্তু তা হলে বড়বৌয়ের এত কষ্ট কেন?'

বাল্যবিবাহ

'তুশ্চ না-হলে আর তাকে সাত-তাড়াতাড়ি 'পরগোত্তর' করে দিতে হয়?'

লিঙ্গবৈষম্য

'এত যদি না দরকারের কথা তো মেয়েমানুষের জন্মাবারই বা দরকার কি।'

নারীনির্যাতন

'এই হতভাগা দেশে মেয়েমানুষকে কী অপমানের মধ্যে, কী লাঞ্ছনার মধ্যে ফেলে রেখেছো? আইন করে বন্ধ করতে পারো না এসব।'

বধূহত্যা

'ওই খুনে মা বেটাকে ফাঁসিকাঠে ঝোলাবার চেষ্টা করবে না তোমরা?'

কিছু প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছে নিজের সত্তার কাছে, কখনো বা শরণাপন্ন হয়েছে চিরকালের ধ্রুবতারা পিতার কাছে। শুধু একটা প্রশ্নের উত্তর পায়নি, বা পেয়েও তার অন্তরাত্মা তৃপ্ত হতে পারেনি—মেয়েদের জীবন কি মানুষের জীবন নয়? বিয়েই কি মেয়েদের জীবনের একমাত্র এবং শেষকথা? বিবাহ-সংস্কারের বিরোধিতা করে কোনো বিদ্রোহের ছবি সত্যের অনুভব-আচরণে খুঁজে পাওয়া না-গেলেও বিবাহ-সংস্কারের জয়গানও তার কণ্ঠে শোনা যায়নি, যদিও সুহাসকে ব্রাহ্মসমাজের পরহিতৈষী ছেলের হাতে সমর্পণের গোপন ইচ্ছে তার ছিল। অবশ্য এর পেছনে তার যুক্তি 'মেয়ে বলেই কী 'তুচ্ছ' বাবা? একটা মানুষের জীবন তো?' মূলত মানুষ হিসেবে ব্যক্তি হিসেবে তার স্বতন্ত্র সত্তাকে স্বীকৃতি দেওয়া, তার অস্তিত্বকে মর্যাদা দেওয়া, তার প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, ইচ্ছে-অনিচ্ছে, কামনা-বাসনা, ভালোলাগা-মন্দলাগা, মূল্যবোধ-মানসিকতাকে প্রাধান্য দেওয়াই ছিল একমাত্র কারণ সেখানে বিবাহকে সে সংস্কার হিসেবে মনে করেনি, তার কাছে বিবাহ জীবনের তুচ্ছ-অতুচ্ছ হাজারো প্রাপ্তির মতোই একটা প্রাপ্তি। সত্য প্রগতিশীল, স্বাধীন, 'ঝাঁকের কৈ' হবার জন্যে সে জন্মায়নি। অথচ এই উদার মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিত্বের বিধবাবিবাহে অনীহার পেছনে কি সত্যিই কোনো কারণ ছিল না? সমকালীন সংস্কার- আন্দোলনের মধ্যে একমাত্র বিধবাবিবাহ সত্যবতীর সার্বিক সমর্থন পায়নি · 'বিধবা বিয়ে আমার চোখে অবশ্যি ভালো ঠেকে না, তবে মন্দের ভালো'। অন্যান্য বৈষম্য নিয়ে সে যতটুকু সরব বা উচ্চকিত, বিধবাবিবাহ প্রসঙ্গ সচেতনভাবে এড়িয়ে যাওয়ার পেছনে যুক্তি হল শাস্ত্রকাবদের উপদেশ। যদি তাই হয় তা হলে শাস্ত্রকারদের অন্যান্য নির্দেশ নিয়ে তার কঠোর মনোভাব অব্যক্ত থাকেনি কখনো কোথাও। মনে হয়, বিধবাবিবাহের ক্ষেত্রে নারীর জীবনদাতা, নারীর পৃথক সত্তা ঘোষণার দাবিদার বিদ্যাসাগরের কথা তার চিন্তায় ছিল, তাই স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন না-করলেও বিরুদ্ধাচরণ করেনি সে।

সব আশাজাল যায় রে যখন উড়ে পুড়ে

সাধন, সরল, সুবর্ণ সত্যবতীর সন্তান। লেখাপড়া শিখিয়ে সত্যিকার মানুষ হিসেবে গড়ে তোলাই ছিল তার উদ্দেশ্য। তার বিশ্বাস 'চাকরির জন্যে পড়া নয়, মানুষ হওয়ার জন্য পড়া'। আর সুবর্ণর মধ্যে সত্য নিজের জীবনের অসম্পূর্ণতাকে পূর্ণ করে তোলার স্বপ্ন দেখে। বাড়িতে পড়াশুনার সঙ্গে সঙ্গে বেথুন স্কুলে ভর্তি হয় সুবর্ণ। গ্রামের বাড়িতে আসা অবধি ঠাকুমা এলোকেশী 'মেয়েমানুষের বিদ্যে শেখা যে কতদূর গর্হিত কাজ' তাই বোঝাতে চেষ্টা করেছেন সুবর্ণকে; এতে ব্যর্থ হলে সুবর্ণকে নিয়ে পাড়া বেড়ানোতে মনোযোগী হয়েছেন। মূলত মা সম্পর্কে সুবর্ণর বৈরীভাব গড়ে তুলতে উদ্যোগী ভূমিকা নেন এলোকেশী, সত্যবতীর শাশুড়ি। কারণ সত্যের নয় বছর বয়স থেকেই শাশুড়ি এলোকেশী পুত্রবধূর সঙ্গে যুক্তিতর্কে জয়লাভ করতে পারেননি। পুত্রকেও হাতছাড়া করতে হযেছে, পুত্রবধূকে বশীকরণ মন্ত্রে, এমনকী শাসনদণ্ডের নাগপাশে শৃঙ্খলিত রাখার ব্রতেও হাব মানতে হয়েছে তাকে। তাই তার ইচ্ছে ছিল 'মা যেমন কুকুর' সুবর্ণকে 'তার উপযুক্ত মুগুর' করে তোলা। কিন্তু সত্যের আকাঙ্ক্ষা তো অনেক উঁচু পর্দায় বাধা। সে চেয়েছিল মেয়ের মধ্যে নিজের অপ্রাপ্তিকে পূর্ণরূপ দিতে, একবার জ্বরের ঘোরে অর্ধচেতন অবস্থায় সত্যবতী স্বামী

নবকুমারকে দিয়ে শপথ করিয়েছিল · 'সুবর্ণকে মেরে ফেলো না। ওকে বাঁচাতে হবে, হাজার হাজার সুবর্ণকে বাঁচাতে হবে'—বাংলাদেশের অগণিত বালিকাকে দেখতে পায় সত্য সুবর্ণর মধ্যে। বাল্যবিবাহের অভিশাপ থেকে বাঁচাতেই সত্যর এই আকুতি-আবেদন। নবকুমার ভেবেছিল 'পাগলের সঙ্গে চাতুরিতে দোষ কি'—সত্য পাগল, অতএব পাগলের সঙ্গে ছলনাতে অপরাধ নেই। প্রচলিত নিয়ম-কানুনের বাইরে, অন্যায় পদ্ধতির সঙ্গে আপসে অনাগ্রহী, সমাজ-মানসিকতার মূল স্রোতের বিপরীতপন্থী জন শুধু উনিশ শতকের দৃষ্টিতেই পাগল নয়, প্রতিটি শতকেই পাগল হিসেবে চিহ্নিত। যুগে যুগে দেশে দেশে এরকম পাগল জন্ম নিয়েছে যারা পরবর্তী সময়ে আখ্যায়িত হয়েছে প্রাগ্রসর বিশেষণে। জীবিতকালে নিন্দাবাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতায় যাদের প্রাপ্তির খাতা পূর্ণ, মৃত্যু-পরবর্তী সময়ে তারাই হয় উচ্চ-প্রশংসিত, বিভিন্ন অভিধায় ভূষিত। সত্যকেও তার সময়, সমাজ, সুজন কেউ বোঝেনি। তাই সত্যের আশা, স্বপ্ন বাস্তবায়িত হতে পারেনি। সবকিছু তাসের ঘরের মতো ভেঙে যায় এলোকেশীর চক্রান্তে আর ব্যক্তিত্বহীন অসাড় নবকুমারের সম্মতিতে। সুবর্ণর বাল্যবিবাহের মধ্য দিয়ে এলোকেশী পুত্রবধূর কাছে পরাজয়ের প্রতিশোধ নিয়ে পিতৃতন্ত্রের ধ্বজারই জয়গান করেন।

স্বামী, সন্তানের কাছে স্পষ্টবক্তা, আপসহীন, সত্যবাদী, ব্যক্তিত্বময়ী সত্যের পরিচয় 'প্রীতিকর নয়? ভীতিকর'। যে-সন্তানকে নিয়ে তার স্বপ্ন-পরিকল্পনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা—সে-ও তো পুরুষতন্ত্রের প্রহরী। তাই বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেবেলায় মায়ের প্রতি সহানুভূতি ভালোবাসার স্থান নেয় বিরক্তি, তাচ্ছিল্য, অবজ্ঞা। অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে মায়ের প্রতিবাদ বা বিদ্রোহ ঘোষণা সাধনের দৃষ্টিতে 'নির্লজ্জ কেলেঙ্কারিব' নামান্তর। কারণ পুত্রও তো পুরুষতন্ত্রের ধারক-বাহক, মায়েব আত্মস্বাতন্ত্র্য তাব কাছে কখনোই স্বীকৃত হতে পারে না।

অন্যদিকে সত্যবতী যেখানে যুগচক্রের আবর্তনে আলোড়িত হয়, নবকুমার সেখানে ধীর, অচেতন। সত্যবতী সিদ্ধান্ত নেয়, সমাধানসূত্র বের করে, অন্যায়ের প্রতিবাদ করে, প্রতিরোধ চায়; সেখানে নবকুমার ভয়ে ভীত, সবকিছুর সঙ্গে সবার সঙ্গে আপসের বাজনীতিতে বিশ্বাসী। সমাজনির্দিষ্ট লিঙ্গ-ভূমিকাব এক বিপরীত ছবি দেখা যায় সত্যবতীর মধ্যে। আর এখানেই সত্যবতী হয়ে ওঠে স্রষ্টাকেও অতিক্রম করে-যাওয়া এক মূর্তিমতী প্রতিবাদ, চেনা-অচেনার আলো-আঁধারিতে এক স্বতন্ত্র সত্তা। তাই পুত্রের অবহেলা, স্বামীর অভিশাপ ('অশেষ দুঃখু আছে তোমার কপালে। স্বামী হয়ে এই অভিশাপ দিচ্ছি তোমায়...') বিচলিত করতে পারেনি তাকে। শ্লেষাত্মক সুরে স্বামীকে লক্ষ করে পিতৃতন্ত্রের উদ্দেশ্যে বলেছে—'তাই তো দিয়ে আসছো তোমরা আবহমান কাল থেকে। স্বামী হয়ে, বাপ হয়ে, ভাই হয়ে, ছেলে হয়ে। ওটা নতুন নয়। অভিশাপেরই জীবন আমাদের'।—এই অভিশাপের জীবন থেকে মুক্ত হবার সংগ্রামই তার আজীবনের সঙ্কল্প, মেয়েমানুষের প্রত্যাশা, চাহিদাকে উত্তরণের পর্যায়ে চিহ্নিত করার প্রচেষ্টাই তার জীবনব্যাপী লড়াইয়ের কেন্দ্রবিন্দু।

আমি একলা চলেছি এ ভবে

উনিশ শতকে নারীরা জন্ম থেকেই স্বামীগৃহের জন্য বলিপ্রদত্ত, 'an inmate of this

active universe' হবার ভাবনা তাদের মধ্যে অঙ্কুরিত হবার অবকাশ নেই। কেউই হতে পারেনি, ইচ্ছে হলেও হতে দেওয়া হয়নি। সত্যবতী এখানেই ব্যতিক্রমী, শিশুবয়সে বিয়ে হলেও চিন্তাশক্তি তার প্রখর, আকাশচুম্বী। তাই সমাজ, সংসারের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে সে নিজের ইচ্ছেকে, নিজের অবস্থানকে পরিণত রূপ দেবার জন্য সচেষ্ট হয়েছে, পরিসরকে বুঝে নিজের অবস্থান তথা আসনকে নিজেই তৈরি করতে চেয়েছে। এক্ষেত্রে তার সহায়ক পুরোপুরি কোনো ব্যক্তিমানস নয়; উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত পিতার প্রখর ব্যক্তিত্ব, অনমনীয় দৃঢ়তা এবং নিজের যুক্তি-বুদ্ধির মধ্য দিয়ে প্রাপ্ত সিদ্ধান্ত। দুজনের প্রচ্ছন্ন সহানুভূতি অলক্ষ্যে ছিল, এক. পিতা রামকালী, দুই. মাস্টার ভবতোষ। তবে সমস্ত কিছুর পেছনেই ছিল হওয়া আর হয়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষা, এক নিরন্তর প্রক্রিয়া। জগতের কর্মযজ্ঞে মেয়েমানুষের অপরিহার্য উপস্থিতির কথা ঘোষণা, মেয়েমানুষ যে শুধু মেয়ে নয়, মানুষ; পুরুষশাসিত সমাজে সে যে শুধু নিয়তির অলঙ্ঘ্য অভিশাপ নয়, তার স্থান কলুর বলদের মতো একহাত ঘোমটা দেওয়া চারদেওয়ালের কূপমণ্ডুক জীবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, তারও যে মন বলে বস্তু আছে, সে-ও যে পুরুষের মতোই বহির্জগতে পদার্পণের অধিকারী, তাই শুধু সগর্বে, সতেজে, সঘোষে শুধু বলাই নয়, করে দেখাতে চেয়েছে ছোটবেলা থেকে। অসাধারণ হয়েই জন্মেছে সে, এরজন্যে শিশুবয়সে বাড়ির প্রবীণাদের কাছ থেকে কৈশোরে শাশুড়ির কাছ থেকে, যৌবনে পতি এবং পরিশেষে পুত্রের কাছ থেকে বিরূপ মন্তব্য শুনতে হয়েছে তাকে। কারণ সাধারণের মধ্যে জন্ম নিয়ে বেড়ে উঠেও সে ছিল অসাধারণ। নির্বাক গোষ্ঠীর প্রতিনিধি ভুবনেশ্বরী কন্যাকে অসাধারণ দেখতে না-চাইলেও বিরুদ্ধাচরণ করেননি, মৌনই থেকেছেন চিরকাল। তবে এক্ষেত্রে পিতা রামকালীর ছিল সস্নেহ প্রশ্রয়, কারণ সত্যকে সাধারণ গোত্রভুক্ত করতে তাঁর মন সায় দেয়নি। সত্য নিজেও তা জানত, তাই অসাধারণের চিন্তাচেতনা ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্বের ভাবনার মানদণ্ডে বিচারের আশায় রামকালীকেই নির্ভর করেছে—'আমার বিচার তুমি কর তব আপন করে'—জীবনের শেষ সিদ্ধান্তের কথা জানাতেও তার অন্য কারো কথা মনে আসেনি, রামকালীই তার একমাত্র ভরসা তথা শেষ আশ্রয়। স্বামীগৃহের বন্ধন ছিন্ন করে তার কাশীযাত্রা আশ্রয়ের জন্য নয়, তার সংকল্প তার শেষ সিদ্ধান্ত, তার উদ্দেশ্য তথা ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা পিতাকে জানানোর অভিপ্রায়ে। 'এত কামনা এত সাধনা কোথায় মেশে'—এই সংশয় থেকেই জীবনব্যাপী তার মুখরতা জীবনের শেষ পর্যায়ে স্তব্ধতায় পর্যবসিত।

'শতক আসে শতক যায় সময় স্রোতের ডাঙ্গায়'— তাই উনিশ শতকের সত্যবতীর মতো বিশ শতকে বাণী বসুর বন্দনাকেও একান্ত নিজের ঘর খুঁজতে অজানা অচেনা অপরিচিত পথে দিশাহারাভাবে পা বাড়াতে হয়। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, শক্তির অবশিষ্টাংশ অবহেলিত জনকে সমর্পণের মধ্য দিয়ে পূর্ণ আনন্দপ্রাপ্তির প্রত্যাশাতেই তাদের এই ভূমিকা, এই উদ্যোগ, এই পদক্ষেপ। প্রশ্ন জাগে, তা হলে কি উনিশ শতকের মতো একুশ শতকেও সার্বিক বিচারে সত্যবতী যুগের তথা সময়ের তথা ভাবনার ক্ষেত্রে একইভাবে প্রাগ্রসর? তাই তার বৈপ্লবিক পদচারণার দৃপ্ত ঘোষণার মধ্যেও থেকে যায় এক না-বলা বাণীর সুর,

'সহস্র শূন্যের শীর্ষে ওড়ে এই ডানার নির্বাক উন্মাদনা ভাষার পালক থেকে ক্রমশ আকাশ

ঝরে যায় কয়েকটি সংকেতলিপি এখনো বুঝিনি ভালো, তাদের আবার পাঠ করি আমিও কিছুটা অসহায়। শুধু এক সর্বগ্রাসী উড়ে যাওয়া ছাড়া আর কী আছে আমার।'

যদিও ২১ শতকের চিন্তাচেতনার স্রোত ভিন্ন খাতে বাহিত তথাপি প্রকৃত চিত্র এখনো প্রচ্ছন্ন, তাই শনাক্তকরণ এ মুহূর্তে দুরূহ। সত্যভ্রমে আচ্ছন্ন চিত্রে স্বচ্ছতার জন্য আমাদের অপেক্ষা করে থাকতে হবে আরও কিছু সময়, পরিসরকে তুলে ধরা তো সময়েরই দায়। আমরা শুধু অশান্ত সময়ের মঞ্চে অবতীর্ণ কলাকুশলীমাত্র।

প্রথম প্রতিশ্রুতি : প্রতিবাদী কথকতার নির্মাণশৈলী

উদয়চাঁদ দাশ

'সত্যবতীর গল্প আমার লেখা নয়। এ-গল্প বকুলের খাতা থেকে নেওয়া'। কাহিনি-কথক তা হলে লেখিকা নন, আর কেউ। 'বকুলের খাতা থেকে নেওয়া'। —তাই বা কেমন করে হবে! বকুলের সে-খাতার খোঁজ মিলল কি? 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' থেকে 'বকুলকথা' পর্যন্ত দীর্ঘ পথ-পরিক্রমায় সে-খাতার তো সন্ধান মেলেনি! বরং 'বকুলকথা'-য় পারুলকে লেখা বকুলের চিঠিতে রয়েছে—'বকুলের খাতাটা কোথাও খুঁজে পেলাম না। মনে হচ্ছে হারিয়েই ফেলেছি।' তবে কি কাহিনি-কথক পারুল! কিন্তু আমরা তো জেনেছি—'লিখতে পারেন না সেজদি। কবিতা পারেন, গদ্য নয়।' আর খাতাই বা কেন। স্মৃতি যা-কিছু সঞ্চিত আছে, সে তো মনের খাতায়! বকুল যখন তার লেখিকা-সত্তা অনামিকা দেবীর সামনে এসে দাঁড়ায়, ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলে—'কী আশ্চর্য! আমাকে একেবারে ভুলে গেলে, স্রেফ বলে দিলে খাতাটা হারিয়ে ফেলেছ,' আর তখন মনের খাতায় সঞ্চিত পূর্বজীবনকে স্মরণ করে স্মৃতি-ভারাতুর অনামিকা দেবী বলে উঠেছেন—'না না! হঠাৎ দেখতে পাচ্ছি হারিয়ে ফেলিনি। রয়েছে, আমার কাছেই রয়েছে। তোমার সব ছবিগুলোই দেখতে পাচ্ছি।' এরপব স্মৃতিপটে ভিড় করে এসেছে ফেলে-আসা বকুলজীবনের কথা। কিন্তু সে তো বকুলের কথা! সত্যবতীর কাহিনি-কথক তবে কে? বকুল চিঠিতে লিখেছিল পারুলকে—'বকুলের খাতাটা আমি খুঁজে পাচ্ছি না. তুই খুঁজে দেখিস'। পারুল যেহেতু গদ্য-কথা লেখেন না, লিখতে পারেন না; তাই মনে মনে বলেন, 'আমি খুঁজে পেয়ে কী করবো,' তারপর বলেন, 'বকুল বলেছিল নিজেদের কথা আগে বলতে নেই। আগে পিতামহী প্রপিতামহীর ঋণ শোধ করতে হয়।' এবং তার পরই মনে ভাবেন, 'সে ঋণ তবে শোধ করছে না কেন বকুল? না কী করেছে কখন সে-ও আমার অসতর্কতায় চোখ এড়িয়ে গেছে?' 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'-রও সূচনা-পাঠে এ-কথার পূর্বধ্বনি শোনা গেছিল · জীবনের দীর্ঘপথ পার হয়ে এসে বুঝতে শিখেছে বকুল, পিতামহী প্রপিতামহীর ঋণ শোধ করতেই সত্যবতীর অবতারণা এবং সেই পথেই এসেছে সুবর্ণলতা। তবু, তা মা এবং মাতামহীর কথা। বকুলের পিতামহী মুক্তকেশীর কথা 'সুবর্ণলতা'-র আখ্যান বয়নের সূত্রে ন্যারেটিভের মধ্যে কিছুটা মিললেও প্রপিতামহীর দেখা মেলেনি নারীজীবনের কালান্তরের কথায়। নারীজীবনের তিন ভুবনের বিস্তারিত কথকতায় এমন ফাঁক আরও পড়েছে। 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র সূচনা-পাঠে যখন জানি এ-গল্প কাহিনি-কথকের নিজের লেখা নয়, তখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে, কে তিনি? যিনি বলেন :

> *বকুলকে আমি ছেলেবেলা থেকে দেখছি। বরাববই বলি,*
> *'বকুল তোমাকে নিয়ে গল্প লেখা যায়।'*

'প্রথম প্রতিশ্রুতি' থেকে 'বকুলকথা'-র মধ্যে আখ্যান কিংবা বকুলের পরিচয়-বৃত্তে এমন কেউ দেখা দেননি, যিনি বকুলের খাতা থেকে এ কাহিনির কথক হয়ে উঠবেন।

আরও আছে। মুর্শিদাবাদের জীবন থেকে রামকালী বিচ্ছিন্ন হবার আগেই যে গোবিন্দ

গুপ্তের স্ত্রী, অর্থাৎ কবিরাজ-গৃহিণীর মৃত্যু ঘটেছিল, সে-কথা 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'-র প্রান্তিক পাঠে রামকালী কবিরাজের স্মৃতিচারণার সূত্রে নতুন করে জানি বটে; কিন্তু সূচনা-পাঠে ছিল গোবিন্দ গুপ্ত এবং তাঁর স্ত্রী উভয়ের কাশীবাসে মনস্থির করার কথা। গোবিন্দ গুপ্ত রামকালীকে পরামর্শ দিয়েছেন, 'তোমার আর রাজবদ্যি হয়ে কাজ নেই বাপু, রাজ্যে এখন ভেতরে ভেতরে ঘুণ ধরতে বসেছে, নবাবের নবাবী তো শিকেয় উঠেছে। আমার এই দীর্ঘকালের সঞ্চিত অর্থরাশি নিয়ে দেশে পালিয়ে গিয়ে নিজে নবাবী করো গে। আমরা স্ত্রী-পুরুষ উভয়ে কাশীবাসে মনঃস্থির করেছি!'

সত্যবতীর আখ্যান যদি বকুলের খাতা থেকে পাওয়া ধরেও নেওয়া যায়, তবু তা কল্পনার ছবি। বকুল তো নয়ই, সত্যবতীকে আশাপূর্ণা নিজেও দেখেননি। সত্যবতীর জীবনভূমি আশাপূর্ণার প্রত্যক্ষ জীবন-অভিজ্ঞতার বাইরে। যে-জীবনের পশ্চাদ্‌ভূমির কথায় এসেছে মুর্শিদাবাদ এবং নবাবি আমলের অপসৃয়মান জীবন। ইতিহাসের সন-তারিখ হাতড়ালে পিছিয়ে যেতে হয় ঔপন্যাসিকের জীবনবৃত্ত থেকে অন্তত শতাব্দীকাল পিছনে। সত্যবতীর পিতা রামকালী কবরেজ যে-জীবন থেকে উঠে এসেছেন ত্রিবেণীর কাছে নিত্যানন্দপুরে, নিজের গ্রাম দেশে।

'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র সূচনাপাঠে কাহিনি-কথককে নিয়ে কিছু দ্বিধা-সংশয়ের সূত্রপাত ঘটলেও এ আসলে আশাপূর্ণার জীবনের পশ্চাৎভূমির গল্প। তা বলবার পক্ষে দুটি পথ খোলা ছিল। আত্মজৈবনিক উপন্যাস-কাঠামোতে উত্তমপুরুষে সরাসরি বলা অথবা, এমনভাবে সর্বজ্ঞের দৃষ্টি থেকে জীবনের রূপকার এবং ব্যাখ্যাতা হয়ে বলা। 'সুবর্ণলতা হচ্ছে সেই যুগের, যে-যুগকে আমার শৈশববাল্যে প্রত্যক্ষ দেখেছি' কিংবা, 'সুবর্ণলতা'র কালটি আমার নিজের দেখা বলেই এই বইটির প্রতি আমার দুর্বলতা একটু বেশি'[১]—এই ধরনের কথায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে সত্যবতীর কাল ঔপন্যাসিকের জীবৎকালসীমাকে ডিঙিয়ে গেছে পিছনের দিকে। যদিও সত্যবতীর কালসমাজ ঔপন্যাসিকের জীবনসীমার পূর্ববর্তী হলেও অজানা নয়। আপন অভিজ্ঞতার জগৎ থেকেই রসদ সংগ্রহ করেছেন সে-জীবন বীক্ষণে :

> *সবাই উঠে এসেছে আমার জীবনের পারিপার্শ্বিক পটভূমি থেকে যা লিখেছি আমার দেখা মধ্যবিত্ত জীবনের গণ্ডি থেকেই দেখা।*[২]

আরেকভাবে সত্যবতীর গল্প তো তাঁরই গল্প। লেখিকার মতে সবার লেখাতেই তার নিজের 'আমি'-টা অন্তরালে কাজ করে।[৩] স্মৃতি হাতড়ে তাঁকে এ-ও বলতে শুনি :

> *যখন আমার খুব কম বয়েস তখন থেকেই দেখতাম পারিবারিক জীবনে আত্মীয়স্বজনের মধ্যে—আমাদের মধ্যবিত্ত জীবনের কথাই বলছি ছেলে এবং মেয়ের মধ্যে মূল্যবোধের বড় বেশি তফাৎ। মেয়েরা যেন কিছুই নয়, আর ছেলেরাই পরম মানিক, এই রকম ব্যাপার। এটা আমাকে খুব বিদ্ধ করত। কিন্তু আমাদের আমলে তো এমন সাহস ছিল না যে প্রতিবাদ করি, এমন কী গুরুজনের মুখের উপর একটি কথা বললেও তো ফাঁসির হুকুম হয়ে যাবে। তাই মনের মধ্যে রাগ-দুঃখ*

জ্বালাটা জমত। আমার সেই নিরুচ্চার প্রতিবাদগুলোই যেন এক একটি প্রতিবাদের প্রতিমূর্তি হয়ে আমার কাহিনির নায়িকারূপে দেখা দিয়েছে। যেমন 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র 'সত্যবতী'।[৪]

প্রতিবাদী লেখিকার অবস্থানটিকে আরেকবার চিনে নিই 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র প্রসঙ্গে বলা অন্য একটি কথায় :

ছেলেবেলা থেকেই আমার প্রশ্নমুখর মন তখনকার প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার অসঙ্গতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে প্রখর হয়ে উঠেছে। মনে হয়েছে মানুষে মানুষে ব্যবস্থার এমন পার্থক্য কেন? অবস্থার এমন অসাম্য কেন? এমন অনেক 'কেন'ই আমায় পীড়িত করেছে। বেশি পীড়িত করেছে মেয়েদের অবস্থা। কেন তাদের সকল বিষয়ে এই অধিকারহীনতা? কেন তাদের জীবন কাটে অবরোধের অন্ধকারে? এই সব প্রশ্ন আমায় স্থির হতে দেয়নি, হয়তো এই প্রশ্নের ফলশ্রুতিই আমার 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'।

কথাবয়নের মধ্যে তাই সর্বজ্ঞের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে অতিরিক্ত যুক্ত হয়েছে আত্মজীবনের অভিজ্ঞতা। আর তাই সূচনাপাঠেই বকুলের স্বরন্যাসে শুনিয়ে দেন—'একে গল্প বলতে চাও গল্প, সত্যি বলতে চাও সত্যি।'

বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে জন্ম নিয়ে যে-সমাজটাকে লেখিকা দেখেছিলেন বাল্যে-শৈশবে, তার মধ্যে নারী-পুরুষের সামাজিক অবস্থানগত অসাম্য তাঁকে সব থেকে বেশি পীড়া দিয়েছে, আলোড়িত করেছে,—এ-কথা তাঁর কাছে বারে বারে শুনতে পাই। সর্বত্র দেখেছেন পুরুষের প্রবল প্রতাপ। মেয়েদের নতজানু, দুঃখ-নিরুপায় জীবন তাঁর মনকে দারুণ অস্থির করত। মনে প্রশ্ন জাগত—'কেন এমন অবিচার? কেন মেয়েদের এমন অধিকারহীনতা?' লেখার মধ্যে সেই প্রশ্নই দেখা দিয়েছে বারে বারে। প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে রবীন্দ্রসৃষ্টির কাছে গেছেন যখন, আপন জিজ্ঞাসার যে-উত্তর তিনি নিজে একরকম করে ভেবেছেন, তারই সমর্থন মিলেছে রবীন্দ্র চিন্তা-দর্শনে :

মেয়েদের ওপর অশ্রদ্ধা ও নিষ্ঠুরতার একটা কারণ আমাদের মনের বুদ্ধিগত বিকাশের কার্যে তাদের সাহায্য আমরা অল্পই পেয়েছি। কেবল আমাদের খাওয়ানো পরানো; কেবলমাত্র আমাদের দেহের প্রয়োজন সাধনে তাদের সেবা পাই বলেই একজায়গায় তাদের মূল্য আমাদের কাছে ভিতরে ভিতরে খুব কমে যায়।

আশাপূর্ণার মনে হয়েছে এটাই আসল কথা এবং বোধহয় শেষকথা। মেয়েদের কাছে পুরুষেরা পায় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, মানসিক সহায়তা তেমন পায় না। পেতে চায়ও না, পাবার চেষ্টাও করে না। উনিশ শতকের যুগ-পরিবেশ অনেক বদলেছে কিন্তু পুরুষতান্ত্রিক সমাজের মনোধর্মকে লেখিকা বদলাতে দেখেননি। তাঁর অনুভবে ধরা দিয়েছে—'মেয়েরা যত সহজে প্রেয়সী হতে পারে, তত সহজে শ্রেয়সী হয়ে উঠতে পারে না।' তাঁর মনে হয়েছে, সাহিত্যে

ব্যক্তিগত সমস্যাই প্রাধান্য পাচ্ছে। সমষ্টিগত সামাজিক সমস্যার কথা কেউ তেমন ভাবছে কই? সমষ্টির সমস্যা যেটুকু সাহিত্যের বিষয়ীভূত হচ্ছে তা মূলত অনগ্রসর সমাজের সমস্যা। পুরুষের কলমে নারীর সামাজিক সমস্যাগুলি তো তেমনভাবে আসছে না। এ-কথা ঠিক, নারীর কলমই নারীকে চিনিয়ে দিতে পারে ভিতর থেকে। প্রতাপের কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত পুরুষের পক্ষে কখনোই সে অন্তরতর ছবিটিকে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব ছিল না। জীবনে কিছু কিছু অভিজ্ঞতা-উপলব্ধির অংশীদার নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রায় সমান হলেও এমন বেশ কিছু অভিজ্ঞতা-উপলব্ধি আছে, যা কেবলমাত্র নারীর। 'সে বিষয়ে নারী যেভাবে প্রশ্ন তুলতে পারেন, প্রতিবাদ জানাতেও পারেন, কোনো পুরুষ সেভাবে পারবেন না; নারীর অভিজ্ঞতা-উপলব্ধির বর্ণমালা অনেকটাই পুরুষের অজানা থেকে যায় বলে।'[৫] 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' থেকে 'বকুলকথা' তাই নারীজীবনের কালান্তরের ছবিকে ফুটিয়ে তুলতে চায়।

আশাপূর্ণা জানেন তাঁর দায়বদ্ধতা আছে সমাজের কাছে। সাহিত্যিকের কাজ উত্তরণের পথ দেখানো। শুধু বানিয়ে তোলা নয়! কেবল সাজিয়ে লেখা নয়। কিন্তু তিনি এ-ও জানেন · প্রতিকারের চিন্তা করা সাহিত্যের কাজ নয়। সে-কাজ সমাজ-সংস্কারকের। তিনি তাই স্পষ্ট করেই জানান :

> *আমি কখনও 'এইটা হওয়া উচিত' এ-কথা মনে করে কিছু লিখিনি।*
> *জানি কী হয় সেটাই বলবার! কী উচিত বলবার আমি কে?*

লেখিকার এই আদর্শগত অবস্থানজনিত কারণে তাঁর উপন্যাসের কথাবয়নে এসেছে পরোক্ষতা। যে-পরোক্ষতাকে কখনো কখনো ভুল বুঝেছি আমরা। ভাবতে চেয়েছি, স্বরচিত সীমারেখাকে আশাপূর্ণা সাধারণত অতিক্রম করতে চাননি। অথচ অন্তরঙ্গ পাঠ-সমীক্ষায় তাঁর উপন্যাসের প্রতিবেদন জুড়ে আমরা লক্ষ করি উঠে আসছে বাচন ও প্রতিবাচনের গ্রন্থনার মধ্য দিয়ে বাচনাতিযায়ী তাৎপর্য। 'সাহিত্য ও সমাজ' চিন্তার মধ্যে আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি লেখিকার মানসবিশ্বে বারবার আলোড়ন তুলেছে এই ভাবনা যে, সাহিত্যে ব্যক্তিগত সমস্যাই প্রাধান্য পাচ্ছে; সমষ্টিগত সামাজিক সমস্যার কথা কেউ তেমন ভাবছেন না। কেন মেয়েদের এমন অধিকারহীনতা কিংবা পুরুষের সঙ্গে তুলনায় চূড়ান্ত সামাজিক অসাম্যের শিকার—নারীর সমস্যা নিয়ে পুরুষেরা কেউ তেমন আলোড়িত নন। আর সেই চেতনায় সমাজ-নির্দিষ্ট লিঙ্গভূমিকাকে অতিক্রম করে যেতেই আশাপূর্ণা তাঁর ত্রয়ী উপন্যাসের প্রতিবেদন গড়ে তোলেন ব্যক্তিস্বরকে সামাজিক উচ্চারণে রূপান্তরিত কবতে চেয়ে। আশাপূর্ণাকে নারীবাদী লেখিকা কিংবা তাঁর সৃষ্ট জগৎ নারীবাদী দৃষ্টিকোন থেকেই ব্যাখ্যাত হবার অপেক্ষা বাখে—এমন কথা বলবার মতো যথেষ্ট উপকরণ যদি আমাদের হাতে না-ও জমে, তবু সৃষ্টিকর্মের পশ্চাদ্‌ভূমির উল্লেখ কিংবা তাঁর নিজস্ব জীবন-ব্যাপী অভিজ্ঞতা-অনুভবে ধরা পড়তে দেখি সেই সত্য, যে-সামাজিক ইতিহাসের গভীর পাঠ একদিন সিমোন দ্য বোভোয়াকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছিল · কেউ নারী হয়ে জন্মায় না, সমাজই তাকে একটু একটু করে নারী করে তোলে।

এদেশে নারী সম্পর্কে সাধারণ বোধটি পুরুষ-নিয়ন্ত্রিত হয়ে যে 'মেয়েছেলে' কিংবা 'মেয়েমানুষ' অভিধায় চিহ্নিত করে, তার আড়ালে লুকিয়ে থাকে যুগ যুগ ধরে বাহিত হয়ে

আসা গ্লানিকর সত্য,—এদেশে নারী প্রথমে মেয়ে, পরে মানুষ। লিঙ্গ অনুসারে বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে দেওয়া মূলত লিঙ্গ-রাজনীতিরই কৌশল, তাকে ধ্বস্ত করে দিয়ে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ-নির্দিষ্ট লিঙ্গভূমিকার সম্পূর্ণ বিপরীত এক ছবি উঠে এসেছে 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'-তে। এ-উপন্যাসের প্রতিবাদী আখ্যানে প্রতিটি সিদ্ধান্ত নেয় সত্যবতী, প্রতিটি অন্যায়ের সাধ্যমতো প্রতিবাদ করে সত্যবতী, প্রতিকারও চায়। অন্যদিকে তার স্বামী নবকুমারের ভীরুতা, সত্যবতীর উপর নির্ভরতা ঐ ছবিকে স্পষ্ট করে তোলে। আধিপত্যবাদী পুরুষসমাজ লালিত ধারণায় অনেককাল থেকে যে-সমস্ত গুণ কেবল পুরুষেরই একচেটিয়া বলে ভেবে আসা হয়েছে, সেই পারিপার্শ্বিক ব্যাপারে সচেতনতা, স্থিরবুদ্ধি, নিবিড় অনুভব এবং জীবনের ব্যাপারে প্রবল ঔৎসুক্যের প্রকাশে সত্যবতী নবকুমারকে ছাপিয়ে যায়। 'কখনো আধখানা বৈ পুরা দেখিলাম না'—উনিশ শতকীয় সামন্ততান্ত্রিক পুরুষ-আধিপত্যবাদী সামাজিক যুগদর্শন এমনি করেই মিথ্যে হয়ে যায়। Authorial Discourse-এর মধ্যে তাই এমন বয়ান উঠে আসে :

> *যুগচক্রের আবর্তনে সত্যবতী কেন এমন অধীর হয়, চঞ্চল হয়,*
> *আন্দোলিত হয় আর নবকুমার কেন সে আবর্তন টেরও পায় না।*

পুরুষশাসিত সমাজে যা-কিছু পুরুষের শোভা পায়, নারীর পক্ষে তাই বড় বেমানান, অশোভন। সমাজ-নির্দিষ্ট এই লিঙ্গভূমিকার বিরুদ্ধতা ঘটিয়ে সত্যবতী তাই উপন্যাসের সূচনা থেকে 'দজ্জাল', 'দস্যি', 'বেয়াড়া'—এইসব শিরোপা পেয়ে বসে আছে। 'পুড়বে মেয়ে উড়বে ছাই, তবেই মেয়ের গুণ গাই'—এই বানিয়ে-তোলা মেয়েমানুষের ছবি সত্যবতী ছিঁড়ে খান-খান করে দিয়েছে। 'মেয়েমানুষ' কথাটাতেই তার আপত্তি। 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'-র কথাবয়নে সত্যবতী তাই হয়ে ওঠে প্রতিবাদের প্রতীক। 'যে মেয়ে অচলায়তন ভাঙতে চেয়েছে, চেয়েছে মেয়েমানুষকেও মানুষের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত দেখতে'[৬]—হেরে যেতে তার একান্ত আপত্তি।

এক

শৈশবের খেলাঘর থেকেই 'মেয়েমানুষ'-এর ধিক্কৃত মূর্তিটিকে ভেঙে নতুন করে গড়তে চেয়েছে সত্যবতী। উপন্যাসের সূচনায় প্রথম আবির্ভাবেই সত্যবতী যখন ছিপ ফেলে মাছ ধরার আয়োজন করতে পান্তাভাতের খোঁজ করে ফেরে, তখন সত্যবতীর পিসঠাকুমা মোক্ষদা ছিপ দিয়ে মাছ ধরার প্রসঙ্গে 'ছিটপিটিয়ে' ওঠেন, বলেন : সাপের পাঁচ পা দেখেছিস? মেয়েমানুষ ছিপ ফেলে মাছ ধরবি? তখনই সত্যবতী পাল্টা মুখ নেড়ে, যুক্তিতে মোক্ষদাকে ধ্বস্ত করে দিয়ে বলে ওঠে :

> *গামছা দিয়ে ধরলে দোষ হয় না, ছিপ দিয়ে ধরলেই দোষ!*
> *চুনোপুঁটি ধরলে দোষ হয় না, বড় মাছ ধরলেই দোষ।*
> *তোমাদের এসব শাস্তর কে লিখেছে গা?*

চিলেকোঠার ছাদের ওপর খেলাঘরে সত্যবতী তার খেলুড়ে পুণ্যিপিসিকে জিজ্ঞেস করে, 'এই পুণ্যি ছড়া বাঁধতে পারিস?' পুণ্যবতী পাল্টা প্রশ্ন করে, 'খুব তো বললি, বলি

মেয়েমানুষকে আবার ছড়া বাঁধতে আছে নাকি?' সেই মেয়েমানুষ! খেলাঘরের খেলা ফেলে সত্যবতী অগ্নিমূর্তি হয়ে বলে, 'কে বলেছে তোকে নেই? মেয়েমানুষ! মেয়েমানুষ! মেয়েমানুষ যেন মায়ের পেটে জন্মায়না, বানের জলে ভেসে আসে! অত যদি মেয়েমানুষ-মেয়েমানুষ করবি তো আমার সঙ্গে খেলতে আসিস না।'

এই একই প্রতিরোধ এবং প্রতিবাদে তেতে উঠে লেখাপড়ার কথায় সত্যবতী আর এক আত্মীয়-খেলুড়ে নেড়ুকে বলে, 'কেন, মেয়েমানুষ তালপাতে হাত দিলে কী হয়? কলকেতায় তো কত মেয়েমানুষ লেখাপড়া করে?' নেড়ু ভগবানের বিধানের দোহাই দিলে সত্যবতী আরও ক্ষেপে উঠে বলে, 'ভগবান কখনো অমন একচোখো নয়। ওসব বেটাছেলেরাই সৃষ্টি করেছে।' পুরুষ-আধিপত্যবাদী সমাজে নিজেদের দামি করে তোলবার এবং আধিপত্যের জালকে আরও বিস্তৃত ও নিরঙ্কুশ করবার প্রক্রিয়াটিকে সত্যবতী ওই বয়সেই নিজের মতো করে বুঝে নিতে পেরেছে। আর তাই পুরুষনির্দিষ্ট লিঙ্গভূমিকার উজানে চলতে চাওয়ার ঝোঁক সত্যবতীর প্রথম থেকেই। নিজে নিজে লিখতে শিখেছে শুনে পুণ্যবতীরা যখন চোখ গোল-গোল করে, মেয়েমানুষের পাপের ভয় দেখায়; তখন সত্যবতী জোরের সঙ্গে বলে, 'মেয়েমানুষেরা যে রাতদিন ঝগড়া কোঁদল করছে, তাতে পাপ হয় না, আর বিদ্যে শিখলে পাপ হবে? বলি স্বয়ং মা সরস্বতী নিজে মেয়েমানুষ নয়? সকল শাস্তরের সার শাস্তর চার বেদ মা সরস্বতীর হাতে থাকে না?' উনিশ শতকের স্ত্রী- শিক্ষাবিরোধী সমাজ-পরিবেশের মধ্যে হাঁপিয়ে-ওঠা মানবী প্রাণের মুখ থেকে এ-কথা বলিয়ে নেন আশাপূর্ণা, একটি সহজ সত্যকে প্রতিষ্ঠা দেবার জন্য। অথচ যা অনেককাল ধরে প্রায় সবাই ভুলে থাকতে চেয়েছেন—শিক্ষার দেবী, জ্ঞানের দেবী মা-সরস্বতী স্বয়ং নারী, মেয়েমানুষ। উপন্যাসের কথাবয়নে আশাপূর্ণা প্রায়শ জুড়ে দিয়েছেন এরকম উদ্দেশ্যমূলক কথা-রূপ। সত্যবতীর কথার তোড়ে নেড়ুর যেমন আর বাক্যস্ফূর্তি হয় না, মানবীপ্রাণের প্রতি অকারণ বিরুদ্ধতাকেও এক নিমেষে ঔপন্যাসিক ভেঙে তছনছ করেছেন। আধিপত্যবাদী বর্গের মেয়েমানুষকে ঘিরে সমস্ত চিৎকার-চেঁচামেচি এক লহমায় থামিয়ে দিয়েছেন নেড়ুদের মতোই।

যাকে ঘিরে সত্যবতীর সমস্ত গর্ব, যাকে সে অভ্রান্ত বলে জানে, সেই রামকালী কোবরেজ; সত্যবতীর পিতা কিন্তু আধিপত্যবাদী বর্গ-প্রতিনিধি হয়েই দেখা দিয়েছেন উপন্যাসে। আর তাই রামকালী যখন লঘুভাবেও বলেন, 'মেয়েমানুষের লেখাপড়া শিখে লাভ কী? তারা কী নায়েব গোমস্তা হবে?'—তখনও সত্যবতী পিতা বলে রামকালীকে রেহাই দেয় না। ন্যারেটিভে আসে ঔপন্যাসিকের অভিপ্রেত কথাবয়ন, যার ভিতর দিয়ে তিনি বলে নেন স্ত্রী-শিক্ষার প্রয়োজন ও সুবিধের দিকটুকু। কিন্তু লঘুতা বজায় রেখে মেয়েকে আরও রাগিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে রামকালী যখন বলেন, 'মেয়েমানুষের এত বেদপুরাণ জানবার দরকারই বা কি?'—স্থান-কাল-পাত্র বিস্মৃত হয়ে সত্যবতী প্রবীণার মতো বলে ওঠে, 'এত যদি না-দরকারের কথা তো মেয়েমানুষের জন্মাবারই বা দরকার কি, তাই বলো তো বাবা শুনি একবার?'

জীবনের প্রান্তিক ভূমিতে দাঁড়িয়ে শৈশবের সেই সত্যবতীই যেন একদা ঘর ছেড়ে

যাওয়া 'কাটোয়ার বৌ' শঙ্করীকে বলে, 'মেয়েমানুষ যে মাটির পাত্তর এ-কথা বুঝি বিধাতাপুরুষ তার গায়ে দেগে দিয়ে ধরাভূমিতে পাঠিয়েছিল?'

'মেয়েমানুষ'-এর অসহনীয় অবস্থার প্রতি বিরূপতা ও বিরুদ্ধতা যত দিন গেছে, তত তীব্রতর হয়েছে; অনেক বেশি প্রতিবাদীও হয়ে উঠেছে সত্যবতী। উপন্যাসের কথাবয়নের মধ্যে তীব্রতার এই ক্রমোচ্চতাকে ধাপে-ধাপে সঞ্চার করে দিয়েছেন ঔপন্যাসিক। পুঁটির অকালমৃত্যু বা বলা ভালো পুঁটি-হত্যার বিশদ বিবরণ যখন সত্যবতী শুনেছে, চিৎকার করে উঠে বলেছে—'এ অন্যায়ের কোনো প্রতিকার করবে না?' নিতাইয়ের বৌ ভাবিনী সমস্ত অদৃষ্টের হাতে তুলে দিয়ে যখন বলে,—'মেয়েমানুষ তো পড়ে মার খেতেই জন্মেছে;' তখন সত্যবতী ব্যঙ্গ-ক্ষুরধার কণ্ঠে বলে : 'সবই অদেষ্ট বৈকি! এই হতচ্ছাড়া দেশে মেয়েমানুষ হয়ে জন্মানোই এক দূরদিষ্ট!' ভাবিনীর মতো অদৃষ্টকে মেনে না-নিয়ে সত্যবতী আরও বলেছে, সে হলে ওই 'মেয়েখাকী' জামাইয়ের মাথা 'ইটিয়ে গুঁড়ো' করে দিত, তারপর ফাঁসি কাঠে ঝুলত।

মেয়েমানুষকে মানুষের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত দেখতে চাওয়ার অভিপ্রায়-আকাঙ্ক্ষার সিদ্ধি 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র কথনবৃত্তের মধ্যে দেখা না-দিলেও প্রথম প্রতিশ্রুতিটুকু শোনা গেছে সত্যবতীর কাছ থেকেই। আর তাকে যুগ-সমাজের পক্ষে বাস্তবিক করে তুলতে, স্বাভাবিক করে তুলতে, পুরুষশাসিত সমাজে মেয়েমানুষের অনেককাল ধরে বানিয়ে-তোলা ছবিটাকে মুছে ফেলতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সত্যবতীর আপত্তি এবং প্রতিবাদের স্বরটিকে কুশলী আশাপূর্ণা ন্যারেটিভের মধ্যে এক ক্রমোচ্চ ভঙ্গি দান করেছেন।

এ ছাড়াও আরেকভাবে এই মেয়েমানুষের ছবিটাকে ধ্বস্ত করে দেবার ভঙ্গি দেখা দিয়েছে কথাবয়নে পরোক্ষতাকে অবলম্বন করে। প্রত্যক্ষতা অপেক্ষা এই পরোক্ষতার ওপরই যেন আশাপূর্ণার বেশি নির্ভর। অপ্রত্যক্ষ ওই কথনশৈলীকে নবনীতা দেবসেন যেভাবে দেখেন :

> *'সমাজের মেয়েদের কথাও যে এক দিক থেকে সমাজের নিম্নকোটিরই কথা। এক অদৃশ্য, নিঃশব্দ জীবনের প্রতিবেদন, আমাদের সে খেয়াল থাকে না। তার মধ্যে আশাপূর্ণার যে নির্মম দৃষ্টি ফুটে ওঠে, সেটাও একটু নজর করে দেখতে হয়। কেননা উনি বড় জটিল। একটি প্রতারক প্রচ্ছদের আড়ালে রাখেন নিষ্ঠুর সত্যটাকে। যেমন প্রতারক তাঁর ব্যক্তিত্ব—ঘরোয়া গিন্নিবান্নি আটপৌরে জীবনের আড়ালে লালন করেছেন তীব্র মননশীল ধীমতী একটি নারীকে।'*

'আরেক আশাপূর্ণা'-র কথায় এই পরোক্ষতার যে-উৎসভূমি, লেখিকার আদর্শগত অবস্থান এবং উপন্যাসিক বীক্ষণ আমরা আগেই দেখেছি। সেখানে তিনি এমন কথা বলেছেন :

> *আমি কখনও এইটা হওয়া উচিত এ-কথা মনে করে কিছু লিখিনি।*
> *জানি কী হয়, সেটাই বলবার। কী উচিত বলবার আমি কে?*

লেখিকা জানেন, শিল্পীর দায়বদ্ধতা আছে যেমন সমাজের কাছে, সাহিত্যিকের কাজ

উত্তরণের পথ দেখানো, তেমনি এ-ও জানেন, 'প্রতিকারের চিন্তা করাও সাহিত্যিকের কাজ নয়।' তাই উপন্যাসের প্রতিবেদনে প্রতিবাদের পাশাপাশি উঠে আসে আরেক ধরনের কথাবয়নের ভঙ্গিমা, যেখানে প্রতিবাদহীন আপাত-সরল কথাগ্রন্থনায় 'মেয়েমানুষ'-এর জীবন সম্পর্কে যে-বিশ্লেষণ উঠে আসে তাতে বিচার নেই, রায় দেওয়া নেই; কিন্তু আছে 'প্রতারক সরলতা'র আড়ালে সত্য উদ্‌ঘাটন। এই পথে কখনো এসেছে কেন্দ্রীয় সত্যের আপাতবিরোধী বক্তব্য, কখনো বা বক্তব্য তির্যক পথমুখী হয়ে উঠেছে। এমনি করে বাচন এবং প্রতিবাচনের কথাগ্রন্থনার মধ্য দিয়ে উপন্যাসে বাচনাতিযায়ী তাৎপর্য উঠে এসেছে, যা আশাপূর্ণার উপন্যাস-বিশ্বের অন্বিষ্ট।

দুই

সত্যবতীর পিসতুতো দাদা জটার সংসার। সংসার মানে সেই পরিচিত দৃশ্য। ঠেঙিয়ে মেয়েমানুষের বিষ ঝেড়ে দেওয়া। বিষ আর কী! জটাব বউ স্বামীকে খাইয়ে-দাইয়ে দুটো খেতে বসেছে আর জটা পান চেয়েছে বউয়ের কাছে। পান নেই—বলাতেই বাবুর রাগ হয়ে গেছে; আর তাই বউয়ের পিঠের ওপর ক্যাঁৎ-ক্যাঁৎ করে লাথির ওপর লাথি। বৌ পড়েছে থালার ওপরেই মুখ থুবড়ে। আর সাড়া নেই। ধাক্কা দিয়ে সাড়া নিতে গিয়ে কুমড়ো গড়ান গড়িয়ে সোজা উঠোনে তুলসীতলায়। হতভাগিনী জটার বউয়ের খেতে বসে প্রায় বিনা দোষে মাব খেয়ে গড়িয়ে পড়ে সাড় না-থাকার এই ছবি ঔপন্যাসিক এঁকেছেন আগাগোড়া প্রায় অনুত্তেজক ভঙ্গিতে। সেই সঙ্গে কিছু লঘু চালের ছাপ আছে কথাবযনে যা আসলে ছদ্মকথনের রূপ নিয়েছে। 'সমাজের মেয়েদের কথাও যে একদিক থেকে সমাজের নিম্নকোটিবই কথা, এক অদৃশ্য নিঃশব্দ জীবনেব প্রতিবেদন'—সে-কথা আমাদের খেয়াল না-থাকলেও আশাপূর্ণার নির্মম দৃষ্টিতে সে-সত্য ফুটে ওঠে। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে ন্যারেটিভে লেখিকার আদর্শগত অবস্থানের আপাতবিরোধী এক বয়ানরূপকে ইচ্ছে করে গড়ে তোলা হয়েছে। একটি 'প্রতারক প্রচ্ছদের আড়ালে' রাখেন তিনি নিষ্ঠুর সত্যটাকে। আসলে প্রতিবাদের এ-ও এক অপূর্ব ভঙ্গি। বিচার নেই, রায় দেওয়া নেই, তবু নিরুচ্চারিত সত্য বোধ এবং বোধির মিথস্ক্রিয়ায় ক্রমাগত পাঠকমনের অভ্যন্তরে বার্তা পাঠাতে থাকে তাকে বুঝে নেওয়ার জন্য। জটার বউয়ের গুরুভার পতনকে কেন্দ্র করে দৃশ্যসজ্জা তৈরি হয়েছে এইভাবে—সমস্ত পাড়ার মহিলাবৃন্দ ঝেঁটিয়ে এসেছে দেখতে। জটার বউয়ের প্রতি সহানুভূতি জানাতে? জটার করা কাজটাকে শুধুই ধিক্কার দিতে? তাদের কথাবার্তায় এমন ভাব অবশ্য দেখা গেছে যার অর্থ গোঁয়ার জটা তার মায়ের উপযুক্ত সন্তান, নিপাট ভালোমানুষ বৌটা বেঘোরে প্রাণ দিল! তবু, অনেক চাপান উতোরের মধ্যেও কি কোথাও প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর শোনা গেল? যাবে কী করে! যারা এসেছে এ-ঘটনার সাক্ষী থাকতে, তারা আসলে এসেছে বৈচিত্র্যহীন দৈনন্দিন গ্রামের জীবনে এমন একটা 'জোবালো রঙদার জীবন নাট্যের দৃশ্য দেখতে' শুধুই মজা দেখতে। আর এক দিক থেকে এ রকম দৃশ্য বড় গা-সওয়া, স্বাভাবিক তাদের কাছে। আর তাই উপন্যাসের কথাবয়নের মধ্যে ঔপন্যাসিকের স্বরন্যাসে ঢুকে পড়ে এমন সিন্‌থেসিস্ :

> *একটা মেয়েমানুষের জন্যে এর চাইতে আর কত বেশি দরদ আশা করা যায়?*

—বাক্যের অন্তর্বর্তী সংলাপ শব্দভেদী বাণ হয়ে ‘মেয়েমানুষ’-এর হতশ্রী ছবিটিকে খান-খান করে দেয়। প্রতিবেশী মহিলাবৃন্দ বড় হতাশ হয় নাটকের শুরুতেই নাটক শেষ হয়ে যাওয়ায়। জটার বউ রামকালী কোবরেজের ওষুধে চোখ মেলে চেয়েছে। জটার বউয়ের এই আচরণ তাদের কাছে তাই ধাষ্টামোর চরম, ক্ষমার অযোগ্য। জটার মা’কে পেড়ে ফেলবার এত বড় সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় কিছুতেই তারা বৌটার ওপর প্রসন্ন হতে পারে না। শুধু কি তাই! ছি, ছি, কী ঘেন্না! মামাশ্বশুরের ছোঁয়াচ লাগিয়ে, তারই হাতের ওষুধ খেয়ে চোখ খোলা! অন্তত গোটা দুয়েক প্রায়শ্চিত্ত এবং দেহশুদ্ধি অচৈতন্য অপরাধিনীর অজ্ঞাতে তার জন্য স্থির হয়ে যায়।

দ্বিতীয় দৃশ্য, লক্ষ্মীকান্ত বাঁড়ুয্যের মেয়ে পটলীর বিবাহসভা। বিয়ের দিন যাত্রা-করা বর মৃত্যু-রোগ নিয়ে যাত্রাভঙ্গ করে বাড়ি ফিরে গেলে পটলী লগ্নভ্রষ্টা হতে বসেছে। সে-ছবিতে পটলী নামক প্রাণীটি চুপচাপ থম মেরে বসে আর মহিলার দল তাকে ধরে নাড়া দিয়ে তারস্বরে চেঁচিয়ে চলেছে যে-সমস্ত কথা বলে, তাকে আর যাই হোক, শুভকামনা বলে না। আর পটলীর মা বেহুলা কাঁদতে-কাঁদতে সরাসরি পটলীর মৃত্যু কামনা করে বলেন, “হে মা ওলাই বিবি, হে মা শেতলা, পটলীকে তোমরা নাও, ওর যেন এ ভিটেতে তেরাত্তির না পোহায়।” সহানুভূতি কিংবা সমবেদনাহীন এক নিষ্ঠুর বাচনের মধ্য দিয়ে যেন ঔপন্যাসিক পরিক্রমা করে চলেছেন; আর কোনো দায় নেই তাঁর। কিন্তু এই বয়নরূপের ভিতরে-ভিতরেই এক পরাবাচন নির্মিত হয়ে চলে। মেয়েমানুষের জীবনের চূড়ান্ত মূল্যহীনতার প্রকাশ ঘটে এভাবেই।

মূল্যহীনতার আরেক পরোক্ষ চেহারা প্রকাশ পায় পটলীকে লগ্নভ্রষ্টা হওয়া থেকে বক্ষা করে রাসু এসে যখন ঘরে ঢোকে। বিধবা মোক্ষদা শাঁখ হাতে করে দাঁড়িয়ে থাকেন বারবাড়ির উঠোনে। শাঁখ বাজিয়ে উলু দিয়ে বর-কনে তুলবেন বলে। আশাপূর্ণার সেই পুরোনো কৌশল, আপাতসরল অথচ ভয়ংকর বিদ্রূপতীক্ষ্ণ প্রচ্ছন্ন বাক্য ছিঁড়ে খান-খান করে দেয় পুরুষশাসিত, পুরুষনির্দিষ্ট সমাজবিধিকে ·

> *শুভকর্মে বিধবারা সমস্ত কর্মে অনধিকারী হলেও, এই একটি কর্মে তাদের অধিকার আছে, সমাজ অথবা সমাজপতিরা বোধ করি এটুকু আর কেড়ে নেননি, ক্ষ্যামা ঘেন্না করে ছেড়ে দিয়েছেন। শাঁক আর উলু।*

কাশীশ্বরীর নাতবৌ শঙ্করী যখন ঘর ছাড়ল, তখন কাজের বাড়িতে তার অনুপস্থিতিকে সাময়িকভাবে গোপন করার জন্য বলা হল, তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ‘মেয়েমানুষকে খুঁজে না পাওয়ার অর্থই নির্ঘাত বড় পুকুরের কাকচক্ষু জল’—এমন বাচনও নির্দিষ্ট হয়ে ওঠে সেই মূল্যহীনতাকেই পরিমাপ করতে।

মেয়েমানুষকে না-মানুষের পর্যায়ে ফেলে দেওয়াতেই প্রতিবাদী ঔপন্যাসিকের প্রবল আপত্তি। প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ বাচনের মধ্যে তাই লেখিকা বারবার সেই অমোঘ সত্য উচ্চারণ করে চলেন · ‘মেয়েমানুষও মানুষ’। অথচ নিষ্ঠুর বাস্তব হল, দুঃখ কিংবা শোক-প্রকাশের অধিকারও তার নেই। এমনকী মাতৃশোকও দেখানো চলে না! ভুবনেশ্বরী মারা যাবার পর সে-খবর যখন সত্যবতীর কাছে পৌঁছায় এলোকেশী মারফত, তখন

সত্যবতী আঁতুড় ঘরে। ছেলে কোলে করে সত্যবতী একসময় ডুকরে কেঁদে উঠতেই এলোকেশী ছুটে এসে চোখ পাকিয়েছেন। লিঙ্গনির্ধারিত সমাজের বিধি-বিধান এলোকেশীর মুখ থেকে বজ্র হয়ে সত্যবতীর বুকে এসে বিঁধেছে। প্রত্যেকটি কথা কেটে-কেটে বসেছে :

> *বলি মা-বাপ কী কারো চিরদিনের? তবু তো বিধাতাপুরুষের সুবিচার হয়েছে, বাপ না গিয়ে মা গিয়েছে। শাঁখা সিঁদুর নিয়ে এয়োসতী ভাগ্যবতী ড্যাং ডেঙিয়ে চলে গেল, দেখে আহ্লাদ কর, তা নয় মা-মা করে চিৎকার তুলছ!*

—একেই বলে সুবিচার! স্বয়ং বিধাতা 'পুরুষ' বলেই কি? আহ্লাদ করার মতো বিষয়ই বটে। আধিপত্যবাদী বর্গ স্ত্রী-শিক্ষার প্রসঙ্গে নবকুমারের মুখ দিয়ে বলে ওঠে :

> *শুনছ কেলেঙ্কারী? মেয়েমানুষ বিলেত যাচ্ছে! কিনা এম. এ. বি. এ. পাস করতে! বিদ্যের পাহাড়ের চূড়োয় ওঠা চাই! কালে কালে কতই হবে।*

অথচ পুরুষমানুষের হাতের মুঠোয় পৃথিবী। একদা ছেলেবেলার খেলুড়ে নেড়ুকে দেখে সে-কথাই মনে হয়েছে সত্যবতীর। এক ভবঘুরের জীবন স্বেচ্ছায় বেছে নিয়েছে নেড়ু। সত্যবতী সেই অধবা জীবনের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, —"ব্যাটাছেলে হয়ে জন্মেছিস, তাই যা খুশি করবার সুখ পেয়েছিস।" নেড়ুর ভবঘুরে জীবনকে পাবার উপায় হয়তো নেই, কিন্তু প্রতিবাদী সত্যবতী শেষ পর্যন্ত পুরুষনির্ধারিত চার-দেওয়ালের গণ্ডির মধ্য থেকে বাইরে চলে আসে আপসহীনভাবে। সারা জীবন ধরে 'মেয়েমানুষ' হবার জ্বালায় জ্বলতে-জ্বলতে অনেকগুলো প্রশ্ন নিয়ে সত্যবতী গিয়ে দাঁড়াতে চেয়েছে তার চোখে পুরুষতন্ত্রের প্রতিনিধি এবং অভিভাবক বাবার কাছে, কাশীতে। পিতা রামকালী সেই বর্গ-প্রতিনিধি বলেই হয়তো সত্যবতী পিতার কাছে আশ্রয় চায় না, চায় নিজের পায়ে দাঁড়াতে। মেয়ে-ইস্কুল প্রতিষ্ঠা করে, শিক্ষকতা করে নিজের সংস্থান সে নিজেই করে নিতে চায়। নবকুমার যখন নরম কথায় সত্যবতীকে ফেরাতে পারে না তখন আধিপত্য ক্ষুণ্ণ হতে দেখে শ্লেষমিশ্রিত পুরোনো স্বরে বলে উঠেছে :

> *এই জন্যই বলে মেয়েমানুষের বিষয়সম্পত্তি থাকতে নেই! বাপের দলিলের ভরসা রয়েছে তাই স্বামীর অন্ন ত্যাগ দিয়ে চলে যাবার সাহস! মেয়েমানুষের এত সাহস ভালো নয়। এই আমি বলে দিচ্ছি, অশেষ দুঃখু আছে তোমার কপালে। স্বামী হয়ে এই অভিশাপ দিচ্ছি তোমায় আমি।*

—অভিশাপের উৎসে যে রয়েছে নবকুমারের চূড়ান্ত দুর্বলতা, তা সত্যবতী বোঝে বলেই অত বড় অভিশাপেও বিচলিত না-হয়ে প্রতিবাদী স্বরকে এক আশ্চর্য ধরনে ব্যবহার করে। বলবার আগে তার হেসে ফেলা এবং বলার পর গলায় আঁচল জড়িয়ে নবকুমারকে প্রণাম করা তার হয়তো বা সব থেকে বড় প্রতিবাদ। সমগ্র উপন্যাসের পরতে পরতে নানামাত্রিক

কথাবয়নে যে-সব প্রতিবাদ সত্যবতী করে এসেছে তাকে ছাপিয়ে যায় এই হাসি ও প্রণাম-মিশ্রিত অথচ দ্রোহাত্মক কণ্ঠস্বর :

> *তাই তো দিয়ে আসছো তোমরা আবহমান কাল থেকে। স্বামী হয়ে, বাপ হয়ে, ভাই হয়ে, ছেলে হয়ে। ওটা নতুন নয়। অভিশাপেরই জীবন আমাদের।*

সামাজিক মূল্যবোধের বৈষম্যই সত্যবতীর কাছে সব থেকে পীড়াদায়ক। সমাজনির্দিষ্ট লিঙ্গ-ভূমিকায় নারীর নিজস্বতা এবং মূল্যকে অস্বীকার করবার যে-নগ্ন চেহারা বারবার সত্যবতীর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, তাতে সত্যবতী দেখেছে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের সব থেকে বড় ভণ্ডামি হল পুরুষকে সমস্ত লৌকিক বিচারের উর্ধ্বে রাখা। পুরুষের করা কাজের সমালোচনা আর যাই হোক কোনো মেয়েমানুষ করতে পারবে না। একেবারে বাল্যাবস্থা থেকে মেয়েদের একটা বিধি-নিষেধের খাঁচার মধ্যে চেপেচুপে ঢুকিয়ে দেওয়াটাই পুরুষতন্ত্রের রাজনীতি। যেখানে নিষেধের পিছনে যুক্তি ধোপে টেঁকেনি, সেখানে পুরুষ বলেছে এটাই ভগবানের বিধান। সামাজিক বৈষম্যের এক শক্তপোক্ত জাল যা নারী-শিকারকে ধরতে পুরুষ-শিকারির বিছানো, তা জন্ম-জন্ম ধরে প্রায় সংস্কারের চেহারা নিলেও সত্যবতী শৈশব থেকেই এই জাল ছেঁড়ার আয়োজন করেছে, তা আমরা দেখেছি। জটাকে নিয়ে ছড়া বাঁধায়, নষ্ট-চরিত্র শ্বশুরকে প্রণাম না-করার সিদ্ধান্তে, বিধবা শঙ্করীর অবৈধ সন্তান সুহাসের ভরণপোষণের দায়িত্ব নেওয়া, সুহাস-সুবর্ণকে বেথুনে পড়ানো—দ্রোহ ভাবেরই বকমফের। অচলায়তনকে ভাঙতে না-পারলেও হার মানেনি সত্যবতী। সংসারও ত্যাগ করে গেছে এক বালিকা বিদ্যালয় গড়ে মেয়েদের শিক্ষার আলোয় আনবার স্বপ্ন চোখে নিয়ে। যাবার আগে পিতৃদত্ত ধনও দিয়ে গেছে সংসারকে, মায়ের নামে ত্রিবেণীতে 'ভুবনেশ্বরী বালিকা বিদ্যালয়' স্থাপনের অনুরোধ জানিয়ে। এই পৃথিবীকে 'মেয়েমানুষ'-এর বাসযোগ্য করে যাবার সংকল্পে সমস্ত অনর্থের মূল অশিক্ষাকে প্রাণপণে দূর করার চেষ্টায় ব্রতী হয়েছে সত্যবতী। আধিপত্যবাদী পুরুষবর্গের চাপিয়ে দেওয়া বিধি-নিয়ম যা প্রায় সামাজিক সংস্কারের মতো জাঁকিয়ে বসেছে মেয়েমানুষের জীবনে, তাকে ধ্বস্ত করে দেবার প্রক্রিয়াটি কিন্তু বড়ই সদর্থক। আর তাকে ভালোভাবে না-বুঝলে কারো অমন ক্ষোভ জাগা স্বাভাবিক—'আশাপূর্ণা শেষ পর্যন্ত বিবাহ-সংস্কারকে অস্বীকার করতে পারেননি।' আজকের নারীবাদী সাহিত্যের ধারাটি কিংবা আলোচনার ধরনটি যেখানে এসে পৌঁছেছে তাকে যে আশাপূর্ণা মেনে নিতে পারেননি, সে তো ঠিক। 'বকুলকথা'র মধ্যে তার সৃষ্টিধর্মী প্রমাণ যেমন রয়েছে, আলাপ-আলোচনায় আশাপূর্ণা বহুবার স্বীকার করেছেন সে-কথা। কিন্তু নারী পুরুষের প্রতিস্পর্ধী হয়ে উঠলে আরেক আধিপত্যবাদকেই প্রতিষ্ঠা দেওয়া হবে—এ-সত্য তাঁর জানা ছিল। আবার বিবাহ-সংস্কার কিংবা স্বামী-স্ত্রীর অচ্ছেদ্য বন্ধনকে প্রত্যাহ্বান জানানোর চেহারাও 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র কথাবয়ানের মধ্যে আছে। একবার শৈশবের সত্যবতীর মধ্যে, আরেকবার পরিণত বয়সে ঘর-সংসার ছেড়ে যাবার সময়ে। কিন্তু সে-ও বড় সদর্থক ভঙ্গি। শৈশবে খেলাঘরের খেলুড়েদের কাছে জটার বউয়ের আচরণে ব্যথিত হয়ে উঠে সত্য বলে উঠেছিল :

নিজের সোয়ামী! ...খ্যাংরা মারো অমন সোয়ামীর মুখে! যে সোয়ামী লাথি মেরে যমের দক্ষিণ দোরে পাঠায় তার সঙ্গে আবার হাসি-গপ্‌প? গলায় দিতে দড়ি জোটেনা?

সংসার ছেড়ে চলে যাবার সময় এই সত্যবতীই বিবাহিত সম্পর্কের চির-অচ্ছেদ্য বন্ধনকে প্রত্যাহ্বান জানিয়ে সৌদামিনীকে বলে :

সব বিয়েতেই নারায়ণ এসে দাঁড়ান কিনা, সব গাঁটছড়াই জন্ম-জন্মান্তরের বাঁধন কিনা, এই প্রশ্ন নিয়ে বাবার কাছে যাচ্ছি ঠাকুরঝি।

সহায়ক গ্রন্থ

১. খেলা থেকে লেখা, ১৩৮২।
২. সমাজ ও সাহিত্য, ১৩৯৯।
৩. সাহিত্য ৫ সমাজ, ১৩৯৯।
৪. তদেব।
৫. মেয়েদের গল্প · মেয়েদের কথা, 'মেয়েলিপাঠ'; —সুতপা ভট্টাচার্য, ২০০০।
৬. দ্র 'আমার সাহিত্যচিন্তা', আর এক আশাপূর্ণা।
৭ ক্যানডিড ক্যামেরায় ধরে রাখা অন্তর্দর্শন; নবনীতা দেব সেন, দেশ, জানুয়ারি, ১৯৯৯।

সত্যবতী : প্রতিস্পর্ধী নারীচেতনার পরিসর

সর্বাণী বিশ্বাস রায় চৌধুরী

মৈত্রেয়ী তাঁর স্বামী যাজ্ঞবল্ক্যকে বলেছিলেন, "যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম।" অর্থাৎ "যাহার দ্বারা আমি অমৃতা না হইব তাহা লইয়া আমি কী করিব!" মৈত্রেয়ী যদিও নারী তবুও তাঁর এই প্রশ্ন ছিল চেতনাসম্পন্না মানুষেরই প্রশ্ন। চেতনার এই উর্ধ্বায়ন প্রক্রিয়ারও গতি স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল মধ্যযুগীয় তমসাচ্ছন্ন রাজনৈতিক তথা সামাজিক প্রেক্ষাপটে। মধ্যযুগীয় অন্ধকার কাটিয়ে যে-নারী ঔপনিবেশিক সামাজিক স্তরে এসে পৌঁছেছিল, তার কাছে 'অমৃত' অনুসন্ধান তো ছিল সম্পূর্ণ অজানা দিগন্ত। উপনিষদ বলেছিল 'আত্মানং বিদ্ধি' অর্থাৎ নিজেকে জানো। কিন্তু নিজেকে জানতে গেলে প্রয়োজন সময়, সমাজ, প্রেক্ষিত সম্পর্কে সচেতন হওয়া। কারণ আত্মানুসন্ধান-এর প্রথম পর্যায় অপরতার দর্শনে নিজের অস্তিত্বানুসন্ধান। অর্থাৎ, নিজস্ব যুক্তিবুদ্ধির আলোকে নিজের অস্তিত্বকে যাচাই করা। বাংলা সাহিত্যে নারীকে দেখা হয়েছিল 'অপরে'র দৃষ্টিকোনে, মধুসূদন থেকে শুরু করে বঙ্কিমচন্দ্র হয়ে রবীন্দ্রনাথে এসে নারীর অস্তিত্বানুসন্ধান এক পরিপূর্ণ রূপ পেয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ প্রথম দেখিয়েছিলেন নাবীকে আপন পরিসর খুঁজে নিতে হবে আত্মমর্যাদার দর্শনেই। সেই পথ ধরেই এসেছেন পরবর্তী নারী-লেখিকারা। পুরুষ-লেখকদের সঙ্গে নারী-লেখিকাদের একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য বোধহয় এই বিন্দুতেই, কারণ আত্মমর্যাদার সঠিক স্বরূপ নির্ণয় সম্ভব আত্মদর্শনেই। আশাপূর্ণা দেবীর 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' উপন্যাস এই অর্থে সম্পূর্ণ প্রথম প্রতিশ্রুতিই সমাজের বোধি সম্পন্ন মানুষের মননের কাছে।

উপন্যাসের কাহিনি বিন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র সত্যবতী। সত্যবতীকে যদি সময়বৃত্তের কেন্দ্রে স্থাপন করা যায়, তাহলে ক্রমপরিদৃশ্যমান তার চেতনারাজ্যের অন্তর্গূঢ় স্তরে পরস্পর-বিরোধী চরিত্রগুলোর ক্রম-অবস্থান। প্রতীকী অর্থে যদি আমরা চরিত্রগুলোর অবস্থান নির্ণয় করি, তাহলে দেখা যাবে রামকালী সত্যবতীর জীবনের সেই বিন্দু যা থেকে ব্যক্তিচেতনার ভিত তৈরি হয়। রামকালী অন্ধকারাচ্ছন্ন মধ্যযুগীয় তিমিরাকাশে সত্যবতীর কাছে প্রথম শুকতারা। তার চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং প্রবল ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সত্যবতীর ব্যক্তিত্বের বৈপরীত্যের দ্বান্দ্বিক বিন্যাস সত্যবতীর মননে সৃষ্টি করেছে দৃঢ় চেতনার জগৎ।

সত্যবতীর চেতনার একটি স্তরে আছে বালবিধবা শুচিবায়ুগ্রস্তা মোক্ষদা যার কাছে বাস্তব জীবনের মানবিক দ্বার নিষেধ দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তাঁকে তথাকথিত সামাজিক আইনে জীবনের সমস্ত রস থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, তাই তিনি যেন এক অদ্ভুত প্যারাডক্সে আত্মজীবনের বঞ্চনাকে সঞ্চারিত করেছেন অপরের মধ্যে। নিজের অসহায়তা, দুর্বলতা, কুসংস্কার অর্থাৎ যে-দুর্বলতাগুলোর সুযোগ নিয়ে সমাজ তাঁকে অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছে সেই দুর্বলতাকে আয়ুধ করে তিনি সংগ্রাম করে গেছেন তথাকথিত সুখী মানুষগুলোর বিরুদ্ধে। তাঁকে যারা জীবনের সব রস থেকে বঞ্চিত করে প্রান্তীয় স্তরে ঠেলে দিয়েছে, সেই বঞ্চনাকে মূলধন করেই তিনি তাদের কাছে ভয়ংকর হয়ে উঠেছেন। একাদশীর দিনটি তাই উপন্যাসের বয়ানে এক প্রতীকী ব্যঞ্জনা নিয়ে প্রতিভাসিত হয় · "ঘরের মধ্যে তো রোদ নেই, তবু এই

ছায়া শীতল প্রকাণ্ড লম্বা ঘরখানা যেন এই রোদে খাঁখাঁ প্রকাণ্ড উঠোনটার মতোই ঝাঁঝাঁ খাঁখাঁ করছে। আর সেই খাঁ খাঁ করা ঘরে এক প্রান্তে বড় বড় দুটো উনুন তাদের মাজাঘষা নিকোনো চুকোনো চেহারা নিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে আছে এক বহু অকথিত শূন্যতার প্রতীকের মতো।" (পৃ. ৩৫) মোক্ষদা বঞ্চনার নিঃশব্দ স্তর থেকে গড়ে তুলেছেন তাঁর বিদ্রোহী সত্তা কারণ "একাদশীর দিন তেষ্টা কথাটা মনে আনাও পাপ। একি আর জানেন না মোক্ষদা; তাও আবার তাঁর মতো বয়স ভাঁটিয়ে যাওয়া শক্ত পোক্ত মজবুত বিধবার।" (পৃ. ৩৫) অপ্রাপ্তির যন্ত্রণাকে মোক্ষদা তাই অবদমিত করে হয়ে উঠেছেন সামাজিক সুখী মানুষদের যন্ত্রণার কারণ, তাই "জগতের কোথাও কোন অনাচার ঘটবে, এ মোক্ষদা বরদাস্ত করতে পারবেন না।" (পৃ. ৩৮) সামাজিক প্রক্রিয়া ধর্মের আচ্ছাদনে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের প্রতাপের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছিল মধ্যযুগীয় হিন্দু রীতিনীতিকে উপলক্ষ করে। অর্থাৎ, যা চিহ্নায়ক হয়ে ছিল আধিপত্যবাদের, তাকে সেই অত্যাচারিতা নারীরা অনেকেই হাতিয়ার করে নিয়েছিল তাদের চেয়ে যারা দুর্বল তাদের অত্যাচার করার কৃৎকৌশল হিসেবে। উপন্যাসের বয়ানে তারই আভাস, "শুভকর্মে বিধবার সমস্ত কর্মে অনধিকারী হলেও এই একটি কর্মে তাদের অধিকার আছে, সমাজ অথবা সমাজপতিরা বোধকরি এটুকু আর কেড়ে নেননি, ক্ষ্যামা-ঘেন্না করে ছেড়ে দিয়েছেন। শাঁক আর উলু।" (পৃ. ৬১) আর তাই "সেই অধিকারটুকুর সম্যক সদ্ব্যবহার করতে থাকেন মোক্ষদা রাসুর দ্বিতীয় অভিযানান্তে প্রত্যাবর্তন উপলক্ষ্যে।" (পৃ. ৬৯) মোক্ষদা সত্যবতীর কাছে নারীর অন্ধকারাচ্ছন্ন অতীতের এক জীবন্ত অভিজ্ঞান, যার পরিচয় সচেতনে অবচেতনে সত্যবতীর চেতনায় সক্রিয় ছিল। মোক্ষদার বঞ্চিত জীবনের এই পরিণামই হয়তো পরবর্তী সময়ে সত্যবতী তার স্বামী-পরিত্যক্তা ননদিনি সৌদামিনীর ইচ্ছানুসারে তাকে স্বামীর ঘরে পাঠিয়েছে। হয়তো এই পাঠানোর পেছনে এই বোধ সক্রিয় ছিল যে, যে-বঞ্চনা সমাজের চাপিয়ে দেওয়া তাতে আরও মোক্ষদা তৈরি হয়, আর যে-বঞ্চনা মানুষ নিজে উপলব্ধি করে তাকে মানুষ নিজেই অতিক্রম করতে চেষ্টা করে।

সত্যবতীর জীবনবৃত্তের আরও দুটি দুর্বল অংশে তার শাশুড়ি এলোকেশী এবং স্বামী নবকুমার। সত্যবতী চরিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে তাদের অবস্থান। এলোকেশীও পিতৃতান্ত্রিক সমাজের অলিখিত আইনে মোক্ষদার মতোই নির্যাতিতা। তাকেও পিতৃতান্ত্রিক সূক্ষ্ম রাজনীতি বঞ্চিত করেছে নিজের মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান থেকে, স্বামী নীলাম্বরের চারিত্রিক দুর্বলতা জেনেও তাকে সামাজিক তথা অর্থনৈতিক অসহায়তার জন্য মেনে নিতে হয়েছিল চরিত্রহীন স্বামীকে। এরই প্রভাব পড়েছিল সত্যবতীর প্রতি তার অত্যাচারে। ভাষার বহুবাচনিক স্বরসঙ্গতিতে এই অন্তর্লীন ক্ষোভের প্রকাশ, "...মুখটা সত্যবতীর আকাশমুখো আর সেই মুখের ওপর পরনের নীলাম্বর শাড়িখানার আঁচলটুকু চাপা দেওয়া...মানে দিতে বাধ্য হয়েছে। ঘোমটাখানা খসবার আগেই এলোকেশী নির্দেশ দিয়েছেন, আঁচলটা মুখে ঢাকা দাও দিকি বাছা। তোমার তো আর বোধবুদ্ধির বালাই নেই, অগত্যে সবই স্পষ্ট করে বলে দিতে হবে আমার।" (পৃ. ১৪৬) এই বাচন যেন ইঙ্গিত দিচ্ছে জটিল মনস্তাত্ত্বিক বিন্যাসের। সত্যবতীর 'আকাশমুখী' মুখকে এলোকেশী 'আঁচলচাপা' দিতে বাধ্য করার মধ্যে যেন এক বিমূর্ত যোগসূত্রের আভাস। অর্থাৎ এলোকেশী যে-সমাজে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে

পারেননি, তিনিও সেই সমাজে সত্যবতীকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে দেবেন না, যেমন দাঁড়াতে দেননি পুত্র নবকুমারকে। তাকে তৈরি করেছেন মেরুদণ্ডহীন, ব্যক্তিত্ব-বিহীন পুরুষ হিসেবে। এই বৈপরীত্য ইঙ্গিত দিচ্ছে একটি সর্বনাশা সামাজিক ক্ষয়েরও। অর্থাৎ, যাকে বঞ্চনা করা হচ্ছে, সে তার দুর্বলতাকে আয়ুধ করে মারণবীজ ছড়িয়ে দিচ্ছে মানুষ থেকে মানুষে। তার প্রথম বলি সৌদামিনী, এই পথেই এসেছে নবকুমার, সত্যবতী এবং সবশেষে সুবর্ণলতা। অর্থাৎ, পুরুষবাহিত যে-ক্ষয়রোগের শিকার নারী, সেই নারী আবার এই ক্ষয়কে ছড়িয়ে দিচ্ছে সমাজের প্রতিটি স্তরে। আত্মজও রেহাই পাচ্ছে না এর প্রকোপ থেকে। এ যেন এক বিচিত্র অন্তর্বয়ন। মারণবীজ অজস্র তন্তুজাল বয়ন করে নিঃশব্দে ধ্বংসকে ত্বরান্বিত করছে যার শিকার সত্যবতীর মা ভুবনেশ্বরী, জটার স্ত্রী, রাসুর প্রথমা স্ত্রী সারদা, রাসুর দ্বিতীয় স্ত্রী পটলী, সত্যবতীর বাড়িতে আশ্রিতা বৌদিদি শঙ্করী।

সত্যবতীর মাতা ভুবনেশ্বরীকে প্রবল প্রতাপী স্বামী রামকালীর সব নির্দেশ মেনে নিতে হয়েছে মুখ বুজে। কেউ তার কাছে কোনোদিন কোনো পরামর্শ চায়নি। তিনি স্বামীর প্রচ্ছায়ার মতো নির্বাক জীবন যাপন করে গেছেন। রাসুর স্ত্রী সারদাকে মেনে নিতে হয়েছে পরিবারের গুরুজনদের জোর করে চাপিয়ে-দেওয়া ছদ্ম ন্যায়ে আচ্ছাদিত অন্যায় সিদ্ধান্ত। রাসুর দ্বিতীয় স্ত্রী পটলী কিছু বুঝে ওঠার আগেই তাকে বিবাহিত রাসুর সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়েছে। সমাজের চোখ রাঙানির ভয়ে সত্যবতীর জীবনে এই বিপরীত চরিত্রগুলি যেন এক অন্তর্নিহিত বিরোধী শক্তি। অর্থাৎ, যে-সমাজে নারীকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা হযেছে, যেখানে একে একে সঙ্কুচিত হয়ে গেছে বহির্বিশ্বের দ্বার, সেখানে সে-ও একসময় হয়ে ওঠে সমাজের বন্দি ফসলের প্রতিভূ। তাদের কাছে মানবিকতার আর কোনো দায় নেই। তারা হয়ে ওঠে অত্যাচারীরই প্রতিচ্ছবি। তারা যেন প্যারোলে (Parole) মুক্তি পাওয়া বন্দি, বহন করে আছে শৃঙ্খলের দায়।

সত্যবতীর চেতনা-রাজ্যের এক সুদৃঢ় ব্যক্তিত্ব তার পিতা রামকালী, যার ব্যক্তিত্বের সঙ্গে প্রতিনিয়ত সংঘর্ষে সত্যবতী হয়ে উঠেছে ব্যক্তিত্বময়ী নারী। অন্তেবাসী নারী-সত্তা খণ্ড খণ্ড অপরতার দর্শনে আবিষ্কার করছে আত্মপরিচয়। রামকালী সত্যবতীর সেই দ্বান্দ্বিক সত্তা, যার সমর্থন বা অসমর্থনে সত্যবতী খুঁজে পায় ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্ কথিত নারী-পরিসরের চাবিকাঠি। যে-রামকালী পথের মধ্যে একবার দেখেই বিবাহ করতে-যাওয়া বরের বিধান দিতে পারেন, তারও সত্যবতী সম্পর্কে ধারণা, "আশ্চর্য! এইটুকু মেয়ে, এত তলিয়ে ভাবে কী করে? আহা মেয়ে মানুষ তাই সবই বৃথা। এ মগজটা যদি নেড়ুটার হত।" (পৃ. ৩৪) যে-রামকালীর চিকিৎসার গুণে জটাধরের নির্যাতিতা স্ত্রী মৃত্যুর মুখ থেকে ঘুরে আসে, সেই রামকালীই পটলীকে আসন্ন বৈধব্য থেকে বাঁচাতে তাঁর বিবাহিত ভ্রাতুষ্পুত্র রাসুর সঙ্গে বিয়ে দেন। ন্যায়শাস্ত্রের মুদ্রার একপিঠে যদি এই কর্ম ন্যায় হিসেবে গণ্য হয়, অপর পিঠে সেই কর্মই প্রতিভাত হয় অন্যায় হিসেবে। সত্যবতীর চোখে এই অন্যায় শিশুকালেও এড়িয়ে যায়নি, তাই বাবার অন্যায় সম্পর্কেও সে সচেতন ছিল, "...সেজঠাকুমা তো ঠিকই বলেছে পিসঠাকুমা। নিয্যস বাবার অন্যায়ই হয়েছে।" (পৃ. ৫৬) তাই রামকালী যখন সত্যবতীকে বলেন, সতিনকে 'কাঁটা' না-ভেবে সবাই মিলে ভালোবেসে থাকতে হয়, তখন সত্যবতী

পিতাকে দেখায় নারীর একান্ত নিজস্ব তমসাচ্ছন্ন জগৎ। যে-জগৎ তৈরি নারীর নিজস্ব চেতনার মাপে, যেখানে ছোট থেকে মেয়েদের নিজের সংসারে টিকে থাকার জন্য সতিনকে নিয়ে ঘর করার যন্ত্রণা দূর করার জন্য করতে হয় সেঁজুতি ব্রত, যার মন্ত্র, "হাতা, হাতা, হাতা, খা সতিনের মাথা।" যেখানে নারী লোকায়ত জীবনে এইভাবেই আপন কবচকুণ্ডল ধারণ করে, রামকালী এই অন্ধকারাচ্ছন্ন ঈর্ষা-বিদ্বেষে জর্জরিত জীবনের পরিচয় পেয়ে শিউরে উঠেছেন; কারণ তিনি এই জীবনযাত্রাকে নিতান্তই অবহেলার চোখে দেখেছিলেন, কিন্তু সত্যবতী তাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাল যে, "পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।" অর্থাৎ এ যেন পিতৃতান্ত্রিক সমাজের অপরতার দর্পণে আত্মদর্শন। তাই রামকালী যখন সত্যবতীকে বললেন, রাসুর স্ত্রীকে বলতে এই সব "ছেলে বুদ্ধি" ছেড়ে দিয়ে কাজকর্মে ব্যস্ত থাকতে, তখন সত্যবতী "একটা তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলে, তা যদি কেটে যেত, তা হলে তো মাটির প্রিথিবীটা সগগো হত বাবা। রুগীর চেহারা দেখে তুমি ওপর থেকে বলে দিতে পারো তার শরীরের মধ্যে কোথায় কী হচ্ছে! আর মানুষের মুখ দেখে বুঝতে পারো না, তার প্রাণের ভিতরটায় কী হচ্ছে।" (পৃ. ৭৮) এই তির্যক উক্তি, এই ব্যঙ্গের লক্ষ্য তো শুধু রামকালী নন, এর লক্ষ্য সম্পূর্ণ পিতৃতান্ত্রিক সামাজিক প্রেক্ষাপট। আবার রামকালীর পিতৃতান্ত্রিক সমাজের মনন অনুযায়ী "মেয়ে মানুষ" জাতটার প্রতি নেই তেমন সম্ভ্রমবোধ, তিনি জানেন "যে জাতটার ভূমিকা হচ্ছে শুধু ভাত সেদ্ধ করবার, ছেলে ঠেঙাবার, পাড়া বেড়াবার, পরচর্চা করবার, কোন্দল করে অকথ্য অশ্রাব্য গালিগালাজ করবার, দুঃখে কেঁদে মাটি ভেজাবার আর শোকে উন্মাদ হয়ে বুক চাপড়াবাব, তাদের প্রতি প্রচ্ছন্ন একটা অবজ্ঞা ছাড়া আর কিছু আসে না রামকালীর।" (পৃ. ৮০) এই বয়ানে যেন চকিতে ছায়া ফেলে রবীন্দ্রনাথের 'বিচারক' গল্পের মোক্ষদা চরিত্র। যে-পুরুষের অবিচার- অবিবেচনায় চরিত্রহীনা মোক্ষদা তৈরি হয়, তারাই বিচারক মোক্ষদাদের চরিত্রের অবনমনের। রামকালীর এতদিনের একপেশে মনকে সম্প্রতি ক্ষুদে একটি মেয়ে যেন "ভাবিয়ে তুলছে, চমকে দিচ্ছে, বিচলিত করছে, মেয়েমানুষ সম্পর্কে আরও একটু বিবেচনাশীল হওয়া উচিত কী না, এ প্রশ্নের সৃষ্টি করেছে।" (পৃ. ৮০) এ যেন উপন্যাসের পরোক্ষ বাচনে এক অন্তর্গূঢ় নৈঃশব্দ্যেরও ইঙ্গিত দিচ্ছে, "আকাশে সন্ধ্যা নামেনি, কিন্তু তাল নারকেলের সারি ঘেরা পুকুরের কোলে কোলে সন্ধ্যার ছায়া।" (পৃ. ৮০) এই অকাল-সন্ধ্যা যেন এক আসন্ন সর্বনাশের ইঙ্গিত দিচ্ছে। রামকালীর মতো বিবেচনাসম্পন্ন পুরুষরা এই অন্ধকারের ইঙ্গিতকে চিহ্নিত করেছিলেন কি।

সত্যবতীর পিত্রালয়ের দুটি ঘটনা। কাটোয়ার বৌ অর্থাৎ শঙ্করীর প্রথমে আত্মহত্যার প্রচেষ্টা এবং পরে পরপুরুষের সঙ্গে পালিয়ে যাওয়া সত্যবতীকে এক অজানা সত্যের কাছে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, "বিধবা হওয়া কী কষ্ট।" (পৃ. ৯৭) অর্থাৎ মানুষ হিসেবে সত্যিই কি কোনো চাহিদা আছে বিধবা মেয়ের? আর, রাসুর প্রথমা স্ত্রী সারদার সংসারে অবস্থান যে রাসুকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিল, "আমাকে স্পশ্য করতে হবে না, আগে মা সিংহবাহিনীর নামে দিব্যি কর আমি বেঁচে থাকতে ছুটকিকে ছোঁবে না।" (পৃ. ১০৮) এই শপথের অন্তঃসারশূন্যতা উপন্যাসের বাচনের ইঙ্গিতময়তায় উঠে আসে এইভাবে, "রাসু কী

শেষ অবধি মা সিংহবাহিনীর মর্যাদা রাখতে পেরেছিল! পুরুষ মানুষ কী তাই পারে! রাসুর মতো মেরুদণ্ডহীন পুরুষ! তবু এমনি মিথ্যে শপথের চোরাবালির উপরই তো ঘর বাঁধতে হয় মেয়েমানুষকে।" (পৃ. ১০৯) নারীর দর্পণে পুরুষের প্রচ্ছায়া এভাবেই গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়। পুরুষ মাত্রেই নারীর কাছে বন্ধনমুক্ত উঁচু আকাশের জীব। প্রখ্যাত ভাস্কর রঁদ্যার সেই ভাস্কর্যের মতো যে এক হাতে নারীকে জড়িয়ে রাখে, অপর হাত আকাশের দিকে বাড়িয়ে দেয়, আর নারী দুইহাতে আঁকড়ে থাকে সমস্ত শরীর-মন দিয়ে পুরুষকে।

সত্যবতী হাতেখড়ি ছাড়াই নিজের হাতে খড়ি নিজে দিয়েছে। তাই নেড়ু, পুণ্যির বিস্ময়ের উত্তরে সত্য বলে, "মেয়েমানুষরা যে রাতদিন ঝগড়া কোঁদল করছে, যাকে তাকে গালমন্দ, শাপমন্যি করছে, তাতে পাপ হয় না, আর বিদ্যে শিখলে পাপ হবে? বলি স্বয়ং মা সরস্বতী নিজে মেয়েমানুষ নয়, সকল শাস্তরের সার শাস্তর চার বেদ মা সরস্বতীর হাতে থাকে না।" (পৃ. ১৩১) এই প্রসঙ্গে আমরা রাসসুন্দরী দেবীর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'আমার জীবন'-এ দেখি, "সকলেই মেয়েছেলেকে বিদ্যায় বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তখনকার মেয়েছেলেগুলো নিতান্ত হতভাগা, প্রকৃত পশুর মধ্যে গণনা করিতে হইবেক। এ বিষয়ে অন্যের প্রতি অনুযোগ করা নিরর্থক, আমাদের নিজের অদৃষ্ট ক্রমে এ প্রকার দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। বাস্তবিক মেয়েছেলের হাতে কাগজ দেখিলে সেটি ভারি বিরুদ্ধ কর্ম জ্ঞান করিয়া বৃদ্ধা ঠাকুরানিরা অতিশয় অসন্তোষ প্রকাশ করিতেন; অতএব আমি কেমন করিয়া লেখাপড়া শিখিব। আমার মনও তাহা মানে না, লেখাপড়া শিখিব বলিয়া সতত ব্যাকুল থাকে।" (পৃ. ৪৯) এই দুই স্বীকারোক্তি নারীর অন্ধকারাচ্ছন্ন সামাজিক অবস্থানকে চিহ্নিত করে। সেই সঙ্গে ইঙ্গিত দেয় এই বাধাকে অতিক্রম করার জন্য নারীর একাগ্র প্রচেষ্টা।

সময়, পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে বারবার ভেঙেচুরে যাচাই করা ব্যক্তিত্বের পরিণতির লক্ষণ। সত্যবতীকে যখন পিতা রামকালী বলেন যে, শ্বশুরালয়ে পাঠালে তার মান থাকবে না, তখন গভীর দুঃখে সত্যবতী বলে, "গলবস্তর হয়ে সেদিন ওদের ঘরে মেয়ে দিয়েছ, মান তো সেদিনই গেছে।" (পৃ. ১৭৫) আবার সেই সত্যই আশ্বস্ত করে রামকালীকে, "তুমি নিশ্চিন্দি থেকো বাবা সত্যকে দিয়ে তোমার মুখ কখনো হেঁট হবে না।" (পৃ. ১৭৬) তাই পরবর্তী সময়ে সত্যবতীর ওপর অত্যাচারের খবর পেয়ে তাকে আনতে গিয়েও শূন্য হাতে ফিরতে হয়েছে রামকালীকে। সত্যবতীর শ্বশুর নীলাম্বর বাঁড়ুয্যের কাছে হেরে যাননি রামকালী, হেরে গেছেন আপন আত্মজার কাছে। বুদ্ধির খেলায়ও রামকালীকে পরাজিত করেছে সত্য। বাপের কাছে প্রতিপন্ন করেছে শ্বশুরবাড়িতে সুখে আছে সে, সন্তোষে আছে, তাই শ্বশুরবাড়ির কর্তব্যের কাছে বাপের বাড়ির তীব্র আকর্ষণ তুচ্ছ করতে পারা অসম্ভব হল না তার। এই প্রবল ব্যক্তিত্ব যার আছে, যার কর্তব্যবোধের কাছে তুচ্ছ হয়ে যায় সমস্ত রকম পিছুটান, সেই সত্যবতীর অভিমান আবার ক্ষমা করে না, রামকালীর অসুস্থ নবকুমারকে দেখতে না-আসার অপারগতা; কারণ রামকালীর কাছেই তো তার সব দাবি। আত্মমর্যাদার কঠোর ভিতের উপর তাই সত্যবতীর অবস্থান।

সত্যবতী তার গণ্ডিবদ্ধ জীবন থেকে পাড়ি দেয় কলকাতার উদ্দেশ্যে, যেন তা এক বৃত্ত থেকে অপর বৃত্তের উদ্দেশ্যে যাত্রা। সেখানে টিকে থাকার জন্য তার একক অভিযান।

সেখানে তার একমাত্র সঙ্গী ভবতোষ মাস্টার। রামকালী-বৃত্ত থেকে তার অপর সময়বৃত্তে আত্ম-নিরিখের যেন নব প্রচেষ্টা। সেখানে নারীর জন্য একদিকে আছে বদ্ধ আকাশ, আর অপর দিকে খোলা আকাশ। সত্যবতী খুঁজে নেয় খোলা আকাশের নিচে মুক্ত পরিসর, যেখানে সে নির্দ্বিধায় স্থান দিতে পারে শঙ্করীর অবৈধ কন্যা সুহাসকে। যে-রামকালী শঙ্করীকে কুলত্যাগ করার অপরাধে মৃতা বলে ঘোষণা করেছেন, সেই রামকালী সত্যবতীর হাতে-গড়া সুহাসকে দেখে গম্ভীর শান্ত গলায় বলেন, "সত্য এ যে তপস্বিনী উমা।" (পৃ. ৪০৪) রামকালীর কাছে এই প্রশংসা তো সত্যবতীর প্রাপ্য, কারণ সত্যবতী তার জীবন দিয়ে প্রমাণ করেছে তার 'হয়ে ওঠা'। কিন্তু বিরুদ্ধ শক্তির কাছে তার পরাজয় হয়েছে জীবনের শেষ প্রান্তে এসে, যখন শাশুড়ি ও স্বামী তার কন্যা সুবর্ণলতাকে মিথ্যের সাহায্য নিয়ে 'গৌরীদান' করে। সত্যবতী যখন এই মিথ্যার আয়োজন দেখে প্রচণ্ড আঘাতে ফিরে চলে, তখন নবকুমার ভর্ৎসনা করে বলে, "অশেষ দুঃখ আছে তোমার কপালে, স্বামী হয়ে এই অভিশাপ দিচ্ছি তোমায় আমি।" (পৃ. ৫০০) তখন সত্যবতীর বাচনে তীব্র ব্যঙ্গে উঠে আসে পুরুষের অবস্থান, "তাই তো দিয়ে আসছ তোমরা আবহমান কাল থেকে। স্বামী হয়ে, বাপ হয়ে, ভাই হয়ে, ছেলে হয়ে। ওটা নূতন নয়। অভিশাপেরই জীবন আমাদের।" (পৃ. ৫৩০) শুধু সদু যখন সুবর্ণলতার দিকে তাকিয়ে তাকে ফিরে আসতে অনুরোধ করে, তখন তার জীবনের এতদিনের সংগ্রামের ফসল হিসেবে এক নূতন সত্যের মুখোমুখি দাঁড়ায় সত্যবতী, "আকাশের দিকে চোখ ফেলে। সেখানে কী সুবর্ণর মুখটাই খোঁজে? ...সুবর্ণকে কী দেখতে পায় সত্য? তাই অমন আচ্ছন্নের মতো বলে, "সুবর্ণ যদি মানুষ হবার মালমশলা নিয়ে জন্মে থাকে ঠাকুরঝি, হবে মানুষ। ...নিজের জোরেই হবে। তার মাকে বুঝবে।" (পৃ. ৫৩১) অর্থাৎ, সত্যবতী উপলব্ধি করে মুক্তি মানুষকে নিজেবই অর্জন করতে হয়। নারীকেও ভাগ্য জয় করাব অধিকার কোনো পুরুষ, কোনো সমাজ হাতে তুলে দেবে না। নিজেকেই এর যোগ্য হয়ে অধিকার অর্জন কবতে হবে।

উনবিংশ শতকের নারীমুক্তি আন্দোলনের যে-ঢেউ শিক্ষিত মানসে দানা বেঁধেছিল, তার প্রতিফলন যদি পুরুষ লেখকের লেখায় লক্ষ করা যায় তা হলে দেখা যাবে শিক্ষিত পুরুষ তার সৃষ্ট নারী-চরিত্রের মধ্যে অনুসন্ধান করছিল শিক্ষিত সঙ্গিনীর। মধুসূদনের সৃষ্ট নারী-চবিত্র থেকে বঙ্কিম হয়ে রবীন্দ্রনাথের নাবী-চরিত্ররা আপন পরিসর সম্পর্কে সচেতন ছিল। যেমন মেঘনাদবধ কাব্যের চিত্রাঙ্গদার রাবণের উদ্দেশে সেই অমোঘ বাক্য, "হায় নাথ, নিজ কর্মফলে মজালে রাক্ষসকুলে, মজিলা আপনি" থেকে শুরু করে কপালকুণ্ডলার নির্দিষ্ট পরিসর সন্ধান "যদি জানিতাম যে স্ত্রীলোকের বিবাহ দাসীত্ব, তবে কদাপি বিবাহ করিতাম না।" আবার রবীন্দ্র উপন্যাসে, কুমুদিনীর আত্মোপলব্ধি, "এমন কিছু আছে যা ছেলের জন্যেও খোয়ানো যায় না।" এই আত্মানুসন্ধান ছিল অপরতার দর্পণে নারী-পরিসর আবিষ্কারের দুর্মর চেষ্টা। আশাপূর্ণা দেবী সত্যবতী চরিত্রের মধ্যে তুলে ধরেছেন নারীর নিজেকে জানার চেতনাদৃপ্ত আত্মজিজ্ঞাসা। যুক্তিবুদ্ধি, নিজস্ব ন্যায়-নীতির আলোকে নিজেকে বারবার ভাঙচুর করে নিজস্ব পরিসর অনুসন্ধান করা এবং সেই পরিসরকে বিনির্মাণ করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার মধ্য দিয়ে সত্যবতী সময়ের সঙ্গে নিজেকে তুলে ধরেছে প্রতিস্পর্ধী চরিত্র হিসেবে।

সামাজিক বিধি-বিন্যাস-কে প্রশ্নে প্রশ্নে বিদ্ধ করে তুলে ধরেছে মুখোশের অন্তরালের মুখশ্রীকে।

ভার্জিনিয়া উলফ তাঁর 'A Room of one's own' গ্রন্থে মন্তব্য করেছিলেন যে, নারীর একান্ত ব্যক্তিগত পরিসর চাই, যে-পরিসরের চাবিকাঠি তার নিজের হাতে থাকবে। পরিসর অনুসন্ধান করতে হলে প্রয়োজন নিজস্ব যোগ্যতাও, কারণ ব্যক্তি তার পরিসর নির্মাণ করে আপন যোগ্যতানুসারে। সত্যবতী তার অস্তিত্বানুসন্ধানের সঙ্গে সঙ্গে চিহ্নিত করেছিল নারীর চারিত্রিক দুর্বলতাও। রামকালী, তার পিসি মোক্ষদা, মাতা ভুবনেশ্বরী, শাশুড়ি এলোকেশী, স্বামী নবকুমার, কন্যা সুবর্ণলতা—সত্যবতীর চেতনারাজ্যের বিপরীত চারিত্রিক মেরু। এই বৈপরীত্যের দ্বন্দ্বের পরিণতিতে নির্মিত হয়েছে সত্যবতীর নিজস্ব পরিসর। অস্তিত্ব অনুসন্ধানের যে-বিন্দু থেকে সে যাত্রা করে আপন চেতনার গভীরতম প্রান্তে, সেখানে সে পর্যায়ক্রমে মুখোমুখি হয়েছে বিপ্রতীপ চৈতন্যস্রোতের, যা তার সম্মুখে তুলে ধরেছে অন্তহীন আত্মজিজ্ঞাসা। রামকালী তার প্রবল ব্যক্তিত্ব দিয়ে গড়ে দিতে চেয়েছিলেন সত্যবতীর চরিত্র। সত্যবতী পিতাকে একান্ত শ্রদ্ধা করে যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে তৈরি করে নিয়েছিল সমান্তরাল নিজস্ব যাত্রাপথ। এই সমান্তরাল চেতনা-স্রোতে মোক্ষদা থেকে শুরু করে প্রতিটি চরিত্রের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষে সত্যবতী বিপরীত সত্য উপলব্ধির সম্মুখীন হয়েছে। অর্থাৎ, আবহমান কাল ধরে একদেশদর্শী যে-সমাজ নারীকে নির্মাণ করেছিল আপন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, সেই নারী যখন সময়ের দর্পণে আপন মুখ দেখে, তখন আবিষ্কার করে অসত্যের আবরণে আচ্ছাদিত সত্যের ভিন্ন মুখশ্রী।

সত্যবতী তৈরি করে নিয়েছিল তার সাংস্কৃতিক পরিসরও কারণ সাংস্কৃতিক অস্তিত্বানুসন্ধানের মূল কথা হল—"Culture is not only what we live by, it is also in great measure what we live for." (P. 130, The Idea of Culture–Terry Eagleton) কারণ সংস্কৃতি তো ব্যক্তিই নির্মাণ করে। তাই যে-সত্যবতী তার জীবনসংগ্রামের প্রতিটি সোপানে চেষ্টা করেছে আত্মসংশোধনের মধ্য দিয়ে সমাজ তথা পরিবারের সংশোধনের, যে-সত্যবতী সন্তানের শিক্ষার জন্য নিরন্তর সংগ্রাম করে কলকাতায় সকলের অমতে পরিবারকে নিয়ে গেছে—সেই সত্যবতীকেই প্রতারণা করে যখন তার শাশুড়ি এবং স্বামী কন্যা সুবর্ণলতাকে অপরিণত বয়সে বিবাহ দেন, তখন সে সুবর্ণলতার পরিণতিতে মাতৃত্বের হাহাকারে ভেঙে না-পড়ে উপলব্ধি করেছিল—সুবর্ণলতা যদি কোনোদিন ব্যক্তি সুবর্ণলতা হয়ে ওঠে তবে তার অস্তিত্ব তথা পরিসর নিজেই সন্ধান করে নেবে। এই একান্ত নিবিড় উপলব্ধির মধ্য দিয়ে নারী তার নিজস্ব পরিসরের চাবিকাঠি খুঁজে পেল। নারীমুক্তির যথার্থ পদক্ষেপ তাই আশাপূর্ণা দেবীর 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'।

আশাপূর্ণার উপন্যাসে অন্তঃপুরের জীবন

সুদীপা চৌধুরী

'অন্তঃপুরের ভাষ্যকার'—সাহিত্যজগতে আশাপূর্ণার যাবতীয় খ্যাতি ও বিড়ম্বনা, এই পরিচয়ের কারণেই। একেবারে নিজের চেষ্টায় লুকিয়ে-চুরিয়ে যাঁর বিদ্যাশিক্ষার সূচনা, এবং সাংসারিক নানা প্রতিবন্ধকতার ফাঁকে-ফোঁকরে রান্নাঘর বা ভাঁড়ারের কোনে বসে যিনি তৈরি করেছেন এক বিপুল ও বিস্তৃত সাহিত্য সম্ভার, তাঁকে এই একটি পরিচয়ে পরিচিত করতে গেলে অবিচার করা হয়। তাঁর রচনায় নারীমুখের ভিড় বেশি—তাই নারীর জগতেরও ঘটেছে স্বাভাবিক উদ্ঘাটন—এই দিক থেকেই বরং আমরা তাঁর রচনা—বিশেষত উপন্যাসগুলিকে দেখতে চেষ্টা করব।

একবিংশ শতাব্দীতে বসে এ যুগের মেয়েদের অবাধ স্বাধীনতা ও প্রগতিকে লক্ষ করে দুই শতক পূর্বে বাঙালি নারীর সামাজিক অবস্থানের বিষয়ে ভাবতে অবাক লাগে। তবে আজও সমাজের সব অংশই যে সমানভাবে আলোকিত, তা বলতে পারি না। সেইসব অন্ধকার ক্রমাগত ঘটিয়ে চলে নারী-নির্যাতনের নানাবিধ ঘটনা। আমরা শিহরিত হই—হই চিন্তিত। আশাপূর্ণা তাঁর রচনায় জীবন্ত করে তুলেছেন গভীর তামসিকতায় ঢাকা সেই সময়টিকে, যখন নারীদের মানুষ বলেই গণ্য করার রীতি ছিল না। ঊনবিংশ-বিংশ শতকের বাঙালি নারীর অসহায়তার চিত্র ফুটে ওঠে তাঁর সুবিখ্যাত ত্রয়ী উপন্যাস, 'মিত্তিরবাড়ি' ও অন্যান্য কিছু রচনায়।

নারীমুক্তি নিয়ে সাম্প্রতিক কালে ঘটে-চলা নানা লেখালেখি ও আন্দোলনের আগেও কিছু সৃষ্টিছাড়া মেয়ে নিয়ত সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে নিজেদের অপমানিত জীবনের, সামাজিক অবস্থানের পরিবর্তন ঘটাতে চেয়েছিল—'প্রথম প্রতিশ্রুতি' উপন্যাসের সত্যবতী, 'সুবর্ণলতা' উপন্যাসের সুবর্ণ—সেইরকম মেয়ে। এদের সংগ্রামকে শ্রদ্ধা জানিয়েই আশাপূর্ণার সৃজন। মূলত সত্যবতী ও সুবর্ণলতার হাত ধরেই আমরা চিনে নেব নারীর সেই সময়ের জগৎটিকে।

এক

ভারতে ইংরেজ রাজত্ব স্থাপনে দেশের অসুবিধা ও অপকার হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু ছোটোখাটো কিছু উপকারও যে ঘটেনি, তা নয়। ইংরেজ রাজত্ব কেবলমাত্র প্রশাসনিক নয়, ভারত তথা বাংলার আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন নিয়ে এসেছিল। সে-সময় অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নতুন বিন্যাসের ফলে বিনিময় প্রথার পরিবর্তে দেখা দেয় মুদ্রা নির্ভরতা। আর এই কারণেই দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো হয়ে ওঠে নগরকেন্দ্রিক। শাসক পক্ষের প্রশাসনিক তাগিদ ও বাঙালি প্রজার পক্ষে জীবিকার তাগিদে কয়েক দশকের মধ্যে বাঙালি সমাজে ইংরেজি শিক্ষার ক্রমপ্রসারণ দেখা দেয় এবং এর ফলে ব্যবসায়ী বাবু ও শিক্ষিত ভদ্রলোকদের সমন্বয়ে গঠিত নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণির পরিধির ধীরে ধীরে সম্প্রসারণ ঘটে। অর্থনৈতিক তাগিদে ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন শুরু হলেও কিছু মানুষের জীবনযাত্রা ও

চিন্তাজগতে পড়তে থাকে তার সুদূরবিস্তারী প্রভাব। ফলে শিক্ষিত জনের মনে ক্রমশ বিবাহ, মহিলা এবং দাম্পত্য-সম্পর্ক বিষয়ে এমন নবচেতনা দানা বাঁধতে শুরু করে, যা পূর্বপুরুষদের অনুভববেদ্য ছিল না।

বহু পূর্বকাল থেকে উনবিংশ শতকের শেষদিক পর্যন্ত সমাজে বাঙালি নারীর অবস্থান ছিল কেবলমাত্র সমাজযন্ত্রের অঙ্গ রূপে। সুদীর্ঘকাল ধরে পুরুষের কর্তৃত্বাধীনে থাকার কারণে এবং পুরুষরচিত কৃত্রিম বিধি-ব্যবস্থার চাপে পিষ্ট হবার ফলে নারীর নিজস্ব অবস্থান ও সামাজিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সে-সময় কোনো সচেতনতাই ছিল না। পাশ্চাত্য শিক্ষা সম্পর্কে জাগ্রত চেতনাধারায় মানুষের মনে কিন্তু প্রশ্ন জাগতে শুরু করল। উনিশ শতকের প্রথম জাগ্রত ব্যক্তিত্ব রামমোহন ১৮১৯ সালে লিখলেন—"বিবাহের সময়ে স্ত্রীকে অৰ্দ্ধাঙ্গ করিয়া স্বীকার কবেন, কিন্তু ব্যবহারের সময় পশু হইতে নীচ জানিয়া ব্যবহার করেন; যেহেতু স্বামীর গৃহে প্রায় সকলের পত্নী দাস্যবৃত্তি করে, অর্থাৎ অতিপ্রাতে কী শীতকালে কী বর্ষাতে স্নানমার্জন, ভোজনাদি পাত্রমার্জন, গৃহ লেপনাদি তাবৎ কৰ্ম্ম করিয়া থাকে, এবং সূপকারের কৰ্ম্ম বিনা বেতনে দিবস ও রাত্রিতে করে,...

কিন্তু এতসব করা সত্ত্বেও স্ত্রীর ওপর স্বামী দৈহিক সহ নানা ধরনের অত্যাচার করতে ছাড়ে না।"

কিছুকাল পরে প্রকাশিত প্রথম মহিলা রচিত আত্মজীবনীতে এই বক্তব্যের সমর্থন পেয়ে যাই। রাসসুন্দরী তাঁর আত্মজীবনী 'আমার জীবন' (১২৮৩) গ্রন্থে লেখেন—"কাজের গতিকে আমাব দিনরাত বিশ্রাম ছিল না। আব অধিক কী বলিব, আমার শরীবের যত্নমাত্রও ছিল না। অন্য বিষয়ে যত্ন দূরে থাকুক, দু বেলা আহার প্রায় ঘটত না।"

তবে রাসসুন্দরীর ভাগ্যে কর্মবাহুল্য থাকলেও যে-ব্যাপারটি ছিল না, তা হল নির্যাতন। সে-সময়ের অধিকাংশ বধূকেই শ্বশুরবাড়ির লাঞ্ছনা ভোগ কবতে হত। বামাবোধিনী পত্রিকায় আশ্বিন ১৩১৮-তে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে লেখিকা ড. সান্যাল লেখেন —"হিন্দুসমাজের প্রায় ঘরে ঘরে বধূদিগেব প্রতি বড়ই অমানুষিক অত্যাচার করা হয়। আমার অনুমান শতকেরা ৫ জন বধূ শ্বশ্রূর স্নেহের অধিকারিণী হইতে পাবেন। অবশিষ্ট ৯৫ জন শ্বশ্রূর কাছে অশেষ প্রকাব বাক্যেব ও অন্যবিধ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া দিনাতিপাত করিয়া থাকেন।

..স্নেহ ও করুণার পরিবর্তে অসহ্য বাক্যবাণ ও নিগ্রহই সর্বক্ষণ তাহার সহচর হয়।"

সেই বধূদের স্বামীরা বি. এ., এম. এ. উপাধিধারী হয়েও 'মাতৃপ্রীত্যর্থে' স্ত্রীকে কর্কশ বাক্যে ও অপ্রিয় বাক্যে জর্জরিত করে মাতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখায়। আমরা এ প্রসঙ্গে কল্যাণী দত্তের 'পিঞ্জরে বসিয়া' গ্রন্থে উল্লিখিত দুই প্রবল শিক্ষিত ব্যক্তিত্ব—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'মাতৃপ্রীত্যর্থে' স্ত্রীর প্রতি অবিচারের ঘটনা স্মরণ করতে পারি।

প্রবন্ধে লেখিকা বধূ নির্যাতনের বিবিধ প্রসঙ্গ নিয়ে বিশদ আলোচনার পর সিদ্ধান্ত করেন—"এইসকল অশান্তির মূল কারণ একমাত্র হিন্দু রমণীর শিক্ষার অভাব।" (হিন্দু গৃহে বধূ-যন্ত্রণা, ড. সান্যাল)

বস্তুত ১৮১৯ সাল থেকেই নারীদের শিক্ষা নিয়ে বাঙালি সমাজে সচেতনতার সূচনা। যার শম্বুক গতি বেথুনের স্কুল স্থাপনের বেশ কিছু বছর পর অবধিও তেমন গতি লাভ করতে পারেনি সমাজের সাধারণ মানুষের চেতনার অনগ্রসরতা ও কুসংস্কারান্ধ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে। সাত-আট বছর বয়সেই সে-সময় মেয়েদের বিয়ে হয়ে যেত এবং সেই সঙ্গে তাকে মেনে চলতে হত অবরোধের সমস্ত নিয়ম কানুন। তাই মেয়েদের শিক্ষার অগ্রগতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল অবরোধমুক্তির প্রশ্নটিও। এ বিষয়ে প্রচুর বাদ-বিবাদ, দৃষ্টান্ত স্থাপন ইত্যাদির পর আস্তে আস্তে রুদ্ধ কপাট খুলতে থাকে—মেয়েরা শিক্ষার আলো পেতে শুরু করেন।

দুই

উনবিংশ-বিংশ শতকেব সামাজিক ইতিহাস পর্যালোচনা করে সে-যুগে নারীর সামাজিক অবস্থান সংক্রান্ত যেসব তথ্য আমরা পাই, আশাপূর্ণা সেইসব তথ্যকেই কাহিনি ও জীবনের রসে জারিত করে উপস্থিত করেন তাঁর মহাকাব্যোপম ত্রয়ী উপন্যাস--'প্রথম প্রতিশ্রুতি', 'সুবর্ণলতা' ও 'বকুলকথা'তে। তাঁর লেখনীর জাদুস্পর্শ, অসাধারণ কালসচেতনতা, নারীর প্রতি সহজাত মমত্ববোধ সেই সময়পর্বটিকে এমন অনাযাসে জীবন্ত করে তোলে যে, ইতিহাস-অসচেতন পাঠকও তা পাঠ করে আপ্লুত হয় এক অজানিত মমতায়। ইতিহাসের প্রেক্ষিত কীভাবে তাঁর নানা উপন্যাসের চালচিত্র নির্মাণ করে তা আমরা দেখে নিই—ত্রয়ী উপন্যাসে বিধৃত সময় উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে বিংশ শতকের শেষ পাদ পর্যন্ত। 'মিত্তিরবাড়ি' উপন্যাসে এসেছে বিংশ শতকের প্রথমার্ধের শেষদিকের চিত্র। সে-সময় সমাজে প্রচলিত নানা কুসংস্কাব—যেগুলির সংস্কার সাধনের জন্য একদা বাঙালির নবজাগ্রত চেতনা বিক্ষোভে ও কর্তব্যে উত্তাল হযে উঠেছিল, তাব অনেকগুলিই এই উপন্যাসগুলিতে এসেছে।

'সত্যবতী' ও 'সুবর্ণলতা'—দুজনেই বাল্যবিবাহ প্রথার বলি হয়েছে। 'সত্যবতী'র পিতা কাবিরাজ 'রামকালী' উন্নত যুক্তি-বুদ্ধির অধিকারী হলেও সমাজ-প্রচলিত সংস্কারকে অন্ধের মতো অনুসবণ করেছেন। একমাত্র কন্যাকে তাব বোধবুদ্ধি জন্মানোব আগেই বিবাহ দিয়ে লাভ করেছেন 'গৌরীদানে'র পুণ্য। সেই সময়ে মেয়েদের দুঃখের অন্যতম কারণ ছিল এই বাল্যবিবাহ প্রথা। রাসসুন্দরী—যিনি বিবাহ পরবর্তী জীবনে কোনো দুর্ব্যবহার লাভ করেননি, তিনিও প্রথমবার শ্বশুরবাড়ি যাত্রার সময়ে তাঁর মনোভাবকে দুর্গোৎসবে বা শ্যামাপূজায় বলির পাঁঠার প্রাণের আশা পরিত্যাগ করে 'মা মা' কবে ক্রন্দনের সঙ্গে তুলনা করেছেন। বারবারই তিনি শ্বশুরবাড়িতে মেয়েদের অবস্থাকে 'পিঞ্জরাবদ্ধ পাখি'র সঙ্গে তুলনা করেছেন।

জ্ঞান হবার আগেই সত্যবতী'র বিয়ে হযেছে—'ঘরবসতে'র সময় ধার্য ছিল দশ বছর—তার এককবছর আগেই তাকে শ্বশুরবাড়ি থেকে নিতে এলে তার পিতা আপত্তি করেছেন। সত্যবতী কিন্তু সে-আপত্তি না-শুনে বাল্যবিবাহের প্রতিবাদেই শ্বশুরবাড়িতে যেতে চেয়েছে। মা-বাবার প্রতি গভীর অভিমানে সে বলেছে—বাল্যবিবাহের পরিণতি জেনেও যখন তাঁরা সে-কাজ করেছেন, তখন আর বৃথা কালক্ষেপে কী প্রয়োজন? 'তুশ্চ'

মেয়েসন্তান বলেই যখন তাকে সাত তাড়াতাড়ি 'পরগোত্তর' করে দেওয়া হয়েছিল এবং সে না-গেলে যখন তার স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহের সম্ভাবনা, তখন তাকে পাঠিয়ে দেওয়াই উচিত। বাবার প্রতি নিদারুণ অভিমানে সে বলেছে, "শ্বশুরবাড়ি আর যমের বাড়ি দুই যখন সমতুল্যি, তখন আর মনে খেদ রেখো না। পাঠিয়ে দিয়ে মনে করো সত্য মরে গেছে।"

'সত্যবতী' নিজের কন্যা সুবর্ণের বিয়ে তাই ষোলো বছরের আগে দিতে চায়নি। কিন্তু তার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী শাশুড়ি তার এই ইচ্ছা কার্যকরী করতে দেয়নি। দেশের বাড়িতে নাতনি বেড়াতে এলে সত্যকে না-জানিয়েই নয় বছর বয়সে সুবর্ণের বিয়ে দিয়ে দিয়েছে। সত্য স্বামীর এই বিশ্বাসঘাতকতাকে ক্ষমা করতে পারেনি, সংসার ত্যাগ করে আমৃত্যু কাশীবাসী হয়েছে। বস্তুত সে-সময় মেয়েদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্যই ছিল বিবাহ ও স্বামীর পরিতুষ্টি বিধান। তাই শিশুকাল থেকেই তাকে সেই শিক্ষায় দীক্ষিত করতেন মা, ঠাকুমারা। মেয়ে সন্তানও তাই জন্মাবধি চিন্তায়, চেতনায় বধূ-সংস্কারই বহন করত। সে-কারণে নিজের অবস্থান নিয়ে প্রশ্নও তুলত না তারা, ঘাড় গুঁজে জীবন কাটিয়ে দেওয়াটাই তাদের নিয়তি বলে তারা মেনে নিত।

'সত্যবতী'র জেঠতুতো দাদা রাসু'র দ্বিতীয় বিবাহের ঘটনাকে কেন্দ্র করে উপন্যাসে 'কৌলীন্যপ্রথা' ও 'বহুবিবাহ প্রথা'র অবতারণা ঘটেছে। ব্রাহ্মণের জাতরক্ষার মহৎ কর্তব্য সাধনের দায়ে রামকালী বিবাহিত ও পুত্রের জনক ভ্রাতুষ্পুত্র রাসুকে তড়িঘড়ি উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে দ্বিতীয়বার বিয়ের পিঁড়িতে বসিয়েছেন। এ বিষয়ে তার প্রথমা স্ত্রীর মতামত নেওয়া তাঁর কাছে যেমন অপ্রয়োজনীয় ছিল, তেমনিই এ ঘটনায় তার মনখারাপ বা কান্নাকাটি করাটাকেও মনে হয়েছে বাহুল্য। কিন্তু মেয়ে বলেই সত্যবতীর ভাবনা-চিন্তা অন্যরকম। সে ভাবে—"এত বোধবুদ্ধি বাবার, অথচ সোয়ামী আর একটা বিয়ে করে আনলে মেয়েমানুষের প্রাণ ফেটে যায় কিনা সে জ্ঞান নেই।" এ বিষয়ে তাই বাবার চৈতন্য সম্পাদন করতে চায় সে। বাবা যখন তাকে 'সতিন কাঁটা' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহারের কারণে ভর্ৎসনা করেন—বোঝাতে চান, মানুষ তো বনের পশু নয় যে হিংসা-হিংসি কামড়া-কামড়ি করবে, দুটি বৌ তো দুই বোনের মতোই থাকতে পারে এক সংসারে। সত্য তখন তর্ক করে—সতিন যদি ভালো, তবে সেঁজুতি ব্রতে সতিনের সর্বনাশের মন্ত্র কেন উচ্চারণ করতে হয়? সে ভেবে আশ্চর্য হয়, তার যে-বাবা মানুষের মুখ দেখে রোগের লক্ষণ বুঝতে পারেন, তিনি মেয়েমানুষের প্রাণের যন্ত্রণার কথা বুঝতে পারেন না কেন? আসলে তিনি পুরুষ বলেই বোধহয় অক্ষম।

মেয়ের কথায় রামকালী নতুন করে ভাবতে বসেন। বুঝতে পারেন, "যে জাতটার ভূমিকা হচ্ছে শুধু ভাত-সেদ্ধ করবার, ছেলে ঠেঙাবার, পাড়া বেড়াবার, পরচর্চা করবার, কোন্দল করে অকথ্য অশ্রাব্য গালিগালাজ করবার, দুঃখে কেঁদে মাটি ভেজাবার আর শোকে উন্মাদ হয়ে বুক চাপড়াবার, তাদের প্রতি প্রচ্ছন্ন একটা অবজ্ঞা'র মনোভাবই রয়েছে তাঁর মনে। অনেক চিন্তায় অগ্রবর্তী হলেও "সমগ্র 'মেয়েমানুষ' জাতটার প্রতি নেই তেমন সম্ভ্রমবোধ, নেই সম্যক মূল্যবোধ।" তাই তাদের কথা আলাদা করে ভাবতে পারেন না। তিনি। সে-যুগের অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যেই ছিল এই দোটানার বোধ।

আসলে সেকালে পুরুষের বারমহল ও মেয়েদের অন্দরমহলের যেমন স্বতন্ত্র অবস্থান ছিল, তেমনি দুই মহলের মধ্যে যাতায়াতেরও প্রচলন ছিল না। তাই সংসারে মেয়েদের কর্মময় ও কঠোর পরিশ্রমের রূপটি প্রায়শই অজ্ঞাত থেকে যেত পুরুষদের কাছে, সেই সঙ্গে তাদের প্রতি সহজাত অবজ্ঞার মনোভাব থাকায়—ঐ মানুষগুলির যে নিজস্ব কোনো চাওয়া-পাওয়ার জগৎ থাকতে পারে, সে-সম্পর্কেও ছিল অসচেতনতা। মেয়েদের মননশক্তি বা মেধা নেই—এটাই ছিল সেকালের জনপ্রিয় বিশ্বাস। রামমোহন এই মনোভাবের প্রতিবাদ করে লিখেছিলেন—"স্ত্রীলোকের মেধা আছে কিনা তা কী কোনোদিন পরীক্ষা করে দেখেছেন?"

রামকালী কন্যার প্রতি স্নেহদুর্বল ছিলেন এবং কন্যাটি তার সাহচর্য পছন্দ করত বলে, সত্যবতী'র সহজাত বুদ্ধি ও বিচারশক্তি পর্যবেক্ষণ করতে পারতেন তিনি। ঐটুকু শিশুর যুক্তি-বোধ তাঁর বিশ্বাসের ভিত টলিয়ে দিত মাঝে-মধ্যেই। কিন্তু এমন ঘটনা তো সে-সময়ের সমাজে প্রায়শই ঘটত না, তাই সমাজপতিদের চোখও খুলত না।

রাসু'র দ্বিতীয় বিবাহ হয় যে-মেয়েটির সঙ্গে, তার লগ্নভ্রষ্টা হবার উপক্রম হয়েছিল যখন, তখন সমাজের কিছু বৃদ্ধের কথায় কৌলীন্য প্রথার আস্ফালন দেখি। লগ্নভ্রষ্টত্বের হাত থেকে বাঁচতে গ্রামস্থ প্রতিশোধপরায়ণ বৃদ্ধ রামহরি পটলীর (কনে) ঠাকুরদাদাকে তার চেয়েও পাঁচ-সাত বছরের বড় দয়াল মুখুজ্যের সঙ্গে বিয়ে দেবার পরামর্শ দেয়। তিনি তাতে আপত্তি জানালে একঘরে করার ভয় দেখায়। গভীর দুঃখ পাই যখন দেখি লগ্নভ্রষ্টা 'দ'-পড়া জীবনের চেয়ে মেয়ের মৃত্যু কামনা করে তার মা নিষ্কৃতি পেতে চান। সমাজ- প্রচলিত বিধি সেকালের মেয়েদের কীভাবে বেঁধে মারত—এ তার এক দৃষ্টান্ত।

নিতান্ত শিশুবয়সে যখন মেয়েরা শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে পৌছাত, তখন তারা কেমন উৎপীড়নের শিকার হত, তা আগে কিছুটা বলেছি। 'সত্যবতী' ও 'সুবর্ণলতা'র জীবনেও নানাবিধ নির্যাতন ঘটেছে কিন্তু তবু তারা বশ্যতা মেনে সমাজ-নির্দিষ্ট পথে 'ভালো-বৌ' হবার সাধনা করেনি।

'সত্যবতী'র চুল বাঁধা নিয়ে তার শাশুড়ি যখন তাকে কিল মারে—সত্য কৈফিয়ৎ চায়। শাশুড়ি বৌ-এর এহেন প্রশ্নে নিতান্ত অপমানিত বোধ করে চ্যালাকাঠ তার পিঠে ভাঙবেন বলে মত প্রকাশ করায় সত্য নির্ভীক কণ্ঠে বলে "মারো না দেখি তোমার কত চ্যালাকাঠ আছে!" এলোকেশী থতমত খান। ঘটনাচক্রে এসে-পড়া পুত্রকে বৌ-শাসনের জন্য প্ররোচিত করলেও নবকুমার পিঠটান দেয়। সারাজীবন নানারকম গঞ্জনা দিতে থাকেন এরপর তিনি—সত্য বাদে-প্রতিবাদে, কখনো নীরবতায় সে-সবের ভার বয়ে চলে।

বছর পঁয়তাল্লিশ পরেও কিন্তু সমাজের চিত্রের কিছু হেরফের ঘটে না, যখন দেখি সত্য'র মেয়ে সুবর্ণকে স্বামী প্রবোধের হাতে মার খেতে এবং শ্বশুরবাড়ির লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, অত্যাচারের শিকাব হতে। সুবর্ণর স্বামী প্রবোধচন্দ্র কলকাতার বাসিন্দা, কিন্তু রক্ষণশীলতায় বহু প্রাচীনকেও হার মানায়।

"দু-তিন ছেলের মা হবার পর মারটা ছেড়েছিল প্রবোধ, কিন্তু পরপুরুষের গা ঘেঁষে বসে আদর কাড়ানোর খবরে আর মেজাজ ঠিক রাখতে পারল না। হিংস্র জানোয়ারের মতো প্রায়

ঝাঁপিয়ে পড়ে দেয়ালে মাথা ঠুকে দিতে দিতে উচ্চারণ করল, "বল্‌ আর বুড়োর সঙ্গে কথা কইবি না! প্রতিজ্ঞা কর।"

'প্রথম প্রতিশ্রুতি' উপন্যাসে স্বামীর হাতে মার খেয়েছে 'জটার স্ত্রী'—সেখানে অপরাধ ছিল সামান্য। স্বামী পান চেয়ে পান পায়নি। কিন্তু সুবর্ণদের কালে স্ত্রী নির্যাতনের অজুহাত হিসাবে সামান্য কারণের সঙ্গে যোগ হয়েছিল স্বামীর হীনমন্যতা, সন্দেহ ইত্যাদি মানসিকতার জটিল কারণগুলিরও।

অথচ এইসব প্রাত্যহিক অত্যাচারকে মেনে নিয়েই সেকালের মেয়েরা সংসার করত, ভাত রাঁধত, সন্তানের জন্ম দিত। জটা'র অত্যাচারী ভূমিকা সম্বলিত ছড়া জটার স্ত্রীকে ক্ষুব্ধ করেছিল, কারণ স্বামী তাকে মেরেছে—সেটা তার কাছে খুব কিছু অপমানের ব্যাপার নয়। তাই সত্যবতীকে সে বলেছিল—"আমার সোয়ামী আমায় মেরেছে, তোমায় তো মারতে যায়নি ঠাকুরঝি? তোমার এত গায়ে জ্বালা কেন যে ছড়া বেঁধে গালমন্দ করতে আস?" সত্য ছি ছি করে সরে এসেছে। মেয়েদের এই 'দুষপ্রবিত্তি'র কারণ খুঁজে পায়নি।

বহুদিন পরে সুবর্ণলতা খুঁজে পেয়েছিল কারণটা। "শুধু একজন সুবর্ণলতাই নয়, এমন হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ সুবর্ণলতা এমনি করে দিনে দিনে তিলে তিলে ধ্বংস হচ্ছে। কেউ লড়াই করে চূর্ণ-বিচূর্ণ হচ্ছে কেউ ভীরুতায় অথবা সংসারের শান্তির আশায় আপন সত্তাকে বিকিয়ে দিয়ে পুরুষসমাজের 'ইচ্ছের পুতুল' হয়ে বসে আছে।"

..."বুঝতে পারি, এদের লড়াইয়ের শক্তি নেই, তাই নিরুপায় হয়ে ঐ দ্বিতীয় পথটা বেছে নিয়েছে।"

"সত্তার বদলে শান্তি কিনেছে ওরা, আত্মার বদলে আশ্রয়। কারণ এ ছাড়া আর উপায় নেই ওদের!"

"সমাজ ওদের সহায় নয়, অভিভাবকরা ওদের অনুকূল নয়, প্রকৃতি পর্যন্ত ওদের প্রতিপক্ষ! ওরা অন্ধকারের জীব!"

স্ত্রী-নির্যাতনের চরমতম রূপ দেখি ভাবিনী'র বোন পুটুর জীবনে। বালিকা বধূ স্বামী সন্নিধানে যেতে ভীত ও অনিচ্ছুক হলে স্বামী ও শাশুড়ি তাকে নোড়া দিয়ে ছেঁচে মেরে ফেলে। ভাবিনী ভাবে ছোট বোনটা মারা গেল বলেই দুঃখ—না-হলে বিয়ে করা পরিবারকে 'মারতে পারা', 'কাটতে পারা', ছেঁচতে পারা', 'কুটতে পারা'র অধিকার আছে তার স্বামীর।

সত্য তখন আগুন-মুখে বলেছে ঐ জামাইয়ের মাথা ফাটিয়ে গুঁড়ো করে ফাঁসিকাঠে ঝুলতে হলেও সে তা করত। তবে সত্য শুধু ভেবেই ক্ষান্ত হয় না। সে কাউকে না-বলে পুলিশের কাছে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এবং শাসন ব্যবস্থার অবিচার সংক্রান্ত অভিযোগ জানিয়ে চিঠি পাঠায়। পুলিশ-কর্তা এসে সত্যকে জিজ্ঞাসা করে, ঘটনার যথাযোগ্য তদন্ত করবেন বলে আশ্বাস দিয়ে যান এবং সত্যর সাহস ও সামাজিক দায়িত্ববোধকে প্রশংসা করেন।

মেয়েরা সে-সময় নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে অসচেতন ছিল, তার প্রধানতম কারণ ছিল শিক্ষার অভাব। রামমোহনের মতো কিছু মানুষ এ ব্যাপারে সচেতনতা দেখান, সমাজের উপরমহলে স্ত্রী-শিক্ষার প্রচলন শুরু হয় কতিপয় উৎসাহী মানুষের উদ্যোগে। নব্যশিক্ষিত

যুবকদের মধ্যে শিক্ষাপ্রাপ্ত স্ত্রীর জন্য চাহিদা দেখা দেওয়ায়, অনড় সংস্কারান্ধ চিত্তে কিছুটা পরিবর্তন ঘটতে থাকে, শিক্ষিত যুবকেরাও তাঁদের বিবাহিত স্ত্রীদের শিক্ষাদান করে নিজেদের মানস-সঙ্গী হিসাবে তৈরি করতে থাকেন। একটি দুটি করে বিদ্যালয় স্থাপিত হতে থাকে—তবু সামাজিক বাধা ও অবরোধ প্রথার কারণে শিক্ষার প্রচলন খুব বেশি বাড়ে না। উনিশ শতকের শেষদিকে স্ত্রী-শিক্ষার প্রচলন কিছুটা বাড়ে।

'সত্যবতী' কে কেউ লেখাপড়া শেখায়নি। ভাইদের দেখে দেখে সে নিজে নিজেই পড়তে শেখে। এই সংবাদ প্রকাশ পেলে তার পরিবারে আলোড়ন ওঠে প্রবল। সত্য লিখতে জানে শুনে তার ঠাকুমা-পিস্ঠাকুমারা হায় হায় করেন, কারণ লেখাপড়া-জানা মেয়েকে শ্বশুরবাড়িতে নেবে না। সত্য'র বাবাকে দিয়ে মেয়েকে বোঝানোর চেষ্টা করেন তাঁরা। সত্যের পক্ষে আছে নিজস্ব যুক্তি—দেবী সরস্বতী নিজেই মেয়ে, কলকাতায় মেয়েরা স্কুলে পড়ছে—তা হলে সে পড়াশোনা করলে কী দোষ? পিতা কৌতুক করে তাকে জিজ্ঞাসা করেন মেয়েরা লেখাপড়া শিখে কী করবে? তারা কী নায়েব-গোমস্তা হবে? সত্য সতেজে উত্তর দেয়—"নায়েব গোমস্তা হতে যাব কেন? লেখাপড়া শিখে নিজে নিজে রামায়ণ মহাভারত পুবাণ বই-টই পড়তে পারব তো? কবে কথকঠাকুর কোথায় পড়বেন বলে অপিক্ষে করে থাকতে হয় না।" ধর্মগ্রন্থ পড়ার আকাঙ্ক্ষাতেই কিছু মেয়ের (রাসসুন্দরীর স্বপ্ন ছিল 'চৈতন্যভাগবত' পাঠের) বিদ্যা-শিক্ষার সূচনা হয়েছিল ঠিকই কিন্তু শিক্ষা লাভ করার ফলে হঠাৎ এক আলোময় জগতের সন্ধান পেয়ে তারা ক্রমশ সেই পথের আনন্দযাত্রী হতে উন্মুখ হয়ে উঠেছিল। বাবার কাছে বিদ্যালাভ করার কিছুদিন পরে তাই সত্য শ্বশুরবাড়ি চলে যেতে বাধ্য হলেও তার শিক্ষা থেমে থাকেনি। নবকুমারের ইংরাজি বই থেকে সে ইংরাজি ভাষায়ও শিক্ষালাভ করেছে। অনেক পরে কলকাতায় বাসা করার পর ভবতোষ মাস্টারের কাছে আরও গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছে সে। সেই শিক্ষার গভীরতাতেই তাই সে পরবর্তীকালে শঙ্করী বৌ' এর অনাথ মেয়ের মনে জ্বালাতে পেরেছে জ্ঞানের আলো। সত্য'র অভিভাবকত্বে সে এগিয়ে গেছে জ্ঞানময় জগতে,—কালে সে স্কুলের দিদিমণি হয়ে নিজেকে সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে, খুঁজে পেয়েছে নিজের পরিচয়।

সুবর্ণ অনেক কম সৌভাগ্যের অধিকারী। তার মা সত্যবতী নিজে পড়িয়ে এবং বিদ্যালয়ে ভর্তি করে তার জীবনকে সুন্দর করে গড়তে চেয়েছিল, কিন্তু শাশুড়ি ও তাঁর বশংবদ ছেলের চক্রান্তে সুবর্ণের বিয়ে হয়ে গেছে এমন-এক ঘরে, যেখানে বৌ-এর শিক্ষা-দীক্ষা থাকার ব্যাপারটিকেই হাস্যকর বলে বিশ্বাস করা হত প্রবলভাবে। নিজের জীবনে জ্ঞানের আলোকবর্তিকাকে জ্বালিয়ে রাখতে গিয়ে তাই তাকে নানা কষ্ট করতে হয়েছে, সহ্য করতে হয়েছে নানা অপমান, লাঞ্ছনা। বিভিন্ন গুপ্ত উপায়ে সে জোগাড় করেছে বই-পত্র, নানা পত্রিকা। নতুন কবিতা পড়ে যেমন হয়েছে শিহরিত, তেমনই জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা খবর তাকে চমৎকৃত করেছে, করেছে সমৃদ্ধ। নিজের সন্তানদেরও সে শিক্ষা দিতে তৎপর। তাই উমাশশী'র মতো রান্নাঘর এবং সংসারের কাজে সমস্ত সময় নষ্ট না-করে সে ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার দিকে মনোযোগ দিয়েছে বেশি করে। পারিবারিক প্রবল বাধায় পারুল-বকুলকে বিদ্যালয়ে পাঠাবার স্বপ্নের পুরোটা সে পারেনি সফল করতে, তবু

বকুলের পড়াশোনা এগোবার জন্য, এন্ট্রান্স পরীক্ষার জন্য প্রাণপণে বাধা সরাতে চেষ্টা করেছে। তার মৃত্যুর কারণে বকুল পরীক্ষা দিতে পারেনি কিন্তু ভবিষ্যতে সুলেখিকা হয়েছে—হয়েছে নিজের আপন জীবনে প্রতিষ্ঠিত। এদেরই ভবিষ্যৎ প্রজন্ম শম্পা ও সত্যভামা কলেজে পড়েছে কিন্তু তাদের বোধজগতের বিকাশের কাজে সে-শিক্ষা কতটা লেগেছে তাতে সন্দেহ রয়েছে। শম্পা তবু জীবনে সত্যের অর্থ, প্রেমের অর্থ-কর্তব্য চিনতে পেরে সদর্থক পথে নিজের জীবনকে নিয়েছে চালিয়ে কিন্তু সত্যভামা মায়ের অন্ধ উচ্চাকাঙ্ক্ষার শিকার হয়ে উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রায় ভাসিয়ে দিয়েছে নিজেকে এবং শেষ পর্যন্ত ভারসাম্য রাখতে অসমর্থ হয়ে নিজেকেই করেছে ধ্বংস। 'মিত্তিরবাড়ি' উপন্যাসে দেখি বিংশ শতকের ত্রিশ-চল্লিশের দশকে নারী-শিক্ষাকে সমাজ মেনে নিয়েছে—পাশ করাতে না-পারলেও সব ভদ্রলোকই মেয়েদের স্কুলে পাঠিয়েছে।

যুগের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে যে-সমস্ত নিষ্প্রাণ তথ্যাদি আমরা পাই—তা আমাদের বুদ্ধিকে স্পর্শ করে কিন্তু সকলের মনে সেভাবে প্রভাব ফেলে না। কাহিনির জমাট বুনোটের মধ্যে দিয়ে যখন সেই সময়টিকেই আশাপূর্ণা সঞ্জীবিত করে তোলেন, কলমের নিপুণ আঁচড়ে ফুটিয়ে তোলেন যন্ত্রণায় মথিত নারীচিত্তের আর্তনাদকে, তখন আমাদের চেতনাজগতে আলোড়ন জাগে; বেদনায় ও বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাই। আর সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই সেই সব মূক নারীকে, যাঁদের জীবনের ধ্বংসস্তূপের ওপরে আজ আমরা তুলে ধরেছি নারী-প্রগতির ধ্বজা।

তিন

আশাপূর্ণার উপন্যাসে মেয়েদের জীবনের প্রেক্ষিতটুকুই যে শুধু স্পষ্ট হয়েছে তা নয়, নারী জন্ম লাভের কারণে তিনি যে-দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করেছেন, তা নারীর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি। সেই দৃষ্টিতে তাই উদ্ভাসিত হয়েছে নারীর প্রাত্যহিক জীবনের নানা ওঠাপড়া ও বৈচিত্র্যময় বিশ্বাস-সংস্কারের জগৎ। মেয়েরা ঘরের ভিতরে দিনের অধিকাংশ সময় কাটায় তাই অন্তঃপুরে প্রচলিত নানা তুচ্ছাতিতুচ্ছ নিয়ম-রীতির সঙ্গে সমঝোতা করে চলতে হয় তাকে—যা পুরুষকে করতে হয় না। সে-কারণেই মেয়েদের লেখায় ফুটে ওঠে একান্ত মেয়েলি সেই অন্তঃপুরের জীবন। লেখিকার হাত ধরে আমরা চিনে নিই অন্তঃপুরের সেই অজানা জগৎকে।

ঊনবিংশ-বিংশ শতকে বাঙালির পরিবারের গঠন ছিল যৌথ ধরনের। একজন প্রধান গৃহকর্তা বা কর্ত্রী'র পরিবারস্থ সকলে শুধু নয়, আত্মীয়-স্বজন, আশ্রিত বিধবা ও নিরাশ্রয় কুটুম্ব সহ প্রচুর মানুষের সমাহার ছিল সেইসব পরিবারে। সংসারের কাজের বহরও ছিল অত্যন্ত বেশি। মেয়েরা নিবিষ্ট চিত্তে সূর্যোদয় থেকে গভীর রাত পর্যন্ত সেইসব সাংসারিক কাজে এবং শুচিতা রক্ষা, সন্তান পালনের ব্যাপারে ব্যস্ত থাকত। খোলা আকাশের দিকে তাকানো তাই যেমন সেকালের মেয়েদের পক্ষে ছিল একান্ত অসম্ভব, তেমনই ঘাড়-গোঁজা জীবনে আকাশ-দর্শনের জন্য ছিল না কোনো স্পৃহাও। 'পিঞ্জরের পাখি'রা পিঞ্জরের লৌহশলাকার আবেষ্টনের সঙ্গে নানাবিধ কাজেব ফিরিস্তি যোগ করে পাকে পা্কে নিজেদের সংসারের ঘানিগাছে বেঁধে ফেলে নিশ্চিন্ত থাকত।

রামকালী'র অন্দরমহলে দুটি হেঁসেল। একটি আমিষ, অন্যটি নিরামিষ। নিরামিষ রান্নাঘরের ভারপ্রাপ্ত বিধবা মেয়েরা এবং আমিষে সধবারা। বিধবা মহিলাদের পরিচ্ছন্নতার বাতিক ও শুচিবায়ুগ্রস্ততা ছিল অত্যন্ত বেশি। কারণে অকারণে শুদ্ধতার প্রয়োজনে তাদের স্নান, গোবরে পদার্পণ, গোময় লেপন ইত্যাদি কর্মের প্রয়োজন পড়ত। হেঁসেলের গা থেকে ঘাট বরাবর পথ করা ছিল, যাতে প্রয়োজন বোধ করলেই মোক্ষদা, দীনতারিণী, শিবজায়ারা স্নান সেরে ভিজে বস্ত্রে সিঁড়ি বেয়ে হেঁসেলে সরাসরি প্রবেশ করতে পারেন। রান্নাঘরের দেওয়ালেই তাদের কাপড়-চোপড় শুকাত, কারণ চারদিকে ভ্রমণরত অচ্ছ্যুৎ কুচো-কাচাদের ছোঁয়া থেকে বাঁচতে ঐ স্থানটিই ছিল নিরাপদ। হেঁসেলের ও সংসারের বিশুদ্ধতা রক্ষার ভার সবচেয়ে শক্তসমর্থ ও সদাসতর্ক দৃষ্টির অধিকারী মোক্ষদার হাতে ন্যস্ত ছিল, যাকে রামকালীও সমীহ না-করে পারতেন না।

সুবর্ণের শাশুড়ি মুক্তকেশী'র সংসারে কাজের দায়িত্ব ছিল নতমুখী বড়বৌ উমাশশীর উপর। তিনি সংসারের কাজ ও সকলের মন যুগিয়ে চলতে গিয়ে সদা ব্যস্ত ও বিব্রত থাকতেন। সংসারের কাজের সঙ্গেই তার অস্তিত্ব ছিল জড়িয়ে। "উমাশশী বড়, উমাশশী নির্বোধ, উমাশশী গরীবের মেয়ে। আবার উমাশশী কিছুটা প্রশংসার কাঙালও। তাই উমাশশী একাই সংসারের অর্ধেক কাজ করে।

প্রতিদিন সকালে এই রাবণের গোষ্ঠীর রান্না সে একাই চালায়। আর তিনজনে পালা করে বিকেলে।"

মিত্তিরবাড়িতে হেঁসেল সামলান বিধবা ন'জা ইন্দ্রপ্রভা এবং সংসারের কর্ত্রী মেজগিন্নি হেমলতা। প্রয়োজন ও যোগানে তাই সর্বদাই ঘটে অমিল এবং ইন্দ্রপ্রভা চেঁচিয়ে মরেন; তার সম্পর্কে লেখিকা বলেন—"ভাঁড়ার ঘর তায় রান্নাঘর, ঠাকুরঘর আর নিরামিষ ঘরের প্রবল ঘানিতে পেষাই হইতে হইতে তাঁহার জীবনের তেল অনেকখানি নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে।"...

বস্তুত সংসারের পাকে চক্রে বাঁধা এই মেয়েদের সারাদিনে যেমন কর্মবিরতির কোনো অবকাশ ছিল না, তেমনই নিজেকে নিয়ে ভাবার জন্য মনেরও ছিল না কোনো অবসর। তাই যে মোক্ষদা একাদশী বা পূর্ণিমার দিনে রন্ধনের অবকাশে বড়ি, আমসত্ত্ব, আচার, মোয়া, নাড়ু, ভাঁড়ারের ঝাড়া-বাছা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন, তিনিও কাজের নেশাকেই জীবনের সর্বস্ব মনে করতেন। হঠাৎ কখনো হয়তো সচেতন হতেন, ভাবতেন রোদে পোড়ার থেকে ছুটি সারাবছরে একবারও তাঁর জীবনে আসে না কেন, একাদশীর দিনে রান্নাঘরের উনুনেরও থাকে ছুটি, কিন্তু "মোক্ষদার ছুটি নেই কেন?"—কিন্তু সে-প্রশ্নের উত্তর ছিল না কারো কাছে।

'বকুলকথা' উপন্যাসে দেখি হেঁসেলের ভাগাভাগি হত। একই বাড়িতে মা-ছেলে, ভাই-ভাইয়ে হাঁড়ি ভিন্ন হয়েছে, হেঁসেল কেন্দ্রিক গণ্ডগোল ও কাজের চাপও গেছে কমে। আধুনিকারা চটি-পড়া খানসামাকেও হেঁসেলে নিযুক্ত করে বার করে নিয়েছে নিজস্ব অবসর।

হেঁসেল সামলানো, সন্তান পালন ছাড়াও সংসারে আরও কিছু কর্তব্যকর্ম ছিল, যাতে মেয়েদেরই ছিল একচেটিয়া ভূমিকা। বিবাহ, বধূবরণ, শিশুজন্ম ইত্যাদি কাজের মধ্যে মেয়েদের কর্মজগৎ বিস্তৃত ছিল, সেসবের দেখভাল যেহেতু তাদেরই করতে হত, সেহেতু

নিয়ম-কানুনের সৃজনকর্ত্রীও প্রায় সময়ে ছিলেন তাঁরাই। সত্যবতী সন্তানসম্ভবা হলে সেই খবর তার শ্বশুরবাড়িতে পাঠাতে হবে—তারও রীতি আছে। মোক্ষদা রামকালীকে বলেন—"এক ঝাঁকা মণ্ডা আর এক জালা তেল দিয়ে পাঠাও কাউকে, তার সঙ্গে পাদ্য-অর্ঘ্য।"

পোয়াতি মেয়েকে নানা মেয়েলি বিধি-নিষেধ মেনে চলতে হয়—দরজায় বসা বারণ, দুজনের মাঝখান দিয়ে যাওয়া নিষেধ, সাঁঝ-সন্ধেতে উঠোনে নামা নিষেধ, ঘাটে-পুকুরে একা যাওয়া নিষেধ। এ ছাড়াও করতে হবে অনেক কিছু—পায়ের আঙুলে পড়তে হবে রুপোর আংটি, চুলের আগায় আর শাড়ির কোল-আঁচলে বাঁধতে হবে গিঁট, সাবধান থাকতে হবে শত্রুপক্ষীয় মহিলা থেকে।

সন্তানজন্মের ব্যাপারটি সংসারের বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলারা ধাই-এর সাহায্যে পরিচালনা করতেন, পুরুষের কোনো অংশগ্রহণ ছিল না তাতে। ছিল আঁতুড়ের বিধি-নিষেধ।

বিয়ের পর বৌ-ছত্রে বৌ এসে দাঁড়ালে সংসারের ভরন্ত রূপ দেখানোর জন্য ওথলানো দুধ দেখাতে হবে—এ কাজে যে-কোনো সধবা মেয়ে যোগ্য বলে বিবেচিত হয় না। স্বামীর প্রথম পক্ষ, অখণ্ড পোয়াতি মেয়েই কেবল এ কাজে হাত দিতে পারে। বালিকা-কন্যা, বিবাহের পর যার ঘর-বসত হয়নি, সে-ও বিয়ের বছর ঘুরলে এসব স্ত্রী-আচার পালনের যোগ্যতা লাভ করে।

খাওয়া-শোওয়া নিয়েও বাড়ির অভ্যন্তরে প্রচলিত ছিল নানা রীতি। বিশেষত বিধবাদের বিভিন্ন নিয়ম মানতে হত। অম্বুবাচি, পূর্ণিমা, বাব-ব্রত ছাড়া রাতে খাওয়ার পদ্ধতির নানা রীতি-পদ্ধতি ছিল। বামুনের বিধবাকে রাতে চালভাজার সঙ্গে শশা খেতে হত আলাদা পাত্রে—এক পাত্রে রাখলে ফলার হয়ে যায়, রাতে বিধবার তা খেতে নেই। এমনকী শশা কামড়েও খাওয়া যাবে না, মুখে ছুঁড়ে ছুঁড়ে খেতে হবে। মুক্তকেশী অম্বুবাচিতে কাঁচা দুধ খেয়ে কাটান। একাদশীর দিন জল খাওয়া তো বারণই—তার কথা মনে আনাও পাপ। মিত্তিরবাড়ি'র উমা একাদশীতে এক কাপ চা খেয়ে ফেলায় ছি-ছিক্কার পড়ে গেছে।

যৌথ পরিবারে খাওয়া-দাওয়ার জিনিস সবাইকে যে সমানভাবে বণ্টন করা হত, তা নয়। সদস্যদের মর্যাদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী বিভাজনের রীতি নির্ধারিত হত।

'প্রথম প্রতিশ্রুতি'তে রামকালী কবিরাজের সংসারে আমের মরসুমে আম বিভাজনের রীতির পরিচয় দিয়েছেন লেখিকা। "সংসারে সদস্যদের শ্রেণি হিসেবেই আমের শ্রেণি হিসেব করে ভাগ হয়। কর্তাদের নৈবেদ্যে লাগে "জোর কলম" গোলাপখাস, ক্ষীরসাপাতি, নবাবপছন্দ, বাদশা-ভোগ, ঢাউশ্ ফজলী ইত্যাদি, গিন্নিদের ভোগেব জন্যে সরানো থাকে পেয়ারাফুলি, বেলসুবাসী, কাশীর চিনি, সিঁদূরে মেঘ।

আর বৌ ঝি ছেলেপুলের ভাগ্যে জোটে 'রাশি'র আম কারণ রাশি রাশি ছাড়া ওদের আশ মেটে না।"

'মিত্তিরবাড়ি' উপন্যাসে সময় এগিয়েছে প্রায় একশ বছব। কিন্তু সংসারের মধ্যে বণ্টনের রীতিতে হেরফের ঘটেনি। বরং নগরকেন্দ্রিক সভ্যতায় কাঁচাপয়সায় সব কিছু কিনতে হয় বলেই ভাগাভাগিতে গৃহকর্ত্রী থাকেন আরও সতর্ক।

"একগোছা ছোট ছোট রেকাবিতে দুইখানা করিয়া বাসি পবোটা, একটু গুড় ও একটা

করিয়া নারকেল নাড়ু সহযোগে প্রাতঃরাশ সাজাইতে থাকেন ন'গিন্নি।

এর চাইতে ভালো আয়োজন ছোটদের জন্য সম্ভব নয়, ভালো জিনিস পড়িবে বাবুদের পাতে।"—সে-কারণে ছোটদের দুধে বাড়তি জল দিয়ে বাবুদের জন্য ক্ষীর করতে হলেও তা করা হবে। বাড়ির এক সৃষ্টিছাড়া ছেলে অনিরুদ্ধ যখন ন'গিন্নিকে প্রশ্ন করে, বাড়িতে আসা লুচি, কচুরি, নিমকি, সিঙারার ভাগ ছোটরা কেন পায় না, তখন সঝঙ্কার উত্তর আসে—"গুষ্টিশুদ্ধু সবাইকে লুচি কচুরী খাওয়াতে হলে কুবেরের ভাণ্ডারেও কুলোবে না বুঝলে বাছা?"

যৌথ পরিবারে শয়নেরও ছিল নির্দিষ্ট ব্যবস্থা। ঠাকুমা দীনতারিণীর ঘরে বাড়ির 'সোমত্ত' মেয়েদের শোবার ব্যবস্থা—"বড় বড় মেয়েরা এখান ওখান ছড়িয়ে থাকে এটা বিধি নয়।" ঘরজোড়া শতরঞ্জির ওপর খানকয়েক মোটা মোটা কাঁথা বিছিয়ে তাদের সেই বিছানা তৈরি হয়, মাথায় দেওয়ার জন্য থাকে দেওয়াল বরাবর টানা অসম্ভব ভারি, টানা বালিশ। বাবুদের বাতিল বালিশের ছেঁড়া খেরো ও পুরোনো তুলো দিয়ে তৈরি সে-বালিশে আরামের প্রশ্ন নেই স্বাভাবিকভাবেই। সে-সময় অবস্থাপন্ন পরিবারেও অপচয়কে কোনোভাবেই প্রশ্রয় দেওয়া হত না—তবে বাতিল জিনিসের ভার বেশির ভাগই পড়ত বাড়ির সবচেয়ে ওঁচা ছেলে-পুলেদের ভাগ্যে। অন্যান্য সব পরিবারে বিছানা-চাদর কাচার সুবন্দোবস্ত হয়তো সর্বদা তেমন নির্দিষ্ট ছিল না। (ড. সান্যালের উদ্দিষ্ট প্রবন্ধে বধূদের অপরিষ্কার কাপড়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে) কিন্তু রামকালীর পরিবারে মাসে দু-বার বাঁধা ধোপা দিয়ে সব কিছু কাচাবার রীতি ছিল। সুবর্ণলতা আঁতুড়ে প্রথম বার ধূলিজড়িত কাঁথা-বালিশে শুতে আপত্তি করে এবং পরে সে নিয়মিত এ সবের পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে নজর রেখেছে।

সে-সময় মেয়েদের পরিচয় দুভাবে দেওয়া যেত—প্রথমত সধবা, দ্বিতীয়ত বিধবা; কারণ কন্যাকে অনূঢ়া রাখার চল ছিল না। 'ধব' সম্পর্কিত পরিচিতি ও অস্তিত্বকেই সমাজ মেয়েদের জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল।

রামকালীর সংসারে বিধবা আত্মীয়রা সসম্মানে বাস করতেন শুধু নয়, সংসার পরিচালনার ভারও অধিকাংশ ছিল তাদেরই হাতে। যে-কোনো সম্পর্কিত বিধবাকেই সংসারে ঠাঁই দিতে রামকালী কুণ্ঠাবোধ করেননি।

সুবর্ণের সংসারে আশ্রিতদের আশ্রয় নেই। তার শাশুড়ি মুক্তকেশী বহুদিন যাবৎ বিধবা। কষ্টেসৃষ্টে ছেলেমেয়েদের মানুষ করে দাপটের জোরে তিনি সংসারের মাথা হয়ে রয়েছেন। সর্বক্ষণ ছেলেরা তার থেকে বৌ-এর প্রতি বেশি অনুরক্ত হয়ে পড়ছে কি না, তারই পরীক্ষা নিয়ে চলছেন তিনি। 'মিত্তিরবাড়ি'-তে যুগের অগ্রগতির সঙ্গে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির কিছু বদল ঘটেছে। তাই নিরাশ্রয় সহায়-সম্বলহীন বিধবা সংসারে কোনোরকমে আশ্রয় পেলেও উঠতে বসতে তাকে খাওয়াব খোঁটা দেওয়া চলে এবং সংসারের অধিকাংশ কাজও তাকে দিয়েই করানো হয়। উমা এমনই এক হতভাগ্য চরিত্র।

'বকুলকথা'য় বকুলের মেজদি চন্নন সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বদলাতে পারেনি, তাই বিধবা হয়ে যাবার পরেও সাংসারিক কূটকচালি ও স্বার্থসিদ্ধির ফন্দি এঁটেই চলে। কিন্তু পারুলের জীবনে বৈধব্য আনে একাকীত্বের মুক্তি। বিধবার নিঃসঙ্গ জীবনে পারুল মোক্ষদার

মতো কাজের আবর্তে পাক খেয়ে জীবনকে ক্ষইয়ে ফেলে না বরং বহতা গঙ্গার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে জীবনের অর্থ উপলব্ধির চেষ্টা করে। চেষ্টা করে বোধ-বিশ্বকে আপন চেতনার দ্বারা স্পর্শ করতে।

মেয়েদের আর এক 'শ্রেণি' সধবা যে-পরিচয়কে সমাজ সর্বাধিক গৌরবের পরিচয় বলে প্রচার করে এসেছে এবং অবিরত ঢক্কানিনাদে বধির মেয়েরাও ভেবে এসেছে এই পরিচয়ের সার্থকতার কথা। তার অন্তঃসারশূন্যতার কথা যেমন এসেছে এইসব লেখায়, তেমনি রয়েছে বৈচিত্র্যময় নানা দাম্পত্য সম্পর্কের উদ্ভাস।

সুবর্ণলতা এবং সত্যবতী'র দাম্পত্য প্রসঙ্গের আগে আমরা দেখে নিই টুকরো টুকরো কোলাজধর্মী সেইসব দাম্পত্য সম্পর্ককে, যেগুলির পরোক্ষ প্রভাব রয়ে গেছে ঐ দুই নারীর দাম্পত্য সম্পর্কিত উপলব্ধির মধ্যে। 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' উপন্যাসে রাসু-সারদা ও রামকালী-ভুবনেশ্বরীর সম্পর্ক উদ্ভাসিত। সারদা স্বামীর অধিকার হারাতে না-চাইলেও ঘটনাচক্রে স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহ হওয়ায় সমস্যায় পড়েছে। দ্বিতীয় স্ত্রীকে অধিকার অর্পণ না-করতে চেয়ে অনেক কৌশল করেও শেষ পর্যন্ত মমতায় আবিষ্ট হয়ে অধিকার ছেড়ে দিয়েছে এবং সংসারের গৃহিণীর পদে সন্তুষ্ট থাকতে চেয়েছে। রাসু ও সারদার সম্পর্ক অনেকটাই সহজ—রাসু কিছুটা ভীরু ও স্ত্রীর দাপটে জড়োসড়ো। রামকালী ও ভুবনেশ্বরীর সম্পর্কে শ্রদ্ধা ও স্নেহের মিলন। ভুবনেশ্বরী স্বামীকে অসম্ভব বেশি সমীহ করেন, স্বামীর মনে স্ত্রীর প্রতি রয়েছে স্নেহ। তাই পরস্পরের মনের যোগাযোগ অস্পষ্ট। ভুবনেশ্বরী'কে কাছে টানতে না-পেরে রামকালীর অভাববোধ ছিল না—কিন্তু নীরব ভুবনেশ্বরী যখন অসুস্থতাকে নীরবে সহ্য করে মারা গেছে, তখন রামকালী বুঝতে পেরেছেন, স্ত্রীকে তাঁর জীবনে আরও কিছুটা স্থান দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। জটার বৌ এবং অন্যান্য সধবা নারীরা দাম্পত্য সম্পর্ক নিয়ে মোটেই ভাবে না। তারা স্বামীর অত্যাচার ও সোহাগ দুটোকেই স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করেছে—সংসারের কাজ করেছে এবং জৈবিক নিয়মে প্রজননক্ষমতা থাকা অবধি মা হয়ে জীবন কাটিয়ে গেছে।

'সুবর্ণলতা' উপন্যাসে অনেকগুলি স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক আমরা দেখি। সংসারে বড়বৌ উমাশশী-স্বামী সুবোধ ভালো মানুষ, সহানুভূতি ও অনুভবশীল মানুষ। কিন্তু তবু এদের সম্পর্ক সহজ নয়। গরিবের মেয়ে উমা—শ্বশুরবাড়ির সকলকে ভয় করে চলেন, স্বামীকেও, তাই তাদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার অভাব থেকে যায়। গিরিবালা ও তার স্বামী প্রভাসের সম্পর্কের মধ্যে রয়েছে ফাঁকি। প্রভাসের মনে স্ত্রীজাতি সম্পর্কে অবজ্ঞা, স্ত্রী-ও তার বাইরে নয়। গিরিবালার তোয়াক্কা না-করেই তাই সে অন্য নারীসঙ্গ করে খারাপ রোগ বাধায়। কিন্তু গিরিবালা দাম্পত্য সম্পর্কের ভিত জোরালো এ-কথা প্রমাণ করার জন্যই ঘটা করে সাবিত্রী ব্রত করে, স্বামীর সঙ্গে তীর্থ ভ্রমণে যায় ও সেই সৌভাগ্যের কথা গর্ব করে বলে বেড়ায়। পরস্পরের সৌহার্দ্য না-থাকলেও লোক-দেখানোর প্রতিযোগিতায় তারা পিছ পা হয় না। সুবর্ণের মনে হয়েছে এদের পুরোটাই ফাঁকি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, সত্যবতীর শাশুড়ি এলোকেশী ও তার স্বামীর সম্পর্কেও অবৈধতার অনুপ্রবেশ ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও গৃহে এলোকেশীর বশংবদ রূপে স্বামীর অভিনয় ও বাইরে পতিব্রতা স্ত্রী রূপে এলোকেশীর

অভিনয় বেশ নিপুণ ছিল। এরা পরস্পরকে বুঝেও লোকসমাজে পারস্পরিক স্বার্থরক্ষা করে চলতেন—এ-ও একরকম বোঝাপড়া।

প্রকাশ ও বিন্দু—সুবর্ণের ছোট জা ও দেওরের সম্পর্কের তেমন কোনো উদ্ঘাটন নেই। সুবর্ণের ননদদের মধ্যে বড় ননদ ও ননদাই-এর সম্পর্কের মধ্যে রয়েছে সহজ বোঝাপড়া ও পারস্পরিক আদান-প্রদান। সুবর্ণ তাই এদের কাছে নিজেকে মেলে ধরতে পারে। সুশীলা ও অমূল্য'র সম্পর্কও অত্যন্ত সুন্দর, সহজ। দারিদ্র্য তাদের পারস্পরিক বোঝাপড়ার অন্তরায় হয়নি, বরং সহজে হেসে, কেঁদে তারা সংসারকে আনন্দের সাগর করে তুলতে সক্ষম হয়েছে, সন্তানদের অন্য গোত্রে বিবাহ দেওয়ার সাহসী পদক্ষেপ নিতে পেরেছে। সুবর্ণের মনে হয়েছে—এদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সম্ভ্রমবোধ রয়েছে বলেই দাম্পত্য তার আদর্শরূপে প্রকাশ পেয়েছে—এমন সহজ সম্পর্কেই দাম্পত্যের পরিপূর্ণতা। বিরাজের স্বামী ভালো হলেও মৃতবৎসা বিরাজের মনের গঠন সুস্থ নয়। তাই স্বামীর প্রতি সহানুভূতি না-দেখিয়ে বা দুঃখের সেতুকে পরস্পরের সহায়-বন্ধন না-করে সে ক্রমাগত স্বামীকেই দোষারোপ করে চলে। 'বকুলকথা'য় অপূর্ব ও তার স্ত্রী'র সম্পর্ক আধুনিকতার অভিশাপ, পারুলের ছেলে মোহন ও রেখা'র সম্পর্কও তাই। অপূর্বের স্ত্রী নিজের মর্জি অনুযায়ী জীবনকে চালাতে চায়, স্বেচ্ছাচারী হতে চায়, অপূর্বের বাধা জোরালো নয়; বরং একে অপরের হারের অপেক্ষায় থাকে। তাদের একমাত্র সন্তান সত্যভামা যখন এই টানাপোড়েনে বিভ্রান্ত হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে, তখন পারস্পরিক ঘৃণা ও অবিশ্বাস উচ্চারিত হয়, সম্পর্কের ফাঁকি অনাবৃত হয়ে যায় সবার কাছে। মোহন ও রেখা তাদের আত্মমর্যাদাবোধের খাঁচায় এমনভাবে বন্দি, যে, সম্পর্কের মধ্যে ক্ষমা বা বন্ধুত্বের বোধকে তারা আসতে দেয় না। তাই পারস্পরিক ভুল বোঝাকে ঠিক করে নেওয়ার চেয়ে আত্মমর্যাদাযুক্ত নিঃসঙ্গ জীবন তারা কাম্য মনে করে। তাদের দুই সন্তান মানসিকভাবে আশ্রয়হীন হয়, জীবনের প্রথম থেকেই তারা সব হারিয়ে অসহায় ও বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে। তৈরি হয় সমাজ-বিদ্বিষ্ট, মায়া-মমতা-ভালোবাসার বোধহীন, প্রতিশোধ-পরায়ণ এক প্রজন্ম। এক কালে সত্যবতী'রা সুবর্ণরা ভাবত 'বিয়ে' বস্তুটা ভাঙবার নয় কেন, তারা এযুগে জন্মালে হয়তো নতুন করেই বসত ভাবতে।

'সত্যবতী' ও 'সুবর্ণলতা'র জীবনধারা কিছুটা অন্যরকম। বিবাহ-সংস্কারকে অস্বীকার করে তারা বাঁচতে পারেনি, কিন্তু প্রতিমুহূর্তে বিবাহ বন্ধন ও সংসারকে অস্বীকার করতে চেয়েছে। সমালোচক যথার্থই বলেছেন—"বুদ্ধিতে, বোধে বহুগুণ নিকৃষ্ট স্বামীর দাম্ভিক প্রভুত্বের চাপে জর্জরিত স্ত্রীর নীরব আর্তনাদের যে ছবি ঘরে ঘরে আছে, সিঁদুরে শাঁখায় মহিমান্বিত সেই দাম্পত্য ছবিই এসেছে প্রথম প্রতিশ্রুতি ও সুবর্ণলতায়।" (মেয়েলি পাঠ : সুতপা ভট্টাচার্য)

সত্যবতী'র স্বামী নবকুমার অনেকটাই মেনে চলত স্ত্রীর কথা, তবে সেই মান্যতা স্ত্রীর বোধশক্তি সম্পর্কে আস্থাসঞ্জাত নয়, স্ত্রীর ব্যক্তিত্বকে ভয় পাওয়া থেকেই আসত। সেজন্য সত্যবতী'র প্রায় সব বাসনাকে স্বীকার করতে পারলেও অন্তরে তার ছিল গভীর হীনমন্যতার বোধ। পুরুষ হিসাবে আহত অপমানবোধ। সত্যবতী'র অমতে সুবর্ণের বাল্যবিবাহ দিয়ে সে

তাই তার স্বামিত্বের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। সত্যবতী নবকুমারকে চিনলেও যে-সম্পর্ক স্ত্রীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার আগ্রহে সন্তানের জীবনকে পর্যন্ত বলি দেয়, সেই সম্পর্কের জের আর টেনে বেড়াতে চায়নি, সংসার ত্যাগ করেছিল।

সুবর্ণের জীবন আরো কষ্টের, যন্ত্রণার। বিবাহ-সংস্কারের ফাঁকিগুলোকে প্রথমাবধি চিনেও সে সংসার ত্যাগ করতে পারেনি। কারণ সে দেখেছে বিবাহিত মেয়ের কাছে তার পিতার গৃহও আশ্রয় হতে পারে না। তাই স্বামীকে পছন্দ না-করেও তার সঙ্গে তাকে সারাটা জীবন কাটিয়ে যেতে হয়েছে। তার অত্যাচারকে সহ্য করে করে ভালোবাসার ভানকে বিশ্বাস করতে চেয়েই কেটেছে তার জীবন। সংসার তার নিজস্ব স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে স্বীকার করে না জেনেও প্রাণপণে বাঁচতে চেয়েছে সে, চেয়েছে আকাশের তলায় দাঁড়াতে। তার তীর্থযাত্রার আয়োজনকে প্রবোধ কৌশল করে পণ্ড করে দিলে অভিমানে, আহত চিত্তে অসুখের আশ্রয় নিয়েছে সে এবং মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে চেয়েছে মুক্তির জগতে পৌছাতে।

স্বামীর সঙ্গে মনের মিল হয়নি বলে প্রথম প্রথম কাঁদলেও সুবর্ণ পরে বুঝেছে প্রকৃতিগতভাবে বিভিন্নধর্মী দুটি মানুষের এক সঙ্গে জুড়ে থাকাটাই ভাগ্যের নির্মম পরিহাস—সমাজে এর হাত এড়িয়ে যাওয়ার কোনো উপায় মেয়েদের নেই। তাই সে এক অসুখী জীবন কাটাতেই বাধ্য হয়েছে। ভেবেছে—

"দুই পরম শত্রু বছরের পর বছর একই ঘরে কাটিয়েছি, এক শয্যায় শুয়েছি, এক ডিবেয় পান খেয়েছি, কথা কয়েছি, গল্প করেছি, হেসেওছি।

ওর বেশি অসুখ করলে আমি না খেয়ে না ঘুমিয়ে সেবা করেছি, আমার কোনো অসুখ করলে ও ছটফটিয়ে বেড়িয়েছে, আর তারই ফাঁকে ফাঁকে ও আমাকে, আর আমি ওকে ছোবল দেবার চেষ্টা করে ফিরেছি।

অদ্ভুত এই সম্পর্ক, অদ্ভুত এই জীবন।"

সত্যবতীর উপলব্ধি—"আসল কথা, সংসার মানুষকে চেপে পিষে ফেলে, বিশেষ করে মেয়েমানুষকে।

তার ভিতরকার যা কিছু মাধুর্য, যা কিছু কোমলতা যা কিছু ছাঁচ, সব যেন ঘষে ক্ষইয়ে ভোঁতা করে শুকিয়ে চারটি ধূলোবালি করে ছেড়ে দেয়।"

যুক্তিতে, বোধে, বুদ্ধিতে উন্নত স্ত্রীরা দাম্পত্যের ফাঁকিকে মেনে নিতে পারে না সহজে, সমাজনির্দিষ্ট বিধিকে চায় না মানতে, ব্যক্তিগত জীবনকে চায় না যত নিয়ম ও নিষেধের বেড়াজালে বেঁধে রাখতে। তাই যন্ত্রণা তাদের প্রবল। কারণ অবিরত প্রতিকূল সমাজ ও পরিবার-মানসের সঙ্গে সংগ্রাম কবতে হয় তাদের, খুঁজতে হয় সহস্র 'কেন'র উত্তর। আর উত্তর খুঁজতে খুঁজতে তার নিজস্ব জ্ঞান-গরিমা কোথায় যেন হারিয়ে যায়, বীণাবাদিনী রূপ বিসর্জিত হয়ে করালদর্শনা, খড়্গহস্তা রূপটিই প্রকট হয়ে ওঠে। অন্তরের সৌন্দর্যবোধ, সুরুচি, আনন্দবোধ সব নিঃশেষে শুকিয়ে গিয়ে পড়ে থাকে চিত্তদহনের ছাইটুকু। তার আপন সন্তানেরাই তা দেখে শিউরে ওঠে। মা'কে তারা ভালোবাসতে পারে না, ভক্তি করতে পারে না। অভিযোগ করে কেবল। আর এই মেয়েরা —সংসারে আর কারো কাছে আশ্রয় না-পেয়ে যখন সন্তানের বোধ-বুদ্ধির ওপর আস্থা রাখতে চায়, তখনও পায় চরমতম প্রত্যাঘাত;

যন্ত্রণায় মুক হয়ে যায়। সত্যবতী এবং সুবর্ণ দুজনেরই পুত্রেরা তাদের আঘাত করেছে, অপমান করেছে, মেয়েরা বহু বহুদিন পরে কিছুটা বুঝতে চেষ্টা করেছে তাদের, কিন্তু সে-খবর তাদের কাছে শান্তির বারি হয়ে পৌছায়নি।

দাম্পত্য-সম্পর্ক ছাড়াও উপন্যাসগুলিতে রয়েছে মেয়েদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের নানা উদ্ভাস। শাশুড়ি যখন অত্যাচারী, সুবর্ণ, সত্যবতী এরা প্রতিবাদ করেছে কিন্তু তাদের প্রতি কর্তব্যে অবিচল থেকেছে। সংসার ছেড়ে দিয়ে গিয়ে অসুস্থ শ্বশুরের সেবা করেছে সত্য, নখ-দন্তহীন বৃদ্ধা শাশুড়ি মুক্তকেশীর প্রতি সুবর্ণ বোধ করেছে মায়া-মমতা। উমাশশী, নীলিমা অত্যন্ত সহিষ্ণু, তাই সংসারের সব ভার তারা নীরবে বয়ে চলে। উমা সেই সঙ্গে ছোট জা'দেরও তোষামোদ করে চলে—নিজস্ব মর্যাদাবোধের খেয়াল না-রেখেই। গিরিবালা ও বিন্দু পরস্পরের সঙ্গে কথা বলে, মৌখিক সৌহার্দ্য রেখে চলে সম্পর্কিত অন্যান্যদের নিন্দামন্দ করার জন্য কিন্তু নিজস্ব স্বতন্ত্র গণ্ডিতে পরস্পরের বিরুদ্ধে করে চলে প্রবল বিষোদ্গার। আবাব স্বার্থপরতার শিক্ষায় সুবর্ণের ননদ ও জায়েরা সুশিক্ষিত, তাই তারা সর্বদাই সুযোগসন্ধানী ও স্বার্থসিদ্ধিতে তৎপর—গিরিবালা, ভাবিনী, বিরাজ, বিজু- এরাও সমমনোভাবাপন্ন।

নারী-চেতনার জাগরণ ঘটায় যে-শিক্ষা, তার অভাবেই সে-কালের মেয়েদের অবসর বিনোদনের একটি প্রধানতম অবলম্বন ছিল অপরের কাজের সমালোচনা ও নিন্দা এবং কলহ। সুবর্ণের সংসারে কিংবা মিত্তিরবাড়ি'র অন্দরমহলে এমন পারস্পরিক চাপান-উতোর, নিন্দা-মন্দের ঘটনা ঘটত নিত্যই। অনেক সময়ে বাড়ির পুরুষ সদস্যের কটু-কাটব্যও হজম করতে হত বধূদের। সুবর্ণের প্রতিটি কাজের কঠোর সমালোচক ছিল তার সেজ দেওর প্রভাস।

সুবর্ণ ও সত্যবতী দুজনেই স্বশিক্ষিত। দুজনের মানসিকতাতেই শিক্ষার আলো এনেছে অভূতপূর্ব সচেতনতা। তাই তাঁরা যেমন সচেতন হতে পেরেছেন সমাজে ও পরিবারে নিজেদের তথা নাবীজাতির দুঃখজনক অবস্থান সম্পর্কে, তেমনই দেশ ও জাতির অবস্থা সম্পর্কেও কৌতূহলী হয়েছেন। দেশে ঘটে-চলা নানা আন্দোলন তাদের আলোড়িত করেছে। সত্য যে ঘরে বসে ভারতবর্ষের পরাধীনতার খবর রাখে কীভাবে,—নবকুমারকে সেই ভাবনা আশ্চর্য করে। সুবর্ণলতা সুশীলার বাড়ি গিয়ে পরিচিত হয় দেশব্রতী অম্বিকার সঙ্গে। দেশ উদ্ধারের প্রসঙ্গে সুবর্ণর চোখে এসে যায় জল, মুখে ফুটে ওঠে দীপ্তি। সুবর্ণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করতে বসে স্বদেশি ছেলেদের কথা। কী তাদের কার্যকলাপ, কী তাদের পদ্ধতি, কী বা তাদের সাফল্য!

দেশশুদ্ধ বিলিতি বর্জনের আগুনে পুড়লেও যখন সুবর্ণের পরিবার নীরব থাকে, তখন সরব প্রতিবাদ শুধু নয়, পুজোর জন্য কেনা নতুন বস্ত্রের পাহাড়ে অগ্নিসংযোগ করে সে দেশব্রতীদের সঙ্গে সহমর্মিতা বোধ করে।

কিন্তু তার সব উৎসাহ নিভে যায় সংসারে মেয়েদের পরাধীনতার কথা ভেবে—চরকার আন্দোলনে তাই আর সে উৎসাহ বোধ করে না। বরং নারীদের পরাধীনতার যন্ত্রণার কারণ অনুসন্ধান করে চলে, বই লেখে, ছাপানোরও ব্যবস্থা করে—পরিজনদের উপহাসে, নিজের

হাতেই বিসর্জন দেয় মুক্তির কামনা ও আলোকবাহী সেইসব লেখাকে। সত্যবতী-ও লেখে—মেয়েদের চেতনার মুক্তির জন্য কাশীতে বিদ্যালয় খোলে—নারীদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ করে চলে।

আশাপূর্ণার লেখায় এভাবে মেয়েদের জীবন—বাহ্যিক ও মানসিক—দুইয়ের এক গভীর পরিচয় ফুটে ওঠে। নারীর সংসার, তার জীবন, তার বিশ্বাস, তার যন্ত্রণা, তার চাওয়া—সব কটি দিককেই স্পষ্ট করে তোলেন তিনি গভীর অভিনিবেশ সহকারে। তবে সে-যুগের চিত্রে একটি জিনিসের অভাব থেকে গেছে বলে মনে হয়েছে, তা হল বার-ব্রত, মেয়েলি কুসংস্কার, বশীকরণ, ঝাড়-ফুঁক, দেবতার ভর ইত্যাদি যে-সমস্ত ব্যাপার একসময় মেয়েদের অন্তরকে গ্রাস করে রাখত—তার চিত্র। বাসুর দ্বিতীয় স্ত্রী'র অধিকারের প্রসঙ্গে বশীকরণের চিত্র একবার এসেছে। মুক্তকেশীর অল্প ব্রতের কথা, শ্যামাসুন্দরীর পুজোর আয়োজন, সত্যবতীর সেঁজুতি ব্রত ছাড়া উঠতে বসতে ষষ্ঠী, মনসা ইত্যাদি বারোমেসে যেসব আচার মেয়েদের ঘিরে থাকত, তার স্পষ্ট চিত্র কম।

আশাপূর্ণা 'সুবর্ণ' এবং 'সত্যবতী'র জীবনবৃত্ত রচনাব ফাঁকে যে-নারীসমাজকে তুলে এনেছেন, তা নারীর দৃষ্টিতে দেখা বলেই এত প্রত্যক্ষ, এত জীবন্ত, এত অনুভবময়। একজন লেখক কখনোই এভাবে নারীর নিজস্ব জগৎকে উপস্থিত করতে সক্ষম হতেন না। নারীর মন ও অবস্থাকে নারী ছাড়া কে-ই বা উপলব্ধি করতে পাবে? তবে শুধু নারী বলে নয়, একজন সংবেদনশীল মানুষ বলেই আশাপূর্ণা মেয়েদের অন্তঃপুবের জীবনকে নিখুঁত ভাবে ফুটিয়ে তোলাব সঙ্গে সঙ্গে একটি প্রশ্নও যেন রেখেছেন—মেয়েরা কি শুধুই মেয়ে? তারা কি মানুষ নয়? যদি মানুষই হবে, তবে কেন সে তার জীবনকে নিযন্ত্রণের অধিকার পাবে না! আজ আমরা সেই যুগ থেকে বহুদূরে চলে এসেছি। নারীদের প্রতি অনেক অন্যায়-অত্যাচার হয আজও তবে তা সত্ত্বেও নারীসমাজের বৃহত্তর অংশ আজ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। বাঁচছে নিজের পরিচয়ে—তা হযতো বহুযুগ আগেকার সেইসব অখ্যাত মেযেদেব অক্ষম প্রতিবাদেরই সুফল। 'প্রথম প্রতিশ্রুতি', 'সুবর্ণলতা'—এইসব সমকাল-অতিযাযী নারী-ব্যক্তিত্বের ইতিহাস—যাদের ভাবনা, যাদের কথা আমাদের কাছে পৌছে দিয়েছেন একমাত্র আশাপূর্ণা।

সহায়ক গ্রন্থ

১. 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'—আশাপূর্ণা দেবী, মিত্র ও ঘোষ, ১৩৮৭, কলকাতা।
২. সুবর্ণলতা—আশাপূর্ণা দেবী—মিত্র ও ঘোষ, ১৪০৬, কলকাতা।
৩. বকুলকথা—আশাপূর্ণা দেবী—মিত্র ও ঘোষ।
৪. মিত্তিরবাড়ি—আশাপূর্ণা দেবী—নাথ পাবলিশিং, জানুয়ারি ১৯৯৫, কলকাতা।
৫. রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া—নারী-প্রগতির একশো বছর—গোলাম মুরশিদ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, মে ১৯৯৩, ঢাকা।
৬. মেয়েলি পাঠ—সুতপা ভট্টাচার্য, কলকাতা।
৭. বাঙালি নারীব ভাবনামূলক গদ্য, সুতপা ভট্টাচার্য।

কোথায় আলো? কোথায় ওরে আলো?

সঙ্গীতা ত্রিপাঠী মিত্র

তিনি বিদ্যালয়ের চৌহদ্দি কখনো মাড়াননি। অতি রক্ষণশীল পরিবারে জন্মগ্রহণের 'পরম সুযোগে' স্কুলে যাওয়ার বালাই ছিল না। পাঠ্য পুস্তকের সঙ্গে নিদারুণ পরিচয় ঘটার দুঃখ যেমন নিতে হয়নি তেমনি অপাঠ্য পুস্তকের সাহচর্যে ছেলেবেলাটা কেটেছে পরম সুখে। তেরো বছর বয়সে লেখিকা জীবনের শুভ সূচনা নেহাতই খেলার ছলে। চল্লিশ বছর বয়সের আগে বহির্জগতের সঙ্গে বাহ্যিক যোগাযোগ সম্ভব হয়নি। কিন্তু অপরিণত বয়স থেকেই বিশ্বস্ত বন্ধুসম যে বইগুলি ভরে রেখেছিল তাঁর অখণ্ড অবকাশ, তাদের-ই হাত ধরে বাইরের বৈচিত্র্যময় ভুবনের প্রবেশ ঘটে তাঁর মনোজগতে। হৃদয় দ্বার উন্মুক্ত হয়েছিল স্বাভাবিক নিয়মে। যুগ, সমাজ, সংসার, মানুষ তাদের নানা রূপ এবং বর্ণ নিয়ে ভরে তুলেছিল তাঁর অন্তর্জগৎ; আশাপূর্ণা দেবীর (৮.১.১৯০৯-১৩.৭.১৯৯৫) মনোজগৎ। জীবনের নানা অভিজ্ঞতা সঞ্জাত উপলব্ধি ও অনুভূতি শিল্পসুষমামণ্ডিত হয়ে সমৃদ্ধ করেছে বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডার। ধন্য করেছে পাঠক মন। জনপ্রিয়তাব উচ্চশিখরে পৌঁছিয়েছে লেখিকাকে।

আশাপূর্ণার জীবনের পারিপার্শ্বিক পটভূমি ঘিরে রেখেছিল যে 'ঘরোয়া মেয়েরা', তাঁর আয়ত্তের মধ্যে যে মধ্যবিত্ত ঘরোয়া মানুষজন—তাদের জীবনকে যেমন দেখেছেন, বুঝেছেন, বিশ্লেষণ করেছেন, তারাই রূপ পেয়েছে তাঁর কলমে। "যা শিখেছি আমার দেখা মধ্যবিত্ত জীবনের গণ্ডি থেকেই দেখা" 'খেলা থেকে লেখা'তে বলেছেন তিনি। স্বীয় অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি জানেন—"মেয়েদের পক্ষে তো আর শ্বশুরবাড়ি জায়গাটা কুসুমকোমল নয়। তা ছাড়া সে তো আবার পিতৃগৃহের 'পর্দার' থেকেও ঘোরালো। স্রেফ লৌহ যবনিকার অন্তরাল।" (খেলা থেকে লেখা)

এই যবনিকার ওপারের ঘটনাপ্রবাহে তিনি মনোনিবেশ করেছেন প্রধানত। ফলে নানা প্রশ্নে তাঁর ভ্রূ কুঞ্চিত থেকেছে সর্বদা। বিক্ষত করেছে হৃদয়। এই যন্ত্রণা অন্যের হৃদয়ে ছড়িয়ে দেবার তাগিদে তাঁর কলম ছুটে চলেছে নিরলস। প্রশ্ন রেখেছে মানুষের দরবারে—"মানুষের গড়া সমাজে মানুষের এমন দুর্গতি কেন? কেন এত অসাম্য? 'এই পৃথিবী আমার-ই জন্য' ক্ষমতাবানদের এমন নির্লজ্জ চিন্তা কেন? তুচ্ছের জন্যে মানুষ নিজেকে বিকোয় কেন? মেয়েদের সব কিছুতেই এমন অধিকারহীনতা কেন? তাদের উপর অন্যায় শাসনের জাঁতা চাপানো কেন? তার জীবন অবরোধের মধ্যে কেন?..." (খেলা থেকে লেখা) মেয়েদের কথাই বেশি ভেবেছেন। আর এই হাজারো 'কেন'-র উত্তর খুঁজে বার করার জন্য অস্থির হয়েছে তাঁর মন।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন, মেয়েদের ওপর অশ্রদ্ধা ও নিষ্ঠুরতার নানা কারণের মধ্যে একটি হল—পুরুষমানুষের মনের বুদ্ধিগত বিকাশের বেলায় নারীর সাহায্য খুবই কম পাওয়া গেছে। আশাপূর্ণাও দেখেছেন—মেয়েরা যত সহজে প্রেয়সী হতে পারে তত সহজে শ্রেয়সী হতে পারে না। তার একটা কারণ শ্রেয়সীকে গ্রহণ করার মতো পুরুষ-মনের প্রস্তুতি অধিকাংশ স্থলেই নজরে পড়ে না। অনেক কিছু বদলালেও অধিকাংশ স্থলেই এই মনোধর্মের

বদল দেখা যায় না। নারীর সমস্যা নিয়ে পুরুষরা খুব বেশি আলোড়িতও নয়। সেই আলোড়ন জাগানোর জন্যই তাঁর বিদ্রোহিনী চরিত্র সৃষ্টি। যারা তাল ঠুকে প্রতিবাদ করে না। হৃদয়ের যন্ত্রণা প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে প্রতিবাদকে ব্যবহার করে। এমন 'ঘরোয়া' মেয়েরা তাঁর সাহিত্যের পাতায় উঠে এসেছে—

"যারা অসহনীয় অবস্থাকে মেনে নিতে পারে না। তেমন অবস্থা হলে ঘর ছাড়ে অথবা বর ছাড়ে।" (খেলা থেকে লেখা)। লেখিকার মনে চিরদিনই একটা আপসহীন বিদ্রোহ ছিল। নারীমুক্তি-পিপাসা ছিল সমাজের সমষ্টিগত মেয়ের জন্য। সত্যবতী আর সুবর্ণলতা সেই পিপাসাকেই রূপ দিয়েছে। তাই তারা মূর্তিমতী বিদ্রোহিনী। মেয়েদের সব বিষয়েই অনধিকার ব্যবস্থা লেখিকাকে পীড়িত করেছে। বিবাহিত জীবনে অধিকারহীন, ক্ষমতাহীন গৃহিণী পদ ঝুটো অলঙ্কারের মতো বিদ্রূপের হাসিতে জর্জরিত করে নারীর জীবন। কিন্তু সব মিলিয়ে সমাজের এই অদ্ভুত ব্যবস্থায় কে বেশি বঞ্চিত? শাসিত? না শাসক? এই ভাবনা তাঁর হৃদয়কে বারবার আলোড়িত করেছে। ফলে ১৩৩০ সালে একটি কবিতার মাধ্যমে পুরুষজাতির প্রতি প্রশ্নবাণ নিক্ষেপিত হল। তাতে বক্তব্য ছিল—দেশকে স্বর্গ এবং নারীকে 'দেবী' বলা স্রেফ আত্মপ্রবঞ্চনা নয় কি?

"— তৃপ্তি পেতেছ তুমি-ই কী শুধু শয্যাভাগিনী লভি?
মর্মে মর্মে সঙ্গী যে নয়, শুধু কামনার ছবি।
আসলে যে পেল দাসীর আসন, 'দেবী' বলে বাড়াও না
'সোনা' 'সোনা' বলে ফাটালে আকাশ, পিতল কী হবে সোনা?"

এর পরে নম্রভাবে হতভাগ্য পুরুষজাতিকে সুপরামর্শ ও সান্ত্বনা দিয়ে আশ্বস্ত করেছেন। আর তারা কী হারাচ্ছে সে-সম্পর্কে সচেতনও করেছেন—

"তোমারও তো আজ ক্লান্তি এসেছে একাকী চলিতে পথ
পশুর মতন চলিছ নীরবে, টানিয়া জীবন রথ।
হাতে হাত রেখে চল দুইজনে, ঘুচে যাক অবসাদ,
কর্মে আসুক নূতন প্রেরণা, নব আনন্দ স্বাদ।"

আজ অবশ্য গোটা সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি বদলেছে। কিন্তু সেই সময় নারীর প্রতি সমাজ তার আচার-আচরণ নিয়ে লেখিকার মনে যে প্রশ্নের চিহ্ন এঁকেছিল তারই নির্যাস তাঁর জনপ্রিয় ত্রয়ী উপন্যাস—প্রথম প্রতিশ্রুতি (১৩৭১) সুবর্ণলতা (১৩৭৩) এবং বকুলকথা (১৩৮০)।

আশাপূর্ণা দেবী জীবনকে দেখেছিলেন শুধুমাত্র ঘটে যাওয়া ঘটনায় নয়, এই ঘটনাগুলিকে বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে। সমাজকে দেখেছিলেন কতগুলি সংস্কার আর নিয়মের নিগড়ে নয়, তার প্রয়োজনীয়তা এবং উপকারিতা দিয়ে। সংসারকে অনুভব করেছিলেন কতগুলি চরিত্রের উপস্থিতি দিয়ে নয়, তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের বোঝাপড়া ঔচিত্য-অনৌচিত্য দিয়ে। তাই তাঁর কলমে, সমাজ-সংসার, নারী-পুরুষ, তাদের নিয়ে ঘটে যাওয়া, না-ঘটা আর যদি এমন ঘটত—ঘটনাগুলি মিলিয়ে এক অনন্য ভুবন গড়ে উঠেছে। পাঠক তিনটি যুগের দৈনন্দিন জীবনের এবং সমাজের, বাস্তব অথচ শিল্পিত রূপ উপভোগ করে তৃপ্ত। 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'

উপন্যাসের পটভূমি ঊনবিংশ শতাব্দীর এক বিত্তশালী পরিবার। কলকাতা শহরের একটি মধ্যবিত্ত পরিবার সুবর্ণলতায় চিত্রিত, যাদের আভিজাত্য নেই অথচ অহঙ্কার আছে। লেখিকা বলেছেন—"সুবর্ণলতা হচ্ছে সেই যুগের—যে যুগকে আমার শৈশব বাল্যে প্রত্যক্ষ দেখেছি। দেখেছি শহর জীবনের চারখানা দেওয়ালের মধ্যে মেয়েদের কী অসহায়তা। কী অবমাননার মধ্যে তাদের সুখের শয়নপাতা।" (খেলা থেকে লেখা)

শেষ গ্রন্থ 'বকুলকথা'র কথক বকুল কিন্তু নায়িকা নয়। উপন্যাস জুড়ে সে শুধু দর্শক। সে তার ঘরোয়া লেখিকা-জীবনের মধ্যে পরবর্তী প্রজন্মের সমাজকে যতটুকু দেখতে পেয়েছে, ধরতে পেরেছে তারই কথা বিধৃত 'বকুলকথা'য়। তিন যুগের পৃষ্ঠপটে আঁকা এই তিন কন্যার ছবিই আশাপূর্ণার সাহিত্য-জীবনের প্রধান ফসল।

তিনটি যুগ ধরে জমে ওঠা লোহার গরাদের মধ্যেকার ছট্‌ফটানি জীবন্ত হয়ে নাড়া দিয়েছে পাঠক-মন। প্রথম যুগে একটু একটু করে খাঁচার দরজা ভেঙে যে মুক্তির হাওয়া বইয়ে দিতে চেয়েছিল প্রথম প্রতিশ্রুতির সত্যবতী, সুবর্ণলতায় তা কী চেহারা পেল? সুবর্ণলতার নিজস্ব চিন্তার আলো স্বাধীনতার কোন স্বপ্নকে জাগরুক করল? আর মায়ের স্বপ্নের অনুভব না-করা দিকটি হঠাৎ কোন উপলব্ধিব উজ্জ্বলতায় ভরিয়ে দিল বকুলের জগৎ? এই অন্বেষণেই বর্তমান যুগের স্বাধীন-আধুনিক মন উন্মুখ।

সত্যবতী সমাজের, সংসারের, মানুষের এবং 'মেয়ে মানুষের' স্বাধীনতার যে স্বপ্ন দেখেছে পরবর্তী যুগ সেই সুরেই কি কণ্ঠ মিলিযেছে? তারই রেশ কি পৌছেছে তৃতীয় প্রজন্মের আধুনিকতার দরজায়?

'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র ভূমিকায় আছে-

> *"বহির্বিশ্বের ভাঙাগড়ার কাহিনি নিয়ে রচিত হয় বিগতকালের ইতিহাস। আলো আর অন্ধকারেব পৃষ্টপটে উচ্চকিত সেই ধ্বনিমুখর ইতিহাস পরবর্তীকালের জন্য সঞ্চিত বাখে প্রেবণা উন্মাদনা রোমাঞ্চ। কিন্তু স্তিমিত অন্তঃপুরের অন্তরালেও কী চলে না ভাঙাগড়াব কাজ?...সেখান থেকে রং বদল হয সমাজের যুগেব সমাজ মানুষের মানসিকতার। ..তবু বচিত ইতিহাসগুলি এই নিভৃত লোকের প্রতি উদাসীন। অন্তঃপুর চিরদিন-ই অবহেলিত।"*

সেই অন্তঃপুরিকাদের-ই একজন নিজেকে অবহেলিত হওয়ার পথে ছেড়ে দেয়নি। সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে প্রথম প্রতিশ্রুতির সাক্ষর বহন করে এনেছে। একটি একটি করে প্রত্যাশার প্রদীপ জ্বেলে এগিয়ে চলেছে একলা নিঃসঙ্গ। প্রবল ঝড়ে বুকের আঁচল দিয়ে সে আলোক-মালিকা আগলে রাখতে চেয়েছে সুবর্ণলতা। বকুল কি আঘ্রাণ করেছে তার স্নিগ্ধ সৌবভ? নাকি আধুনিকতার তীব্রতায় ঝলসে গেছে স্বাধীনতাব প্রকৃত সুরটি?

দুই

সমাজবদ্ধ সাধারণ ঘরোয়া মানুষ আশাপূর্ণা দেবীর লেখার উপকরণ। এদের জীবনে রোগ, শোক, দারিদ্র্য আর আকস্মিক দুর্ঘটনা ছাড়া কোনো নাটকীয় ঘটনা বড় একটা ঘটে না।

'প্রথম প্রতিশ্রুতি'তে সত্যবতী যদি না-থাকত, সুবর্ণলতায় সুবর্ণকে যদি না-পাওয়া যেত আর বকুলকথার বকুল, পারুল, শম্পা যদি হারিয়ে যেত. তা হলে বৈচিত্র্যহীন মানুষের সমাজ উপন্যাসের গুরুত্ব হাবাত। কিন্তু এদের আমরা পেয়েছি। কারণ ছেলেবেলা থেকেই লেখিকার প্রশ্নমুখর মন "তখনকার প্রচলিত সমাজব্যবস্থার অসঙ্গতির বিরুদ্ধে প্রখর হয়ে উঠেছে।" (আমার সাহিত্য চিন্তা) তাঁকে "পীড়িত করেছে মেয়েদের অবস্থা। কেন তাদের জীবন কাটে অবরোধের অন্ধকারে?" (আমার সাহিত্য চিন্তা)। নানা প্রশ্ন লেখিকাকে স্থির থাকতে দেয়নি। তাঁর এই অস্থিরতার ফসল 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'। সৃষ্ট হয়েছে প্রতিবাদের প্রতীক সত্যবতী, "যে মেয়ে অচলায়তন ভাঙতে চেয়েছে।" চেয়েছে 'মেয়েমানুষ'কে 'মানুষে'র মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা দিতে। তার এই সংকল্পের পরিচয় প্রথম প্রতিশ্রুতির পাতায় পাতায় জাজ্জ্বল্যমান।

উপন্যাসে সত্যবতীর জীবনবোধ, চেতনা, সংগ্রামী দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিবিম্বিত করেছে একটা যুগকে। এই যুগের সংগ্রামের ইতিহাস ধরে এগিয়ে গেছে তার বংশধরেরা। সমাজের ভারসাম্যহীন আচরণ, সংসারের অযৌক্তিক নিয়ম, নানারকম অন্যায়ের বিরুদ্ধে একলা সংগ্রামে রত থেকেছে সে। "এগিয়েছে খানা ডোবা ডিঙিয়ে, পাথর ভেঙে, কাঁটা ঝোপ উপড়ে। পথ কাটতে কাটতে হয়তো দিশাহারা হয়েছে, বসে পড়েছে নিজের-ই কাটা পথের পথ জুড়ে। আবার এসেছে একজন। তার অবরুদ্ধ কার্যভার তুলে নিয়েছে নিজের হাতে।" (প্র· প্র: ১২)। এমনি করেই তৈরি হয়েছে পথ সত্যবতীর বংশধরদের। ভবিষ্যতে তাদের হাতে গড়ে উঠবে 'রথচলার পথ' এই প্রত্যাশায়।

শৈশব থেকেই সত্যবতী নিজেকে প্রকাশ করেছে যুক্তিপূর্ণ ভাবনা দিয়ে। মেয়েমানুষ ছিপ দিয়ে মাছ ধরতে পারবে না। যদিও রাঙাখুড়িমা আর ও-বাড়ির পিসিরা ধরে। তবে সে গামছা দিয়ে। ছোট-খুড়িমার নিষেধাজ্ঞায় আপত্তি জানিয়ে সে বলেছে—"তাতে কি?... গামছা দিয়ে ধরলে দোষ হয় না, ছিপ দিয়ে ধরলেই দোষ? চুনোপুঁটি ধরলে দোষ হয় না, বড় মাছ ধরলেই দোষ! তোমাদের এসব দোষের শাস্তর কে লিখেছে গা?" (প্র: প্র·- ২৫)। অর্থাৎ এ শাস্ত্র সে মানে না। পথ কেটে চলল বালিকা সত্য, যে-পথ ধরে মেয়েরা তাদের অধিকার পাবে, স্বাদ পাবে স্বাধীনতার। সমাজ হবে সুস্থ সবল ভাবনা-চিন্তার প্রতীক।

পিসতুতো দাদা জটা তার বৌকে নৃশংসভাবে ঠেঙায়। বৌ বেচারির মরণাপন্ন অবস্থা। গ্রামবাসীরা দু-চারটে 'আহা আহা' ধ্বনি তুলে দায়িত্ব মুক্ত হয়েছে। কারণ, "একটা মেয়ে মানুষের জন্য এর চাইতে আর কত বেশি দরদ আশা কবা যায়।" (প্র· প্র: ৩২) সমাজের কাছে কোনো প্রতিকার আশা করা যায় না। কিন্তু একটি বালিকা সবাইকে চমকে দিয়ে জটাকে উপযুক্ত শাস্তি দিয়েছে। ছড়া বেঁধে গ্রামের সব ছেলেমেয়েদের শিখিয়েছে। গ্রামবাসী শুনেছিল কবি গলার ঐকতানে "খাঁজে খাঁজে হাসি ছড়ানো" সেই ছড়া—

"জটা দাদা পা গোদা যেন ভোঁদা হাতী
বৌ-ঠেঙানো দাদার পিঠে ব্যাঙে মারুক লাথি।
জটা জটা পেট মোটা ভাত মারবার ধাড়ী।
দেখব মজা কেমন সাজা যাও না শ্বশুর বাড়ি।"

তার ছড়া বাঁধার সংকল্পে পুণ্যিপিসির (সঙ্গিনী) আপত্তিতে ঝঙ্কার দিয়ে বলেছে "বাঁধতে নেই?...কে বলেছে তোকে নেই? মেয়েমানুষ মেয়েমানুষ। মেয়েমানুষ যেন মায়ের পেটে জন্মায় না। বানের জলে ভেসে আসে। অত যদি মেয়েমানুষ মেয়েমানুষ করবি তো আমার সঙ্গে খেলতে আসিস নে।" (প্র: প্র: ৪০)

শুধু পুণ্যিপিসি কেন সমাজও স্তম্ভিত। এ মেয়ে তো শাসনের বাইরে। নিজের জায়গাটা বোঝার ক্ষমতা রাখে সে।

অপরাধী জটাদার সঙ্গে তার বৌ-এর হাসি-মস্করা করাটা সত্যবতীর কাছে কলঙ্কময় আচরণ। জটার বৌ-এর এই 'দুষ্পিবিত্তি'তে আত্মাভিমানী বালিকা জ্বলে উঠে বলেছে—"মনিষ্যি রীতি-চরিত্তির দেখে ঘেন্না ধরে গেছে।" (প্র: প্র: ৬৩) "খ্যাংরা মারো এমন সোয়ামীর মুখে। যে সোয়ামী লাথি মেরে যমের দক্ষিণ দোরে পাঠায় তার সঙ্গে আবার হাসি-গপ্প? গলায় দিতে দড়ি জোটে না?" এই অপমানবোধ জটার বৌদের নেই। কারণ তারা 'মেয়েমানুষ'। পুরুষ মানুষের দাক্ষিণ্যে যতটুকু পায় তাতেই কৃতার্থ। তাই স্বামী-সোহাগি জটার বৌ-এর মুখে মেরুদণ্ডহীন ঊনবিংশ শতাব্দীর নারী, সত্যবতীকে ধিক্কার দিয়েছে—"আমার সোয়ামী আমায় মেরেছে, তোমায় তো মারতে যায়নি ঠাকুর ঝি? তোমার এত গায়ে জ্বালা কেন যে ছড়া বেঁধে গাল মন্দ করতে আস?" (প্র: প্র: ৬৪)

কিন্তু এই জ্বালাটাই তো বাংলার নারীর মনে ছড়িয়ে দিতে চায় সত্যবতী। পরাধীনতার জ্বালা। সমাজের কাছে, নারীর নিজের কাছে 'মেয়েমানুষে'র পরিচয় মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। মেয়েদের চোখ-কান বন্ধ করে দিয়ে, সমাজের এই ঘুম পাড়ানোর রীতি সত্যকে অস্থির করে তোলে। নারী-পুরুষের এই ভারসাম্যহীন ব্যবস্থাপনার কাছে তার যুক্তি, বুদ্ধি, স্বাভাবিক আচরণ সব সময় মার খেয়েছে। "মনে হয়েছে মানুষে মানুষে ব্যবস্থাপনার এমন পার্থক্য কেন? অবস্থার এমন অসাম্য কেন?" (আমার সাহিত্যচিন্তা)। লেখিকার এ যন্ত্রণা নানা ঘটনাপ্রবাহের ঘাত-প্রতিঘাতে প্রকাশ করেছে শৈশবের সত্য, পরিণত সত্য আব জীবনযন্ত্রণায় বিদ্ধ সুবর্ণ।

প্রথমা স্ত্রী ষোড়শী সারদা-র বর্তমানে, এক কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাকে রক্ষা করতে ভাইপো রাসুর দ্বিতীয় বিবাহ দিয়েছেন রামকালী। ভেবেই দেখেননি আর কোথায়, কার সঙ্গে অন্যায় করা হল। সত্যবতীর যা বয়স তাতে এই ঘটনার অর্থ সম্যক উপলব্ধি সম্ভব নয়। তাই "বড়দের বাক্যুদ্ধের মাঝখানে" সে "হাঁ করে তাকিয়েছিল।" কিন্তু এই যুদ্ধের যেটুকু কর্ণগোচর হল, তা মর্মে গিয়ে আঘাত করেছে। নিশ্চিত দৃঢ়তার সঙ্গে সে বলেছে, "নিয্যস বাবার অন্যায়ই হয়েছে।" (প্র: প্র:-৬৯) রামকালী চাটুজ্যেকে সমালোচনা করায় সেদিন অন্দরমহলে বাজ পড়েছিল। কিন্তু প্রশ্ন জাগে, যুগের হাওয়ার উল্টো দিকে হাঁটার সাহস এবং শক্তি পেল কোথা থেকে বালিকাটি? তার মা ভুবনেশ্বরী গতানুগতিক সংসারের শান্ত নিরীহ মানুষটি। কিন্তু তার বাবা রামকালী ব্যতিক্রমী চরিত্র। তাঁর বিচিত্র জীবনাভিজ্ঞতা সে-যুগের নিরিখে অভিনবত্বের দাবি রাখে। সত্যবতীর নির্মল তেজের উৎস তার পিতা। তিনি-ই একমাত্র তার মনের উপযুক্ত সঙ্গী। তাই সত্য তাঁকে নিঃসংকোচে প্রশ্ন করেছে—"সতিন যদি বোনের মতো হবে, তবে এত মন্তরের প্রয়োজন হবে কেন? বোনের

খোয়ারের জন্য কী কেউ বত্ত করে?" "সতিন যদি ভালো তবে বড় বৌ-এর এত কষ্ট হচ্ছে কেন? (প্র· প্র· ১৮)।

সত্যবতী বুঝতে পারে না "এত বুদ্ধি বাবার, অথচ সোয়ামী আর একটা বিয়ে করে আনলে মেয়েমানুষের প্রাণ ফেটে যায় কী না সে জ্ঞান নেই।" তারপরে নিজেকে সমর্থন করে এভাবে "আর যদি না ফাটবে তা হলে কৈকেয়ী কেন তিন যুগে হেয় হয়েও রামকে বনবাসে পাঠিয়েছিলেন? কথক ঠাকুরের কথাতেই তো শুনেছে সত্য।" (প্র· প্র· ৯৪)

বাবার এই অক্ষমতার কারণও সে বুঝে ফেলে, "আসল কথা বেটাছেলেরা তো আর সতিন মর্ম বোঝে না তাই..." (প্র· প্র: ৯৩)।

কিন্তু বাবার এই অজ্ঞতায় কাতর হয়ে তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে সে বলেছে, "...রুগীর চেহারা দেখে তুমি ওপর থেকে বলে দিতে পারো তার শরীরের মধ্যে কোথায় কী হচ্ছে, আর মানুষের মুখ দেখে বুঝতে পারো না তার প্রাণের ভেতরটায় কী হচ্ছে?" (প্র· প্র· ৯৬)

চমকে উঠতে বাধ্য হন রামকালী। "এতটুকু মেয়ে এত তলিয়ে ভাবে কী করে?" আবার নতুন করে নিজের ভাবনা-চিন্তা নিয়ে আলোচনা করতে বাধ্য হন মনে মনে।

সমাজেব প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে সত্যর এই যে পথচলা, তার দীক্ষাগুরু বাবা স্বয়ং। যিনি চালকলা বাঁধা মেকি তেজস্বিতাকে অগ্রাহ্য কবে কবিবাজি পেশায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। বাল্য বয়সে বাড়ির বড়দের প্রশ্ন করেছিলেন—"ঠাকুর জল খায় না তো তাকে দাও কেন?" তারপরেই এক চরম সত্য উপলব্ধি করেন—জনার্দন মিথ্যা, ঠাকুর মিথ্যা, অমোঘ সত্য হল খড়ম। এর পর ব্রাহ্মণ সন্তানের গৃহত্যাগ। অপুত্রক কবিরাজ গোবিন্দ গুপ্তের গৃহে জাত খোয়াবার ভয়কে পরোয়া না-করে আশ্রয় গ্রহণ। ফলে রামকালীর জীবনে সংকীর্ণতা-মুক্ত বাতাস খেলেছে তাতে বিস্ময় জাগে না। বটবৃক্ষের আশ্রয়ে নিশ্চিন্ত বোধ করেছে তার আশেপাশের ছোটবড় চরিত্রগুলি। গণ্ডিবদ্ধ জীবনেব বাইরে অনায়াস বিচরণের ফলেই তাঁর ব্যক্তিত্বে উদারতা, স্বচ্ছতা, সংস্কারহীনতা, তীব্রতা, তেজস্বিতা, বলিষ্ঠতা প্রভৃতি গুণগুলিব সমাহার হয়েছিল। এই বিশেষত্বগুলিই উত্তরাধিকার সূত্রে সত্যবতীতে বর্তেছিল। বাবার মতো কাঁচা বয়সেই বাস্তবকে চিনে নেবার ক্ষমতা ছিল তার। অন্যায়ের সঙ্গে আপস করেনি বাবার মতোই। চিন্তা-ভাবনার স্বকীয়তা সত্যবতীকে তার বাবার থেকে স্বতন্ত্র ও আরও প্রগতিশীল করেছে। তাই পিতার অন্যায় বা ভুলকেও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার ক্ষমতা রেখেছে সে।

নারীর অপমানের আর এক উদাহরণ সৌদামিনীর জীবনকথা। অকারণ খেয়ালবশে স্বামী বিতাড়িতা সৌদামিনী প্রৌঢ়ত্বের সীমায় এসে 'চরণের দাসী' স্বাক্ষরে চিঠি পাঠায় সেই ব্যক্তিটিকে যে আর একটা বিয়ে করে "ফুটবলের মতো লাথিয়ে লাথিয়ে ঘরের বার করে দিয়েছিল" সৌদামিনীকে। নারীর নিজের সম্পর্কে এই মূল্যহীন আচরণ সত্যর বিচারে পদস্খলন। কেন নারী সমাজের কাছে এত তুচ্ছ হবে? অস্থির হয় সত্যবতী।

অন্তহীন পথ চলার স্বপ্ন ও ভুল পথ সংশোধন করে জীবনকে নতুন করে গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা সত্যবতীর জীবনকে করেছে অনন্য। নারী সম্পর্কে ভীরু, ব্যক্তিত্বহীন, অকারণ কুণ্ঠিত, লজ্জাবতীর যে-ছবি বাঙালি-মনে স্থায়িত্ব পেয়েছে তাকে অস্বীকার করেছে

সত্যবতীর ক্রিয়া-কলাপ। নারীর অধিকার-বঞ্চনা তার রোমকূপে তীব্র জ্বালা ধরিয়েছে। জীবনযন্ত্রণা থেকে নারীকে একমাত্র মৃত্যুই মুক্তি দিতে পারে—এ ভাবনা সত্যবতী সহ্য করতে পারে না। "সব মেয়ে মানুষের মুখে দেখি এক রা 'মরব' 'মরছি' মরণ হয় তো বাঁচি।" পুরুষ তো কথায় কথায় এমন ভাবে না! 'স্ত্রীর পত্রে'র মৃণালও সমাজে নারী-পুরুষের সাম্যহীনতাকে প্রশ্ন করেছিল—"নাটকের তামাশাটা কেবল বাঙালি মেয়েদের শাড়ির উপর দিয়েই হয় কেন আর বাঙালি বীরপুরুষদের কোঁচার উপর দিয়ে হয় না কেন, সেটাও তো ভেবে দেখা উচিত।" অবহেলিত বিন্দুর তুচ্ছ জীবন মৃণালকে "সংসারের মাঝখানে মেয়েমানুষের পরিচয়টা" পাইয়ে দিয়েছে। তাই তীর্থে গিয়ে শ্বশুরালয়ের 'চরণতলাশ্রয়ছিন্ন' মৃণাল ঘোষণা করেছে—"আমি আর তোমাদের সেই সাতাশ-নম্বর মাখন বড়ালের গলিতে ফিরব না।" (গল্পগুচ্ছ-অখণ্ড-পৃ: ৫৭৫) অখণ্ড জীবনের স্বাদে সে ধন্য। সমাজ ও সংসারের অন্ধকার বেড়াজাল ছিন্ন করে সে মুক্ত।

শারীরিক ও প্রকৃতিগত গঠনে পুরুষ ও নারীর পার্থক্য আছে। কিন্তু মর্যাদাগত দিক দিয়ে কোন নিয়মে নারী পুরুষের থেকে কম হবে, বারবার নারী-ই কেন অপমানিত হবে, সমাজের শুদ্ধতা রক্ষার দায় কেবল নারীকেই কেন বহন করতে হবে এমন অসংখ্য প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছে সত্যবতী তার সারা জীবনের পথ বেয়ে।

তার শ্বশুর নীলাম্বরের 'রাতচরা' অভ্যাস সমাজ ও সংসারের কাজে সমর্থনযোগ্য, কিন্তু সত্যবতী এ সংসারে প্রথম প্রতিবাদ। তার বিচারে সে-মানুষ তো 'পতিত'। এই শব্দটি আমাদের সমাজে অজানা নয়, অব্যবহৃত। কিন্তু শঙ্করী অনায়াসে 'পতিতা' হয়ে যায়। 'পতিত' শ্বশুরকে সম্মান জানাতে অস্বীকার করেছে সত্য নির্ভীকভাবে। তার স্বামীর আপত্তি ও সমাজের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে শঙ্করী ও তার কন্যা সুহাসকে গৃহে ঠাঁই দিয়েছে অন্যায়ের প্রতিবাদ স্বরূপ। বিধবা শঙ্করীর দ্বিতীয় এবং স্বেচ্ছাবিবাহ স্থায়ী হয়নি। আর সুহাস তারই ফসল। কিন্তু শঙ্করীর এই অবস্থার জন্য দায়ী তো সে একা নয়? পুরুষও সমান অংশীদাব। আশ্রয় দিয়ে সমাজেব সব শঙ্করীদের সম্মান স্বীকৃতি দিতে চেয়েছে সত্য। সুহাসকে শিক্ষিত করতে চেয়েছে। কোনো আন্দোলন বা সমাজসেবার মোহে নয়। সে বুঝেছিল নারীর শিক্ষার প্রয়োজন তার স্বাধীন ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য। সমাজে ভারসাম্য আনার জন্য। এরই সাধনা করেছে জীবনভোর। কন্যা সুবর্ণলতাকেও সেই আলোয় প্রদীপ্ত করতে চেয়েছে। ছোট্ট মেয়েকে সে বোঝাত, "বিদ্যেই হচ্ছে আসল বুঝলি? 'মেয়ে মানুষের বিদ্যে সাধ্য নেই বলেই তাদের এত দুর্দশা...তাই তাদের সবাই হেনস্তা করে।" কিন্তু "আর যেসব মেয়ে মানুষ'রা বিদ্যে করেছে, করতে পেরেছে বিদুষী হয়েছে?... কত গৌরব তাদের—কত মান্য। সেই মান্য সেই গৌরব তোরও হবে।" (সু-২৪৯)।

কিন্তু সত্যর সে-সাধ অপূর্ণই রয়ে গেছে। সুবর্ণকে ঘিরে তার সব স্বপ্ন অশিক্ষার অজ্ঞানতার আগুনে ভস্মীভূত হয়েছে তারই চোখের সামনে। বাল্যবিবাহের ছোবল সুবর্ণর জীবনের গতি বইয়ে দিয়েছে সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত অথচ সে-যুগের পক্ষে অতি স্বাভাবিক খাতে। যার বিষজ্বালা সে বয়ে বেড়িয়েছে সারা জীবন।

"ছেলে আর মেয়ের মধ্যে মূল্যবোধের বড় বেশি তফাৎ; মেয়েরা যেন কিছু-ই নয় আর

ছেলেরাই পরম মাণিক।” এটা লেখিকাকে খুব বিদ্ধ করত। যন্ত্রণা দিত। কিন্তু এই জ্বালা প্রকাশ করা যেত না। তাই কুরে কুরে খাওয়া মনের যন্ত্রণা সাহিত্যে রূপ পেয়েছে সত্যবতীকে আশ্রয় করে।

খেলার সময় নেড়ু যখন পৌরুষের অহংকারে ঘোষণা করে, সংসারের সব ভালো কাজগুলো পুরুষদের জন্য আর না-ভালো কাজগুলো মেয়েদের জন্য—এটাই ভগবানের বিধান তখন লেখিকার মনের কথাই ঝঙ্কৃত হয়েছে সত্যবতীর প্রত্যয়ভরা উক্তিতে—“ভগবান কখনো অমন একচোখো নয়। ও সব বেটাছেলেরাই ছিস্টি করেছে।” অতএব এ মত গ্রহণযোগ্য নয়।

বিশ্ব সংসারকে জানার আগ্রহ শুধুমাত্র অভিজ্ঞতার হাতে সমর্পণ না-করে সত্য লেখা-পড়া শিখেছিল নেড়ুর বই নিয়ে চুপি চুপি। সমাজের পক্ষে নতুন ঘটনা এটা। অনুচিতও। কিন্তু সত্যর যুক্তি হল—“মেয়েমানুষরা যে রাতদিন ঝগড়া কোঁদল করছে। যাকে তাকে গাল মন্দ শাপমান্যি করছে তাতে পাপ হয় না আর বিদ্যা শিখলে পাপ হবে? বলি মা সরস্বতী নিজে মেয়ে মানুষ নয়? সকল শাস্তরের সার শাস্তর চার বেদ মা সরস্বতীর হাতে থাকে না?” (প্র: প্র: ১৬১)

তার এই অকাট্য যুক্তি বিরাট একটা দৃষ্টির দরজা খুলে দেয়। ‘পরম ভুলে যাওয়া’ এত বড় কথাটা হঠাৎ-ই যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পরবর্তী কালে ইংরেজি শিখেছে সত্যবতী নিজে নিজেই স্বামীর বই থেকে। অন্য বাঙালি মেয়েদেরও অক্ষর ও মনের শিক্ষায় শিক্ষিত করার ব্রতে নিমগ্ন থেকেছে। বাংলাদেশের সমস্ত অভাগিনি মেয়ের মন আলোয় ভরিয়ে দেবার সংকল্প তার। কিন্তু এই ব্রতে স্বামীসাহচর্য থেকে বঞ্চিত সে। তবে কোনো প্রতিকূলতা তাকে দমাতে পারেনি। “হেরে যেতে একান্ত আপত্তি সত্যবতীর। কোনো ক্ষেত্রে কোথাও হার মানবে না এই পণ” তার। (প্র: প্র: ৩৯)

সত্যবতীর অভিধানে অন্যায় করা আর সওয়া কোনোটিরই স্থান নেই। নিষ্কলুষ হৃদয়। নির্মল তেজের প্রকাশ তার ব্যক্তিত্বে। তাই রামকালী চিন্তিত ‘পৃথিবী কী ওকে বুঝবে?’ মেয়ের সততা-স্বচ্ছতায় মুগ্ধ হলেও উদ্বিগ্ন রামকালী ভেবেছেন—আর পাঁচটা মেয়ের মতোই সত্যবতী হলে তিনি নিশ্চিন্ত হতেন। কিন্তু যুগযুগান্তরের অন্ধ সংস্কারের শক্ত প্রাচীর ভেঙে সোনালি ভাবীকালকে আহ্বান করার প্রতিশ্রুতি যার, সে সাধারণের সঙ্গে ‘ঝাঁকের কই’ হয়ে মিশবে কী করে? রামকালীর মতোই সে-ও একা, স্বতন্ত্র। তবে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে যে-গুণাবলি পুরুষকে উচ্চাসনে বসিয়ে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়, সেই বিশেষত্বই নারীর ক্ষেত্রে সমস্ত অবমাননা ও ধিক্কারের উৎস। তাই সত্যর অনন্যতা অনেক বেশি নজরে আসে।

মর্যাদাবোধ তার দৃঢ়। সেই দৃঢ়তার প্রসার ঘটাতে চায় বাংলার নারীর মনে। জাগাতে চায় আত্মমর্যাদাবোধ। নিজের প্রাপ্য আদায় করতে তার কোনো কুণ্ঠা নেই। শিক্ষা তাকে শক্তি দিয়েছিল স্বাধীনতার, আত্মনির্ভরতার। সেই শক্তির আলোতে জীবনের বহু সংকটময় মুহূর্তে পথ খুঁজে পেয়েছে সে। কঠিন ও দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিতে বিচলিত হয়নি। সেই শক্তির মহিমায় প্রয়োজনে তার বাবার প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করেছে। সংসারে মেয়েরাও স্বনির্ভর হয়ে বলিষ্ঠতার সঙ্গে নিজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুক নির্দ্বিধায়—সত্যবতীর একান্ত কামনা ছিল।

শ্বশুরবাড়ির সমস্যার মোকাবিলাও তারা নিজের শক্তিতে করবে বাস্তবকে এড়িয়ে পিত্রালয়ের আড়ালকে আশ্রয় না-করে এ স্বপ্নও দেখত সে। স্পষ্ট, পরিচ্ছন্ন, সাবলীল ও সত্য আচরণে গড়ে উঠুক নারীচরিত্র। সংসারের কাজে তার মূল্য প্রতিষ্ঠিত হোক। জীবন হোক স্বচ্ছন্দ গতিময় এই ভাবনা পোষণ করত। তাই সারাজীবন ধরে যুদ্ধ করে গেছে শৈশবের লড়াকু মেয়েটা। একলা, সঙ্গীহীন। পরিণত বয়সে তার চিন্তা-ভাবনা আরো গভীরতা পেয়েছে। জীবনযজ্ঞে পুরুষের সহযোগিতাও যে সমাজে কাম্য—বোঝাতে চেয়েছে সমাজকে। নারী-পুরুষ উভয়েই যে-সমাজের বলিষ্ঠ স্তম্ভ। যে-কোনো একটি দুর্বল হলে তাতে সমাজের স্বাস্থ্যহানি—এই সহজ কথাটা মানুষ বোঝে না।

নির্ভীক বালিকা অন্ধকারে পেঁচার চোখ গুনতে যায়। ফলে অকারণ শাশুড়িকে ভয়, শাশুড়ি হুকুম না-দিলে ওষুধ খেতে ভয়, পান থেকে চুন খসলে ভয়...বিরক্ত বালিকা সত্যবতী জানতে চায়, "তোমাদের এত ভয় কিসের বলতে পারো?" (প্র. প্র· ৫০)।

প্রকৃত সত্য হল—সাধারণত প্রচলিত ধারার বাইরে ভাবতে গেলেই নানারকম অজানা ভয় এসে ঘিরে ধরে। সত্য জানে এই ভয়ের জ্বালাতেই স্বর্গ হাতছাড়া হয়ে যায়। শ্বশুর শাশুড়ির ইচ্ছার বিরুদ্ধে, বাপের বাড়ির সদস্যদের অবাক করে দিয়ে উভয় সমাজের বহু নারীর ঈর্ষার পাত্রী হয়ে কলকাতায় রওনা হয় সে স্বামীর সঙ্গে। বাসায় থাকবে। দেখবে মাথায় কেমন 'বজ্র' এসে পড়ে। গ্রামের চৌহদ্দির মধ্যে গতানুগতিক জীবন যাপন-ই সহজ ছিল তার স্বামী নবকুমারের কাছে। কিন্তু বাইরের জগৎকে জানার, চেনাব আকাঙ্ক্ষা সত্যকে এই দু·সাহস জুগিয়েছে। সমসাময়িক ঘটনাবলি সম্পর্কে সচেতন সত্যবতী নবকুমারকেও নতুনের স্বাদ দিতে চায়। সে বোঝে, "নিজেকে চব্বিশ-ঘন্টা ক্ষুদ্দুর প্রাণী, ক্ষুদ্দুর প্রাণী ভাবলেই মনটা ক্ষুদ্দুর হয়ে যায়।" তাই প্রতিটি মানবমনকে এই 'ক্ষুদ্দুর'-এর কবল থেকে মুক্ত করতে চায়। সুপরামর্শ দেয়—"জোড় হস্ত করবি ভগবানের কাছে। করবি মানুষের মতো মানুষের কাছে। পয়সার কাছে করতে যাস কেন মরতে?" (প্র. প্র: ৪১৩)।

ভাবিনীর বোন পুঁটির ঘটনায় সত্যবতীর রূঢ় বাস্তব অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হল। সে জানল—"বিয়ে করা পরিবারকে মারতে পারো, কাটতে পারো, ছেঁচতে পারো, কুটতে পারো (প্র: প্র· ৫৯০)। তাই নয় বছরের "পাকাটির মতো পুঁটি", যার স্বামী "সা-জোয়ান একটা তাগড়া বেটাছেলে, বৌ মরে যার 'খাই' 'খাই' অবস্থা"—তার আদরকে ভয় পেত। যেতে চাইত না শয্যায়। ফলে নোড়া দিয়ে মাথা ছেঁচে 'ছাতু' করে তার এই 'স্বামী-শয্যা'য় না-যাওয়াটাকে চিরস্থায়ী করেছে স্বামী আর শাশুড়ি মিলে নির্দ্বিধায়। কারণ, "সকল খুনের শাস্তি আছে, দেশে বৌ খুনের তো আর শাস্তি নেই।" (প্র: প্র: ৫৮৬)। মেয়েদের চোখের ওপর 'মোটা পর্দা' ঝুলিয়ে রেখে অদৃষ্টের ওপর সব অনাচারের দায়িত্ব চাপিয়ে দেবার প্রবণতাকে ধিক্কার দিয়েছে সত্য। এই নৃশংস আচরণের প্রতিকারের উদ্দেশ্যে আইনের দ্বারস্থ হয়েছে স্বামী এবং সংসারের অসহযোগিতা সত্ত্বেও। হাজার হাজার পুঁটির যন্ত্রণা দগ্ধে দগ্ধে মেরেছে তাকে। 'মেয়ে' বলেই মেয়েরা তুচ্ছ হতে পারে না। একটা মানুষের জীবন দিয়ে দেখে না কেন সমাজ? কোনো অভ্যস্ত সামাজিক ধারণা স্বীকৃতি পায় না সত্যবতীর জগতে। শুধু জমে ওঠে কেন? কেন? কেন? উত্তর অন্বেষণ চলেছে জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত।

সারা জীবনের অভিজ্ঞতা সত্যকে আর-এক বিরাট জিজ্ঞাসা চিহ্নের সম্মুখীন করেছে। *বিবাহ নামক সামাজিক প্রথাটি সে-প্রশ্নের কেন্দ্রে।* বিয়ের ব্যাপারে মেয়েদের ইচ্ছে-অনিচ্ছের কথা কেউ ভাবে না। বিয়ের পর মেয়েদের ভূমিকাও—যে-সংসার যেমন ভাবে রাখে তার ওপর নির্ভরশীল। "কি অদ্ভুত কাল ছিল সত্যদের। ...ছি ছি সে বিয়ে যেন ছেলেমেয়েগুলোকে নিয়ে বড়দের পুতুল খেলার সাধ মেটানো। ...মেয়েগুলোর চোখ মুখ ফোটার আগেই হাঁড়ি কাঠে গলা দিয়ে রেখে দেওয়া।" (প্র: প্র:) সুহাসের বিয়ে সত্য পুতুলখেলার পর্যায়ে রাখেনি। কিন্তু নিজের বিয়ে তো আট বছরের বালিকা-বিবাহ। জীবনের কোনো যন্ত্রণার মুহূর্তে তাই তার কান্না শোনা গেছে—"বাবা বাবা গো, দশটা নয় পাঁচটা নয় একটা মাত্তর মেয়ে আমি তোমার। না দেখে শুনে এমন ঘরেও দিয়েছিলে? এত তুমি বিচক্ষণ আর এই তোমার বিচার?"

হ্যাঁ, তার বাবা বিচক্ষণ কিন্তু পুরুষের অহংবোধ তাকে আচ্ছন্ন রেখেছিল। তাই মানুষকে মানুষের মর্যাদা দেবার শিক্ষা থাকলেও সমগ্র মেয়েমানুষ জাতটার প্রতি তাঁর তেমন সম্ভ্রমবোধ ছিল না। মূল্যবোধও না। বরং প্রচ্ছন্ন একটা অবজ্ঞা মিশ্রিত করুণা ছিল তাঁর। উপন্যাসের উজ্জ্বলতম পুরুষ চরিত্রটির স্ত্রী তাঁর কাছ থেকে 'মেয়েমানুষ' ছাড়া মানুষের মর্যাদা কখনই পাননি।

জীবনের শেষে সত্যবতীর যে চরম উপলব্ধি, তা সুবর্ণকে লেখা চিঠিতে প্রশ্ন হয়ে ধরা দিয়েছে। "পুরুষের পক্ষে বিবাহ" একটি ঘটনা মাত্র। অথচ নারীর পক্ষে "চির অলঙ্ঘ্য কেন?" "এই বন্ধনের দৃঢ়তা পুরুষ ও নারীর পক্ষে সমান নয় কেন?" বিবাহ প্রথার সামাজিক বন্ধন এইভাবে সত্যবতীর আকুল প্রশ্নের সম্মুখীন। এই প্রশ্ন উঠে এসেছে তার দাম্পত্য জীবনের ফসল থেকেই।

বাল্য বয়সেই বহুবিবাহ ধিক্কৃত হয়েছিল তার কাছে। পরিণত বয়সে বাল্যবিবাহকে রোধ করতে চেয়েছে সে। যথার্থ শিক্ষিত না-হয়ে তার পুত্রদেরও বিবাহ দিতে চায়নি। কন্যা সুবর্ণলতাকে বেথুনে পড়াচ্ছিল। মেয়েকে বাল্যবিবাহের অভিশাপ থেকে বাঁচাতে স্বামীর কাছে কাতর প্রার্থনা জানিয়েছিল সত্য। হাজার সুবর্ণর মুক্তির সূচনা ছিল তাতে। 'রুগীর সঙ্গে চাতুরীতে দোষ নেই' ভেবে নবকুমার গুরুত্বই দেয়নি স্ত্রীর আবেদনের। সত্যর অগোচরে মায়ের পরামর্শে গ্রামের বাড়িতে নয় বছরের সুবর্ণকে বিয়ের পিঁড়িতে বসানোর সময়েও স্ত্রীর আকুল মিনতির কথা মনে পড়েনি তার। এই ধরনের বোঝাপড়ার উপর দাঁড়িয়েছিল তাদের তিরিশ বছরের বিবাহিত জীবন। সত্যবতী বারবার উপলব্ধি করেছে যথার্থ শিক্ষা শুধু নারী নয়, পুরুষেরও প্রয়োজন। এই জ্ঞানের অভাব কত কচি সুবর্ণর চঞ্চল চোখকে 'আহত পশুর চোখ'-এ পরিণত করেছে। সমাজ টেরও পায়নি। সত্য শেষ চেষ্টা করেছিল, "এই পুতুল খেলার বিয়েটা মুছে ফিরিয়ে দেবে আমার সেই সুবর্ণকে?" (প্র: প্র: ৬৫৩) বিয়ের নামে পুতুলখেলা বন্ধ হোক, মনেপ্রাণে কামনা করেছিল সে। নবকুমারের এই বিশ্বাসঘাতকতা তার মনে আর-এক গুচ্ছ প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে—সব বিয়েতে নারায়ণ এসে দাঁড়ান কি? সব গাঁটছড়াই জন্মজন্মান্তরের বাঁধন হয় কি? তা হলে তার প্রকৃত স্বরূপ কী?

অন্যায়কে কোনোদিন মেনে নেয়নি সে। সম্মানকেও নয়। জীবনের সব প্রশ্নকে সঙ্গী

করে বাকি জীবনটা তার উত্তর অন্বেষণে নিযুক্ত থাকার বাসনায় সংসার ত্যাগ করেছে সত্যবতী চিরকালের জন্য। চলে যাবার সময়ও তার স্বাধীন চিন্তা নাড়িয়ে দিয়ে যায় মনকে—'নিজের পেট' সে নিজেই চালাবে। উনবিংশ শতাব্দীর নারী জানে—শৈশবে বাবার, যৌবনে স্বামীর, বৃদ্ধাবস্থায় সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়েই বাঁচতে হয়। শুধু সত্যবতী-ই জানে না সে-কথা।

জীবনের শেষ পর্যায়ে সত্যর উপলব্ধি · "স্ত্রী লোকের যাহা কিছুতে অধিকার, তাহার অধিকার অর্জন করিতে হইবে স্ত্রী জাতিকেই" (সুবর্ণলতা-২৭৫)। সেই অধিকার অর্জনের লড়াইয়ের মন্ত্র সে দিয়ে গেছে কন্যা সুবর্ণলতাকে। পিতামহী প্রপিতামহীদের যন্ত্রণার ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি চায় না সে।

সত্যবতীর কাঙ্ক্ষিত সমাজ, মর্যাদা, সুখ পেয়েছিল সুবর্ণ? মায়ের এই মুক্ত ভাবনা, আত্ম-মর্যাদাবোধ, স্বাধীন চিন্তার শিক্ষা—যা নয় বছরের পর আর পায়নি সে—তা কি বহন করতে পেরেছিল? দৃষ্টান্ত রাখতে পেরেছিল তার যুগের কাছে? সুবর্ণলতায় গাঁথা আছে সে ইতিহাস।

তিন

সত্যবতী আর সুবর্ণলতার যুগের বালিকাবধূদের শ্বশুরবাড়ির অন্দরমহলটি মোটামুটি একই ধাঁচেব। যুগের হাওয়ার ঢেউ নতুন কোনো ছবি আঁকে না। কিন্তু সত্যবতী তার শ্বশুরগৃহের চিত্রটি নতুন করে তুলেছিল স্বীয় চরিত্রের সততা-দৃঢ়তা ও ঋজুতা দিয়ে। যদিও তার সে-জীবনকে নিষ্কণ্টক বলা চলে না, তবু পরিচিত তো নয়!

সত্যবতী-কন্যা সুবর্ণলতাও তার শ্বশুরালয়ে যে-অভ্যর্থনার সঙ্গে প্রবেশ করে তাও খুব সুখকর নয়। তখন 'গৃহত্যাগিনী মার নিন্দা' ছিল তার সম্বল।

সত্যবতী যখন মেয়েদেব অধিকারের লড়াইয়ের মন্ত্র সুবর্ণলতাকে দেয়, তখন জীবনের মানে বদলে দেবার লড়াইয়ে সুবর্ণ পর্যুদস্ত। কিন্তু তার গোত্রান্তরের জীবন শুরু হয়েছিল সে-যুগের আর পাঁচটা কাঁচা বয়সের মেয়েদের মতোই। কিন্তু সত্যবতীর মেয়ে বলেই সে স্বতন্ত্র।

চতুর্দশী সুবর্ণর মধ্যে সত্যবতীর নির্ভীকতা খুঁজে পাওয়া যায় যখন সে জানায়, "আমি বলে রাখছি বারান্দা আমার চাই-ই চাই!" (সু · ৫)। বাঙালি গেরস্ত ঘরের বৌ-এর মুক্ত কণ্ঠে চাইবার 'আস্পদ্দা' দেখে তার জন্মসূত্রের কথাই মনে পড়ে যায় সবার। তবে তার বারান্দার প্রতি আকর্ষণের মূল কারণটা কিন্তু ধরতে পারে না কেউ। 'বউমানুষে'র সংসারের গণ্ডির বাইরে নতুন কিছু যে ভাববার আছে এ-কথা তারা কল্পনাও করতে পারে না। এদিকে সুবর্ণর ইচ্ছে—"এরা শৌখিন হোক, সভ্য হোক, রুচি পছন্দের মানে বুঝুক। এদের নিয়ে সুন্দর করে সংসার করবে।" (সু : ৭) কারণ "দাঁড়ানোর প্রথম সোপান-ই তো সুন্দর একটা বাড়ি। পরিবেশটা সুন্দর না-হলে জীবনটা সুন্দর হবে কিসের উপর?" কিশোরী বয়সে তার বুভুক্ষু মনের কাছে" জীবন সৌন্দর্যের মাপকাঠি তখন ওই রাস্তা দেখতে পাওয়া বারান্দা দেওয়া একখানি ঘর।" (সু · ৭)।

কিন্তু এইটুকু পাওনা থেকেও সে বঞ্চিত হয়েছিল। আর তখনই এই সত্যটি জেনেছিল

যে তার স্বামী ঠগ, প্রবঞ্চক। মিথ্যে স্তোক দিয়েছিল তাকে।

নয় বছরের কচি মেয়েটি মনে কত স্বপ্ন, বুকে কত আশা নিয়ে নেমেছিল নতুন সংসারে। আঘাতের পর আঘাত হেনে তাকে রূঢ় কঠিন করে তুলে নিজের কর্তব্য করেছিল তার শ্বশুরালয়।

'মেয়েমানুষ' হয়ে সৎ, উদার, সংবেদনশীল হওয়ার স্বাধীনতা পাওয়া যায় না, এ তথ্য অজানা ছিল সুবর্ণর। একটি কথার জন্য শাস্তি পাওয়া, বই পড়ার জন্য অপমানিত হওয়া, ননদের বিয়েতে নিজের গয়না দিতে চেয়ে স্বামীর কাছে তিরস্কৃত—হওয়া সবই সংসারের পক্ষে স্বাভাবিক আচরণ। কিন্তু সুবর্ণর কাছে তো এ মনুষ্যত্বের অপমান। তার আত্মা আর্তনাদ করেছে মুহুর্মুহু। কারো কানে প্রবেশ করেনি সে হাহাকার। বরং অধিকাংশ সময় লাঞ্ছিত হয়েছে, পীড়িত হয়েছে কিন্তু হার মানেনি সে। নিজের বিবেককে চাপে পড়ে ছোটও করেনি।

কিন্তু দিনের পর দিন প্রবোধের লুব্ধ ইচ্ছার দাসীত্ব করতে করতে সুবর্ণ নিজের আত্মাকে বিকিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। মুক্তি পেতে পারেনি। কত সুবর্ণ-ই তো এমন দাম্পত্য জীবন বয়ে চলেছে। সত্যবতী কি এই স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিল?

প্রথম যেদিন সুবর্ণ অনুভব করে স্বামীর সঙ্গে তার কোনো মনের মিল নেই এবং কোনো দিনই হবে না—সেদিন লুকিয়ে কেঁদে ভাসিয়েছিল পাগল মেয়েটা। এমন সংবেদনশীল মন তার। পরে জীবনের অভিজ্ঞতায় জেনেছিল মিল জিনিসটা দুর্লভ। দৈবাৎ কেউ লাভ করে। আপন আত্মজদের মধ্যেও মনের মিল পাওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার। স্বামী-সন্তান-সংসারের কাছ থেকে নিরাশ হয়ে সুবর্ণ হৃদয়যন্ত্রণায় জর্জরিত হয়েছে।

মায়ের মতোই সুবর্ণ সাহসী ও স্পষ্টবাদী চরিত্র। অন্যায় ও অন্যায্য কথা মুখ বুজে সহ্য করে না। ফলে দুঃসহ মূল্যও চোকাতে হয় তাকে। তবুও সে ন্যায্য হুকুম হলে মানবে, অন্যায্য হলে নয়। উচিত কথা শ্বশ্রূঠাকুরানিকে বলতেও বাধে না। তার লক্ষ্মীছাড়া জন্মের খোঁচা যখনই সে খেয়েছে সমুচিত জবাবও দিয়েছে। প্রয়োজনে শাশুড়ি, স্বামী, দেওর সবার সঙ্গে প্রলয় বাধিয়েছে। সত্যবতীর মতোই নির্ভীক সে।

সারা জীবন ধরে অনেক কিছু চেয়েছে সুবর্ণ। পায়নি কিছু। প্রথমে অভিমান করেছে, প্রতিজ্ঞা করেছে কিন্তু বাঙালি ঘরের বৌ, কোনোটাকেই রাখতে পারেনি। সব ভাসিযে দিয়ে নিস্তার চেয়েছে সে। সভ্যতা, ভব্যতা, সুরুচি, বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে আত্মিক যোগ, সর্বোপরি মানুষের মতো বাঁচা, তার চাহিদাগুলির মধ্যে ছিল প্রধান।

রবীন্দ্র কবিতার স্নিগ্ধতায় প্রবোধের মন ভরে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু সন্দেহবাতিকগ্রস্ত স্থূল রুচিসম্পন্ন প্রবোধ সে-কবিতার মধ্যেও সন্দেহের কারণ খুঁজে পেয়েছে। সে-বই আর সুবর্ণর হাতে আসেনি কখনো, প্রতি মুহূর্তে স্বামীর অপদার্থতার পরিচয় পেয়ে ক্লান্ত সে। অবশ্য অপদার্থতাটা তার মাপকাঠিতেই। নইলে অমন স্বামী পেয়ে অনেক মেয়েই নাকি ধন্য হয়ে যেত। ওইখানেই তো প্রভেদ অন্য অনেক মেয়েদের সঙ্গে সত্যবতী-তনয়ার।

দমবন্ধ করা পরিবেশে মুক্তি পেতে পারে না বুঝেই পড়াশোনার মাধ্যমে নিজের মনকে প্রসারিত করতে চেয়েছে সুবর্ণলতা।

আশাপূর্ণা দেবী নিজের জীবন দিয়ে বুঝেছিলেন সাহিত্যে ও সংস্কৃতির পরিবেশ মানুষের

মনকে স্বতন্ত্র করে, মার্জিত করে, উন্নত করে, দৃঢ় করে, আত্মপ্রত্যয়ী করে। তাই মাতা-কন্যা উভয়েই নিজ নিজ সমাজে স্বতন্ত্র।

"সুবর্ণলতা জানে না অকারণ গাল খেয়ে চুপ করে থাকতে হয়। ...অকারণ অহেতুক খোশামোদ আর তোয়াজ করতে হয়।" তাই তার আচরণ, "অকারণ একটা কথা কাটাকাটি, অকারণ একটা জটিলতা সৃষ্টি করা" মনে হয়। সে স্বীকার করে "তোমাদের ভালোর সঙ্গে আমার ভালো মেলে না।" সে দেখেছে ননদ "সুরাজের দাদারা কী স্থূল, কী অমার্জিত। কী সেকেলে। সুরাজের বৌদিরা যেন ঝি চাকরানি পর্যায়ের। সুরাজের ভাইপো-ভাইঝিগুলো যেন গোয়ালের গরু-ছাগল।" এদের আচরণে তার মনে হয়েছে—"ভালোভাবে থাকতে ইচ্ছে হয় না এদের?" (সু : ৬০)

সুরাজকে দেখে আশান্বিত সুবর্ণ ভাবে—"তবু বাংলাদেশের একটা 'মেয়েমানুষ' ও মানুষের মতো বাঁচছে।" এই বা কম কীসে?

'পরিবেশ-ই মানুষকে ভাঙে গড়ে'। সুবর্ণও তার পরিবেশকে ভেঙে মনের মতো করে গড়তে চেয়েছে। কিন্তু তার দৃষ্টিভঙ্গির অভিনবত্ব সংসার বোঝেনি। তার উদারচেতা মন সংস্কারের গতানুগতিকতার নিয়মে ধাক্কা খেয়ে ফিরেছে বারবার। সে জীবনটাকে যেভাবে সাজাতে চায় দর্জিপাড়ার সেই গলির মোড়ের বাড়িটার সদস্যরা তার নাগালই পায় না। সে যখনই নতুন কিছু প্রবর্তন করতে গেছে সংসারের কেউ তার পাশে দাঁড়ায়নি। বরং "মেজবৌ একেলে হাওয়া ঢোকায় বাড়িতে' (সু : ৪৯) বলে তাকে ধিক্কৃত ও লাঞ্ছিত করেছে। তবু লড়াই বহাল রাখে সে। "হেরেও কোনো উপায়ে জিতে যায় সুবর্ণ, মার খেতে গিয়েও মাথায় চড়ে বসে। এ এক অদ্ভুত রহস্য।" (সু : ১০৯)।

গান্ধিজির 'একলা চল' নীতি গ্রহণ করেছে। প্রচুর নিন্দা কুড়িয়েছে। তবু মন সচেতন করতে বাড়িতে খবরের কাগজ আনিয়েছে। আঁতুর ঘরে পরিচ্ছন্নতা এনেছে। বাড়িতে মেয়েদের পড়াশোনার রীতির প্রচলন করেছে। দেশাত্মবোধের কারণে ঘটা করে বিলিতি কাপড় পুড়িয়েছে, এমন কত ঘটনা ঘটিয়েছে যাতে মুক্তকেশীর সংসার নাড়া খেয়েছে। তার কলমের উপর কলম চালিয়েছে, তারই হেঁসেলে রান্নার লোক নিযুক্ত করে শাশুড়ির সংসারে যুগ-প্রলয় ঘটিয়ে ছেড়েছে।

সুবর্ণর ব্যতিক্রমী ভাবনা বারবার লাঞ্ছিত, তবু উন্নততর চাহিদা থেকে বিরত হয়নি। আক্ষেপ করেছে—"ওদের বোধের জগৎটা ওদের তৈরি বাড়ির ঘরের মত। কোথাও একটা ভেন্টিলেটর নেই যেখান দিয়ে চলমান বাতাসের এক কণা ঢুকে পড়তে পারে।" (সু : ৩১)

সংসারে সব দিক থেকে নিরাশ সুবর্ণ নিজের মুক্তির নতুন পথ বের করেছে। খাঁচাবন্দি জীবনের ডানা ঝটপটানির গল্পকে লিপিবদ্ধ করেছে। খাঁচার বাইরের বিশাল জগতের সুর ও রঙও এসে মিশেছে তাতে। আশা করেছে হয়তো "জবাবী বিবৃতির মধ্য থেকে সেই সংসার সুবর্ণলতাকে বুঝতে পারবে।" (সু : ২৪৯)। "পৃথিবীটাকে হঠাৎ ভারি সুন্দর লাগে" তার। "খুশি ঝলমলে সকালের আলোয় ... নিজের সংসারটাকেও" হঠাৎ যেন ভালো লেগে যায়। অনেক না-বোঝা উপলব্ধি স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়। এরা যে তাকে ভালোবাসে না এ ধারণাটা ভুল তার, ওরা ওদের নিজেদের ধরনে বাসে। সুবর্ণও ওদের বুঝতে চেষ্টা করার

অঙ্গীকার নেয়। আশান্বিত হয়—'জীবনের মানে'র খোঁজ পাবে বলে। কিন্তু এই স্বপ্ন-বিভোরতাও রূঢ় বাস্তবের আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। সহস্তে নিজের সৃষ্টির চিতা জ্বালতে হয়েছে তাকে স্বামী ও পুত্রের ব্যঙ্গবাণে জর্জরিত হয়ে। (সু : ২৪৯) সুবর্ণের ছাদের ওপর ধ্বংসযজ্ঞের একমাত্র নীরব দর্শক ছিল বকুল। এ কথা সুবর্ণ কোনোদিন জানতে পারেনি। কিন্তু সেই দিন থেকেই অন্তত একজন সুবর্ণকে বুঝতে শুরু করেছিল।

স্বদেশিয়ানার মন্ত্রে দীক্ষিত করে সুবর্ণর মুক্তিকামী অন্তর-চেতনাকে জাগিয়ে তুলেছিল অম্বিকা। যদিও সেখানেও প্রবোধ তার কদর্য রুচি নিয়ে উপস্থিত হয়ে সুবর্ণকে অপমান করে তার পৌরুষের প্রতিষ্ঠা করেছে সদর্পে এবং সগর্বে। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে অম্বিকা বৌঠানের সঙ্গে দেখা করতে এলে গৃহিণীর অধিকারে সুবর্ণ তাকে স্বাধীনভাবে যথোচিত সম্ভাষণ জানাতে তো পারেইনি, স্বামী-পুত্রের হাতে অম্বিকার এবং নিজের অপমান সহ্য করেছে। একি সত্যবতীর কন্যা? মানতে কষ্ট হয়। তবে অম্বিকাকে করা প্রশ্নে সত্যবতী যেন কথা কয়ে উঠেছে—"কেন ব্যর্থতা জান ঠাকুরপো? তোমাদের সমাজের আধখানা অঙ্গ পাঁকে পোঁতা বলে। আধখানা অঙ্গ নিয়ে কে কবে এগোতে পারে বল? অখদ্যে অবদ্যে মেয়েমানুষ জাতটাকে যতদিন না শুধু মানুষ বলে স্বীকার করতে পারবে ততদিন তোমাদের মুক্তি নেই। মুক্তির আশা নেই। চাকরানিকে পাশে নিয়ে কী তোমরা রাজ সিংহাসনে বসবে?" (সু . ২৬৮)

শাশুড়ির অমতে এক আত্মীয়ার বাড়ি নিমন্ত্রণ রক্ষা করে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে ঘরের বাইরে রাত কাটাতে হয় সুবর্ণকে। মায়ের মতো কোনো দৃঢ় পদক্ষেপ তো নিতে পারেনি সুবর্ণ?

স্বামীর প্রথম মিথ্যায় বিচলিত সুবর্ণর মনে পড়েছিল আর-এক মিথ্যার কারণেই তাব মা সংসারত্যাগী। কিন্তু নিজে তো সেই মায়ের মেয়ের যোগ্য কোনো দৃষ্টান্ত রাখতে পারল না সে? আত্ম-বিশ্লেষণ করেছে এইভাবে—"তোমার মেয়ে মায়ে তাড়ানো বাপে খেদানো, তেজটা ফলাবে কোন পতাকা তলে দাঁড়িয়ে? ধিক্কার দিতে এসো না মা শুধু এইটুকু ভেবে।" সকলের জীবন তো সমান নয়। সবাইকে এক মাপকাঠিতে বিচার করা যায় না। যাকে বিচার করতে হবে আগে তার পরিবেশের দিকে তাকানো প্রযোজন বৈকি!

সত্যবতীর পিতা সত্যর জীবনের 'ধ্রুবতারা'। তার মেরুদণ্ডের শক্তি। কিন্তু সুবর্ণর পিতা? তার জীবনের শনি। আর প্রবল ব্যক্তিত্বময়ী মায়ের সান্নিধ্যবঞ্চিত সে নয় বছর বয়সে বিবাহ লগ্ন থেকে। কিন্তু সংসারের সব অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছে সে তার নিজস্ব নিয়মে। কোনো লাঞ্ছনা তার মাথা নত করতে সক্ষম হয়নি। এ ক্ষমতা তার উত্তরাধিকার সূত্রেই পাওয়া।

ধীরে ধীরে সুবর্ণ নিজেকে সংসারে অপ্রয়োজনীয় ভাবতে শুরু করে। সে বোঝে সংসারে তার মূল্যায়ন ঠিক হয়নি। শুধু একটা অভ্যাস-মলিন শয্যায় তার মূল্য ধার্য হয়েছে। এ তো নারীত্বের অপমান। কত প্রজন্ম থেকে নারীর অপমানের ধারা অব্যাহত। বদল শুধু মলাটে। যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট হয়েছে সে জীবনভর। যে-মেয়ে অজানা জগৎকে মনের মধ্যে পুরে নিতে চায়, অদেখা নীল সমুদ্রের হাতছানি শুনতে পায়, তার মূল্য বুঝবে কী করে প্রবোধের সমাজ?

জীবন সম্পর্কে তার মনের অপূর্ণ সাধ আশ্চর্যরকম ভাবে আস্বাদ করেছে সুবর্ণ ননদ সুবালার সংসারে। এই নতুন ভুবনে প্রবেশ করে সে দেখে, "এ ভুবনে শুধু আকাশেই উদার উন্মুক্ত আলো নেই, মানুষগুলোর মধ্যেও রয়েছে সেই আলো, উদার উন্মুক্ত উজ্জ্বল।" (সু: ১৫৪)

সুবালা-অমূল্যর দাম্পত্য সম্পর্ক, শ্বাশুড়ি-বৌ, দিদা নাতি-নাতনি, দেওর বৌদি—প্রতিটি সম্পর্কই এত মধুর, সুস্থ, সুন্দর বোঝাপড়ায় নিটোল, যে সুবর্ণ অভিভূত, মুগ্ধ প্রসন্ন হয়ে যায়। সে সুন্দর সুস্থ সম্পর্কের অভিলাষী কিন্তু তার চিত্র যে অমন তা তার অজানা ছিল।

সুবালাকে সবাই গরিব বলে। সুবর্ণ ভাবে—"সুবালা যদি গরিব, তো ঐশ্বর্যবতী কে? হোক আড়ম্বরহীন, টানাটানির সংসার। তবু এই সংসারখানির সম্রাজ্ঞী তো ওই সুবালা। এ সংসার পরিচালিত হচ্ছে সুবালার ইচ্ছানুসারে, সুবালার নির্দেশে।" (সু : ১৫৪)

এ-ও একটা সংসার, পরিবার আর সুবর্ণরও একটা সংসার।

সুবালার সংসার সুবালাকে অর্ঘ দিয়েছে, তার শিক্ষা তার বোধ-বুদ্ধির কাছে আত্ম-সমর্পণের অর্ঘ। তার ফলে সুবালার ঝুলিতে এসেছে "আদরিণীর সাহস, বিজয়িনীর সাহস, প্রশ্রয়ের সাহস।"

সুবর্ণলতাও তার দুঃসাহসের জন্য বিখ্যাত। "কিন্তু এ সাহসের সঙ্গে তুলনা হয়? সুবর্ণলতার সাহস হচ্ছে--তিক্ততার শেষ সীমায় পৌঁছে তীব্রতায় ফেটে পড়া।" (সু · ১৫৫) এই সাহস তো স্বাধীনতা আনে না? পরাধীনতার শৃঙ্খল-যন্ত্রণা মনে পড়িয়ে দিতে থাকে বারবার।

"মেয়েমানুষ'কে শাসনে না রাখলেই সে মাথায় ওঠে"—এ জীবনদর্শন তার শ্বশুর বাড়ির। "সুবর্ণর বাবা-মার সংসারে এটা ছিল না।"

কিন্তু প্রবোধ সুবর্ণলতার বশ্যতা স্বীকার করে। একটু বেশি রকমই করে। কিন্তু সে আনুগত্যে সম্মান নেই তো? সুবর্ণলতা যদি প্রবোধের স্তরের হত তবে "তার মনের মতো হতে পারত।" সে যদি "কৃপণ হত, যদি সংকীর্ণচিত্ত হত, যদি স্বার্থপর হত, যদি স্বামীর কাছে মধুময়ী এবং অন্যের কাছে মুখরা হত, হয়তো সে বশ্যতা স্থায়ী হত।" (সু · ১৫৬) তবু তার স্বামী স্ত্রৈণ। সাধারণ নারীর যা গর্বের আব সুবর্ণর যা বিরক্তির কারণ।

কিন্তু অমূল্য সুবালার 'বশ' হয়েও তো স্ত্রৈণ নয়! স্ত্রীর প্রতি শ্রদ্ধা, সম্ভ্রম ও ভালোবাসায় তার মন পরিপূর্ণ। এই মর্যাদাপূর্ণ স্বীকৃতি সুবর্ণ তার স্বামীর থেকেও আশা কবেছিল। কিন্তু 'সম্ভ্রম' কথাটার অর্থ তার পরিবারের অজানা, যা 'গরিব' সুবালার সংসারের মূলধন। তার সংসারে অনটন আছে কিন্তু এ সংসার কোনো 'জ্বালায়' জ্বলতে জানে না। বরং ভয়ংকর সত্য কঠোর সত্য নিয়ে 'জ্বালার' গল্প রচিত হয় এ সংসারে। কৌতুককর গল্প।

ঈপ্সিত জীবনের সার্থক রূপায়ণ প্রত্যক্ষ করে মন ভরে ওঠে সুবর্ণর। যাক সব মেয়েরই হতশ্রী অপমানকর আসন নয় এ সংসারে। নিজের সংসারে তার বুদ্ধি বিবেচনা বারবার তিরস্কৃত, অবহেলিত—এই তো দেখে এসেছে বরাবর। তাই মন্ খুশিতে ভরে উঠলেও সুবালার সংসার তার মনে কোথায় একটা চিন্‌চিনে ব্যথার জন্ম দেয়। মানবধর্মের স্বাভাবিক নিয়ম মেনেই।

'দেওর ভাজ'-এর অনাবিল প্রীতির সম্পর্ক সুবর্ণর মনের 'ভুবন' অনাস্বাদিত মাধুর্যে পরিপূর্ণ করেছে। সে জানে—"দেবররা ভ্রাতৃজায়াদের ব্যাখ্যান করবে, এটাই তো মুক্তকেশীর বাড়ির নীতি। তারা ব্যঙ্গ করবে, হূল ফোটাবে নিন্দে করবে, এই তো নিয়ম।" (সু : ২৫৭) এ নিয়ম শুধু মুক্তকেশীর সংসারেই সীমাবদ্ধ কি? আজকের সংসারের জীবনচিত্র কী বলে? তবে এটা ঠিক এ সংসারে সুবর্ণরা খাপ খায় না। আর সংসারও সেটা মেনে নিতে পারে না। তাই "পরাধীনতার যন্ত্রণা আমরা মেয়েমানুষরা বুঝবো না তো আর কে বুঝবে? আমরা যে চাকরেরও চাকরানি।" (সু) এই মানসিক দাসীবৃত্তি ঘোচাতে ব্যাকুল সুবর্ণ, মাটি কেটে পাথর ভেঙে 'জয়রথ' চলার উপযুক্ত পথ তৈরি করতে প্রস্তুত। মা-ই অলক্ষ্যে তার অভিনব কর্মময় জীবনের চালিকা শক্তি।

সুবালার সংসারে এসে সুবর্ণ নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করেছে। কেবল লাঞ্ছনা, অবজ্ঞাই নয় তার "জন্যেও পৃথিবীতে শ্রদ্ধা আছে, প্রীতি আছে, নির্মল ভালোবাসার স্পর্শ আছে। ... তবে পৃথিবীর উপর একেবারে বিশ্বাস হারাবে কেন সুবর্ণ?" (সু: ১৯৩) মনের কোনে আশার আলো জ্বলতে থাকে তার। সন্তানদের মানুষের মতো গড়ে তোলার আলো, যারা পৃথিবীর উপর ফিরিয়ে আনবে বিশ্বাস, জাগিয়ে তুলবে আশা জগতের মনে মনে।

কিন্তু দেখা গেছে সারা জীবন আশার আলো জ্বলে ওঠার পরেই প্রবল ঝড়ের দাপটে গেছে নিবে। তমসাচ্ছন্ন তার জীবন। ঘটনাপ্রবাহের উত্থান-পতনে সুবর্ণর সংসার-তরণি নিমজ্জিত-প্রায়। "কিন্তু বাঙালি মধ্যবিত্ত ঘরের মানুষগুলোর মতো এমন মজবুত জীব অল্প-ই আছে। এরা জলে ডোবে না, আগুনে পোড়ে না, খাঁড়ায় কাটে না। মনে হয় 'গেল গেল সব গেল—আবার দেখা যায় কই কিছু-ই হল না।" তাই সহজে শেষ হয় না নিবে যাওয়া বাড়িতে বারবার আলো জ্বালানোর চেষ্টা।

বিবাহিত জীবনের পুঞ্জীভূত সমস্ত প্রশ্ন আর অবরুদ্ধ নারীসমাজের নিরুদ্ধ প্রশ্নকে উন্মত্তের মতো প্রকাশ করতে চেয়েছে সুবর্ণ দেয়ালে ঠাঁই ঠাঁই মাথা ঠুকে—"কেন তোমরা সবাই মিলে আমাকে অপমান করবে? কেন? কেন? কেন?" (সু ৮৩)। এ অপমান কি একা সুবর্ণলতার? এ যন্ত্রণা বাঙালির প্রতিটি সুবর্ণলতার যারা জ্ঞান হওয়া অবধি শিখে এসেছে বুক ফাটবে কিন্তু মুখ ফুটবে না। আর এরই সুযোগ নিয়ে এসেছে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নিশ্চিন্তে। সংসারে মেয়ে নামক জীবগুলির মনে কোনো প্রশ্নই জাগে না। যদি জাগার সম্ভাবনাও থাকে সে-প্রশ্নের টুঁটি চেপে ধরাটা অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু সত্যবতীর মেয়ে মায়ের চাওয়াকে রূপ দিতে চায়। তার কণ্ঠরোধ করে কার সাধ্য? সে জানিয়েছে, "মা তুমি যা চেয়েছিলে তোমার সুবর্ণ তা-ই হয়েছে। তবে প্রায় তোমার-ই মতো জীবন তার। শুধু তফাৎ এই, তুমি সংসারকে ত্যাগ করেছো, আর সংসার সুবর্ণকে ত্যাগ করেছে।" (সু : ৭৬) স্বভাবের দিক দিয়ে সুবর্ণলতা মায়েরও ওপর দিয়ে গিয়েছিল। সংসার তাকে সইবে কেমন করে? তাই কেউ তার অন্তরাত্মার গভীর আর্তি শুনতে পায়নি। উপলব্ধি করেনি তার আত্ম-মর্যাদার প্রখর তেজ-দৃপ্ততা।

মানসিক স্বাধীনতা আর মুক্তির নেশায় সত্যবতী অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চলার স্বপ্নে বিভোর ছিল। কৃপণ বিধাতা ঘা মেরে তাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন নিজের ক্ষমতা বুঝে পা

ফেলো। তখন সত্য ভেবেছে ";আমি পাইনি কিন্তু আমার মেয়ের জন্য মুঠোয় ভরে আহরণ করে নেব সেই আলো। আর সেই আলোর সাজে সাজিয়ে তাকে পাঠিয়ে দেব ওই রাজপথে, যেখান দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে আর এক পৃথিবীর মেয়েরা।" (সু : ১১১)।

কিন্তু তার আশা সমূলে উৎপাটিত। মেয়ের রাজপথে আলো জ্বলেনি। অন্ধকার পথে নয় বছরের বালিকাকে অসহায়ভাবে ছেড়ে পালিয়ে গেছে স্বপ্নভঙ্গের হতাশায়। আহত স্তব্ধ সত্যবতী।

"ইচ্ছায় অনিচ্ছায় প্রতারকের প্রতারণায়, অহঙ্কারীর নির্লজ্জ মত্ততায়, যে-কোনো ঘটনায় ঘটিত বিয়েও চিরস্থায়িত্ব পাবে কেন?" বাকি জীবনটা সত্য এই প্রশ্নের উত্তর হাতড়ে বেড়ালেও সুবর্ণর পথ প্রশস্ত হল কই? শিকল ভেঙে বেরিয়ে নিজের পথ তো তাকে নিজেই তৈরি করতে পথে নামতে হয়েছে। বিধাতার আঘাত, ব্যঙ্গকে সঙ্গী করে "আলোর মন্দিরের টিকিট" কাটার চেষ্টা করতে হয়েছে। তাহলে কোথায সত্যবতীর স্বপ্নের স্বাধীনতা যা পরবর্তী প্রজন্মকে দিতে চেয়েছিল? সত্যবতীর লড়াই সুবর্ণলতার সংগ্রামের রূপ নিয়েছে। পাবে কি পথ? জানে না সুবর্ণ, পথের শেষ কোথায়? কী-ই বা আছে পথের শেষে?

সুবর্ণর ভাবনা প্রবোধের মনের বাইরের দরজাতেই আছাড় খায়। তাই প্রবোধ ভাবে—"সত্যি বাড়ির সমস্ত স্ত্রী লোকগুলোকে বুঝতে পারা যায়, পারা যায় না শুধু নিজের স্ত্রীকে। একি কম যন্ত্রণা।" (সু:)

"মেয়েমানুষ পরচর্চা করবে, কোঁদল করবে, ছেলে ঠেঙাবে, ভাত রাঁধবে, আর হাঁটু মুড়ে বসে এক কাঁসি চচ্চড়ি দিয়ে এক গামলা ভাত খাবে। এই তো জানা কথা। কিন্তু প্রবোধের ভাগ্যে সবই উলটো।" (সু : ১১২)

সেটাই তো স্বাভাবিক। কারণ জাগতিক চাওয়াটাই জীবনের খুশির প্রধান কারণ হলে সুবর্ণ অবশ্যই খুশি মানুষদের একজন। কিন্তু ওর মুখেই তো শুনি—"খুশি? কি জানি জিনিসটার আস্বাদ তো জানলাম না একাল অবধি?" (সু : ১৮৭)।

সে জানবে কেমন করে? মানবধর্মের যে-উপলব্ধি তার মনে—তাকে তো সাংসারিক হিসেবনিকেশে পাওয়া যায় না। তার কাছে মর্যাদা, স্বাধীনতা, উদারতা অনেক বেশি মূল্যবান। বোঝাতে পারে না সে এ-কথা মুক্তকেশীর সংসারের সদস্যদের। তাই প্রতি কথায়, ভাবনায়-আচরণে লাঞ্ছনা-অবমাননার পুরস্কার লাভ করে "পনেরো বছর বয়স থেকে মরণ কামনা করতে করতে মূল্যহীন বেঁচে থাকার ঘৃণা থেকে মুক্তি চেয়েছে বার বার আত্ম হননের পথ ধরে। আশ্চর্য।" (সুবর্ণলতা) প্রতিবারই শেষ রক্ষা হয়নি। তার সমসাময়িক নারীকুলের জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা বা হতাশা প্রকাশের অভিব্যক্তি তো এ নয়। কারণ নিজেদের তুচ্ছতাকে স্বীকার করে অন্ধকারে বেঁচে থাকতেই তারা অভ্যস্ত। তাই সকলের সমালোচনার পাত্রী সুবর্ণকে এক হাত নিতে পারার চেষ্টায় সবাই তৎপর। পরিণত বয়সে বহুকাঙ্ক্ষিত দক্ষিণের বারান্দা ঘেরা গোলাপি বাড়ির কর্ত্রী সুবর্ণ। সন্তানদের নিজের আদর্শে গড়বে বলে দর্জিপাড়ার সংকীর্ণ ছায়া থেকে তাদের দূরে সরিয়ে আনতে চেয়েছিল। সুবর্ণর বাসনা ছিল, "স্বামী সন্তানদের নিয়ে নিজের ইচ্ছেমতো সংসার গড়ে তোলবার" (সু· ২৩০) স্বামী-পুত্র বারান্দাওয়ালা সুরুচিপূর্ণ বাড়ি— সুবর্ণর আর তো কোনো নালিশের জায়গা নেই জীবনের

কাছে?

কিন্তু সন্তানদের সে মনের মতো মানুষ করতে পেরেছে কি? তার 'ছেলের গায়ে পালিশ পড়েছে'। অহং করার মতো বিকৃত পৌরুষের শিকার হয়েছে সে। মাকে 'মেয়েমানুষে'র বাইরে কিছু বোঝার উপলব্ধি জাগেনি। সত্যবতীও তার সন্তানদের মনে নিজের আদর্শ পৌঁছে দিতে পারেনি। পায়নি তাদের সমর্থন। সে তো কলকাতায় নিজের সংসারেই মানুষ করেছে তাদের। কিন্তু প্রতিটি কাজে স্বামীর সঙ্গে ঘটেছে মনোমালিন্য। তার ব্যক্তিত্ব ও দৃঢ় সংকল্পের মনোভাব নানা কাজে তাকে জয়ী করলেও সংসারের মনে জয়ের আসন সে পাততে পারল কই?

সন্তানদের পছন্দ মতো গড়ে তুলতে সুবর্ণলতাও ব্যর্থ। অথচ মাতৃকর্তব্যের দায়ের কাছে নিজের সর্বশক্তি বিকিয়েছিল। কিন্তু তার উপযুক্ত ছেলেদের কথার অক্ষরে অক্ষরে ঝরে পড়া মুঠো মুঠো অবজ্ঞা তার স্বপ্ন ভঙ্গ করেছে। কন্যা চাঁপা অনায়াসে 'মাটাকে' 'বেহায়া' বলতে পারে। "এদের সম্পর্কে নালিশের কোনো পথ নেই। এরা সুবর্ণলতার ইচ্ছানুরূপ শিক্ষিত হয়েছে. সভ্য হয়েছে, চৌকশ হয়েছে। সুবর্ণলতার জীবনের প্রত্যেকটি অণুপরমাণুর ধ্বংসের মূল্যে যে সম্পদ সঞ্চয় করেছে সুবর্ণলতার ছেলেরা, সেই সম্পদের অহংকারেই তারা অহরহ সুবর্ণলতাকে অবজ্ঞা করছে।" হয়তো সব ক্ষেত্রেই এমন হয়, "বোধ জন্মালেই 'ঋণ বোধ'ও জন্মায় আর সেই ঋণবোধের দাহ-ই ফণা তুলে থাকে ছোবল হানতে।" (সু : ২৩২)। এই তো স্বপ্নের সংসারের কাছে সুবর্ণর প্রাপ্তি। তবু শেষ অবলম্বন পারুল-বকুলকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছে সে। প্রাপ্তি ঘটেছে বাধা, বিদ্রূপ, অসহযোগিতা। কিন্তু তার সন্তানদের দোষও দেওয়া যায় না। কারণ "মুক্তকেশীর মুক্ত বেড়া কেটে বিরাট পরিবারের মধ্যে থেকে সুবর্ণলতা তাদের শুধু উদ্ধার করেই এনেছে, 'আশ্রয়' দিতে পারেনি।" (সু : ২৩২) "তাদের সদ্য-উন্মোচিত জ্ঞানচক্ষুর সামনে অহরহ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে মা-বাপের দাম্পত্য লীলার যুদ্ধ আর সন্ধির বহু কলঙ্কিত অধ্যায়। তারা জানে তারা সুবর্ণলতার স্বপ্ন সাধনার বস্তু নয়, যুদ্ধের হাতিয়ার মাত্র।" (সু · ২৩৩)। তরুণ বয়সে মায়ের মধুর আশার স্বপ্নের সন্ধান তারা পায়নি। 'দক্ষিণের বারান্দালোভী স্বপ্নাতুর' মাকে তারা দেখেনি। জানেনি কখনো তাদের মায়ের মধ্যে বস্তু ছিল। স্বপ্ন ছিল মানুষের মতো মানুষ হয়ে বাঁচার। রঙিন কোমল ঝলমলে মন ছিল তার। মায়ের সভ্যতা, ভব্যতা, সৌকুমার্য ক্ষয় হয়ে গেছে নয় বছর বয়স থেকে যুদ্ধের রসদ জোগাতে জোগাতে। তাই সুবর্ণকে বোঝার কেউ চেষ্টাই করেনি। বাইরের ঘটনা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ঘৃণা করেছে, বিদ্রূপ করেছে তাকে। অসহিষ্ণু হয়েছে তার প্রতি।

জীবনে নোংরামি আর কুশ্রীতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে করতে সুকুমার বৃত্তিগুলি হারিয়ে কখন যে নিজেই নোংরা আর কুশ্রী হয়ে গেছে, টেরই পায়নি সুবর্ণ। তারই পরিণাম সন্তানদের অবজ্ঞা। তবু সুবর্ণলতা "আপসহীন সংগ্রামের নায়িকা।" কিন্তু প্রশ্ন হল—মর্যাদাপূর্ণ জীবনের জন্য সংগ্রাম করে তার পাওনাটা কী হল?

এর উত্তর তার জীবদ্দশায় মেলেনি।

শিক্ষার আলো, মুক্ত বাতাস, মেয়েদের সম্মানযুক্ত আশ্রয়—এসবের জন্য সংগ্রামের

মর্যাদা পরে উপলব্ধি করেছে কনিষ্ঠা কন্যা বকুল। মায়ের প্রখর দৃষ্টির অধিকারিণী সে। সুবর্ণর তীব্র আত্মমর্যাদাবোধ বর্তেছে পারুলে। যে বাবা-মায়ের প্রতি কোনো কর্তব্য করার সুযোগ পায়নি সুবর্ণ, তাঁদের মৃত্যুর পর বুকের অব্যক্ত যন্ত্রণা যখন চোখের অঝোর ধারায় রূপ পেয়ে ঝরে পড়েছিল, চমৎকৃত পারুল প্রথম সেদিন মাকে নিয়ে নতুন করে ভাবতে বসেছিল। পরিচয় পেয়েছিল মায়ের হৃদয়ের কোমল দিকটির, তীব্রতার রুক্ষতার আড়ালে। বুঝেছিল মায়ের উপর তারা এত দিন অবিচারই করে এসেছে।

কবিরা যেমনটি ভাবেন তেমনি মধুর সুকোমল ভালো লাগায় নিজেকে ভরিয়ে তুলতে ইচ্ছে হত সুবর্ণলতার। বকুলের স্বপ্নিল আকাশের খবর পেয়ে নিজের অপূর্ণ সাধ ভালোবাসার রঙে ভরিয়ে দিতে চেয়েছিল সে। এখানেও সাফল্যবঞ্চিত সুবর্ণ।

জীবনের প্রতিটি স্তরে ব্যর্থতার ইতিহাসকে সঙ্গী করে কোন স্বাধীনতার স্বপ্নপূরণ ঘটল তার? মা সত্যবতীর যার প্রত্যাশা ছিল?

সত্যবতী ঠিকই বুঝেছিল—স্বামী-সন্তান নিয়ে সচ্ছল পরিবার দেখে সুবর্ণকে আপাত সুখী মনে হলেও, প্রকৃত সত্য তা নয়। কারণ সুখের যে-সংজ্ঞা সত্যবতী জানে তার উপযুক্ত করে না-পেরেছে সুবর্ণকে গড়তে, না-পেরেছে সমাজকে তৈরি করতে।

কিন্তু তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল সুবর্ণ ভেঙে পড়তে পারে না। সমস্ত প্রতিকূলতার সম্মুখীন হবার শক্তিতে সে পূর্ণ। কারণ মায়ের কঠিন ধাতুতেই সে গড়া।

সুবর্ণর নির্মল হৃদয়, ব্যক্তিত্বময় উপস্থিতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসাও জুগিয়েছে। সুবালার পরিবারের সদস্যরা ছাড়াও সখী জয়াবতী, বড় ননদ সুশীলা, তার স্বামী কেদার, মামাতো ভাসুর জগু, তার মা শ্যামাসুন্দরী, ভাসুর সুবোধ প্রভৃতি এরা প্রত্যেকে সুবর্ণর জীবনকে সম্ভ্রম ও প্রীতির ঐশ্বর্যে ভরিয়ে তুলেছে।

নিজের সংসারে একটু স্বীকৃতি একটু মর্যাদার জন্য তৃষ্ণার্ত সুবর্ণ, পরিণত বয়সে একটি অপ্রত্যাশিত স্বীকৃতি পেয়েছে। ঊনআশি বছরের তীক্ষ্ণ তীব্র খোলা চোখ দুটো চিরদিনের জন্য 'ছুটি' পাবার আগে "মুক্তকেশীর চোখ দিয়ে আবার দু ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো। চেয়ে রইলেন সুবর্ণলতার মুখের দিকে। তারপর আস্তে আস্তে ডান হাতটা তুললেন, সুবর্ণলতার মাথা অবধি উঠল না হাতটা, স্খলিত হয়ে পড়ে গেল তারই কোলের ওপর...চোখটা বুজে গেল।" (সু : ২৯১)। ছুটি নেবার আগে মুক্তকেশীর ঝরে পড়া অশ্রু-বিন্দু, আশীর্বাদ আর ক্ষমা প্রার্থনায় অভিষিক্ত করে ধন্য করে গেল সুবর্ণকে। এই দুর্লভ স্বীকৃতি সুবর্ণর লাঞ্ছিত জীবনের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল অংশ, অমূল্য সম্পদ নিশ্চয়ই। এখানেই সুবর্ণর পথ কাটার সার্থকতার সূচনা। সুবর্ণর মৃত্যুর পরে বাইরের লোকে তো বটেই তার শ্বশুরবাড়ির মানুষজনেরাও তার প্রতি সম্ভ্রম প্রকাশ করেছিল। শ্রদ্ধা করেছিল তার অনন্য চরিত্র ও প্রাণশক্তিকে। এ ঘটনা পরবর্তী প্রজন্মের পক্ষে প্রত্যাশার ইঙ্গিতবাহী নয় কি?

একটা শিশুকে ধরে জোর করে বিয়ে দিয়ে দিলে আর একটি বালিকাকে ধরে জোর করে মা করে দিলেই তার মনের দরজা বন্ধ হয়ে যেতে বাধ্য—এ কথা বুঝেও নিজের সন্তানদের পছন্দমতো বিবাহ দিতে পারেনি সুবর্ণ। কিন্তু তার সংস্কারমুক্ত মনের ভাবনা রূপ লাভ করেছে আবার সুবালারই সংসার-জীবন পরিচালনায়। সে বিবাহযোগ্যা কন্যাদের 'গলায়

পাথর বেঁধে পুকুরে ফেলে দেবার প্রথাগত' রীতিকে অস্বীকার করেছে। সচ্ছল, পছন্দসই অকুলীন পরিবারে কন্যাদের পাত্রস্থ করে তাদের সুখী করেছে। সমাজে 'একঘরে' হওয়ার সিদ্ধান্তকে পরোয়া না-করার দৃঢ়তা রাখে সে। সত্যবতীর স্বাধীন ভাবনার মূর্ত রূপ সুবালার সংসার-কাহিনিকে ঘিরে স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

সুবর্ণ মায়ের কাছে ভরসা পেয়েছিল—"মহাকাল-ই পুরুষ জাতিকে এ শিক্ষা দিবে যে," "মেয়েমানুষও মানুষ! বিধাতা তাহাদেরও সেই মানুষের অধিকার ও কর্মদক্ষতা দিয়াই পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন। এক পক্ষের সুবিধা সম্পাদনের জন্যই তাহাদের সৃষ্টি নয়।" (সু : ২৭৬)। তবে তারই সঙ্গে মেয়েদেরও ধৈর্য, সহ্য, ত্যাগ ও ক্ষমার তপস্যায় উত্তীর্ণ হতে হবে। তার মতো সুবর্ণলতাও সহস্র মেয়েদের কথা চিন্তা করবে, তাদের সম্মান, স্বাধীনতা ও অধিকারের জন্য ক্ষুধার্ত হয়ে থাকবে তার মন—এমনটাই বাসনা পোষণ করত সত্যবতী। অপূর্ণ হয়নি তার মনোবাঞ্ছা। সুবর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী করেছে, "পতি পরম গুরুর মন্তর চিরদিন আর চলবে না।" আর বলেছে "প্রায়শ্চিত্ত কবতে হবে। অত্যাচার অবিচার এর মাপ হয় না।" (সু : ১৩৬) নিজের স্বামী সম্পর্কে ভাবতে গিয়ে ছটফটিয়ে উঠেছে, "ওর সঙ্গে এক বিন্দু মিল নেই আমার, তবু চিরদিন ওর সঙ্গে ঘর করতে হবে আমায়?" (সু · ৩০৬)

মায়ের মতোই ব্যাকুল জিজ্ঞাসা তাকে অস্থির করেছে অহবহ—"কবে অহঙ্কারী পুরুষ সমাজ খোলা গলায় স্বীকার করতে পারবে, তুমি আর আমি দুজনেই ঈশ্বর সৃষ্ট। তুমি আব আমি দুজনেই সমান প্রয়োজনীয়?" (সু · ২২৬)

নিজের অধিকারবোধ ও স্বীকৃতি-র আকাঙ্ক্ষায় গৃহ ছেড়েছে Doll's House-এর Nora, রুচি ও ব্যক্তিত্বের সংঘাত দূরত্ব এনেছে যোগাযোগের কুমুদিনী আর মধুসূদনের জীবনে। রবীন্দ্রনাথের একাধিক ছোটগল্পে দেখা গেছে নারী তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের, স্বকীয়তার স্বীকৃতি প্রকাশ্যে পাচ্ছে না, বরং ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে তার স্বাধীনতা খর্ব করাই স্বাভাবিক আচরণ রূপে গণ্য হয়েছে। তাই নারীকে স্বাধিকার অর্জন করতে হচ্ছে স্বামীকে অন্ধকারে রেখে। কখনও নারী নিজেই নিজের ক্ষমতা প্রকাশে লজ্জিত হয়ে পড়েছে। ল্যাবরেটরির নন্দকিশোর অসবর্ণ বিবাহ পছন্দ করেননি। তার মতে, "স্বামী হবে এঞ্জিনিয়র আর স্ত্রী হবে কোনটা-কুটনি, এটা মানব ধর্ম শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। ঘরে ঘরে দেখতে পাই দুই আলাদা আলাদা জাতে গাঁটছড়া' বাঁধা, ...পতিব্রতা স্ত্রী চাও যদি, আগে ব্রতের মিল করাও" (গল্পগুচ্ছ-অখণ্ড- ৬৯৬)। পুরুষেরা যেদিন ব্রতের মিল দিয়ে নারীর জাত মেলাতে পারবে সেই দিনই পাবে যোগ্য সঙ্গিনী। সত্যবতী, সুবর্ণদের স্বপ্নপূরণ হবে। কিন্তু নারী ও পুরুষের 'আলাদা জাতের গাঁট ছড়া' আজও খুব নতুন কথা নয়। পিছনে তাকালে দেখা যায় পুরোনো ধারা আজও বহমান নতুন মলাটের আড়ালে।

এই ধারা বদলে দিয়ে সুবর্ণদের নতুন ভুবন এনে দেওয়ার প্রতিজ্ঞা ছিল সত্যবতীর। তার অসমাপ্ত কাজের দায়িত্ব সুবর্ণলতায় বর্তেছিল। কিন্তু সারা জীবনের হাজারো প্রশ্ন সামনে রেখে পরবর্তী প্রজন্মকে উত্তর খোঁজার ভার নিজের অলক্ষ্যে সমর্পণ করে যায় সুবর্ণ। বকুল-পারুলরা সেই গুরুভার বহনে সক্ষম কি? 'বকুলকথা'ই সে-উত্তর দিতে পারে।

চার

সত্যবতী ও সুবর্ণলতার চরিত্র আপন আপন স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। কিন্তু তেজস্বিতা তীব্রতা সর্বোপরি অন্যায় বা অসঙ্গতির বিরুদ্ধে লড়াকু বা সংগ্রামী মনোভাবে উভয়ের সাদৃশ্য বিদ্যমান। তবে উক্ত মনোভাবের প্রকৃতি ও তার প্রকাশে অবশ্য নয়। জীবনের রঙ্গমঞ্চে তাদের ভূমিকা নজর-কাড়া রূপে সক্রিয়। তাদেরই বংশধর বকুল। বহু সন্তানবতী সুবর্ণলতার শেষ পর্যায়ের সন্তান। মাতা ও মাতামহীর উপলব্ধির প্রতিটি স্তরের তীব্রতা ও তীক্ষ্ণতাকে আত্মস্থ করে সুস্নিগ্ধ প্রশান্তিতে নিজেকে মেলে ধরেছে জীবনের পাতায়। যে-কোনো প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে তার পূর্বসূরিদের পদ্ধতি গ্রহণ করেনি। ধীর স্থিরভাবে ধৈর্যের সঙ্গে সহ্যশক্তি দিয়ে সত্যের অটল অবিচল অবস্থায় নিজেকে দৃঢ় রেখেছে। ছেলেবেলা থেকেই নিজেকে তুচ্ছ ও অবাঞ্ছিত ভাবার ফলে জীবনের কোনো মোড়েই কারো কাছ থেকে কোনো কিছুর প্রত্যাশী নয় সে। সে জানে ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা তার জন্য নয়। তাই মনের কোমলস্নিগ্ধ অনুভূতিকে নিভৃতে লালন করে জগতে নিজেকে উপেক্ষিতের খাতায় রেখেই সন্তুষ্ট থেকেছে। কিন্তু তার মন ছিল সদা জাগরুক। বাস্তব জগৎ তার প্রতিটি অণু-পরমাণু নিয়ে বকুলের চারপাশকে মগ্ন রেখেছে সদা-সর্বদা। তাই সংবেদনশীল অথচ আত্মস্থ বকুলের নবজন্ম লাভ অনামিকা দেবীতে। নতুন মোড়কে তার যুগের উপলব্ধিকে নির্লিপ্ত দর্শকের ভূমিকায় প্রকাশ করেছে। সেই সদা সঙ্কুচিত, কুণ্ঠিত, ভীরু বকুলের খোলস খসে পড়ে সম্পূর্ণ এক স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের প্রকাশ অনামিকা দেবীতে। বকুলের মোহ, বিশ্বাস ও প্রত্যাশার সঙ্গে সুবর্ণলতার দৃঢ়তা ও আত্মগরিমা মিশে অনামিকা দেবীর সৃষ্টি। জীবনের বিভিন্ন ঘটনার চাপে বকুলের কোমলতা দলিত। তাই অনামিকা দেবী আবেগ জিনিসটাকে তুচ্ছতার সঙ্গে হাস্যকর ভাবতে শিখেছেন। যদিও তার সৌকুমার্যের সুষমাটুকু হৃদয়ে সযত্নে লালিত। নইলে অভিজ্ঞতার জগৎ বর্ণহীন হয়ে পড়বে যে! মেয়েদের স্বাধীনতা আর জগতের আধুনিকতার চেহারা ধরা পড়েছে তার কলমে। যুগ তার শিক্ষা-সভ্যতা নিয়ে উপস্থিত বকুলের কথনে। সত্যবতীর বাসনা ছিল মেয়েরা শিক্ষিত হোক। সুবর্ণলতারও তাই। সত্যবতী বালিকা বয়সে খেলার ছলে ছড়া বেঁধেছে, পয়ারও। স্বীয় প্রযত্নে ইংরেজি বাংলা শিখে পিছিয়ে পড়া নারীজাতিকে এগিয়ে যাওয়ার পথ দেখিয়েছে।

সুবর্ণলতা নিঃসঙ্গ মনে জীবনের অভিজ্ঞতা-উপলব্ধি-অনুভূতিকে রূপ দিতে চেয়েছে ছাপার অক্ষরে। উভয় নারীই নিজের সন্তানদের সুশিক্ষিত করে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছে। কিন্তু তাদের ব্যক্তিগত প্রত্যাশা অপূর্ণই থেকেছে—বেদনাময় ইতিহাস তার সাক্ষী। বকুলের যুগে নারী-শিক্ষার বিচিত্র চেহারা সামনে এসেছে। কিন্তু পূর্বসূরিদের অপূর্ণতা মূর্ত হয়েছে নবজন্ম রূপী বকুলের কলমে। অনামিকা দেবীর জনপ্রিয়তায়, প্রতিষ্ঠায়।

পূর্বের গ্রামীণ সমাজ আর নেই। নেই শহর জীবনের সেই দেওয়াল-মোড়া সমাজ। ফলে সে-সব সমস্যাও নেই আর। যুগ বদলের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের জীবনের সেই অসহায় অবস্থারও অবসান ঘটেছে। লৌহ যবনিকার অন্তরাল থেকে বেরিয়ে পড়ে আজ জলে-স্থলে-অন্তরিক্ষে বিজয় পতাকা উড়িয়ে বেড়াচ্ছে তারা। কিন্তু মেয়েদের জীবনের সমস্যার অবসান সত্যিই কি ঘটেছে? আইনগত বাহ্যিক স্বীকৃতির সঙ্গে সঙ্গে মর্যাদাপূর্ণ

আন্তরিক স্বীকৃতি ঘটেছে কি? উন্নতি হয়েছে তাদের অবস্থার?

অনামিকা দেবীর দেখা যুগের মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গে সাইকেলে বিশ্বভ্রমণে যাচ্ছে। 'সিনেমায়' নামে, কিংবা ম্যাজিসিয়ান অধিকারী'র দলে 'ভর্তি' হওয়ায় মেয়েদের সম্মান ক্ষুণ্ণ হয় না। কারণ অভিভাবকদের মত—"শুনতে খারাপের কথা বলছ? ...ওসব কথা আজকাল আছে নাকি?" (পৃ. ৩৯৭)। যুগ বদলেছে। এ যুগে 'নিন্দের' বলে কিছু নেই। অথচ সুবর্ণলতা, বকুলরা নিন্দার আঘাতে জর্জরিত হয়েছে তাদের যুগে।

স্বাধীনতা হঠাৎ পেলে মানুষ অতি-আধুনিক হয়ে বাঁধন-ছেঁড়া আচরণকেই মুক্তিলাভ মনে করে। সুরুচি সৌজন্যের ওপরও যে জগৎ দাঁড়িয়ে, মনেই থাকে না। তাই অনামিকা দেবীকে শুনতে হয়—"খুব নাকি সংস্কার মুক্ত তুমি? ...জীবিকার জন্যে মানুষকে কত কীই করতে হয়। 'পছন্দ নয়' বলে কী আর বসে থাকলে চলে? ..." (বকুলকথা-৩৯৮)

বেঁচে থাকার সংগ্রাম মানুষের মূল্যবোধকেই দিয়েছে বদলে। বকুলের রক্ষণশীল পরিবারের অতি আধুনিক নাতনি সত্যভামা (মহাভারতের নামকরণই সে-যুগের লেটেস্ট ফ্যাশন)। "খুবই নাক উঁচু। ফ্যাশনি। মানুষকে যেন মানুষ বলে গন্যই করে না।" (ব : ক: ১৫৪)। 'পচিয়ে মেয়ে' হয়ে গড়ে ওঠাটা তাদের যুগে 'মানুষে'র মতো 'মানুষ' হওয়া। তাই সত্যভামা 'ক্যাবারে নাচিয়ে'। এই পেশায় অতি আধুনিকতার উচ্চাসনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত পেয়ে সে গর্বিত। 'নির্বোধ' আর 'আধুনিকতার বিকারগ্রস্ত' তার মা-ও তৃপ্ত। সত্যবতী কি 'মেয়েমানুষে'র এমনই 'মানুষ' পরিণতি কামনা করেছিল?

যে বড়দার কঠোর অনুশাসনে পাশের বাড়ির ছায়া মাড়ালেও (আর কোনো যাবার জায়গাও ছিল না) প্রশ্নবাণে জর্জরিত হতে হত বকুল-পারুলকে, সেই দাদার আঠারো বছরের নাতনি সত্যভামা 'গায়ে সাঁটা' জামা পরে, মুখে রঙ মেখে "তার বয়ফ্রেন্ডদের সঙ্গে পিকনিক করতে" অনায়াসে যেতে পারে "দীঘায়, পুরীতে, রাঁচিতে, কোলাঘাটে, নেতারহাটে।" (ব: ক: ১২৩)

যুগের বদলের ফলে "এদের হাতে যথেচ্ছ বিহারের ছাড়পত্র। এদের হাতে সব দরজার চাবি, সব জগতের টিকিট। এরা ভাবতেও পারে না সুবর্ণলতা কত শক্ত দেওয়ালের মধ্যে আটকা থেকেছে। আর বকুলকে কতো দেওয়াল ভাঙতে হয়েছে, কতো ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়ে।" (ব: ক: ১২৩)।

অনায়াসে ছাড়পত্র পেয়ে তার যথেচ্ছ ব্যবহার করছে তারা। এযুগের ছেলে-মেয়েদের সাজসজ্জা আচার-আচরণ সবই অভব্য, অশালীন। আর এটাই তাদের আধুনিকতার, প্রগতিশীলতার, স্বাধীনতার মাপকাঠি। এরা ফ্যাশনের মোহে আকৃষ্ট। বোঝেই না "ফ্যাশনের শিকার হয়ে মেয়ে জাতটা কত হাস্যাস্পদই হয়।" (ব: ক: ৭৪)। "বকুলের মা একদা বিধাতার কাছে মাথা কুটে এই হতভাগা দেশের মেয়েদের বন্ধনগ্রস্ত জীবনের মুক্তি-আকাঙ্ক্ষী ছিল। চেয়েছিল তার মাও। সেই প্রার্থনার বর কী এই রূপ নিল? অসভ্যতাই সভ্যতার চরমসীমা? উচ্ছৃঙ্খলতাই মুক্তির রূপ। সবকিছু ভাঙাই প্রগতি? গড়ার কোনো জায়গা নেই? তাই এক এক সময় মনে হয় "খাঁচা থেকে বেরিয়ে পড়া পাখিরা নতুন আর এক সর্বগ্রাসী শিকারীর জালে আটকে পড়ে ছট্‌ফটাচ্ছে না কি? যে শিকারীর নাম

'আধুনিকতা'। যার রঙচঙে রাঙতা মোড়া জালে আটকে পড়ে শুধু মেয়েরাই নয় ছট্‌ফটাচ্ছে সমাজ, সাহিত্য, শিল্প আর সভ্যতা।" (খেলা থেকে লেখা)

অনামিকা দেবীর উপলব্ধি—আলোচ্য প্রজন্মের অভিভাবকরাও সন্তানের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। কিন্তু ভালোটা যুগের সঙ্গে ঠিক ঠিক তালে না-বাজলে, প্রকৃত ভালোটা চিনতে না-পারলে, সাময়িকভাবে 'শম্পা'রা হারিয়ে যায়। "তাড়াতাড়ি করতে গেলেই বাড়াবাড়ি করতে হয়।...হঠাৎ যখন খেয়াল হয়, ছিছি বড্ড পিছিয়ে আছি তখন মাত্রাজ্ঞানটা থাকে না।" (ব: ক: - ৩৩২) তার ফলস্বরূপ সত্যভামাদের এ জগৎ থেকে বিদায় নিতে হয়।

এ যুগের ছেলেমেয়েরা এবং তাদের অভিভাবকরাও বোঝে না, আধুনিকতা আর উচ্ছৃঙ্খলতা এক বস্তু নয়। আধুনিকতা বয়স দিয়ে মাপা যায় না। ওটা মনোভঙ্গি। তাই প্রৌঢ়ত্বের সীমা পেরিয়ে বার্ধক্যে প্রবেশ করেও সনৎকাকা আধুনিক। "যারা বয়স হিসেব করে আধুনিকতার গর্বে মত্ত তারা বোঝে না বয়স জিনিসটা প্রতি মুহূর্তে বাসি হয়ে যাচ্ছে। কুড়ি বছরটা পঁচিশ বছরের দিকে তাকিয়ে অনুকম্পার হাসি হাসছে।" (ব : ক: ১৪৯)

শম্পার প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের সব চেয়ে বড় যন্ত্রণা, "তারা শ্রদ্ধা করার মতো মানুষ পাচ্ছে না। ওদের মনের নাগাল পায় এমন মা বাপ পাচ্ছে না। হয়তো আগের যুগ ওতেই সন্তুষ্ট থাকতো, এ যুগের মন মেজাজ দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা।" কারণ এরা 'লোভ'কে 'লোভ' বলে বুঝতে শিখেছে। 'দুর্নীতি'কে 'দুর্নীতি' বলে চিনতে শিখেছে। (ব · ক · ৩২০) তাই এদের সব চেয়ে নিকটজনদের ওপর-ই সবচেয়ে ঘৃণা।" তবে এরা দাঁড়াবে কোন ভিত্তিভূমির উপর? এদের নিজেদের সম্পর্কে ধারণাটাও পরিষ্কার : "অসভ্য উদ্ধত বেয়াড়া" হলেও 'ভেজাল নয়' এরা। 'সৎ এবং খাঁটি'। (ব: ক: ৩৫৯) নিজেদেরকে বারুদের বস্তা মনে করে গর্বিত এ যুগের প্রজন্ম। তাই "রঙিন পাখির সোনালি পালক গোঁজা সুসভ্য ভাষণ" এদের নয়। "স্রেফ পোশাক পালিশ ছাড়া নগ্ন ভগ্ন তাদের।" (ব: ক: ৩৫৯)

তবু এরাই তো সব নয়? এদের দিয়ে গোটা যুগের বিচাব করাটা অন্যায।

গৃহবধূ নমিতা চেয়েছে গৌরবময় ভালোবাসা। বঞ্চিত সে। সদা-জাগ্রত অধিকারবোধের ও স্বাধীনতার চেতনা তাকে করেছে বিপর্যস্ত। গৃহত্যাগী স্বামীর আত্মীয়বাড়ির নিশ্চিন্ত গৃহ-কোন তাকে সুখ দিতে অক্ষম। নিজের স্বতন্ত্র স্বীকৃতির আশায় ঘর ছেড়েছে সে। বোঝেনি যে-পথে অকল্যাণ, গ্লানি, সে-পথে প্রগতি আসে না। নিজেকে অন্বেষণ করতে করতে হতাশ নমিতার চোখ-ধাঁধানো বর্ণময় জীবন সীমায়িত হয়েছে ঘুমের ওষুধ খেয়ে চিরশান্তির কোলে আশ্রয় নিয়ে।

এ যুগে আধুনিক হয়েছে মানুষের মন। স্বাধীন হয়েছে মেয়েরা। কিন্তু প্রকৃত পথ না-পেয়ে আত্মহননের পথ বেছে নিতে হয়েছে নমিতা, সত্যভামাদের।

সুবর্ণলতার প্রেম করতে সাধ জেগেছিল। কবিদের মতো প্রেমের আনন্দে ঝলমলিয়ে উঠতে চেয়েছিল তার মন, মেঘলা দুপুরে স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখে প্রেমের অনুভূতি কেমন—ভাবতে ভাবতে কেটে গেছে তাব প্রেমহীন জীবন। প্রেমবিহ্বল ভালোবাসার কোমল স্পর্শ পায়নি কখনো সে।

অবহেলিত, অপ্রয়োজনীয় বকুল কিন্তু প্রেমের উষ্ণতায় সমৃদ্ধ। যদিও সংসারের

চোখ-রাঙানি তার ভালোবাসা বাস্তবায়িত হবার পথে অন্তরায় হয়েছে।

কিন্তু ভাইঝি শম্পা সে-অভাবও পূর্ণ করেছে। এগারো বছর বয়সেই তার প্রেমের অভিজ্ঞতা লাভ। তারপর থেকে চলেছে তার প্রেমিক পরিবর্তন। বকুলের যুগে নিজের ভালোবাসার কথা উচ্চারণ নিম্ন শিক্ষার পরিচয় বহন করত। তাই প্রেমে ব্যর্থতাকেই 'স্বাভাবিক' মেনেছে বকুল। আর শম্পা একের পর এক 'শিকার' ধরেছে, আর ছেড়েছে। দূর সম্পর্কের মামাতো দাদা, 'স্টেশনারী দোকানের সেল্‌সম্যান', 'সহপাঠিনীর দাদা', 'সাঁতারের মাস্টার', 'ক্যাবলা বিবাহিত প্রফেসর', 'লাইব্রেরীয়ান ছোকরা'—একের পর এক মানুষ বদল করে খুঁজেছে তার ভালোবাসা। অভিভাবকরা ক্রমশ তাকে শাসন করার সাহস হারিয়ে বসেছেন। আচরণ সংযত করতে বললে বিরক্ত হয়ে বলেছে সে, "হারেমের যুগে বাস করছো নাকি তোমরা?" (ব: ক: ১০)

এই কি সত্যবতীর স্বাধীনতার পরিণতি? না সুবর্ণলতার কাঙ্ক্ষিত প্রেমের স্বাদ? কিংবা বকুলের ব্যর্থ প্রেমের সার্থক রূপায়ণ? বকুলের তো দেখা গেছে শম্পার আচরণের প্রতি প্রচ্ছন্ন সমর্থন?

শম্পা পিসির কাছে তার মনের খবর পৌঁছে দিয়েছে—

> *"একটা প্রেম ট্রেম থাকবে না। কেউ আমার জন্য হাঁ করে বসে থাকবে না। আমায় দেখলে ধন্য হবে না, এ ভালো লাগেনা বুঝলে পিসি? কিন্তু সত্যি প্রেমে পড়তে পারি এমন ছেলে দেখি না।" (ব· ক· ১০)*

'সত্যি প্রেমের যখন প্রশ্ন নেই, তখন আজেবাজেতেই শুধু চার্ম' খোঁজে শম্পা। বকুল নিজে ভীরু, কুণ্ঠিত, নম্র। শম্পা পরবর্তী প্রজন্মের দুঃসাহসে মোড়া। তার দৃপ্ত ভঙ্গিমায় সে-সত্যানুসন্ধানের বুভুক্ষা সত্যবতী-সুবর্ণলতার ধারা বেয়েই তা প্রবাহিত। সন্ধানের পদ্ধতিটি শুধু স্বতন্ত্র। তাই বকুলের পারফেক্‌শনিস্ট মন শম্পার এই প্রেমানুসন্ধানকে প্রশ্রয় দিয়েছে।

সত্যবতীর অনুসন্ধিৎসার আগুন সুবর্ণলতায় যে তেজপ্রাপ্ত হয়েছে, শম্পার চরিত্রে তা অবিরাম ঝলসে উঠতে দেখা গেছে। এরই পাশে বকুলের সমস্ত পিপাসা আগুনের রক্তিম আভায় স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছে। উগ্র হতে সে পারে না। কিন্তু এই তীব্রতার, উগ্রতার জন্মের কারণ সম্যক উপলব্ধি করে। মা সুবর্ণলতার যন্ত্রণার ইতিহাস বকুলের আবিষ্কার। বহির্জগতের জন্য মায়ের যে-পিপাসা, তা সে উপলব্ধি করে। সেই অবরুদ্ধ আত্মার বাঁধন-ছেঁড়া মুক্তি সে শম্পার বহির্মুখী ব্যক্তিত্বে খুঁজে পায়। সমস্ত বিধি-নিষেধের বেড়াজালকে উপেক্ষা করে শম্পা যেন সুবর্ণর অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণতা দান করেছে। এই উপেক্ষা করার তীব্র বাসনা সত্ত্বেও বারেবারে ব্যর্থ হয়েছিল সুবর্ণ। তাই শম্পার মধ্যে মায়ের কাঙ্ক্ষিত সার্থকতা রূপায়িত হতে দেখে পরিতৃপ্ত বকুল। সেই কারণেই "এই মেয়েটার কাছাকাছি এলেই যেন অনামিকা দেবীব খাঁচার মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসে একটি বন্দি পাখি, এসে আলোর দরজায় উঁকি মারে।" (ব· ক· ২৫)

শম্পা বকুলের পরিবারে দলছুটদের একজন। তবে অন্ধকারে আলো সে। অনামিকা ভাবেনও "কত যুগ পরের মেয়ে?" নিজের ছেলেবেলায় প্রেমাস্পদের সঙ্গে যোগাযোগ

করতে নানা ছুতোর আশ্রয় নিতে হয়েছে বকুলকে। ঘাড় নিচু করে দাঁড়িয়ে-থাকা নিরীহ মেয়েটিকে কারা যেন সমবেতভাবে শাসন করত। অপার শূন্যতা সঙ্গী করে সব সয়ে যেত ভীরু মেয়েটি। সেই পরিবারের মেয়ে আধুনিক যুগের দুঃসাহসে ভরা, আহ্লাদি, বকুলের প্রশ্রয়ে লালিতা স্বাধীনচেতা শম্পা।

সে-যুগে বকুলের প্রেমিক নির্মল-এর সাহসের অভাবে বকুলের জীবন ব্যর্থ। নির্মলের জীবন অপূর্ণ। কিন্তু আধুনিক এ যুগে শম্পার প্রেমিক নির্ভীক। প্রত্যয়ের সঙ্গে শম্পার বাড়িতে এসে বিয়ের প্রস্তাব রাখে। বকুলের ভালো লাগে জীবনদুটো শূন্যতার গভীরে তলিয়ে যাবে না ভেবে।

শেষমেশ শম্পার মন যেখানে বাঁধা পড়েছে সে "একটা লোহার যন্ত্রপাতির কারখানার" অ্যাসিস্টেন্ট ফোরম্যান। আর তার 'বেশ একখানা কংক্রীট চেহারা। দিব্যি একটি বন্য বর্বর-বন্য-বর্বর ভাব আছে।" (ব: ক: ১২১) শম্পা বলে "চেহারায় কী এসে যায় পিসি? মানুষটা কেমন সেটাই দেখবার বিষয়। ..মনের সঙ্গে সঙ্গে চোখের পছন্দও বদলাবে বৈ কি!" (ব: ক· ১২৫)

ওর পছন্দের উন্নতি আপাতত 'বন্য বন্য বর্বরে' এসে ঠেকলেও কালে তা পুরো অরণ্যের প্রাণীতে গিয়ে ঠেকলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই", কারণ "মানুষ জাতটা দিন দিন যেরকম ভেজাল হয়ে যাচ্ছে।" (ব: ক: ১২৬) আধুনিক প্রজন্ম মনে করে "জানোয়ারের সঙ্গে মানুষের তফাৎ শুধু বাইরের চেহারাটায়" অন্য কোনো তফাৎ আছে কিনা? ধৈর্য ও মানসিকতা এদের নেই। তাই তাদের পক্ষে বলাটা সহজ, "তফাৎ থাকবে কেন? এখানেও রক্তমাংস, ওখানেও রক্তমাংস, রক্তমাংস ব্যতীত কোথায় কি?" হয়তো "অনবরত শুনতে শুনতে ওটাই বিশ্বাসের বস্তু হয়ে দাঁড়াবে।" (ব: ক· ১৬৯) শম্পাও আধুনিক। কিন্তু সে বোঝে "প্রাণের মধ্যে যখন সত্যিকারের আবেগ আসে তখন...ওসব সেকেলে একেলে জ্ঞান থাকে না"। (১৪৯) সত্যিকারের আবেগের সঙ্গে এ যুগের ছেলেমেয়েদের তেমন পরিচয় না-থাকলেও শম্পা তার স্বাদ জানে। তার আপাত-হালকা আচরণের ভিতর যে প্রকৃত অন্বেষণ লুকিয়ে আছে তাতেই মুগ্ধ বকুল। তাই সে দেখে শম্পার "ওই লজ্জাহীনতার মধ্যে কোথায় যেন একটা অমলিন মমতা আছে।" "যে বস্তু ইহসংসারে প্রায় দুর্লভ।" (ব: ক: ১২০)। ·

বকুলের কাল শম্পার কালের কাছে মাথা হেঁট করে বলেছে—"তোমাদের কাছে আমরা হেরে গেছি। আমরা জীবনে সব থেকে বড় করেছিলাম ভয়কে, তোমরা সেই জিনিসটাকে জয় করেছো। তোমরা বুঝেছো ভালোবাসার চেয়ে বড় কিছু নেই...নিজের জীবন নিজে আহরণ করে নিতে হয়, ওটা কেউ কাউকে হাতে করে তুলে দেয় না। সেই জীবনকে আহরণ করে নিতে তোমরা তোমাদের রথকে গড়গড়িয়ে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারো কাঁটাবনের উপর দিয়ে।" (ব: ক: ৩০১) তাই "আজকাল কেউ অমন বোকার মতো আর বেচারির মতো ভালোবাসে না। (ব: ক· ২২২) তবে এ প্রজন্মের কাছে 'ভালো' শব্দের অর্থ জানা নেই। ওদের কাছে 'বাজে'ই হল আসল কাজের। ওই কাণ্ডগুলিই 'সমাজের দর্পণ।' সামঞ্জস্য কথাটা ওদের কাছে অর্থহীন, এরা বড় উদ্ধত অহংকারী, নিষ্ঠুর, লজ্জাহীন। এদের মানসলোকে

'সত্যে'র চেহারা অস্থির অস্পষ্ট। "দোদুল্যমান দর্পণে প্রতিফলিত প্রতিবিম্বের মতো সে চেহারা কখনো কম্পিত, কখনো বিকৃত, কখনো দ্বিধাগ্রস্ত, কখনো যেন অসহায়। যেন ঝড়ে বাসা ভাঙা পাখি ডানা ঝাপ্‌টে ঝাপ্‌টে পাক খেয়ে মরছে। এখনো ঠিক করে উঠতে পারছে না, ঝড় থামলে পুবোনো বাসাটাই জোড়াতালি দিয়ে আবার গুছিয়ে বসবে, নাকি নতুন গাছে গিয়ে নতুন বাসা বাঁধবে?" (ব: ক:—৭৭) এই দ্বিধা-সংশয়-অস্থিরতার মাধ্যে স্বাধীনতা, আধুনিকতার স্বরূপও যে স্বচ্ছ মূর্তি পেতে পারে না সে-কথা সহজেই অনুমেয়।

মেয়েরা আইনগতভাবে যে অধিকার, স্বাধীনতা লাভ করেছে তার সঠিক ব্যবহার হচ্ছে কি না নিঃসংশয়ে বলার জায়গা আসেনি। মনের মধ্যে স্বাধীনতা নামক যে-স্বপ্নের জগৎ দানা বেঁধেছিল তার বর্তমান বাস্তব রূপ সংশয়রহিত নয়। সুবর্ণলতার পরবর্তী প্রজন্মের মেয়েরা অসীম ক্ষমতা বলে ঘর এবং বাহির উভয়ই সামলাচ্ছে কিন্তু তবু একটা অভাব থেকে যাচ্ছে। পরমত সহিষ্ণুতার অভাব। ফলে সংসারে নেমে আসছে অশান্তি। লেখিকা বলেছেন—"আমার তো মনে হয় শিক্ষা সভ্যতা আর শালীনতার প্রথম পাঠ-ই হচ্ছে পরমত সহিষ্ণুতা। ধৈর্যের সঙ্গে অপরের দিকটা ভাবা। এটা থাকলে অবশ্যই জীবন সুন্দর হতো।" সংসার হত সুখের। এখন প্রেস্টিজে ঘা লাগে অল্পেতেই। তাই দশ বছরের বিবাহিত জীবন যাপনের পর রেখা হঠাৎ আবিষ্কার করে, "এই ফাঁকিতে ভরা দাম্পত্যজীবন বহনের কোনো মানে হয় না" (ব: ক: ৩৩৬)। অথচ সুবর্ণলতার জীবন নয় তার, 'শিকার' শিকারির পালা বদল ঘটে গেছে এদের যুগে। 'নিজেকে গলিয়ে গলিয়ে দিব্যি রেখার ছাঁচে' ঢালাই করে নিয়েছিল স্বামী শোভন। কিন্তু দুজনের ছাঁচে সামঞ্জস্য না-থাকলে শেষ রক্ষা হয় না। রেখা তার স্বাধীনতাব অধিকারে নিজের স্বতন্ত্র জীবন বেছে নিয়েছে। দুই সন্তানকে পৃথক করেছে। একবারও ভেবে দেখেনি শিশুরও মন থাকে। আর সে-মনে বাপ-মায়ের জন্য কী সঞ্চিত হচ্ছে। দুটি পরিণত মনের অসহিষ্ণুতা শিশুমনের অনাবিল হাসি কেড়ে নিয়ে তৃপ্ত হয়েছে। পারুল বিদীর্ণ হৃদয়ে প্রশ্ন করেছে—"আমরা কী মেয়েদের এই স্বাধীনতারই স্বপ্ন দেখেছিলাম? আমরা, আমাদের দিদিমা-রা?" (ব: ক: ৩৪১) জীবনের চলার পথে রুচির অমিলটা এত বড় হয়ে ওঠে যে সেখান থেকে জন্ম নেয় জেদ। মন হয়ে যায় অহমিকার বশ। তাই লেখিকা বলেছেন—"যদিও নারীমুক্তি নিয়ে মেয়েরা খুবই উদ্দীপ্ত. উত্তেজিত কিন্তু মুক্তি সম্বন্ধে সুস্থ ধারণা কোথায়?" মনের মুক্তিতে তো সংসার আরও শান্তিপূর্ণ কল্যাণময় হয়ে ওঠার কথা। কিন্তু নিজের আত্মমর্যাদাপূর্ণ অবস্থানটা সম্পর্কে তাদের ধারণাটা খুব পরিষ্কার নয়। তাই নিজেকে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করার বদলে, সমাজের ভাঙনে সহায়তা করে বসেছে নারী কখন, তা টেরও পায় না। আত্মমর্যাদা ও আত্মঅহমিকা যে এক নয় সে-সম্পর্কে মন সচেতন হয়নি।

সুবর্ণলতার যুগে বিবাহবিচ্ছেদ (হিন্দু নারীর) সম্ভব ছিল না বলে তার কন্যাদের মনে আক্ষেপ জমেছিল। কিন্তু আজ তা আশীর্বাদ বলে মনে হচ্ছে। স্বাধীনতার ভাঙনের চেহারা শিহরিত করে তুলেছে বকুল-পারুলদের।

আশাপূর্ণা দেবী তাঁর সময়ের সদ্যবিগত তিনটি যুগকে ত্রয়ী উপন্যাসগুলিতে ধরে রাখতে পেরেছেন। কিন্তু তার পরবর্তী যুগও অস্থির সমাজের চেহারা বিগত যুগগুলির মতো

সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলা কঠিন। অনামিকা দেবীর কলম সে-যুগের চরিত্র তুলে ধরেছে এইভাবে—"যে-সমাজ প্রতিক্ষণ নতুন ঢেউয়ে উত্তাল, মুহূর্তে মুহূর্তে যার রং বদলাচ্ছে, গড়ন পাল্টাচ্ছে, সে-সমাজকে গোটা একটা চেহারায় দেখব কোথায়? ধরবো কোনখানে? সে তো খণ্ড ছিন্ন অসমান। সেই অসমান টুকরোগুলোর যতটা ধার আছে ততটা ভার নেই। ওই তীক্ষ্ণতাটা অদূর ভবিষ্যতেই ভোঁতা হয়ে যাবার সূচনা বহন করছে। তাই আজ যা 'ভয়ংকর দুঃসাহস' বলে গণ্য হচ্ছে, আগামী কালই তা হয়ে যাচ্ছে ডাল ভাতের মতো আটপৌরে পুরোনো। আজকের ফেনিল মুহূর্তগুলোর স্থায়ী কিছু দেবার ক্ষমতা নেই। ওরা যা দিচ্ছে বলে অহঙ্কার করছে, তা সাবানের ফেনার মতন রঙিন বুদবুদ ফেটে বাতাসে মিলিয়ে যাচ্ছে।" তাই দ্রুত পরিবর্তনশীল এই যুগটাকে ঠিকমতো ধরার উপায় নেই। প্রকৃতপক্ষে আধুনিকতা ও স্বাধীনতার আশীর্বাদ স্বরূপ ক্রমশই মানুষের সুখী হবার ক্ষমতা কমে যাচ্ছে। মানুষকে ভালোবাসার পরিধি কমে যাচ্ছে। ফলে বস্তুর মধ্যে সুখের সন্ধানে ব্যস্ত থেকে ব্যর্থ হয়ে ফিরছে বারে বারে। যত দিন যাচ্ছে, হৃদয়ের প্রেরণাগুলি হারিয়ে ফেলে মানুষ ক্ষুদ্র আর সংকীর্ণ হয়ে পড়ছে। ভালোবাসার ক্ষমতা ক্রমশ সংকীর্ণ হতে হতে আত্মকেন্দ্রিকতার গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে।

সমাজে যে-বিয়ে পুতুলখেলার নামান্তর—তা প্রয়োজনে ভাঙা যাবে না কেন?—এই প্রশ্নের উত্তরের খোঁজে সত্যবতীর গৃহত্যাগ। সুবর্ণলতাও বিবাহ নামক সামাজিক পদ্ধতির বিরুদ্ধে অসহিষ্ণু প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছে। ক্ষমতার জোরে বিয়ে দিয়ে দিলেই তা রক্ষার দায়িত্ব বর্তায় না। সেই সামাজিক প্রথাটি নিয়ে বকুল-পারুলও চিন্তিত। সত্যবতীর যে বেদনাকাতর মন্তব্য—'এ বিয়ে বিয়ে নয় পুতুল খেলা।' (ব· ক· ৪০০) তার সঙ্গে আজকের সভ্য সমাজের বিয়ের কোথায় যেন সাদৃশ্য। "ভালোবাসার বিয়ে। এরই বা পুতুল খেলার সঙ্গে তফাৎ কোথায়। খেলতে খেলতে পুরোনো হয়ে গেলে, বৈচিত্র্য হারালে আবার অন্য পুতুল নিয়ে খেলা শুরু এই তো! আর যদি নতুন করে শুরু নাও কর খেলাটাই ত্যাগ করলে। খেলাটা ভাঙলে পুতুলটা আছড়ে ফেলে দিলে।" (ব. ক: ৪০০)

তবু একটু তফাত আছে। সত্যবতী সুবর্ণর সময়ে মেয়ে-পুতুলগুলো ভালোবাসতে পারত না নিজের ইচ্ছেয়। সমাজের চোখরাঙানি বিয়ের পর স্বামীকে ভালোবাসতে বাধ্য করত। বকুল-পারুল যে যুগকে দেখে প্রশ্ন করছে সেখানে প্রকৃত ভালোবাসা বুঝুক আর না-ই বুঝুক ভালোবাসার স্বাধীনতা মেয়েরা অর্জন করতে শুরু করেছে। সুবর্ণলতা বা পারুলের মতো কেবলমাত্র কল্পনাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়নি। কিংবা বকুলের মতো ব্যর্থ প্রেমের দীর্ঘশ্বাসে হৃদয় ভরে ক্ষান্ত থাকতে হয়নি। বকুল যখন তার বিদ্রোহিণী মাতামহী কিংবা তেজস্বিনী জননীর কথা ভাবে—এরা কি বিবাহের এই চেহারাই চেয়েছিলেন? তখনই শম্পার প্রজন্মের কণ্ঠস্বরে পূর্বপ্রজন্মের আকাঙ্ক্ষাই যেন উচ্চাবিত হয। যে-বিয়ে মিথ্যে অর্থহীন তার বোঝা বয়ে চলা মূঢ়তা মাত্র। তা হলে প্রশ্ন জাগে—প্রকৃত বিয়েই বা কোনটা? আজকের সত্যি তো কালই মিথ্যায় পর্যবসিত হয়ে যেতে পারে। মূল্যবোধের পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে যে।

আশাপূর্ণা দেবীর কলমের রেখায় চোখ রেখে দেখি, তিন যুগ ধরে বিবাহ নামক বস্তুটা

বোঝারই সমপর্যায়ভুক্ত। অথচ এ বোঝা ঘাড় থেকে নামিয়ে হালকা করে সহনযোগ্য করার প্রচেষ্টা আজও দেখা গেল না। নবকলেবরে এই ভার কাঁধে তোলার জন্য পরবর্তী প্রজন্মও উন্মুখ। ফলে সত্যবতীর হাহাকার রূপ বদলে প্রতিধ্বনিত হয় যুগ থেকে যুগান্তরে। বিয়ে ভাঙবার কি না এই প্রশ্নটাই এক সময় হয়ে ওঠে 'হাস্যকর'।

সত্যবতী স্বাধীনতার যে-স্বপ্ন দেখেছে, সুবর্ণলতা তাকে যে-রূপ দিতে চেয়েছে তার মধ্যে ঔদ্ধত্যের স্বীকৃতি কখনো ছিল না।

"যে স্বাধীনতার জন্যে একদা পরাধীন মেয়েরা পাথরে মাথা কুটেছে, নিরুচ্চার আর্তনাদে বিধাতাকে অভিসম্পাত করেছে, যে মুক্তির আশায় লোহার কারাগারে শৃঙ্খলিতা মেয়েরা তপস্যা করেছে প্রতীক্ষা করেছে," সেই স্বাধীনতার বিকৃত রূপ দেখেছে বকুল। এর অপব্যবহারও ঘটতে দেখেছে দাদাদের সংসারে। আধুনিকতার অনর্থক উগ্র প্রকাশে সমাজে নারীর আসন সসম্মানে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। নিজের ব্যক্তিত্ব ও অস্তিত্ব লজ্জাহীন স্বেচ্ছাচারিতায় ধুলোয় মিশিয়ে ফেলে সম্ভ্রম পাওয়া যায় না।

সত্যবতী-সুবর্ণলতারা গতানুগতিকতার প্রবাহে ভেসে যেতে আসেনি। জীবন সম্পর্কে তাদের বিচার-বিশ্লেষণের ধারা সর্বসাধারণ নিতে পারেনি, পারা সম্ভবও নয়। ব্যতিক্রমী নারীদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ঠিকমতো রূপ পায় না। তবে পুরোপুরি ব্যর্থও হয় না। তাদের দেখানো পথেই পরবর্তীদের শোভাযাত্রা। পথে যেটুকু কাঁটা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তা উপড়ে ফেলে নতুন পথ তৈরি করার পালা। পুরোনো পথের সঙ্গে সাদৃশ্য কম হলেও তো সেটা পথ। তাই সুবর্ণলতাদের সংসারে শম্পাদের আবির্ভাব নিজেদের যুগের 'পরম প্রতীক' হয়ে। পুরোনো যুগের অপূর্ণ বাসনা নিজের ঢঙে সম্পূর্ণ করার তাগিদে এরা প্রকৃত প্রেমের অনুসন্ধান করে। প্রেমিকের পেশা কিংবা আভিজাত্য তাদের ভালোবাসার মাপকাঠি হয় না। সর্বস্বের পরিবর্তে নিজের জীবনে প্রেমকে প্রতিষ্ঠিত করার দৃঢ়তা এবং সাহস এরা রাখে। নারীর এই স্বাধীনতা ও জীবন সম্পর্কে আধুনিক মনোভাব নতুন যুগকে বিশৃঙ্খলতায় ভেসে যাওয়া থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে। তাই সত্যবতীর স্বাধীনতা সত্যবতীর ঢঙে প্রতিষ্ঠিত হয় না পরবর্তী প্রজন্মগুলিতে। বিকৃতি এসে উড়িয়ে নিয়ে যেতে চায় উদ্দেশ্যহীনতার পথে। তবু সমাজ টিকে থাকে নতুন আলোর স্বপ্ন নিয়ে। সে-স্বপ্ন দেখে শম্পারা। সেই স্বপ্নকে নতুন রূপ দিতে প্রস্তুত হয় পরবর্তী প্রজন্ম।

প্রকৃত সত্য হল আমরা নিজেদের কল্পনায় সমাজের একটা ছাঁচ গড়ে ফেলি। "আমাদের সর্বাঙ্গে শৃঙ্খল যেখানে যেখানে অসহনীয় যন্ত্রণায় পীড়িত করেছে, সেখানটায় বন্ধন শিথিল" করতে চাই, ভাবি "এই শেকলে নাটবল্টু-কব্জা স্ক্রু এগুলো একটু আলগা হোক, কিন্তু আমাদের চাওয়াই তো শেষ চাওয়া নয়! আর চাওয়ার পথ ধরে ওই স্ক্রু, কব্জা, নাটবল্টুগুলো খুলে খুলে ছিটকে পড়ে হারিয়ে যাচ্ছে...যাবেই। কারণ আর এক নতুন ছাঁচ জন্মাবার অপেক্ষায় রয়েছে।" (ব: ক: ৪৩৩)।

তাই সত্যবতীর যুগে বহুচিন্তা ও পরিশ্রমের ফসল সুবর্ণলতার সময়ে সম্পূর্ণটা গ্রহণ-যোগ্য হয় না। আর সুবর্ণলতার প্রজন্মের বহু পরিশ্রম বকুলের যুগে বেমানান। আবার বকুলের কালের অনেক চেষ্টার সমাজব্যবস্থাকে শম্পাদের প্রজন্ম বিদ্রূপ করে। কারণ বাস্তব

হল, "এক যুগে যা নির্ভুল ছাঁচ পরবর্তী যুগে তা ভুলে ভর্তি।" (ব: ক: ৪৩৩)। কাজেই সত্যবতীর আকাঙ্ক্ষার প্রত্যাশিত পরিণতি শম্পার কালে আশা করাই মূঢ়তা। শম্পারা তাদের নিজস্ব নিয়মের সততায় বেঁচে আছে এ সত্য অস্বীকার করার উপায় নেই। যুগ যুগ ধরে বদলে যাওয়া মূল্যবোধের অন্তরালে সততার যে-ফল্গুধারা প্রবহমান তার আলোই এক সূত্রে গ্রথিত করে রেখেছে স্বাধীনতার নব নব রূপ, মুক্তির ভিন্ন ভিন্ন স্বাদ, শিক্ষার অভিনবত্বের দীপ্তি এবং আধুনিকতার বৈচিত্র্যময় প্রকাশ।

শিক্ষা, স্বাধীনতা, সম্ভ্রমবোধ, আধুনিকতা, মুক্তি প্রভৃতির আলোয় জীবনের পথ দেদীপ্যমান। ঘুম ভেঙে, চোখ মেলে শুধু চিনে নেবার অপেক্ষা। খুব কি কঠিন সে-কাজ?

সুবর্ণলতা : নারীসত্তার নির্মাণ-প্রকল্প

তপোধীর ভট্টাচার্য

'আপাতদৃষ্টিতে 'সুবর্ণলতা' একটি জীবনকাহিনি, কিন্তু সেইটুকুই এই গ্রন্থের শেষ কথা নয়। সুবর্ণলতা একটি বিশেষ কালের আলেখ্য। যে কাল সদ্যবিগত, যে কাল হয়তো বা আজও সমাজের এখানে সেখানে তার ছায়া ফেলে রেখেছে। 'সুবর্ণলতা' সেই বন্ধন-জর্জরিত কালের মুক্তিকামী আত্মার ব্যাকুল যন্ত্রণার প্রতীক।

আর একটি কথা বলা আবশ্যক। আমার 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' গ্রন্থের সঙ্গে এর একটি যোগসূত্র আছে। সে যোগসূত্র কাহিনির প্রয়োজনে নয়, একটি 'ভাব' কে পরবর্তী কালের ভাবধারার সঙ্গে যুক্ত করার প্রয়োজনে।

সমাজ বিজ্ঞানীরা লিখে রাখেন সমাজ বিবর্তনের ইতিহাস, আমি একটি কাহিনির মধ্যে সেই বিবর্তনের একটি রেখাঙ্কনের সামান্য চেষ্টা করেছি মাত্র।'

'সুবর্ণলতা'র বয়ান শুরু হওয়ার আগে আশাপূর্ণা দেবী এভাবে পবাপাঠ সম্পর্কে আমাদের অবহিত করে তোলেন। বুঝে নিই, এমন-এক উপন্যাস উন্মোচিত হতে যাচ্ছে, যা নিছক নান্দনিক তাগিদে রচিত নয়। এরও মর্মে রয়েছে পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞান এবং অস্থির ভিতর রয়েছে ইতিহাসচেতনা। রাজারানির ইতিহাস নয়, চলমান জীবনপ্রবাহের ইতিকথা। অসাধারণ সাধারণ যাঁরা, সেইসব মানুষ-মানুষীর অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি নিঙড়ে নেওয়া বৃত্তান্ত। আর, সেইসব বৃত্তান্তের আলো-আঁধার, উচ্চাবচতা, সম্ভাবনা ও অন্ধবিন্দু। 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'তে যে নারী-পরিসরের সন্ধান থেকে নারীর বয়ান প্রস্তাবিত হয়েছিল, তারই স্বাভাবিক বিস্তার ঘটেছে 'সুবর্ণলতা'য়। তবু এ এক আলাদা পাঠকৃতি; তাই নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য ও সামগ্রিকতা রয়েছে তার। 'একটি বিশেষ কালের আলেখ্য' বলেই নয়; সমাজ-বিবর্তনের বৃহত্তর ইতিহাসের পটে একক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সাহিত্যিক পাঠকৃতির নিজস্ব সংকেতগূঢ় ভাষায় ব্যক্ত করছে বলেই এর নিবিড় পাঠ জরুরি।

প্রজন্মের পরে প্রজন্ম আধিপত্যবাদী অচলায়তনের বিরুদ্ধে সচেতন ও অবচেতন লড়াই চালিয়ে যায়। সত্যবতীরা যতটুকু জমি অর্জন করতে পারে, তার পরিধি প্রসারিত করার পরিবর্তে পরবর্তী প্রজন্মের সুবর্ণলতারা হয়তো তা-ও হারিয়ে ফেলে। এক কদম এগিয়ে দু'কদম পিছিয়ে যাওয়ার মধ্যেও চলমান ইতিহাসের সত্য প্রমাণিত হয়। আশাপূর্ণার ত্রয়ী উপন্যাসে স্তরে স্তরে বিন্যস্ত রয়েছে পৌরসমাজের অবরুদ্ধ অন্দরমহলের নিরন্তর ভাঙাগড়ার ইতিবৃত্ত। এই ইতিবৃত্ত যেহেতু রচিত হয়েছে অন্তঃপুরবাসিনী এক নারীর কলমে, পিতৃতান্ত্রিক প্রতাপের দ্বারা গ্রস্ত ইতিহাস পুনঃপঠিত ও পুনর্বিবেচিত হয়েছে। উত্থান-পতনের কিংবা ক্রম-বিবর্তিত মূল্যবোধের যেসব ধারণার ওপর গড়ে ওঠে পৌরসমাজের ইতিহাস, আশাপূর্ণা দেখিয়েছেন, একে স্বতঃসিদ্ধ বলে বিনা প্রশ্নে গ্রহণ করা যায় না। পিতৃতন্ত্রের আগ্রাসী উপস্থিতিতে যে-পরিসর কার্যত অনুপস্থিত, তাকে আবিষ্কার করার জন্যে আশাপূর্ণা মূলত যাবতীয় যথাপ্রাপ্ত অবস্থানকে তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসায় বিদ্ধ করেছেন। পশ্চিমি তাত্ত্বিকেরা যে-ধরনের Interrogation-কে নব্য পাঠকৃতির ভিত্তি বলে নির্দেশ

করেছেন, আশাপূর্ণা নিজস্ব জীবনানুধ্যান থেকে সেই প্রক্রিয়াকে সুবর্ণলতার বয়ানে সক্রিয় করে তুলেছেন।

নারীর নিজস্ব সংবেদনা দিয়ে নারীর একান্ত আপন কথা লিখতে গিয়ে আশাপূর্ণা মূলত নৈঃশব্দ্যের ঝরোখা সরিয়ে দিতে চেয়েছেন। এই ঝরোখার আড়ালে যুগের পরে যুগ ধরে অজ্ঞাত ও অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে প্রকৃত নারীসত্তা। এই নৈঃশব্দ্য নির্মাণ করেছে পিতৃতন্ত্র; নারীর ওপর চাপিয়ে দিয়েছে প্রতিমা হয়ে ওঠার নিশ্ছিদ্র আয়োজন। পিতৃতান্ত্রিক প্রতাপের স্বেচ্ছাবৃত পুতুল হওয়াতে নারীত্বের অবিচল প্রতিষ্ঠা—ধর্মতন্ত্র নিরলসভাবে এই আদর্শ প্রচার করে গেছে। পুরুষের ভাষা, চেতনা, বিশ্বাস, মূল্যবোধ যে-ছাঁচ তৈরি করেছে, তাকে সাগ্রহে ও প্রবল উন্মাদনায় মান্যতা দেয় যারা—তাদের আদর্শ নারী বলে বন্দনা করেছে রক্ষণশীল পৌরসমাজ। সত্যবতীর প্রতিবাদ ছিল অচলায়তনের এই সর্বগ্রাসী বৌদ্ধিক ও আস্তিত্বিক সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে। অন্তেবাসী নারীর মানুষ হয়ে ওঠার সেই প্রথম প্রতিশ্রুতি কিন্তু সরলীকৃত পাটিগণিতের নিয়মে রক্ষিত হয় না। কোনো-এক সুবর্ণলতা প্রতিবাদের স্ফুলিঙ্গ মননে জাগিয়ে রেখেও ঈপ্সিত অগ্ন্যাধান করতে পারে না নিষ্ঠুর ও বিবেকশূন্য পিতৃতান্ত্রিক সমাজের বাস্তব পরিস্থিতির চাপে। তবু, সমস্ত তাৎপর্য যেহেতু সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয়, তার ব্যক্তিগত পরাজয়ও একমাত্রিক নয়। নারীসত্তার নির্মাণ-প্রকল্প উপন্যাসের নিরুচ্চার বার্তা হিসেবে সতর্ক পাঠকের কাছে ঠিকই পৌঁছে যায়। পাঠক লক্ষ করেন : 'সুবর্ণলতা সেই দুর্লভ মেয়েদের একজন—যারা তাদের কালকে অতিক্রম করে যায়—এগিয়ে দেয় প্রবহমান কালের ধারাকে, যে ধারা মাঝে মাঝে স্তিমিত হয়ে যায়, নিস্তরঙ্গ হয়ে যায়। এরা বর্তমানের পূজা পায় কদাচিৎ, এরা লাঞ্ছিত হয়, উপহাসিত হয়, সমসাময়িক সমাজের বিরক্তিভাজন হয়। এদের জন্য কাঁটার মুকুট, এদের জন্য জুতার মালা। ...তবু এরাই একদিন স্মরণীয় হয়ে ওঠে—এদের নিয়েই সাহিত্যসৃষ্টি হয়। ...সুবর্ণলতা এইরকম একটি নারীচরিত্র।'

মূল বয়ানে পৌঁছানোর আগেই এভাবে অজস্র ভাষ্যের সম্ভাবনা উন্মুক্ত হয়ে যায়। হয়তো সাধারণভাবে পাঠক-প্রতিক্রিয়াবাদী দৃষ্টিকোন থেকে এধরনের বয়ানে লেখক-স্বরের আধিক্য যথেষ্ট আপত্তির কারণ হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। কিন্তু আশাপূর্ণার 'সুবর্ণলতা'য় ঔপন্যাসিকতার গ্রন্থনা আপন স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করে বিবরণ ও ভাষ্যের অন্যোন্যাশ্রয়িতায়। আশাপূর্ণার ঘোষিত পরাপাঠ বারবার নিজের প্রগাঢ় উপস্থিতিকে সঞ্চারিত করেছে। সুবর্ণলতার নারী-সত্তার অপূর্ণতা ও রিক্ততা সর্বগ্রাসী পিতৃতান্ত্রিক প্রতাপের দ্বারা কীভাবে নির্ধারিত হয়েছে, ঔপন্যাসিক অজস্র অনুপুঙ্খের বিন্যাসে সেই কেন্দ্রীয় সত্যকে প্রকাশ করেছেন। স্বামী হয়ে পুত্র হয়ে প্রতিবেশী হয়ে ধর্মচেতনার স্বনিযুক্ত মুখপাত্র হয়ে নারীকে শাসন করে পিতৃতন্ত্র, কেড়ে নেয় তার আলোহাওয়ারোদ : এই মর্মান্তিক বৃত্তান্তই তো সুবর্ণলতার। শুধু তা-ই নয়। ত্রয়ী উপন্যাসে বারবার আশাপূর্ণা দেখিয়েছেন, বহু প্রজন্ম ধরে পিতৃতন্ত্রের ছাঁচে-গড়া নারীরা কখনও শাশুড়ি হয়ে কখনও ননদ হয়ে, কখনও বা জা এমনকী কন্যা হয়েও সুবর্ণলতাদের আকাশ কেড়ে নেওয়ার বন্দোবস্ত করে। এদের মন পুরুষের, ভাষা পুরুষের বিশ্বাসও পুরুষের যেহেতু এদের চেতনা

নিশ্ছিদ্রভাবে উপনিবেশীকৃত। নিছক শারীরিক পরিচয়ে এরা নারী, অস্তিত্বগত নিরিখে নারী নয়। বরং নারীর শারীরিক ভিন্নতাকে এরা হীনতার অভিজ্ঞান হিসেবে ধরে নেয় এবং শরীর দিয়েও পিতৃতন্ত্রের কাছে বলি-প্রদত্ত হওয়ার জন্যে স্বেচ্ছায় তৈরি থাকে। শরীর সম্পর্কে এদের থাকে অদ্ভুত অশুচিতা-বোধ, যা নানাধরনের উৎকট সংস্কারে ও আরোপিত বিধিনিষেধে ব্যক্ত হয়। 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র বয়ানে এই বিষয়টি আমরা বারবার লক্ষ করেছি; 'সুবর্ণলতা'য় এর পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম হলেও উপেক্ষণীয় নয়।

এমনকী নারীর রচিত বয়ানেও নারী-পরিসর স্পষ্ট হয় না সর্বদা, তা আমরা পাঠ-অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছি। নারীর যথাপ্রাপ্ত লৈঙ্গিক অবস্থান আসলে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নির্মিতি—এই অত্যন্ত জরুরি তথ্যও সমস্ত পাঠকৃতিতে প্রাপ্য গুরুত্ব পায় না। আশাপূর্ণা লিখেছেন সমস্ত আরোপিত ঝরোখা সরিয়ে দেওয়ার জন্যে। 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'তে যদিও বা লেখক-অস্তিত্ব আখ্যান-প্রকল্প থেকে যত্ন-রচিত দূরত্ব বজায় রেখেছে, 'সুবর্ণলতা'র বয়ানে আগাগোড়া অনুভব করি কথকস্বর-ভাষ্যকারের যুগলবন্দি উপস্থিতি। বস্তুত কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভাষ্যকারের তীক্ষ্ণ স্বর কথক-অস্তিত্বকেও আড়ালে সরিয়ে দিয়েছে। সুবর্ণলতার আপাত-পরাজয়ের বেদনা মন্থন করে নারীর নিজস্ব জীবন-পাঠের নির্যাসকে সামূহিক বাচনের ঐতিহাসিকতায় উপস্থাপিত করেছেন আশাপূর্ণা।

দুই

প্রকৃতপক্ষে নিবিড় পাঠে এমন মনে হয় যে 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' নাতি-ধূসর অতীতের ও 'বকুলকথা' ধুপছায়াময় বর্তমানের সাহিত্যিক নির্মিতি। কিন্তু 'সুবর্ণলতা' পড়তে পড়তে বারবার ঝাপসা হয়ে যায় এই সত্য যে এ-ও চলিষ্ণু সময়ের আরেক সাহিত্যিক নির্মিতি। মনে হয় যেন বাঙালির পৌরসমাজের অন্তঃপুর আঁধার-ঘেরা অপর পরিসর হয়ে আমাদের হৃদয়েতে পথ কেটে চলেছে।

সুবর্ণলতার অশ্রুসজল আখ্যানে বারবার হারিয়ে যায় পাঠকের নৈর্ব্যক্তিক দূরত্বের বোধ। এইজন্যে সুবর্ণলতার বেদনা-রক্তিম অশ্রুপিচ্ছল উচ্চারণ অনুরণিত হতে থাকে পাঠকের মনে এবং একসময় সুবর্ণলতার উচ্চারণের সঙ্গে সংবেদনশীল পাঠকের কণ্ঠস্বরও মিশে যেতে থাকে। তাই ত্রয়ী উপন্যাসের সামগ্রিক পরিসরের মধ্যে 'সুবর্ণলতা' নিজস্ব পার্থক্য-প্রতীতির অভিজ্ঞানে বিশিষ্ট। আশাপূর্ণার নারী-পরিসর সন্ধান এবং নারীর নিজস্ব আখ্যান সম্পর্কিত তাত্ত্বিক প্রতিবেদন তৈরি করার জন্যে 'সুবর্ণলতা'র স্বতন্ত্র গুরুত্ব অবশ্য-স্বীকার্য। ভারতীয় পিতৃতন্ত্র কিংবা, বলা ভালো, ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র যুগযুগ ধরে নারীকে যেভাবে ঊনমানব বলে এবং পিঞ্জরবদ্ধ বিহঙ্গী হিসেবে আপন সম্পত্তি বলে গণ্য করে নৃশংস অত্যাচার ও লাঞ্ছনা করেছে—তারই প্রতিনিধিত্বমূলক বয়ান দেখতে পাই 'সুবর্ণলতা'য়।

'স্তিমিত অন্তঃপুরের অন্তরালেও কী চলে না ভাঙাগড়ার কাজ?'—এই প্রশ্ন 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র পরাপাঠ হিসেবে ব্যক্ত হতে দেখেছি। যেন সেই জিজ্ঞাসার অধিকতর বেদনামথিত বিস্তার উন্মোচিত হল 'সুবর্ণলতা'য়। 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র বয়ান আপাত-সমাপ্তিতে পৌঁছেছে সত্যবতীকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে তার আট বছরের মেয়ে সুবর্ণকে তারই অজ্ঞাতে গ্রামের বাড়িতে বিয়ে দেওয়ার বৃত্তান্তে।

এই বৃত্তান্তের সূত্রে সুবর্ণলতা কেন্দ্রিক পাঠকৃতিতে পৌঁছানোর আগেই আমরা বুঝে নিই, প্রান্তিকায়িত নারীর উপস্থাপনা চিহ্নায়িত হয়ে গেছে। সত্যবতীর জীবন-ব্যাপ্ত সংগ্রাম, প্রতিরোধ ও বিকল্প জীবনের সন্ধান পরবর্তী প্রজন্মে প্রসারিত হতে পারল না নিষ্ঠুর ও বিবেকশূন্য পিতৃতন্ত্রের প্রতিশোধ-স্পৃহায়। শাশুড়ি এলোকেশী ও স্বামী নবকুমার পিতৃতান্ত্রিক অচলায়তনের প্রতিহারী হয়ে সত্যবতীর দীর্ঘকালীন বিদ্রোহের জন্যে মোক্ষম প্রতিশোধ নিয়েছে। সুবর্ণলতাকে পিতৃতন্ত্রের যূপকাষ্ঠে বলি দিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছে যে মেয়ের ওপর মায়ের কোনো অধিকার নেই। ঔপন্যাসিক আশাপূর্ণার দ্রষ্টাচক্ষুতে ধরা পড়েছে সুবর্ণলতার 'একজোড়া আহত পশুর চোখ'। অত্যন্ত মৌলিক জিজ্ঞাসার উপস্থাপনায় কাহিনি সংকেতগর্ভ হয়ে উঠেছে। নারীসত্তার চরম অবমাননার সঙ্গে আপস না-করে সত্যবতী মুহূর্তমধ্যে বিয়ের আসর ছেড়ে চিরকালের মতো পাড়ি দিয়েছে সম্ভাব্য বৃহত্তর জগতের সন্ধানে। বিয়ে মানে সত্যিই অনন্তকালের বন্ধন কি না, এই মীমাংসা করার জন্যে সে আসলে নিজের কালের সংকীর্ণ গণ্ডি থেকে উত্তীর্ণ হয়েছে সম্ভাব্য ভবিষ্যতে। তার উচ্চারণও হয়ে পড়েছে চিহ্নায়িত : 'যা হয়ে গেছে তার চারা আছে কিনা সেইটাই শুধু ভাবব বসে বসে বাকি জীবনটা ধরে...বাকি জীবনটুকু কী খুব বেশি হল? অনেকগুলো জন্ম ধরে ভাবলেই কী সে ভাবনার শেষ হবে? উত্তর পাওয়া যাবে? ...সব বিয়েতেই নারায়ণ এসে দাঁড়ান কী না, সব গাঁটছড়াই জন্মজন্মান্তরের বাঁধন কী না, এই প্রশ্ন নিয়ে বাবার কাছে যাচ্ছি...।' স্বভাবত নবকুমারের মতো বৃত্তবন্দি স্থূলবুদ্ধি মানুষেরা এ ভাষার মানে বোঝেনি।

ভাঙা-গড়ার বহুস্বরিক ইতিবৃত্ত রচনা করতে গিয়ে আশাপূর্ণা আসলে নানা ধরনের নিরুচ্চার ও সোচ্চার জিজ্ঞাসার গ্রন্থনা তৈরি করেছেন। সারা জীবন ধরে অনেক প্রশ্ন জমিয়ে রেখেছিল সত্যবতী, কাশীতে বাবার কাছে সেসব কিছুর উত্তর সে পেয়েছিল কি না—আশাপূর্ণা জানাননি। হিস্টিরিয়া-গ্রস্ত মানুষের মতো নবকুমার স্বামিত্বের অহঙ্কারে অভিশাপ দেওয়ার কথা বলেছে যখন, অসামান্য জবাব দিয়েছে সত্যবতী : 'তাই তো দিয়ে আসছো তোমরা আবহমান কাল থেকে। স্বামী হয়ে বাপ হয়ে ভাই হয়ে ছেলে হয়ে। ওটা নতুন নয়। অভিশাপেরই জীবন আমাদের।' এই 'তোমরা' ও 'আমাদের' সর্বনাম দুটি গভীর দ্যোতনাগর্ভ। বুঝে নিই, আশাপূর্ণার ঔপন্যাসিক প্রতিবেদনের পরাপাঠ কী! সত্যবতী ও সুবর্ণলতা কোনো একক বাচনের ধারক নয়, এরা আবহমান কাল ধরে লাঞ্ছিত, অপমানিত, সংযোগশূন্যতার অন্ধকারে প্রান্তিকায়িত নারীর পরিসরের বোবা যন্ত্রণার প্রতিনিধি। 'আগে এলে বিয়েয় বাধা দিত, তাই জানানো হয়নি' —নবকুমারের এই কথায় তো সত্যবতীর মতো মায়েদের সারা জীবনব্যাপী সাধনার পরিণাম সহ পিতৃতান্ত্রিক পিঞ্জরে তাদের প্রকৃত অবস্থানের সারমর্ম বিধৃত রয়েছে। এই প্রেক্ষিতে সুনির্দিষ্ট হয়ে গেছে সুবর্ণলতার ভবিষ্যৎও। শ্লেষগর্ভ বাচনে 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র সেই আপাত সমাপ্তিতে কথকস্বর রোরুদ্যমানা হতচকিত সুবর্ণের সঙ্গে সত্যবতীর চূড়ান্ত বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিয়েছিল এই বলে : 'মার পিছুপিছু যাবে তার উপায় নেই, আঁচলের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা! অমোঘ অচ্ছেদ্য বন্ধন। অনন্তকালের ওপার পর্যন্ত নাকি যার ক্ষমতা ...ক্ষেত্র বিস্তৃত।' এই ধর্মনৈতিক বিধানকে সত্যবতী প্রত্যাখ্যান জানাতে পেরেছিল সোচ্চারে। সুবর্ণলতা পারেনি যদিও নিরুচ্চার বয়ান

সে-ও বহতা সময়ের কাছে পেশ করে গেছে। যেন তার নিরুপায় অবস্থার সাহিত্যিক ক্ষতিপূরণ করার জন্যে আশাপূর্ণা বয়ানে ভাষ্যকারের উপস্থিতিকে প্রত্যক্ষগোচর করে তুলেছেন।

তিন

এই নিবন্ধের শুরুতে আশাপূর্ণার বক্তব্যে লক্ষ করেছি, 'একটি' ভাবকে পরবর্তী কালের ভাবধারার সঙ্গে যুক্ত করার প্রয়োজনে' ত্রয়ী কাহিনির গ্রন্থনার মধ্যে তিনি আন্তঃসম্পর্ক বজায় রেখেছেন। সুবর্ণলতার বিয়ের নাটকীয় বৃত্তান্ত এইজন্যে 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র সমাপ্তিতে দ্রুত গতি এনে দেয়নি শুধু, এর রৈখিকতাকেও হঠাৎ ভেঙে দিয়েছে। আমাদের উৎসুক করে তুলেছে সুবর্ণলতার জীবনকথা সম্পর্কে। 'সুবর্ণলতা'র বয়ানে সত্যবতী ধূসরায়িত স্মৃতিপট মাত্র; শুধুমাত্র একবার মেয়ের কাছে লেখা চিঠির সূত্রে তার বিলম্বিত উপস্থিতি। তবু, অনুভবে টের পাই, সত্যবতীর অনুপস্থিত অস্তিত্ব তার মেয়ের বিড়ম্বিত জীবনে আগাগোড়া ছায়া ফেলে গেছে। আর সুবর্ণেরই মেয়ে বকুল রয়েছে পাঠকৃতির শুরুতে এবং শেষে। হয়তো এই বকুল পরবর্তী 'বকুলকথা'য় অনেকখানি রূপান্তরিত, তবু তার উপস্থিতি প্রাগুক্ত ধারাবাহিকতা ও আন্তঃসম্পর্কের গ্রন্থনার প্রতি তর্জনি সংকেত করে। এই প্রেক্ষিতে 'সুবর্ণলতা' নামক পাঠকৃতির কেন্দ্রীয় অস্তিত্বকে মনে হয় দুটি মেরুর সংযোজক। কিন্তু শুধুমাত্র এই কি তার গৌরব? একান্ত নিজস্ব মহিমায় ম্লান ও বিষণ্ণ গোধূলির সৌন্দর্যের মতো সে কি স্মরণীয় নয়? প্রবহমান ধারা যখন নিস্তরঙ্গ, অস্তিত্ব যখন পরাজয়ের মর্মান্তিক বেদনায় বিধুর—তখনও তা চলমান ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বয়ে আনে, তিল-তিল করে অর্জিত হয় নারী-পরিসর। সলতে পুড়ে যায় বলেই আলো জ্বলে পিদিমে।

সত্যবতী সমিধ সংগ্রহ করেছিল। আলো হয়তো জ্বালতে পারেনি কিন্তু অন্ধকার তাকে গ্রাস করতে ব্যর্থ হয়েছিল। তার মেয়ে সুবর্ণ জীবনের ভেতরে অন্য জীবনের অস্তিত্ব খুঁজতে খুঁজতে অন্ধকার বলয়ে হারিয়ে গেল। তার বোধের কেন্দ্রে ছিল জঞ্জাল-পোড়ানো আগুন, কিন্তু পুঞ্জীভূত ছাইয়ের মধ্যে তার স্তিমিত অস্তিত্ব সুবর্ণকে দাহ দিয়েছে শুধু, দীপ্তি দেয়নি। আশাপূর্ণাকে এইসব লিপিবদ্ধ করে যেতে হয়েছে কেননা আমাদের পৌরসমাজের প্রকৃত ইতিহাস রচিত হয়েছে সত্যবতী ও সুবর্ণদের নিরন্তর দ্বিরালাপে। এগিয়ে যাওয়া ও পিছিয়ে আসার সংঘর্ষে যে বিদ্যুৎ-দীপ্তি রচিত হচ্ছে অহরহ, তাতেই তো প্রমাণিত হচ্ছে বৃষ্টিগর্ভ মেঘের সঞ্চার। নইলে বকুল কী করে অনামিকা দেবীতে রূপান্তরিত হয়ে বিনির্মাণ করবে মা-ঠাকুমাদের জীবনমন্থনকথা, অতীতের বৃন্ত থেকে চয়ন করবে বর্তমানের কুসুম। সুবর্ণলতারা হয়তো মরুপথে হারিয়ে যায়, তবু তাদের বিস্মৃত হওয়া চলে না; কেননা মোহনার সম্ভাবনা শুকনো খাতে, ক্ষীণ জলধারায়, ওরাই জাগিয়ে রাখে। তাই মূল বয়ানের প্রবেশকে আশাপূর্ণা জানান :

'তবু এরা আসে।

হয়তো প্রকৃতির প্রয়োজনেই আসে।

তবে কোথা থেকে যে আসবে তার নিশ্চয়তা নেই। আসে রাজরক্তের নীল আভিজাত্য থেকে, আসে বিদ্যাবৈভবের প্রতিষ্ঠিত স্তর থেকে। আসে নামগোত্রহীন মূক মানবগোষ্ঠীর মধ্য থেকে, আসে আর ঘন অন্ধকার থেকে।

তাদের অভ্যুদয় হয়তো বা রাজপথের বিস্তৃতিতে, হয়তো বা অন্তঃপুরের সঙ্কীর্ণতায়।

কিন্তু সবাই কী সফল হয়?

সবাইয়ের কী হাতিয়ার এক?

না।

প্রকৃতি কৃপণ, তাই কাউকে পাঠায় ধারালো তলওয়ার হাতে দিয়ে, কাউকে পাঠায় ভোঁতা বল্লম দিয়ে। তাই কেউ সফল সার্থক, কেউ অসফল ব্যর্থ। তবু প্রকৃতির রাজ্যে কোনো কিছুই হয়তো ব্যর্থ নয়। আপাত ব্যর্থতার গ্লানি হয়তো পরবর্তী কালের জন্য সঞ্চিত করে রাখে শক্তি-সাহস।'

ধারালো তরোয়াল হাতে নিয়ে আসেনি সুবর্ণ, ভোঁতা বল্লম নিয়ে সে দুর্ভেদ্য অচলায়তনের একটি পাথরও খসাতে পারেনি। তার মা সত্যবতী খড়ির গণ্ডি পেরিয়ে গিয়েছিল তীব্র ঘৃণায়, বেদনায়, কিন্তু সুবর্ণের জন্যে কূপই নেতিবাচক অর্থে হয়ে উঠল অকূল সমুদ্র। তবু তার 'আপাত-ব্যর্থতার গ্লানি'র মধ্যেই সঞ্চিত ছিল পরবর্তী কালে তার মেয়ে বকুলের অনামিকা দেবী হয়ে ওঠার ইতিহাস। এ কেবল রাতের সমস্ত তারার দিনের আলোর গভীরে থাকার কথা নয়, তার চেয়ে বেশি কিছু। এ হল জীবনের, প্রগতির ধীরমন্থর দ্বিবাচনিকতা। পশ্চিম দিগন্তকে অন্ধকার করে যখন সূর্য অস্ত যায়, পূর্ব দিগন্তকে আলোয় ভরিয়ে দিয়ে সূর্য উদিত হয় তখন। উপন্যাসের প্রতিবেদন শুরু হয়েছে ছায়াছবির ফ্ল্যাশব্যাক-এর ভঙ্গিতে। সুবর্ণলতার মৃত্যুর তাৎপর্য দিয়ে। তার মা সত্যবতী তবু দাপটের সঙ্গে জীবনের একটা বড় অংশ কাটাতে পেরেছিল; যথাপ্রাপ্ত পিঞ্জরের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে বিকল্প জীবনের সন্ধানে কলকাতায় পাড়ি দিয়েছিল। এক নাটকীয় পরিস্থিতির মধ্যে চূড়ান্ত অবিশ্বাস্য সত্যের উদ্ভাসন ঘটেছিল তার; নারী হিসেবে, জায়া ও জননী হিসেবে, আসলে কোথাও তার পরিসর নেই। স্বামী-পুত্র-কন্যাকে অন্ধকারের সংক্রমণ থেকে সে বাঁচাতে পারেনি কেননা তার অবস্থান চোরাবালির উপরে, এতদিন শূন্যে সৌধ নির্মাণ করেছিল সে। অতএব নিজেকে চিরস্থায়ী বহিরাগত বলে বুঝতে পেরে আত্মমর্যাদা অটুট রাখার জন্যে সত্যবতী পা' বাড়িয়েছিল বাইরে। অন্দর ও বাহির একাকার হওয়ার সীমাহীন যন্ত্রণা ও গ্লানির সঙ্গে আপস করা সম্ভব হয়নি তার পক্ষে।

নরওয়েজীয় নাট্যকার ইবসেনের 'A Doll's House' (১৮৭৯) নাটকে নায়িকা নোরার পরিস্থিতি ছিল পুরোপুরি ভিন্ন, কিন্তু দুই কালের দুই সমাজের দুই সংস্কৃতির দুই নারীর মধ্যে কোথাও যেন ঐক্যসূত্র রয়েছে। নোরার স্বামী হেলমের পিতৃতান্ত্রিক ঔদ্ধত্য নিয়ে একবাচনিক সম্পর্কের সূত্রধার হিসেবে এই তাৎপর্যপূর্ণ কথা বলেছিল; 'You just lean on me, I shall give you all the advice and guidance you need... You are safe and sound under my wing...I'll take all the decisions for you.' এই অসহনীয় নিরেট ঔদ্ধত্যের জবাব দিয়েছে নোরা সমস্ত প্রান্তিকায়িত নারীর পক্ষ থেকে। গৃহত্যাগ করার আগে সে তার স্বামীকে এই কথাগুলি বলে গেছে : '...Never have we exchanged

one serious word about serious things, ...I passed out of Daddy's hands into yours. You arranged everything to your tastes and I acquired the same tastes...I have been your doll wife,...That's been our marriage, Torvald...'

নবকুমার আপাতদৃষ্টিতে সত্যবতীকে পুতুল ভাবতে পারেনি; কিন্তু মোক্ষম মুহূর্তে সে হেলমেরের মতোই (যদিও পিতৃতন্ত্রের দ্বারা উপনিবেশীকৃত সংস্কারপিণ্ড এলোকেশীর প্রভাবে) সমস্ত সিদ্ধান্ত নিজেই নিয়েছে। যেন সুবর্ণ শুধু তারই মেয়ে, সত্যবতী শুধু জন্মদাত্রী। এক মুহূর্তে সত্যবতী, নোরার মতোই, নিজের এত বছরের দাম্পত্যকে চিনে নিয়েছে। কিন্তু সুবর্ণের স্বামী প্রবোধ তো নবকুমারের চেয়েও অধম, কামসর্বস্ব এক পুরুষ। সুবর্ণকে সে আগাগোড়া প্রতারণা ও সন্দেহ করে গেছে। বাড়ি তৈরি থেকে সুবর্ণের কেদার-বদ্রী যাওয়া বানচাল করার ঘটনা পর্যন্ত, প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রবোধ নিজেকে রক্ষণশীল অচলায়তনের মনশূন্য প্রহরী এবং অন্ধকারের স্থূল ও উৎকট প্রতিনিধি বলে প্রমাণ করেছে। এই প্রেক্ষিতে সুবর্ণলতার ট্র্যাজিক বেদনা আরও দু'কূলপ্লাবী হয়ে ওঠে। সে ও নোরা ভিন্ন উৎসজাত ও ভিন্ন সামাজিক ইতিহাসের বাসিন্দা, তাই নোরার মতো সে স্পষ্ট ঘোষণা করতে পারত না যে স্বামী ও সন্তানদের প্রতি প্রশ্নহীন দায় পালনকে সে 'most sacred duty' মনে করে না। কিংবা পুরুষের চোখে ভালো স্ত্রী ও মা হয়ে ওঠার বদলে 'my duty to myself' কে মনে করে নবার্জিত জীবনবোধের ভিত্তি। নোরার কাছে যখন তার স্বামী হেলমের আট বছরের দাম্পত্যের পরেও হঠাৎ অপরিচিত হয়ে যায়, তার তিন-সন্তানের জননী হয়েছে ভেবে নোরা নিজেকে টুকরো টুকুরো করে ফেলতে চায়। অতএব স্ত্রী ও মা হয়ে ওঠাকে নারীর পবিত্র কর্তব্য বলে সে আর গণ্য করে না। বলে 'I believe that first and foremost I am an individual just as much as you are–or atleast I am going to try to be. I know most people agree with you, Torvald, and that's also what it says in books. But I am not content any more with what most people say, or with what it says in books. I have to think things out for myself, and get things clear.'

চার

স্পষ্টত এজাতীয় উচ্চারণে সুবর্ণলতা কখনও কাউকে বোঝাতে পারেনি যে সে নিজেই নিজের মতো করে সব কিছু ভেবে নিতে চাইছে। একজন ব্যক্তি হয়ে স্পষ্টতার দাবি সে করতে পারেনি কখনও। ১৮৭৯ সালে নোরা যে-কথা স্বচ্ছন্দে বলতে পেরেছে, বঙ্গীয় সমাজের গৃহবন্দিনী বধূ সে-কথা বিশ শতকের প্রথম দিকে, স্বদেশি আন্দোলনের মুক্তি-কামী সময়ের পরিধিতেও, কল্পনা করতে পারেনি। আট বছরের দাম্পত্য শেষে নোরা তবুও প্রতিবাদের ভাষা খুঁজে পেয়েছিল। কিন্তু সুবর্ণলতার বাস্তব বহুমাত্রিক ঔপনিবেশিকতায় ধ্বস্ত। তাই বাড়ি তৈরির সময়ে নিষ্ঠুর মিথ্যায় তাকে প্রতারিত করে গেছে তারই স্বামী প্রবোধ। আট বছর বয়সে বিয়ে হওয়ার পরে ছ'বছর সে কাটিয়েছে এজমালি শ্বশুর-বাড়িতে। নতুন বাড়িতে তার ইচ্ছেকে দাম দেওয়ার জন্যে কোথাও বারান্দা তৈরি হয়নি যেখানে দাঁড়িয়ে সে ক্ষণিকের জন্যে মুক্তির স্বাদ পেতে পারত। আর, 'সেই বাড়িতেই তো ত্রিশটা বছর কাটিয়ে গেছে সুবর্ণলতা, সেখান থেকেই বার আষ্টেক আঁতুড়ে গেছে,

কেঁদেছে, হেসেছে, খেটেছে, বিশ্রাম করেছে, সংসারলীলার যাবতীয় লীলাতেই অংশ গ্রহণ করেছে, তবু পিঞ্জরের যন্ত্রণা বোধে অহরহই ছটফট করেছে।' মা সত্যবতী কিংবা ভিনদেশের পূর্বসূরি নোরার মতো সুবর্ণলতা পিতৃতান্ত্রিক অচলায়তনকে উপেক্ষা দিয়ে প্রত্যাঘাত করতে পারেনি। কিন্তু লেখিকা তাঁর উপন্যাসের শুরুতেই জানিয়ে দিয়েছেন যে নিজের চূড়ান্ত রুদ্ধতার মধ্যেই সে-ও অন্তত প্রতীকীভাবে নির্মম-নিষ্ঠুর সংসার থেকে নিজেকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যাহার করে নিয়েছিল—'দক্ষিণের এই চওড়া বারান্দাটায়, যেখানে শুয়ে থাকত সুবর্ণলতা সংসার থেকে চোখ ফিরিয়ে'। কায়িক মৃত্যুর আগেই দৃষ্টিহীন চোখের অধিকারী-জনদের কাছে সুবর্ণ নিজের আত্মিক অবলুপ্তি যেন ঘোষণা করেছিল। চোখ ফিরিয়ে নেওয়া নিঃসন্দেহে চিহ্নায়িত।

কাহিনি গ্রন্থনায় যাঁর প্রশ্নাতীত নৈপুণ্য ত্রয়ী উপন্যাসে বারবার ব্যক্ত হয়েছে, সেই আশাপূর্ণা বিবরণের সঙ্গে কথকতার উদ্বৃত্ত সম্পর্কেও প্রখরভাবে সচেতন ছিলেন। 'সুবর্ণলতা তার স্বামিত্যাগিনী মায়ের নিন্দনীয় ইতিহাসের সম্বল নিয়ে মাথা হেঁট করে শ্বশুর ঘর করতে এসেছিল'—এই তথ্য অজস্র না-বলা কথার বীজবাণীতে ঠাসা। পিতৃতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান এতই নিরেট অচলায়তন এবং এত নির্দয়ভাবে একদেশদর্শী যে কোনো নারীর বিদ্রোহকে মেনে নেওয়া তার পক্ষে পুরোপুরি অসম্ভব। প্রশ্নহীন আনুগত্য নিয়ে পুরুষসর্বস্ব সমাজের কাছে আত্ম-সমর্পণ না-করে সত্যবতী এর শাসন অস্বীকার করেছিল। তার মেয়ে সুবর্ণের ওপর যাতে পরোক্ষেও মায়ের ছায়া না-পড়ে, তা নিশ্চিত করার জন্যে পিতৃতান্ত্রিক দুর্গের ত্রস্ত প্রহরীরা মাত্রাতিরিক্ত নৃশংসতার পরিচয় দিয়েছে। তার শাশুড়ি মুক্তকেশী যে বাড়িতে কেউ বেড়াতে এলেই 'সুবর্ণলতাকে তার বিয়ের দরুন পাওয়া জরিতে জবরজঙ বেগুনী রঙা বেনারসী শাড়ি আর বড় বড় কলকাদার লাল মখমলের জ্যাকেট পরিয়ে সাজিয়ে ফেলত আর সাতখানা করে নিন্দে করত বৌয়ের আর বৌয়ের বাপের বাড়ির'—তাতে অবরোধবাসিনীর চূড়ান্ত গ্লানিকর পরাধীনতা স্পষ্ট। প্রজন্মের পরে প্রজন্ম ধরে এমন ব্যবহারই ধারাবাহিকভাবে পেয়ে এসেছে গৃহবন্দিনীরা। সত্যবতী স্পষ্ট বিদ্রোহ দিয়ে এবং সুবর্ণলতা তুষের আগুনে পুড়ে-পুড়ে কালো হয়েও নিজের স্বতঃস্ফূর্ত আভিজাত্যময় স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে ঐ ধারাবাহিকতায় ছেদ এনে দিয়েছে। নইলে প্রান্তিকায়িত নারীর পরিসরের যন্ত্রণা আখ্যানের আধেয় হতে পারত না। মৃত্যু তো জীবনের দ্বিবাচনিক দর্পণ; এতে প্রতিফলিত হল সুবর্ণলতার সমূহ পরাজয় থেকে উঠে-আসা নতুন আরম্ভের নির্যাস। তাই এই আখ্যানেই আশাপূর্ণাকে বকুল-কথার আসন্ন পাঠকৃতি সম্পর্কে ইশারা রেখে যেতে হল। আখ্যানের সূচনায় এবং সমাপ্তিতে। দ্বিবাচনিক প্রক্রিয়ার অমোঘ উপস্থিতি এতে স্বীকৃত হল যেন।

এইজন্যে মোহনায় দাঁড়িয়ে উৎসের দিকে তাকানোর ভঙ্গিতে প্রতিবেদনের সূচনায় লিখেছেন আশাপূর্ণা :

'তাই সে (সুবর্ণ) জেনেছিল সে কেবল তার অসার্থক জীবনের গ্লানির বোঝা নিয়েই পৃথিবী থেকে বিদায় নিচ্ছে। জেনেছিল তার জন্য কারো কিছু এসে যাবে না। সুবর্ণলতার মৃত্যুতে যে সুবর্ণলতার সতেরো বছরের আইবুড়ো মেয়ে পায়ের তলায় মাটি খুঁজে পায়নি;

এ খবর জেনে যায়নি সুবর্ণলতা। জেনে যেতে পারেনি ওই মেয়েটার কাছে সুবর্ণলতার মৃত্যুদিনই জন্মদিন।'

খুব তাৎপর্যপূর্ণ ও ইশারাময় এই উপস্থাপনা। বকুল তার মায়ের মৃত্যুর মোহনায় না-দাঁড়ালে মায়ের সারাজীবনের উপাখ্যানকে নতুন চোখে দেখতে পারত না। বুঝতে শিখত না একক বাচনের মধ্যে সামূহিক বাচনের উদ্‌ভাসন এবং এক বঞ্চিত ও অবজ্ঞাত নারীর জীবনকথায় পরিসর-সন্ধানী নারীবিশ্বের উন্মোচন। যতক্ষণ দৈনন্দিন বাস্তবের সংলগ্নতায় অতিপ্রকট ছিল সুবর্ণলতা, বকুল তার কাছে যেতে পারেনি। মৃত্যু যখন অমোঘ দূরত্ব রচনা করল, মায়ের জীবন থেকে নারীর নিজস্ব বার্তা পাঠ করার অবকাশ তৈরি হল। প্রতিবেদনের শেষ প্রান্তে কথকস্বর মর্মরিত হয়ে উঠল এভাবে : 'নিত্য সংঘর্ষের গ্লানিরত যে জীবনকে খণ্ডছিন্ন অসমান বলে মনে হয়, দূর পরিপ্রেক্ষিতে সেই জীবনই একটি অখণ্ড সম্পূর্ণতা নিয়ে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে বিস্তৃতির মহিমায়, ব্যাপ্তির মহিমায়। নিতান্ত নিকট থেকে যে আগুন শুধু দাহ আর উত্তাপের অনুভূতি দেয়, দূরে গেলে সেই আগুনই আলো যোগায়।

দূরত্বেই সম্ভ্রম, দূরত্বেই প্রত্যয়।'

এই দূরত্বের বিপ্রতীপে রয়েছে যে অতিসান্নিধ্য, তার ভেতরকার ভয়াবহ ক্রূরতা ও শূন্যতার ছবি তো রচিত হয়েছে উপন্যাসের প্রতিবেদন জুড়ে। নিরেট নিশ্ছিদ্র প্রাচীর পেরিয়ে বাইরের জল-হাওয়া-রোদ এসে পৌছানোর কথা নয়। তবু অঘটন ঘটেছিল। সুবর্ণলতা ঘরের জানালা থেকে পাশের বাড়ির একটা ছোট ছেলের হাতে সুকৌশলে খাতার পয়সা এবং তার ঘুড়ি-লাট্টুর পয়সা চালান করে মাঝেমাঝে বাঁধানো রুল টানা খাতা আনাত। সেই খাতাগুলি দীর্ঘকালের সঙ্গী ছিল, তিলে তিলে ভরে উঠেছিল বহু সুখ-দুঃখের অনুভূতির সম্বলে। লোকচক্ষুর অন্তরালেই সম্পর্কিত ভাসুর জগন্নাথের ছাপাখানায় বইও ছাপিয়েছিল। কিন্তু নিজেরই সন্তান, স্বামী ও পরিবারের অন্য মহিলাদের চরম স্থূল ও সংবেদনাশূন্য প্রতিক্রিয়ায় সুবর্ণের তিল তিল করে গড়ে-ওঠা স্বপ্ন মুহূর্তে ধ্বস্ত হয়ে গেল। নিজেদের বাড়ির ছাদে পাঁচশ বই এবং সেইসঙ্গে সমস্ত খাতা সে পুড়িয়ে ছাই করে দিল।

এই ঘটনা প্রকৃতপক্ষে বহুস্বরিক। কথকস্বর আপাত-নির্মোহ ও নিরাসক্ত বাচনে জানিয়েছে : 'ধ্বংস হয়ে গেল আজীবনের সঞ্চয়। নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল চিরকালের গোপন ভালোবাসার ধনগুলি। সুবর্ণলতার আর কোনো খাতা রইল না।' ঘাতক পিতৃতন্ত্র নারীসত্তার স্বাতন্ত্র্য প্রকাশের কোনও অভিজ্ঞানকে সহ্য করতে পারে না। এই অসহিষ্ণুতায় শুধুমাত্র সুবর্ণলতার লিখন-উদ্যম নয়, তার আত্ম-অভিজ্ঞানসন্ধানী সত্তাও পরাভূত ও নিশ্চিহ্নায়িত হয়ে গেছে। সুবর্ণ যখন নিজেই নিজের স্বপ্ন-সাধের চিতা জ্বালিয়েছে, আকস্মিকভাবে এই অভাবনীয় দৃশ্য বকুলের চোখে পড়ে গিয়েছিল। সেই মুহূর্তে এর তাৎপর্য বোঝা যায়নি। নিজের মায়ের মৃত্যুর দর্পণে যখন লাঞ্ছিত ও অপমানিত নারী-পরিসরের বার্তা খুঁজতে চেয়েছে বকুল, তখন এই আগুনে-সমর্পিত শব্দপুঞ্জের মর্মান্তিক হাহাকার সে উপলব্ধি করেছে। সুবর্ণের আরেক মেয়ে পারুলও কিন্তু কবিতা লিখতে পারেনি, তার স্বামী অমলবাবুর সন্দেহবাতিক তার স্রষ্টা সত্তাকে মুছে দিয়েছিল। এইজন্যে পূর্বসূরিদের যাবতীয় বেদনা ও পরাজয়ের প্রেক্ষিত থেকে সমবেদনার নির্যাস নিঙড়ে নিয়ে বকুলকে ত্রয়ী

উপন্যাসের অন্তিম প্রতিবেদনে আমরা অনামিকা দেবী হয়ে উঠতে দেখলাম। আর, এ-ও কম তাৎপর্যপূর্ণ নয় যে আশাপূর্ণা তাকে অবিবাহিতা হিসেবে উপস্থাপিত করলেন। বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠান নারী-সত্তার পক্ষে কৃষ্ণবিবর, ইশারায় এ-কথা যেন জানানো হল। বই ও খাতা যখন আগুনে পোড়াচ্ছে সুবর্ণ, বকুলের চোখে পড়েছিল : 'প্রচণ্ড রোদের মাঝখানেও সুবর্ণর মুখে আগুনের আভার ঝলক।...সেই আভায় চিরপরিচিত মুখটা যেন অদ্ভুত এক অপরিচয়ের প্রাচীর নিয়ে স্থির হয়ে ছিল।'

আগেই লিখেছি, কথক-ভাষ্যকারের যুগলবন্দি উপস্থিতি এই ঔপন্যাসিক প্রতিবেদনের গোত্রলক্ষণ। অতএব ঠিক তার পরের তিনটি বাক্যে প্রশ্নছলে মীমাংসা প্রস্তাবিত হয়েছে : 'কিন্তু ওই অপরিচিত মুখটার প্রত্যেকটি রেখায় রেখায় ও কিসের ইতিহাস আঁকা? জীবনব্যাপী দুঃখই না পরাজিত সৈনিকের হতাশার, ব্যর্থতার, আত্মধিক্কারের?' বকুল কীভাবে এর উত্তর খুঁজেছে মায়ের সম্ভাব্য অথচ অকর্ষিত জীববিশ্বে এবং পরে তা প্রসারিত হয়েছে বিবর্তনশীল সাধারণ নারীপরিসরে—এখানে সেই তথ্য প্রাসঙ্গিক নয়। তবু এই সূত্রে এ কথা উল্লেখ্য যে আশাপূর্ণা গভীর সংকেতগূঢ় বিষণ্ণ বাচনে বর্তমান থেকে ভবিষ্যতে পৌঁছানোর পথ ও পাথেয় নির্দেশ করে গেছেন। সুবর্ণের আত্ম-নিরাকরণ যেন বা দধীচির অস্থি, যা দিয়ে পরবর্তী প্রজন্মে নির্মিত হল বজ্র। পারাপারহীন অভিমানে-বেদনায়-গ্লানিতে নিজের জীবনের প্রকাশ-সূচক যাবতীয় চিহ্নায়ক সুবর্ণ মুছে ফেলেছিল বলেই তো বকুল কিংবা বকুলেরা, প্রবল দীপ্তি নিয়ে জেগে উঠেছে। একের দহনে অন্যের আলো · এই বার্তায় কূটাভাস আছে, আছে নিষ্ঠুরতাও। তবু এটাই নারীসত্তা নির্মাণের ধারাবাহিক প্রকল্প। তাই 'সুবর্ণলতা'র অন্তিম পরিচ্ছেদে বকুল হাতে তুলে নিয়েছে পতাকা, বিনির্মিত জীবন থেকে নতুন বয়ান রচনার অঙ্গীকার :

'এই ছাতেরই ওই কোণটায় আর এক চিতা জ্বলতে দেখেছিল সে। কোনোদিন জানলো না কী ভস্মীভূত হয়েছিল সেদিন।

আজ ঘুমের আগে মা'র ফেলে যাওয়া সমস্ত কিছু তন্নতন্ন করে দেখছিল সে, কোথাও পায়নি একটি লাইনও হস্তাক্ষর। 'সুবর্ণলতা যে নিরক্ষর ছিল না, সে পরিচয়টা যেন একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে গেছে সুবর্ণলতা।

বকুল ছাতের সেই চিতার কোণটায় বসে রইল অন্ধকারে।'

পাঁচ

বলা যায়, এই অন্ধকার আলোর অধিক কেননা সেখানে বকুলের দ্রষ্টা চক্ষু জেগে উঠেছে। নিশ্চিতভাবে এই প্রথম তার মা সুবর্ণলতার সম্পূর্ণ জীবনের অন্তঃসার অথবা অন্তঃসারশূন্যতা তার কাছে ধরা পড়েছে। অন্তত বকুল তো সুবর্ণলতার প্রথম সন্তান চাঁপার মতো নয় যে তার মাকে 'বৌ হয়ে থাকতে দেখেছে, অথচ দেখেছে তার অনমনীয়তা আর দেখেছে বাড়িসুদ্ধ সকলের বিরূপ মনোভঙ্গি।' এবং, পিতৃতন্ত্রের ছায়ায় লালিত হয়ে পূর্বজাদের যান্ত্রিক অনুকৃতি হিসেবে চাঁপার মতো চূড়ান্ত অগভীরতার পরিচয় দেয়নি বকুল। মুক্তকেশীদের বহতা ধারার প্রতিনিধি হিসেবে চাঁপা ব্যস্ত থেকেছে 'শাশুড়ির চোখে ছানি, পিসশাশুড়ির বাত, খুড়শ্বশুরের উদরী; দ্যাওরপোদের হাম-পানবসন্ত, নিজের ছেলেদের

রক্ত আমাশয়, হুপিং কাসি' নিয়ে। 'তা ছাড়া চাঁপার ভাসুরঝির বিয়ে, ভাসুরপোর পৈতে, ভাগ্নীর সাধ, মামাশ্বশুরের শ্রাদ্ধ, আর সর্বোপরি চাঁপার বরের মেজাজ' তো আছেই। এতসব সামলে মায়ের মৃত্যুশয্যায় চাঁপার আসার ফুরসৎ হয়নি। বর্ণনার এই নাতিপ্রচ্ছন্ন শ্লেষ কার্নিভালের ছোঁয়ায় শানিততর হয়ে ওঠে যখন লেখিকা জানান : 'মায়ের নবাবী, মায়ের বিবিয়ানা, মায়ের গো-ব্রাহ্মণে ভক্তিহীনতা, মায়ের ছেলের বৌদের আদিখ্যেতা দেওয়া, আর কোলের মেয়েকে আস্কারা দেওয়ার বহর—এই সবই হল চাঁপার গল্প করবার বিষয়বস্তু।' শুধু কি শ্লেষ! সীমাহীন বেদনাও জেগে ওঠে কোথাও; কেননা, বুঝতে পারি, সুবর্ণলতার সন্তান হয়েও চাঁপা আসলে তার মায়ের সেই অপর যাতে আলো পড়ে না। বকুল-পারুল ছাড়া অন্য সবাই মূলত প্রবোধের সন্তান, পিতৃতন্ত্রের কৃষ্ণ মহাদেশে তাদের জন্ম ও বৃদ্ধি ঘটেছে। এই প্রেক্ষিতে সুবর্ণর জীবন-ব্যাপ্ত বেদনাসিন্ধুতে উত্তাল হয়ে ওঠে না-ঝরা চোখের জলের জোয়ার।

অতএব অক্ষরের চিতা জ্বলে উঠেছিল যেখানে, সেখানকার নিস্তব্ধ অন্ধকারে বাঙ্ময় হয়ে উঠল অক্ষর-স্থাপত্যের পুনরুজ্জীবনের সম্ভাবনা। বকুলের চেষ্টায় সুবর্ণলতার পারাপারহীন হাহাকারের গ্রন্থনা থেকে পুনর্জীবিত হবে তার জীবনের পাঠকৃতি, সৃজনশীল কল্পনা তাতে বাস্তবকে অনুসরণ করবে সংলগ্ন ছায়ার মতো। কিন্তু সুবর্ণলতা কেন্দ্রিক ঔপন্যাসিক প্রতিবেদনে সেইসব ইশারা মাত্র। বকুল তার মায়ের পাণ্ডুলিপির খোঁজে জগন্নাথের কাছে গিয়ে জানতে পারে প্রেসের কর্মচারী প্রেসের যাবতীয় জিনিসপত্র শিশি-বোতল-ওয়ালাকে বেচে দিয়েছে। এভাবে সুবর্ণের অক্ষর-বিশ্ব নিঃশেষে মুছে গিয়েছে। এই বর্ণহীন আকারহীন শূন্যতা থেকেই শুরু হয় বকুলের অভিযাত্রা। এবং, সুবর্ণলতার জীবন-কথার পুনর্নির্মাণ- ও। এ আসলে বার্ত-কথিত শূন্যবিন্দু লিখনের চমৎকার নান্দনিক ও সামাজিক ভাষ্য। উপন্যাসের সমাপ্তিতে বকুল মনে-মনে বলে : 'মা, মা গো! তোমার পুড়ে যাওয়া, হারিয়ে যাওয়া লেখা, না-লেখা সব আমি খুঁজে বার করব। সব কথা আমি নতুন করে লিখব। দিনের আলোর পৃথিবীকে জানিয়ে যাব অন্ধকারের বোবা যন্ত্রণার ইতিহাস। যদি সে পৃথিবী সেই ইতিহাস শুনতে না চায়, যদি অবজ্ঞার চোখে তাকায়, বুঝব আলোটা তার আলো নয়, মিথ্যা জৌলুসের ছলনা। ঋণ শোধের শিক্ষা হয়নি তার এখনও।' এই প্রগাঢ় উচ্চারণের আন্তরিকতা কার্যত কল্পনা-নির্মিতির সঙ্গে পাঠকের চিরাচরিত বাস্তব জগতের ব্যবধান মুছে দিয়েছে। জীববিশ্বের এই কথকতা শিল্প ও জীবনের মান্য ব্যবধানকে অবান্তর করে দিয়েছে যেন। তাই প্রতিবেদনের এমন মোহানায় পৌঁছে সুবর্ণলতার জীবন-বৃত্তান্তের তাৎপর্য আমাদের কাছে আমূল পাল্টে যায়। নারী-পরিসরের সন্ধান-বিষয়ক প্রকল্পটির নিবিড়তর পুনঃপাঠের সূচনা হয় তখন। সত্যবতী ও বকুলের সংযোজক অস্তিত্ব হিসেবে নয় শুধু, অন্ধকারের বোবা যন্ত্রণায় জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে গিয়েও সুবর্ণলতা তীব্র বেদনার কালকূট আপন অস্তিত্বে শুষে নিতে-নিতে নিজস্ব মহিমায় আত্মদীপ হয়ে ওঠে।

যেহেতু এই উপন্যাসে লেখিকা নিজেই নিয়েছেন ভাষ্যকারের ভূমিকা, সত্যবতীর তুলনায় সুবর্ণলতার আপাত-দৃষ্টিতে পিছিয়ে যাওয়ার কারণও বয়ানের মধ্যে চমৎকারভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। বারবার শাশুড়ি ও অন্যান্যদের কাছে গঞ্জনা পেয়েও, বিশেষভাবে

প্রবোধের মতো কামুক ইতর সন্দেহ-প্রবণ স্বামীর দ্বারা অপমানিত হয়েও কেন সুবর্ণ বিদ্রোহ করতে পারেনি : এর কারণ জানাতে গিয়ে লেখিকা বাস্তব পরিস্থিতির বাস্তব বিশ্লেষণ করেছেন। নারীর পরিসর সন্ধান তো একরৈখিক হতে পারে না কখনও। এইজন্যে আশাপূর্ণা এভাবে তাঁর বয়ান উপস্থাপিত করেন যে সত্যবতীর মেয়ে হয়েও সুবর্ণলতা মায়ের অনুকরণ করতে পারে না। তার মা স্বামীর বিশ্বাসঘাতকতা সইতে না-পেরে এককথায় স্বামী সংসার ত্যাগ করে গিয়েছিল, আর ফেরেনি। সে ব্যক্তি হয়ে উঠতে পেরেছিল কি না তার সংকেত নিহিত রয়েছে সুবর্ণের কাছে লেখা দীর্ঘ চিঠিতে। আসলে যে-কথাগুলি আখ্যানের নিজস্ব ব্যাকরণ অনুযায়ী আশাপূর্ণা প্রকাশ করতে পারেননি, তা দীর্ঘ চিঠির সূত্রে ব্যক্ত করেছেন।

বেশ কিছু মৌলিক প্রশ্ন, উপন্যাসের গণ্ডির মধ্যে মীমাংসা না-হওয়ার সম্ভাবনা সত্ত্বেও, তীক্ষ্ণভাবে উত্থাপিত হয়েছে। সত্যবতী এই আশা প্রকাশ করেছিল যে সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে সুবর্ণ এগিয়ে যেতে পারবে। সংসার থেকে দূরে সরে গিয়ে যাদের বুদ্ধিহীন বলে ভেবেছে সত্যবতী, ভেবেছে যে তারা বড়জোর বিরক্তি ও করুণার পাত্র, ক্রোধের যোগ্য নয়—গৃহবন্দিনী সুবর্ণ সম্ভবত নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে এই সিদ্ধান্তে আসতে পারত না। সত্যবতী নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করে হিন্দু বিবাহের মূল তাৎপর্য ও লক্ষ্য সন্ধান করেছে; কিন্তু তথাকথিত জন্ম-জন্মান্তরের বন্ধন পুরুষ ও নারীর পক্ষে সমান নয় কেন—এর কোনো সদুত্তর পায়নি। তবে এই চিঠিতে যেসব জিজ্ঞাসা তীক্ষ্ণ শলাকার মতো উঠে এসেছে, মূল আখ্যানের অন্তর্গত না-হয়েও প্রতিবেদনের পরাপাঠ প্রতিষ্ঠার পক্ষে তা আবশ্যিক। যেমন : 'ক্রমশ বুঝিয়াছি এর উত্তর পুরুষ দিতে পারবেনা, ভবিষ্যৎ কালই দিবে। কারণ কোনো একটি সম্পত্তিতে ভোগ দখলকারী ব্যক্তি স্বেচ্ছায় সহজে দানপত্র লেখিয়া দেয় না। স্ত্রীলোকের যাহা কিছুতে অনধিকার, তাহার অধিকার অর্জন করিতে হইবে স্ত্রী-জাতিকেই।'

ঐ চিঠিতে সত্যবতী আক্ষেপ করেছিল যে মেয়ে-মানুষের কর্মজীবন নেই যেখানে পুরুষের মতো তারও জীবনের সার্থকতা-অসার্থকতা নির্ণীত হতে পারে। নিঃসন্দেহে এই বক্তব্য পিঞ্জরবদ্ধ বিহঙ্গীদের পক্ষে চিন্তারও অগোচর। সত্যবতী কাশীতে মেয়েদের স্কুল করতে পেরেছিল। নারী-সত্তার সামাজিকীকরণ যে তার মুক্তির প্রধান সোপান, এই ইঙ্গিত রইল এখানে। অভিজ্ঞতার পাঠ থেকেই সত্যবতী এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল : 'আশা হয় এইভাবেই কালের চেহারার পরিবর্তন হইবে। মানুষের বুদ্ধি বা শুভবুদ্ধি সহজে যাহা করিয়া তুলিতে সক্ষম না হয়, প্রয়োজন আর ঘটনা প্রবাহই তাহাকে সম্ভব করিয়া তোলে। কেবলমাত্র পুথিপত্রে বা কাব্যে গানে নহে, ভবিষ্যতে জগতের সর্বক্ষেত্রেই পুরুষ মানুষকে এ-কথা স্বীকার করিতেই হইবে মেয়েমানুষও মানুষ। বিধাতা তাহাদেরও সেই মানুষের অধিকার ও কর্মদক্ষতা দিয়াই পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন। একপক্ষের সুবিধা সম্পাদনের জন্যেই তাহাদের সৃষ্টি নয়।' নিঃসন্দেহে সত্যবতী কালান্তরের পথিক, নিজের সময় থেকে অনেক বেশি এগিয়েছিল বলেই দেশের পরাধীনতা ও স্ত্রীজাতির পরাধীনতা দূর করার কথা সে একই নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করেছে। শুধু নিজের মেয়ের জন্যে নয়, দেশের সহস্র সহস্র

সুবর্ণলতার জন্যে কেঁদেছে সত্যবতী। ন'বছর বয়সে সুবর্ণের বিদ্যাশিক্ষার ইতি হয়েছিল বলে মায়ের মনে দ্বিধা ছিল, হয়তো এতদিন পরে তার কথা মেয়ে বুঝবে না। আসলে সুবর্ণের মা নিজেকে জানিয়ে গেছে, সুবর্ণকে জেনে যায়নি। সুবর্ণ কিন্তু 'স্তব্ধ, মৃত্যুর মতো স্তব্ধ' হয়ে গিয়েছিল। 'ধৈর্যের, সহ্যের, ত্যাগের এবং ক্ষমার তপস্যা' সে কম করেনি। আর, অভিজ্ঞতা তাকেও এই পাঠ দিয়েছে যে মায়ের পরিস্থিতির সঙ্গে তার পরিস্থিতির আকাশ-পাতাল তফাত।

ছয়

অতএব মা যা করতে পেরেছিল, সুবর্ণ তা করতে পারেনি। মায়ের তেজের কণিকামাত্র পায়নি সে, তাও ঠিক সিদ্ধান্ত নয়। কারণ, সুবর্ণর মা'র জীবনের পৃষ্ঠপটে ছিল এক অত্যুজ্জ্বল সূর্যজ্যোতি, সত্যবতীর বাবা সত্যবতীর জীবনের ধ্রুবতারা, সত্যবতীর জীবনের বনেদ, সত্যবতীর মেরুদণ্ডের শক্তি।

সুবর্ণর পৃষ্ঠপটে শুধু এক টুকরো বিবর্ণ ধূসরতা। সুবর্ণর কাছে বাবার স্মৃতি—বাবা প্রতারণা করে তার বিয়ে ঘটিয়ে জীবনটাকে ধ্বংস করে দিয়ে নির্লিপ্ত হয়ে বসে আছে।

'সুবর্ণর বাবা সুবর্ণর ভাগ্যের শনি।

আর স্বামীভাগ্য?

সে-ও কী কম তফাত?

সত্যবতীর স্বামী অসার অপদার্থ ছিল কিন্তু অসভ্য অশ্লীল ছিল না। সত্যবতীর অযোগ্য হতে পারে তবে সে অত্যাচারী নয়। কিন্তু সুবর্ণলতার ভাগ্যে তো মাত্র ওই দ্বিতীয় বিশেষণগুলোই। আজীবন সুবর্ণকে একটা অসভ্য, অশ্লীল আর অত্যাচারীর ঘর করতে হচ্ছে।

ত্যাগ করে চলে যাবে কখন?

সোজা হয়ে দাঁড়াতে শেখবার আগেই তো ঘাড়ে পিঠে পাহাড়ের বোঝা উঠছে ক্রমে।'

"সত্যবতীর ছিল হাল্কা ছোট্ট সংসার, কিন্তু সুবর্ণলতা একান্নবর্তী পরিবারের অন্ধকূপে বন্দিনী। তার ওপর কামুক প্রবোধের জান্তব চাহিদা মেটাতে গিয়ে তাকে বারবার আঁতুড়ঘরে যেতে হয়েছে। তাই তো সুবর্ণ মনে-মনে মাকে বলেছে : 'তোমার মেয়ে মায়ে- তাড়ানো বাপে-খেদানো তেজটা ফলাবে তবে কোন পতাকাতলে দাঁড়িয়ে? ...সকলের জীবন সমান নয়, সবাইকে একই মাপকাঠিতে মেপে বিচার করা যায় না। যাকে বিচার করতে বসবে, আগে তার পরিবেশের দিকে তাকিও।'

বস্তুত এই বোধ দ্বিবাচনিক জীবন-সত্যের প্রধান প্রাক্-শর্ত। ঔপন্যাসিক প্রতিবেদন জুড়ে এই বিরুদ্ধ পরিবেশের অমানবিক হিংস্রতার ছবি অজস্র অনুপুঙ্খে ব্যক্ত হতে দেখেছি। সুবর্ণ এমন এক রক্ষণশীল পরিবারের পঙ্ককুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল, যাদের কাছে বহতা সময়ের কোনো বার্তা পৌঁছায় না, বাইরের জগতের রূপান্তর কোনো তাৎপর্য নিয়ে আসে না। কিন্তু সুবর্ণ রাজনৈতিক পরাধীনতা থেকে মুক্তি কামনার উত্তাপ অনুভব করে, কবিতার সূক্ষ্ম আবেদন তার মনে শিহরণ জাগায়। সবচেয়ে বড় কথা, মানবিক সম্পর্কের নিজস্ব মহিমার তাৎপর্যও সে অনুভব করে। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রে তার সন্দেহ-প্রবণ সংকীর্ণ-চিত্ত স্বামী প্রবোধ সমস্ত আলো শুষে নেয়। এই পরিবেশের রূঢ় বাস্তবের কথাই মনে মনে

ভেবেছে সুবর্ণ। বারবার নিষ্ঠুর আঘাতের মধ্যে তাকে আবিষ্কার করতে হয়েছে, তার শ্বশুর বাড়িতে 'শোভা সৌন্দর্য শিল্প রুচি' ইত্যাদির কোথাও ভূমিকা নেই। এমনকী তার শ্বশুর বাড়িও যেন 'সাদামাটার একটা প্রতীক, না আছে শ্রী না আছে ছাঁদ'। একে একে সে জেনেছে স্ত্রীর মতামতের কোনো দাম নেই কেননা স্ত্রীর মত নিয়ে কাজ করলে লোকে বলবে স্ত্রৈণ! প্রতিবেদনের শুরুতে আশাপূর্ণা দেখিয়েছেন অজস্র অপমান সইতে সইতেও বিবাহিত জীবনের প্রথম পর্যায়ে 'নিজের ক্ষমতার উপর অনেকখানি আস্থা আর আশা ছিল সুবর্ণলতার'। কীভাবে সব কিছু ঝরে গেল তার, নিজের একান্ত গ্লানিময় পরাধীন অবস্থানের প্রতীতি শুষে নিল তার জীবন-বাসনা · তারই রক্তিম বিবরণ ছড়িয়ে আছে উপন্যাসের পাতায়-পাতায়। আর, ঠিক এখানেই 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র তুলনায় 'সুবর্ণলতা'র পরিবেশের মৌলিক ভিন্নতা স্পষ্ট।

সত্যবতীর পিঠে তার শাশুড়ি এলোকেশী কিল বসিয়ে দিয়েছিল বলে সদ্য শ্বশুরঘর করতে-আসা সত্যবতী বলে উঠেছিল, 'তুমি আমায় মারলে যে!' সামাজিক বিধি অনুযায়ী শাশুড়ির সঙ্গে কথা বলা নিষেধ, তবু সে ন্যায্য প্রতিবাদ জানানোর জন্য নিয়ম ভাঙতে দ্বিধা করেনি। তখন তার মুখে ছিল 'আগুনের আভা'। পাঠকের মনে পড়ে, সুবর্ণলতার মুখমণ্ডলেও ঐ আগুনের আভা ফুটে উঠেছিল অন্য এক পরিস্থিতিতে। বৌ ঠিক করতে চ্যালাকাঠ পিঠে ভাঙবে, এই শাসানিতে ভয় পায়নি সত্যবতী; প্রত্যাহ্বান জানিয়েছে : 'মারো না দেখি, তোমার কত চ্যালাকাঠ আছে।' সুবর্ণলতা অবশ্য শাশুড়ির সঙ্গে কথা বলতে পারত; কিন্তু তাতে পরিস্থিতির খুব একটা ইতর-বিশেষ হয়নি। সব বিষয়ে তার প্রবল ইচ্ছা পিতৃতন্ত্রের নিশ্ছিদ্র দুর্গে প্রতিহত হতে-হতে অবশ্যম্ভাবীভাবে হারিয়ে গেছে নৈঃশব্দ্যের সংযোগশূন্য অন্ধকারে। যুক্তির ভাষা মুক্তকেশীদের বোধগম্য হয়নি কখনও। নতুন বাড়ি তৈরির সময় সুবর্ণের কোনো কথা গ্রাহ্য হয়নি; আক্ষরিক ও রূপক—কোনো অর্থেই বারান্দা ছিল না তাতে। বহির্জগতের সঙ্গে নারীর সংযোগের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনাকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করে পিতৃতন্ত্র। তাই চব্বিশ বছর বয়সেই প্রবোধ ইতরতায় ও চিত্ত-মালিন্যে দেহে-মনে জরাগ্রস্ত বৃদ্ধের সঙ্গে পাল্লা দেয়। সন্দেহপ্রবণ মনে কুটিল কথা ও কদর্য ভাবনার যত প্রমাণ সে ভবিষ্যতে দিয়েছে, তার সূত্রপাত হয়েছিল সুবর্ণকে বাড়ি-তৈরি না-দেখানো এবং বারান্দার ব্যবস্থা না-করার মধ্য দিয়ে। চোদ্দ বছর বয়সেই সুবর্ণ পরিচিত হয়েছে জলজ্যান্ত মিথ্যে ধাপ্পার সঙ্গে; বুঝেছে, স্বামী প্রবোধ শুধু নিরবচ্ছিন্নভাবে তার বাড়ন্ত শরীরকে ভোগ করতে চায়। সুবর্ণের মন নিয়ে প্রবোধের কোনো মাথাব্যথা নেই। এইজন্যে একের পরে এক সন্তানের জন্ম দিয়ে সুবর্ণ শুধু তার নিঃসঙ্গতাবোধই প্রসারিত করেছে। তাকে এই অলঙ্ঘ্য বিধি জেনে নিতে হয়েছে যে, 'বেটাছেলের আবার কিছুতে দোষ আছে নাকি? মেয়েমানুষকেই সব কিছু মেনে-শুনে চলতে হয়।' মেয়েমানুষের কোনো আকাঙ্ক্ষা থাকার কথা নয়; তার মুখে কখনও উচ্চারিত হতে পারবে না, 'আমার চাই'। যদি কেউ এই স্পর্ধা দেখায়, সীমাহীন নিষ্ঠুরতা দিয়ে তাকে শাসন করে পিতৃতন্ত্র। যতদিন বালিকা ছিল সুবর্ণ, তার মায়ের গৃহত্যাগের জন্যে মরমে মরে থাকত। তার মা যে মেয়ে-মানুষ হওয়ার বদলে ব্যক্তি-মানুষ হতে চেয়েছে এবং চাওয়াকে মহিমান্বিত করেছে, এই সত্যের উদ্ভাসন হয়েছে অনেক পরে।

কথকস্বর জানিয়েছে : 'তা অনেক দিন পর্যন্ত অপরাধিনী-অপরাধিনী হয়েই ছিল সুবর্ণ। তারপর দেখলে এরা শক্তের ভক্ত, নরমের যম। যত নীচু হও ততই মাথায় চড়ে এরা; অতএব শক্ত হতে শিখল।' অবশ্য শক্ত শুধু ভেতরে-ভেতরে, উপন্যাসের বয়ানে তেমন স্পষ্ট বহিঃপ্রকাশটা দেখিনি যেমনটি দেখেছি সত্যবতীর ক্ষেত্রে। আবার ফিরে আসে অমোঘ পরিবেশের প্রসঙ্গ। আর, কে না জানে দ্বিবাচনিকতার প্রাথমিক সূত্র অনুযায়ী, প্রতিটি প্রসঙ্গ চায় যথার্থ প্রেক্ষিতের সমর্থন। সত্যবতী তবু বাবার কাছে যেতে পেরেছিল মাঝে-মাঝে, অন্তত মনে ছিল বাবার উজ্জ্বল উপস্থিতি। কিন্তু সুবর্ণেব তো বাবার কাছে যাওয়ার উপায় ছিল না। অতএব নির্গমশূন্য চক্রব্যূহে বন্দিনী হয়েই সে মনের গভীরে লালন করেছে অনন্বয়ের নিজস্ব প্রতিরক্ষা কৌশল। যারা শৌখিন নয়, সভ্য নয়, রুচি-পছন্দের মানে বোঝে না, উদার আবহাওয়ার স্বাদ জানে না, বই পড়তে শেখেনি—তাদের বাধ্যতামূলক গ্লানিকর সাহচর্যের মধ্যে থেকে সুবর্ণ 'জীবনসৌন্দর্যের মাপকাঠি' খুঁজেছে : এটাই তার প্রতিবাদ। প্রথম অবস্থায় ভেবেছে : 'এই জীবনের মধ্যেই মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে সুবর্ণকে'। কিন্তু পারেনি। ঔপন্যাসিকের বয়ন-কৌশলে বাচনে আমরা পেয়েছি বহুস্বরিক উদ্বৃত্তের ইশারা : '...সুবর্ণ এ দরজা ও দরজা পার হয়ে একই ঘরে বারবার আসে বিমূঢ়ের মতো, বুঝতে পারে না কোন দরজাটি দিয়ে বেরোতে পারলে সেই গোপন রহস্যে ভরা পরম ঐশ্বর্যলোকের দরজাটি দেখতে পাবে। ঘুরেফিরে তো শুধু দেয়াল। রিক্ত শূন্য খাঁ খাঁ করা সাদা দেয়াল।' যেন উপন্যাসের নিজস্ব ভাষায় আশাপূর্ণা মাত্র দুটি বাক্যে সুবর্ণলতার জীবনবৃত্তান্তের সারমর্ম তুলে ধরেছেন; প্রকৃতই এরপর আখ্যান যত ডালপালা ছড়িয়েছে, দেখতে পেয়েছি, প্রবঞ্চিতা ও অপমানিতা সুবর্ণের জীবনে শুধু ঘুরেফিরে সাদা দেয়াল যা রিক্ত যা শূন্য যা গ্রীষ্মের দুপুরে মরুভূমির মতো খাঁখাঁ করে। তাতে কখনও কোনো ছবির আদল তৈরি হয না। মিথ্যাবাদী, বিবেকশূন্য, লজ্জাহীন প্রবোধ বরং ঠকানোর কথায় চোটপাট করে আরও। বেটাছেলে পুরুষ-বাচ্চা ভেড়ুয়ার মতন পরিবারের কথায় ওঠবোস করবে না, কিন্তু সেই রাতেই স্ত্রী-শরীর থেকে প্রাপ্য সুখ লুণ্ঠন করবে ঠিকই। সুবর্ণ যাবে রান্নাঘরে এবং 'অপরিসীম একটা ধিক্কারে দীর্ণ-বিদীর্ণ' হবে। অল্প বয়সে যদি কোনো প্রতিজ্ঞা করেও, পরবর্তী পর্যায়ে তার সন্তানেরা পিতৃতন্ত্রের পতাকাই বহন করবে, মায়ের অভিমানের কোনো খবর এরা রাখবে না।

'সুবর্ণলতা'-কেন্দ্রিক এই ঔপন্যাসিক প্রতিবেদনেও আশাপূর্ণা নারীসত্তার নির্মাণ-প্রকল্প উপস্থাপিত করেছেন; তবে তা রয়েছে 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'তে ব্যক্ত প্রকল্পের বিপ্রতীপে। সত্যবতীর ক্ষেত্রে বড় হয়ে উঠেছে নারী কী হতে পারে, আর সুবর্ণের উপস্থাপনায় প্রাধান্য পেয়েছে, নারী কী হতে পারে না। 'কেন' নিরুচ্চার যদিও, অব্যক্ত নয়। এই দুটি প্রতিবেদন না-হলে দ্বিবাচনিকতার প্রক্রিয়া ও প্রকরণ সম্পূর্ণ হতে পারে না, এই হল আশাপূর্ণার প্রত্যয়। যান্ত্রিকভাবে নির্ধারিত বিবাহের মধ্য দিয়ে নারীপুরুষের জন্ম-জন্মান্তরের বন্ধন কতখানি সত্য, ঐ বন্ধন ছিন্ন করার দুঃসাহস দেখিয়ে তা যাচাই করতে চেয়েছিল সত্যবতী। তার মেয়ে সুবর্ণ চোদ্দ বছর বয়সেই শরীর-লুব্ধ স্বামী সম্পর্কে এই উপলব্ধিতে পৌছেছিল : 'লোকটার ওই পরিতৃপ্ত ঘুমন্ত দেহটার দিকে তাকিয়ে কেমন ঘৃণা আসে, অপবিত্র লাগে

লোকটাকে। এই কিছুক্ষণ আগেই যে ওর আদরের দাপটে হিমশিম খেতে হয়েছে, তা ভেবে বুকটা কেমন করে ওঠে।' কিন্তু হীন প্রবৃত্তিসম্পন্ন ঐ লোকটার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার কথা ভাবতে পারেনি। যৌনতা ও প্রতাপের নিগূঢ় সম্পর্কের দিকটি আলতোভাবে ছুঁয়ে গেছেন ঔপন্যাসিক। যেহেতু সুবর্ণ নিরালম্ব ও নিঃসহায়, নারীসত্তার অবমাননা মেনে নিয়েই তাকে শুকনো কাঠে কিশলয় জেগে ওঠার স্বপ্ন দেখতে হয়েছে। নিজের মধ্যে প্রচ্ছন্ন 'ভালোবাসার আর ভালোবাসা পাবার বাসনা'য় চোখ বুজে আশ্রয় খুঁজতে হয়েছে। কেননা ঐ পাষণ্ড স্বামী 'নেব না' বললে দাঁড়াবে কোথায় সুবর্ণ? তার তো কোনো পাদপপাদপ নেই সত্যবতীর বাবার মতো।

সাত

সুতরাং আমৃত্যু সুবর্ণ রয়ে গেল নিষ্ক্রমণশূন্য পিঞ্জরে। মাঝেমাঝে আকাশ হাতছানি দিয়েছিল তাকে, শুনেছিল বড় সময় ও বড় পরিসরের ঊর্মিমালার দূরাগত আহ্বান। আপন শূন্যতাকে ভরিয়ে দেওয়ার জন্যে শূন্যকে নিঙড়ে নিয়ে তৈরি করেছিল একান্ত নিজস্ব বয়ান। কিন্তু বারবার সব কিছু তলিয়ে গেছে চোরাবালিতে; নিজের নিভৃত আকাঙ্ক্ষার চিতা রচিত হতে দেখেছে। অমোঘ এই অসম্পূর্ণতার বয়ান থেকে নারীসত্তার নির্মাণ-প্রকল্পই পাঠকের অভিনিবেশ দাবি করে। 'সুবর্ণলতা ভব্যতা চেয়েছে, সভ্যতা চেয়েছে, মানুষের মতো হয়ে বাঁচতে চেয়েছে। সুবর্ণলতা বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে নাড়ীর যোগ রাখতে চেয়েছে, দেশের কথা ভাবতে চেয়েছে, দেশের পরাধীনতার অবসান চেয়েছে।' অতএব সত্যবতীর মতো দুঃসাহসী না-হলেও সুবর্ণ প্রতিস্পর্ধা জানিয়েছে নিশ্চয়। প্রতিস্পর্ধা বলছি কারণ তার চারদিকে ছিল ঘোর অন্ধকারের কৃষ্ণবিবর। চূড়ান্ত রক্ষণশীল পরিবারের বৌ হয়েও সুবর্ণের সমস্ত সত্তা মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় ছটফট করে বহির্জগতে বহমান বাতাসের স্পর্শ চায়। আর, পায়নি বলেই পনেরো বছর বয়স থেকেই মৃত্যুকামনা করতে-করতে পঞ্চাশ বছর বয়সে মারা যায়। তার শ্বশুরবাড়ির বাসিন্দাদের 'বোধের জগৎটা ওদের তৈরি বাড়ির ঘরের মতো। কোথাও এমন একটা ভেন্টিলেটার নেই যেখান দিয়ে চলমান বাতাসের এক কণা ঢুকে পড়তে পারে। দর্জিপাড়ার এই গলিটার বাইরে আর কোনো জগৎ আছে, এ ওরা শুধু জানে না তা নয় মানতেও রাজী নয়।' সুবর্ণ 'খবরের কাগজ পড়া মেয়েমানুষ' বলে তাদের কাছে ভয়াবহ ও দুর্বোধ্য। চূড়ান্ত অশিক্ষা ও কুসংস্কারের কাছে বাইরের আলো-হাওয়া-রোদ পরাভূত হয়েছে বলেই সুবর্ণের জীববিশ্বও পূর্ণতা পায়নি।

ঔপন্যাসিক প্রতিবেদনে অজস্র অনুপুঙ্খ গ্রন্থনার মধ্যে অনিবার্য ভবিতব্যকে প্রতিষ্ঠিত হতে দেখেছি, এমন বলব কি? বাপের বাড়িতেও তো 'একটু বিষণ্ণতার আধারে ভরা একখণ্ড মূল্যবান রত্ন' বলে গণ্য-হওয়া সুবর্ণর দাম মুহূর্তে কমে গিয়েছিল। তার ব্যক্তিত্বহীন সংবেদনাশূন্য বাবা নবকুমার যখন মেয়ের সংকটকে বোঝার চেষ্টা না-করে পুরোনো অভ্যাসে সত্যবতীকে গালাগাল দিয়েছে, সুবর্ণ পলকে বুঝে নিয়েছে, নবকুমার ও প্রবোধের মধ্যে তফাত শুধু মাত্রাগত, চরিত্রগত নয়। আর, তার ভাই সাধনও পিতৃতন্ত্রের প্রহরী, মা সত্যবতী তার কাছে যতখানি অস্বস্তিকর ততখানি বোন সুবর্ণও। প্রকৃতপক্ষে নারীর পরিসর কোথাও নেই, না বিবাহ-পূর্বপর্তী অবস্থানে না বিবাহ-পরবর্তী পিঞ্জরে। 'নিজের কপালটা

ধাই ধাই করে দেওয়ালে ঠুকতে ঠুকতে' সুবর্ণ যখন আর্ত প্রশ্ন করে, 'কেন? কেন তোমরা সবাই মিলে আমাকে অপমান করবে? কেন? কেন?'—তাতে সমস্ত প্রান্তিকায়িত নারীসত্তার সামূহিক বাচনই ব্যক্ত হয়। আসলে এই বিন্দুতে শেষ হতে পারত আখ্যান, তাতে ঔপন্যাসিকতার হানি হত না কোনো। কেননা পরবর্তী তিনশ পৃষ্ঠা ধরে ঐ সামূহিক স্বরই বিস্তৃত হয়েছে কেবল। এখানে 'তোমরা' সর্বনাম বিশেষ তাৎপর্যবহ। আর 'আমার' আসলে আমাদের। ঐ আর্ত প্রশ্নের তীব্র বিচ্ছুরণ শেষ হতে-না-হতে ভাষ্যকার-কথকস্বর জানায় :

> *'ভিতরের অব্যক্ত যন্ত্রণাকে প্রকাশ করবার আর কোনো ভাষা খুঁজে পায় না-বলেই সুবর্ণলতা ওর এই এতদিনকার বিবাহিত জীবনের পুঞ্জীভূত সমস্ত প্রশ্নকে এই একটিমাত্র শব্দের দ্বারা ব্যক্ত করতে চায়।'*

কিন্তু কাদের কাছে? সেইসব নবকুমার-প্রবোধ-সাধনদের কাছে যারা বাবা হয়ে, স্বামী হয়ে, ভাই হয়ে নির্বিকার ও নির্বিবেক পীড়নকে নিশ্ছিদ্র করে তুলেছে? সেইসব মনুষ্যবেশী জন্তুদের কাছে, শতধৌত হলেও যেসব অঙ্গারেব মালিন্য মোচন হয় না? অতএব সুবর্ণলতাদের প্রশ্ন আসলে বহতা কালের কাছে, কোনো-এক দিন মীমাংসা উঠে আসবে, এই প্রত্যাশায়। আপাতত কথকস্বর নারীপরিসরের সম্ভাব্য নির্মাণ-প্রকল্পের প্রতি তর্জনি সংকেত করতে পারে শুধু :

> *'হয়তো বা শুধু তাও নয়, সমস্ত অবরুদ্ধ নারীসমাজের নিরুদ্ধ প্রশ্নকে মুক্তি দেবার দুর্দমনীয় বাসনা এটা, যা সত্যকার কোনো পথ না পেলে এমন উন্মত্ত চেষ্টায় মাথা কুটে মরে।*
> *হয়তো বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধেও সভ্যতা আর প্রগতির চোখ ঝলসানো আলোর সামনে সাজিয়ে রাখা রঙচঙে পুতুল মেয়েদের পিছনের অন্ধকারে আজও কোটি কোটি মেয়ে এমনিভাবে মাথা কুটে কুটে প্রশ্ন করছে—কেন? কেন? সুবর্ণলতার যুগ কী শেষ হয়ে গেছে? কোনো যুগই কী কোনোদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে শেষ হয়ে যায়? হয়তো যায় না।*
> *হয়তো বৃদ্ধা পৃথিবীর শীর্ণ পাঁজরের খাঁজে খাঁজে কোথাও কোনোখানে আটকে থাকে ফুরিয়ে যাওয়া যুগের অবশিষ্টাংশ, এখানে ওখানে উঁকি দিলে তার সন্ধান মেলে।*
> *যেখানে মাথাকোটার প্রতিকার নেই। সেখানে লক্ষ লক্ষ 'কেন' ছুটোছুটি করে মরছে।'*

একদণ্ডের জন্যে পাহারা সরায় না পিতৃতন্ত্র; নিজের সত্যিকারের জীবনে ফিরে যাওয়ার স্বপ্ন মিলিয়ে যায় একসময়। ভালোবাসাহীন দাম্পত্যের দৈনন্দিন নিষ্ঠুরতা ও কদর্যতা মেনে নিতে-নিতে নিথর হয়ে যায় সুবর্ণলতাদের মন। তবু সারাটা জীবন কাঠিন্যের তপস্যা করে সুবর্ণ নারীসত্তার নির্মাণ-আকল্পকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। অবিরাম যুদ্ধ করে যেতে হয় 'বিকিয়ে যেতে দেব না' পণ করে। ধ্বংস-হয়ে-যাওয়া আত্মাকে পুনর্গঠনের স্বপ্ন দেখতে হয়। এক-প্রজন্মে তা হয় না। এ এক ধারাবাহিক লড়াইয়ের ইতিকথা। অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সুবর্ণ

বুঝেছিল, সত্যবতী তার জীবনের অন্তরালে রয়েছে আলো হয়ে, গান হয়ে। তেমনই বকুলও মা সুবর্ণকে জেনেছে পথ-চলার প্রেরণা হিসেবে। ঔপন্যাসিক প্রতিবেদনে ধারাবাহিক যুদ্ধের মধ্য দিয়ে নারীসত্তা ও নারীপরিসরের আবিষ্কার ও ধীরবিলম্বিত প্রতিষ্ঠার বৃত্তান্ত উপস্থাপিত হয়েছে। ভাষ্যকার কথকস্বর বারবার জানিয়েছে : 'শুধু একজন সুবর্ণলতাই নয় এমন হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ সুবর্ণলতা এমনি করে দিনে দিনে তিলে তিলে ধ্বংস হচ্ছে। কেউ লড়াই করে চূর্ণবিচূর্ণ হচ্ছে, কেউ ভীরুতায় অথবা সংসারের শান্তির আশায় আপন সত্তাকে বিকিয়ে দিয়ে পুরুষ সমাজের ইচ্ছের পুতুল হয়ে বসে আছে।'

এভাবে আশাপূর্ণা বঙ্গীয় সমাজের গভীরে অনতিপ্রচ্ছন্ন কৃষ্ণ মহাদেশের ঘোর অন্ধকারের উৎস থেকে উৎসারিত আলোর মহাকাব্যিক কথকতা করেছেন। যন্ত্রণার দহনকথাই তাঁর সংবেদনশীল লিখনবিশ্বে হয়ে উঠেছে সমান্তরাল যুদ্ধেরও আখ্যান। জিজ্ঞাসার বিশিষ্ট উপস্থাপনায় বিধৃত রয়েছে সম্ভাব্য মীমাংসার বিশল্যকরণী। না, কবি যা-ই বলুন, নারীকে পুরুষ 'সৌন্দর্য সঞ্চারি' গড়ে তোলেনি। এ যে কত বড় প্রকাণ্ড মিথ্যা, আশাপূর্ণার ঔপন্যাসিক প্রতিবেদনে ধরা রয়েছে তারই ক্রমিক ও সানুপুঙ্খ বিবরণ। নারীসত্তার নির্মাণ-প্রকল্পের সূত্রধার ও অভিযন্তা সত্যবতী-সুবর্ণলতা-বকুলের মতো নানাপ্রজন্মের নারী এবং অন্তঃপুরের কারাগারে তুষের আগুনে পুড়ে-পুড়ে ছাই হল যারা প্রতিনিয়ত। নারীসত্তা ও নারী-পরিসর নিয়ে নারীর যথার্থ বয়ান কী হতে পারে, আশাপূর্ণা সেই প্রাথমিক জিজ্ঞাসাকে আখ্যানে রূপান্তরিত করেছেন। 'আমি নারী, আমি মানুষ' : এই তো সত্যবতী-সুবর্ণলতাদের মুখ্য বার্তা; তাদের কথা তারা নিজেরা বলেছে—বাংলা সাহিত্যে এ এক নতুন আরম্ভের ঘোষণা।

এর তাৎপর্য চমৎকারভাবে প্রকাশ করে গেছেন সিমোন দ্য বোভোয়া, তাঁর যুগান্তকারী 'The Second Sex' বইতে : 'A man would never think of writing a book on the specific situation of males in the human race. But if I want to define myself, I must first of all declare : 'I am a woman', this truth is the background from which all further claims will stand out. A man never begins by affirming that he is an individual of a certain sex; that he is a man goes without saying.'

এই নিরিখে জীবনের জয়-পরাজয় নয়, আখ্যানবিশ্বের টানাপোড়েনে সূত্রধার হওয়া না-হওয়া নয়—সময়-স্রোতে ভাসমান বাঙালিনীর যুগপৎ নারী এবং মানুষ বলে পরিচিত হওয়ার ন্যূনতম দাবি জানানোর ঔপন্যাসিক প্রতিবেদনই হল 'সুবর্ণলতা'।

সুবর্ণলতার অনর্জিত বারান্দা

সুচরিতা চৌধুরী

খানচারেক ঘর, মাঝখানে টানা দালান, এদিকে-ওদিকে খোঁচা খোঁচা একটু ঘরের মতো, এরই মাঝখানে দিশেহারা হয়ে ঘুরপাক খায় সুবর্ণ, এ দরজা ও দরজা পার হয়ে একই ঘরে বারবার আসে বিমূঢ়ের মতো, বুঝতে পারে না কোন্ দরজাটা দিয়ে বেরোতে পারলে সেই গোপন রহস্যে ভরা পরম ঐশ্বর্যলোকের দরজাটি দেখতে পাবে।

সুবর্ণকে প্রতারণা করেছিল তার ভাগ্য, প্রতারণা করেছিল তার স্বামী। যে-খোলা বারান্দার স্বপ্ন দেখেছিল সুবর্ণ, সে তো শুধুমাত্র বারান্দা ছিল না, ছিল বন্দি-জীবনের মাঝখানে একটুখানি খোলা আকাশ, চেতনার উন্মুক্ত বাতায়নে শ্বাস নেওয়া। প্রবোধের 'বোধের ঘরে ভেন্টিলেটরের অভাব' ছিল বলেই তার মনে হয়েছে এ শুধুমাত্র বেহায়া মেয়েমানুষের পরপুরুষ দেখার ছুতো। সুবর্ণ সকল লোকের মাঝে বসে 'নিজের মুদ্রাদোষে' আলাদা ও স্বতন্ত্র, আর এই স্বাতন্ত্র্যের জন্যই মুক্তকেশীর দর্জিপাড়ার বদ্ধ আলোহীন পরিবেশে সে বরাবরই বেমানান, সহস্র লোকের মাঝেও সে একা—

> "নিজের ভিতরে তুমি একা কাঁদো
> বড় অশ্রুহীন..."
> (কবিতা সিংহ)

মুখরা, মেজাজি, বেহায়া, জেদি মেজোবউ সুবর্ণ, তবু কেন জানি চিরদিনই মাথা উঁচু করে চলল। স্বামীব অর্থের জোরে, রূপের জোরে? না। সুবর্ণ নিজের জোরেই চলেছে। চারপাশের নারীরা তার ব্যতিক্রমী চরিত্র দেখে ব্যঙ্গ করেছে, ভয় করেছে নতুবা সাবধান করে দিয়েছে। সুবর্ণর অবশ্য এতে কোনোদিনও পথ পাল্টাবার ইচ্ছে জাগেনি। রূপবান সচ্ছল স্বামীকে নিয়ে সুবর্ণ সুখে থাকতে পারেনি। যা স্বাভাবিক বলে গ্রহণ করেছে সমাজ, সুবর্ণ তাকে মানতে পারেনি। যাকে আদর্শ বলে তার মধ্যে মহত্ত্ব খোঁজা হচ্ছিল, যা আমাদেরকে বিস্মিত করছিল সেই প্রাতিষ্ঠানিকতার বিরোধিতা করেছে সুবর্ণ। নারীর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বা ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন নেই, এই বেদবাক্যে বিশ্বাস না করলেই সুবর্ণর নামের পেছনের বিশেষণগুলো জুটে যায়। সুবর্ণ আর পাঁচটা সাংসারিক নারীর মতো সতীত্বের খোলস পরে থাকতে চায়নি, প্রবোধের সঙ্গে এক ছাদের তলায় বাস করাটা তাকে পীড়িত করেছে। সামাজিক দৃষ্টিতে অবশ্যই এগুলো নিন্দনীয় তবে বিবাহের পরিণামে স্বাভাবিক সান্নিধ্যে যদি ভালোবাসা না জন্মে তবে এমন সংস্কার বয়ে নিয়ে চলাও অপরাধ।

সুবর্ণ যে-পরিবারে এসেছে সে-পরিবার রক্ষণশীল গোঁড়া। যেখানে বাড়ির বৌয়েদের খোলা বারান্দার স্বপ্নে বিভোর হতে নেই, লেখাপড়া শেখা আকর্ষণীয় শুধুমাত্র রান্নাঘর আর স্বামীর ঘর. 'A room of one's own' এর কোনো সম্ভাবনাই নেই। এই ভাবনা যুগ যুগ থেকে আমাদের পুরুষ শাস্ত্রকারেরা দিয়ে এসেছেন; সুবর্ণর শ্বশুরবাড়ির লোকেরা তো তাকে অনুসবণ করেছে মাত্র, তাতে তাদের দোষটাই বা কোথায়, সুবর্ণর মা সত্যবতী তাকে যে আদর্শে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন সেখানে ছিল সংস্কার মুক্তির ভাবনা, আদর্শবাদ, উদার

রুচিশীল শিক্ষিত মন। সুবর্ণর 'ভাগ্যদোষে তার বিপরীত ঘটেছিল, স্বামী দর্জিপাড়ার রক্ষণশীল ধারারই সমর্থক। ফলে পত্নীর সঙ্গে বিরোধ তীব্রতর হয়ে উঠেছে। সুবর্ণ এ ধরনের মানসিকতাকে মেনে নিতে পারেনি এবং এর বিরুদ্ধে অকুণ্ঠভাবে নিজস্ব মানসিকতাকে প্রকাশ করেছে। সমাজ প্রদত্ত পৌরুষের ঝাঁজে প্রবোধও বৌকে প্রহার করতে ছাড়েনি। সুবর্ণ চিরকালই তার অপরিচিত। মেয়েমানুষ রান্নাঘর নিয়ে পড়ে থাকবে, বারবার আঁতুড়ে গিয়ে সন্তান উৎপাদন করবে, আর সকলের অলক্ষ্যে বেশি ভাত খাবে—এরাই প্রবোধের পরিচিত নারী। সুবর্ণ আলাদা হলে, স্বামীর বশবর্তী না-হলে পুরুষ প্রবোধ কি তার বদলা নেবে না? বারবারই বেখাপ্পা বায়নার জন্য সুবর্ণ নির্যাতিত হয়েছে। ঠাকুরজামাইয়ের কাছে কন্যাপ্রতিম সুবর্ণ সমুদ্র দেখার অনুমতি নেওয়ার আব্দার জানিয়েছে—এই ঘটনায় প্রবোধ চরিত্রহীন স্ত্রীকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে পেরেছে—

"বল্ আর বুড়োর সঙ্গে কথা কইবি না..."

সুবর্ণকে তবু বাগে আনতে পারেনি, রাত্রির সুর কেটে যাচ্ছে দেখে আবদারি গলায় বলেছিল আপদ মরলেই সুবর্ণ বাঁচে। হ্যাঁ। সুবর্ণ তা-ই চেয়েছে। প্রবোধের মনে হয়েছিল বিধবা হলে সুবর্ণর মাছ খাওয়া ঘুচবে। সুবর্ণ জানিয়েছিল খাওয়াটাই তার জীবনেব সর্বস্ব নয়। বোঝা হয়ে-ওঠা এ সংসার থেকে নিস্তার পাওয়ার আর কোনো উপায় ছিল না সুবর্ণর; তা হলে স্বাধীন ইচ্ছার প্রকাশ কববে না সে, তা হয না। সুবর্ণ স্বামীপুত্রের বিরুদ্ধে গিয়েই তাই প্রতিবাদ করে গেছে। তার মাধ্যমে সামাজিক সংস্কার বা পরিবর্তনের কোনো ইঙ্গিত দেননি লেখিকা, সে সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের বধূ—ছিল একটি উদার শিক্ষিত মন, যাকে বাঁচাতে চেয়েছে সুবর্ণ, দেখতে চেয়েছে তার সন্তানরা মানুষ হচ্ছে সংকীর্ণতামুক্ত পবিবেশে। স্বামীকে সে প্রত্যাশা করেছিল তাব চিন্তা-ভাবনার সহযোগী হতে, কিন্তু তা হল না। তবু সুবর্ণ এই স্বামীর ঘরই করল, বহু সন্তানের জননী হল, অবশেষে স্বামীর কাছ থেকেই বিদায় নিল। এ কি সুবর্ণর অসহায়ত্ব? 'স্ত্রীর পত্রে' মৃণাল যেমন সকলকে বর্জন করে নিজের জগৎ তৈরি করতে পেরেছে, সুবর্ণরও তো 'অন্য কোথাও যাবার কথা ছিল, অন্য এক আকাশের নীচে একলা দাঁড়াবার' ইচ্ছে ছিল, তবু কোনোভাবেই নিজস্ব জগৎ তৈরি করতে পারল না। কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগেই মাথার ওপর বোঝা বেড়ে গেল। বোঝাই তো, যদিও সন্তান কোনোদিন মায়ের কাছে বোঝা নয়, তবু সুবর্ণ এদেরকে বোঝা মনে করেছে। এসমস্তই যে দেহের দান, মনের নয়। শরীরলোভী প্রবোধের হিংস্রতার ফসল চাঁপা, চন্দন, ভানু, কানু, মানু, পারুল, সুবল, বকুল। প্রবোধ সামাজিক দৃষ্টিতে লম্পট ছিল না, এক পত্নীর প্রতিই তার সমস্ত আকর্ষণ। তবু আপাদমস্তক লম্পটই ছিল সে। পত্নীর প্রতি লাম্পট্য সমাজে নিন্দিত নয় বলে প্রবোধকে চরিত্রহীন অভিধা দেওয়া যায়নি। আমোদিনী ঘোষের 'ফস্কা গেরো' উপন্যাসে সংসারের এমন একটি দিকেরই প্রতিফলন ঘটেছে ·

"সংসারের যে দিকটা আমরা দেখি, সেটাও সংসারের আসল দিক নয়, —জীবনের ওপরে আছে একটা সুদৃশ্য আবরণ—নানা বর্ণে নানা ছন্দে নানা কারুকার্যে খচিত। কিন্তু তার তলায় আছে অসভ্য কদর্যতা, কুশ্রীতা, অঙ্গহীন বিকলতা, ক্লেদাক্ত বীভৎস ক্ষত। যার চোখে সে দৃশ্য

একবার পড়ে, বাইরের সাজানো আবরণটা তার চোখের কাছ থেকে যায় উড়ে আর সত্যের বেশে মিথ্যার যে মায়ারূপ জগৎ জুড়ে বসে আছে তা যায় ছন্নকার হয়ে মিলিয়ে।"

সুবর্ণও সংসারের এই কুশ্রী দিকটিই দেখেছিল। সুবর্ণ যখন তার দাম্পত্যের অতি স্বাভাবিক অভিজ্ঞতার কথা বলে তখন আশ্চর্য লাগে, শাস্ত্রকারদের কথায় বৈবাহিক জীবনের মহত্ত্ব বর্ণনা যে নেহাৎই কথার কথা সে-বিষয়ে সন্দেহ থাকে না।

"...সংকুচিত হয়ে ঘুমন্ত মানুষটার ছোঁয়া বাঁচিয়ে শুয়ে পড়ে সে। লোকটার ওই পরিতৃপ্ত ঘুমন্ত দেহটার দিকে তাকিয়ে কেমন ঘৃণা আসে, অপবিত্র লাগে লোকটাকে। এই কিছুক্ষণ আগেই যে ওর আদরের দাপটে হিমশিম খেতে হয়েছে, তা ভেবে বুকটা কেমন করে ওঠে। কিন্তু কী করবে সুবর্ণ?" (সুবর্ণলতা)

"আমার কবন্ধদেহ ভোগ করে তুমি তৃপ্ত মুখ; জানলে না কাটামুণ্ডে ঘোরে এক বাসন্তী-অসুখ লোনা জলে ঝাপ্‌সা করে চুপিসারে চোখের ঝিনুক।' (কবিতা সিংহ)

সুবর্ণ প্রাণপণ চেষ্টা করেছিল সন্তানেরা যাতে প্রবোধের মানসিকতায় গড়ে না-ওঠে, কিন্তু—

" . সেই হাসির আভাষ ফুটে উঠেছে ভানুর মুখে, যে হাসি এ বাড়ির প্রথম গ্র্যাজুয়েট প্রভাসচন্দ্রের একচেটে। আর তখনই ধরা পড়েছিল ওর মুখের গড়নটা ওর সেজকাকার মতো। ...সুবর্ণলতার ছেলে বলল. 'মেয়েমানুষকে নিয়ে রাস্তায় যাওয়া আমার দ্বারা হবে না।'

সুবর্ণর অতীত-ভবিষ্যৎ সবই কি তবে কুশ্রীতায় আচ্ছন্ন? শেষ আশা ছিল সন্তানেরা মানুষ হবে, কিন্তু তা-ও হল না। সারাজীবনের ব্যর্থতাকে সে দেখল নিজের ছেলের মধ্যেই। দর্জিপাড়ার বাড়ির সংকীর্ণতা নিজের ছেলের মধ্যে ফিরে এসেছে দেখে শিউরে উঠেছে। এক মুহূর্তে সে বুঝতে পারে, তার অতীত যেমন ব্যর্থ হয়েছে তেমনি ভবিষ্যৎও। মাতৃত্বও আসলে একটা মোড়ক, সেই মোড়ক খুলে যখন একটি মানুষ কথা বলে তখন সন্তানের চোখেও মা মস্ত বড় অপরাধী হয়ে দাঁড়ায়। নিজের সম্পর্কসূত্রেই সে মা বলে যাকে জানে তাকে গোটা মানুষ হিসেবে চিনতে সমাজ শেখায় না। গোটা পুরুষ-সমাজের মনের কথা সুবর্ণর মুখ দিয়ে আশাপূর্ণা বলিয়ে নিয়েছেন—

"তোমার রূপবতী মূর্তির কাছে আমি মুগ্ধ ভক্ত, তোমার ভোগবতী মূর্তির কাছে আমি বশম্বদ, তোমার সেবাময়ী মূর্তির কাছে আমি আত্মবিক্রীত, তোমার মাতৃমূর্তির কাছে আমি শিশুমাত্র। ...কিন্তু এগুলি একান্তই আমার জন্য হওয়া আবশ্যক। হ্যাঁ, আমাকে অবলম্বন করে যে 'তুমি' সেই 'তুমি'টিকেই মাত্র বরদাস্ত করতে পারি আমি। তবে বাইরের 'তুমি' হচ্ছ বিধাতার একটি হাস্যকর সৃষ্টি।"

এদের কাছে সুবর্ণ কিছুই পায়নি, এতে আশ্চর্যের কোনো কারণ নেই। সংসারের জ্বালায় তিতিবিরক্ত হয়ে-ওঠা সুবর্ণ একবার আয়োজন করেছিল প্রতিবেশীদের সঙ্গে তীর্থে যাওয়ার। সে-আয়োজন পুণ্য অর্জনের জন্য না-হোক, বাইরের পৃথিবীতে মুক্ত হবার বাসনায় তো অবশ্যই। সুবর্ণের তো চিরকালই পালিয়ে যাবার বাসনা ছিল। নববধূ হয়ে এ পাষাণপুরীতে ঢুকে হাঁপিয়ে-ওঠা সুবর্ণ ভেবেছিল, এ বাড়ি থেকে পালাতে পারলেই তার কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন সফল হবে। ধীরে ধীরে বুঝতে পেরেছে পালানো সহজ নয়। তবু নিস্তার পাওয়ার মতো একটা সুযোগ এলেও মিথ্যে কলেরার অভিনয় করে তাকে প্রবোধ নিরস্ত করল। মন না-চাইলেও সমাজের দাপটে সুবর্ণকে স্বামীর পাশে থাকতে হল, থাকাটা কর্তব্য বলে। ভালোবাসাহীন সংসার আর মনুষ্যগুলির সঙ্গে সুবর্ণ জীবন কাটাল কিন্তু বুকে ভরা রইল একরাশ অভিমান। বৃদ্ধা সুবর্ণ তাই হয়ে উঠেছিল প্রশান্ত ও গম্ভীর। তর্ক থেকে দূরে থাকে, নিষ্ফল প্রতিবাদে উত্তেজিত হয় না। সুবর্ণের সরব প্রতিবাদ জানানোর ভাষা থেমে নীরবতায় ঢেকে গেল। সেই সময় একমাত্র কলমই হয়ে উঠল তার নীরব প্রতিবাদের ভাষা। সেই কলমে ঝলসে উঠতে লাগল বিবাহ সম্পর্কের অন্তঃসারশূন্যতা। সুবর্ণকে লেখা চিঠিতে দেখা যায় সত্যবতীও সেই একই প্রশ্নে আন্দোলিত হয়েছে—

> *"...তদানীন্তন বহু কাশীবাসী পণ্ডিতের নিকট নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া সন্ধান করিয়াছি হিন্দু বিবাহের মূল তাৎপর্য কি, মূল লক্ষ্য কি, এ বন্ধন যথার্থই জন্মজন্মান্তরের কী না। কিন্তু যখনই প্রশ্ন তুলিয়াছি, এই বন্ধনের দৃঢ়তা পুরুষ ও নারীর পক্ষে সমান নয় কেন? পুরুষের পক্ষে 'বিবাহ' একটি ঘটনামাত্র, অথচ নারীর পক্ষে চির-অলঙ্ঘ্য কেন, সদুত্তর পাই নাই। উপরন্তু এই প্রশ্নের অপরাধে অনেক স্নেহশীল পণ্ডিতের স্নেহ হারাইযাছি। ক্রমশ বুঝিয়াছি এর উত্তর পুরুষ দিতে পারিবে না, ভবিষ্যৎকালই দিবে। কারণ কোনো একটি সম্পত্তিতে ভোগ দখলকারী ব্যক্তি স্বেচ্ছায় সহজে দানপত্র লিখিয়া দেয় না। . স্ত্রী লোকের যাহা কিছুতে অনধিকাব, তাহার অধিকার অর্জন করিতে হইবে স্ত্রী জাতিকেই।"*

সুবর্ণর' লেখা স্মৃতিকথায়ও তাই সামাজিক ভণ্ডামি আর নীতিহীনতার প্রতি তীব্র শ্লেষ ঝরে পড়েছে—

> *"পতি পরম গুরু? স্বামীর বাড়া দেবতা নেই! ধোকাবাজি! ধাপ্পাবাজি!"*

কোথাও লেখা রয়েছে—

> *"দুই পরম শত্রু বছরের পর বছর একই ঘরে কাটিয়েছি, এক শয্যায় শুয়েছি, এক ডিবেয় পান খেয়েছি, কথা কয়েছি, গল্প করেছি, হেসেওছি।"*

হ্যাঁ! সুবর্ণ স্বামীকে শত্রু বলেছে, সে একবিন্দু ভালোবাসেনি স্বামীকে, বহু শত বৎসরের সংস্কারের কারণে বা অর্থনৈতিক পরাধীনতার জন্যই হোক, স্বামীর সংসারে এখনও উদ্ধত

হয়ে উঠতে পারেনি গৃহবধূরা। সংসারে দাম্পত্য বন্ধন, পুত্রকন্যা থাকলেও সব সম্পর্কের সঙ্গে অভিনয় করে যেতে হয় হৃদয় যাতে সাড়া দেয় না। নীরস, প্রেমহীন, আনুষ্ঠানিকতাসর্বস্ব সংসারে সুবর্ণকে থাকতে হয়েছে বাধ্য হয়ে, এটাই সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি তার জীবনে। তাই দেখতে পাই আত্মজীবনীর পাতায় পাতায় লেখার ভাষা জ্বলন্ত হয়ে উঠেছে—

> *"...দুবেলা দুমুঠো ভাতের বদলে আস্ত একটা মানুষকে নিয়ে যা খুশি করতে পারার অধিকার, একি সোজা সুখ? ওই দুমুঠোর বিনিময়ে সেই মানুষটাব দেহ থেকে, মন থেকে, আত্মা থেকে, সব কিছু থেকে খাজনা আদায় করা যাচ্ছে—তার ওপর উপরি পাওনা নিজের নীচতা আর ক্ষুদ্রতা বিস্তার করবার একটা অবারিত ক্ষেত্র।"*
>
> *"...আমার ইচ্ছে হয় কেউ আমায় ভালোবাসুক, আমি কাউকে ভালোবাসি, ...প্রেমে পড়তে ইচ্ছে হয় আমার।" "*
>
> *...একটা শিশুকে ধরে জোর করে বিয়ে দিয়ে দিলে, আর একটা বালিকাকে ধরে জোর করে 'মা' করে দিলেই তার মনের সব দরজা বন্ধ হয়ে যাবে? যেতে বাধ্য?"*

সুবর্ণ এয়ো স্ত্রী, স্বামীর সঙ্গবিহনে সুখ খোঁজা অন্যায়, কিন্তু সুবর্ণ তার জীবনে যে রাত্রিগুলিকে মূল্যবান ও মুক্তির রাত মনে করতে পেরেছে তা হচ্ছে যেদিন প্রবোধ তার কাছে থাকেনি। অন্তত একরাতের জন্য হলেও রেহাই দিয়েছিল। সেই এক স্বপ্নমধুর রাতে কবিতার নির্ঝরিণীও এসেছিল লেখনীর মুখে—

> "... ... ...
> পিঞ্জরের পাখি সম বন্দি তার প্রাণ
> উর্দ্ধ আকাশেতে যেন কী করে সন্ধান!
> ... ..."

স্মৃতিকথায় সুবর্ণর কথাগুলো কেমন এলোমেলো, কোনো সন-তারিখ নেই, শুধু কথাগুলো পরপর সাজানো। একে কি অসংলগ্ন বলা যায়? আর যদি অসংলগ্নই হয় তবে তা কি অস্বাভাবিক? যার জীবনে এত ক্ষোভ আর অভিমানের জমাট মেঘ তার ধারা তো সুললিত ভঙ্গিতে নেমে আসতে পারে না। আর সুবর্ণর উপর যে-অত্যাচার তার ইতিহাস শুধুমাত্র তারই নয়, সে যুগ যুগ ধরে চলা নারী নির্যাতনের ইতিহাস। এর সন-তারিখ সত্যিই কি রাখা সম্ভব? অভিযোগের মাত্রা যখন বাড়তেই থাকে তখন তাকে শৈল্পিক শৃঙ্খলা দান করতে পারে না সুবর্ণ, সুবর্ণ তো লেখিকা নয়, কলমে শুধুমাত্র তার বিষের জ্বালায় ক্ষতবিক্ষত অন্তরের নীরব ভাষ্য মাত্র তুলে ধরতে চেয়েছে।

মায়ের সঙ্গে নিজের তুলনা করতে গিয়ে দেখেছে মায়ের সংসার ক্ষুদ্র, তার বৃহৎ। বাবার

সঙ্গে নিজের স্বামীকে মিলিয়ে দেখেছে প্রবোধ অসভ্য ও অত্যাচারী। সত্যবতীর স্বামীও তাকে প্রতারণা করেছিল সুবর্ণকে গোপনে বিয়ে দিয়ে। সেই প্রতারণার অপরাধের জন্য সত্যবতী নবকুমারকে পরিত্যাগ করেছিল। সুবর্ণ পরের প্রজন্মের হয়েও এমন বিদ্রোহী হয়ে উঠতে পারল না, শুধুমাত্র খোলা বারান্দাই তো চেয়েছিল, পায়নি। অভিমানে স্বামীকেও ছাড়তে পারল না। গৃহবধূ সুবর্ণ বুঝেছিল—

'এখানে মিছে কাঁদা
দেওয়ালে পেয়ে বাধা
কাঁদন ফিরে আসে আপন কাছে।'

রবি ঠাকুর ছাড়া এমন করে সুবর্ণর মনের কথা কে কবে বলতে পেরেছিল? স্বামী-পুত্রদের অগোচরে বসে এ সমস্ত কথা লিখতে হয়েছিল, না-হলে কলম ধরার অপরাধে স্বামী-পুত্রের ব্যঙ্গবাণে জর্জরিত হতে হবে। কিন্তু ছাপাখানা থেকে যেদিন বইগুলি অজস্র ভুল আর বিকৃত বানান নিয়ে বেরিয়ে এল, সেদিনটি বিষম লজ্জার। পুত্রের দল তাদের পিতৃদেবকে নিয়ে হুল্লোড়ে মেতে উঠল। বিদ্রোহী মা'কে অসম্মানিত করার এমন সুযোগ সহজে হাতছাড়া করা যায় না। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প 'খাতা'য় উমার খাতার করুণ পরিণতির সঙ্গে সুবর্ণর জীবনের এ ঘটনা যেন মিলে যায়। পার্থক্য একটাই, সুবর্ণ চেয়েছিল তার সযত্ন সংরক্ষিত খাতার বাণী প্রকাশ করতে, আর উমা চেয়েছিল লুকিয়ে রাখতে। কিন্তু প্রকাশের লজ্জা দু-জনকেই সমানভাবে বহন করতে হল। সেই সুচেতনাসমৃদ্ধ বিকলাঙ্গ দেহের নবজাতক নির্মম পিতৃতন্ত্রের হাতে লাঞ্ছিত হচ্ছে দেখে সুবর্ণ ঝাঁপিয়ে পড়ে ছিনিয়ে এনেছিল তাদের হাত থেকে। তারপর আগুনে পুড়িয়ে খাক্ করে দিল গোপনে লিখে-রাখা দীর্ঘ বৎসরের সঞ্চিত বিবর্ণ হয়ে-যাওয়া খাতা ও আত্মজীবনী, সুবর্ণর দীর্ঘ অভিমানের ইতিহাস পুড়ে গেল। এর মতো প্রাণাধিক প্রিয়জন এ সংসারে তার কেউ ছিল না। এদের গায়ে সুবর্ণ নিজেই আগুন লাগাল, মূল্যহীন মনে করে নয়, বরং মূল্যহীন সমাজ তার যথার্থ সম্মান দেবে না-বলে। সুবর্ণ তবু থামেনি, মেয়েকে মাস্টার রেখে এন্ট্রান্স পরীক্ষা দেওয়াবার জন্য তৈরি করেছে। সমাজে ছেলের মায়েরা যা করেছে, তার উল্টোটাই করতে চেয়েছে। পুত্রের জন্য দরিদ্র কন্যা সন্ধান করে পাত্রীপক্ষের কাছে নিজেই যেতে চেয়েছে। প্রবোধ বাধা দেয়। পাত্রীপক্ষ পাত্রপক্ষের 'পায়ে তেল দেবে' এটাই চিরাচরিত নিয়ম। সুবর্ণ মনে মনে ভবিষ্যতে বাংলার ছবিতে মেয়েদের জন্য মড়ক প্রার্থনা করে, তখন—

"...দেখি তোমরা মহানুভব পুরুষ সমাজ কোন্ সিংহাসনে বসে ক্রীতদাসী সংগ্রহ কর? এ অহংকার ফুরাবে তোমাদের...হে মোর দুর্ভাগা দেশ যাদের করেছ অপমান—"

সুবর্ণ যাই ভাবুক না কেন, প্রবোধের রক্ত কি মিথ্যে হয়ে যাবে? পুত্র ভবিষ্যতের লোভে ধনবান ব্যক্তির কন্যাকেই গ্রহণ করল। সে জানে সংসারে 'রূপের চেয়ে রুপোর দাম' বেশি। অসুস্থ হয়েও সুবর্ণর অভিমানের শেষ হল না। এই সংসার থেকে ধীরে ধীরে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে শেষ আশ্রয় নেয় সেই পরম আকাঙ্ক্ষিত দক্ষিণের বারান্দায়। সুবর্ণর ছোট ছেলে সুবল সে-ব্যবস্থা করে দেয়, এ সেই ছেলে যাকে সুবর্ণ বুঝতে পারে না, সে নীরব

কিন্তু মায়ের জন্য উৎকণ্ঠিত। তবে কি সুবর্ণর ভবিষ্যৎ একেবারে ব্যর্থ? সুবর্ণ তবু কোনো এক ক্ষোভের যন্ত্রণায় পথ্য গ্রহণ করতে চায় না, আব মন থেকে তার সৃষ্টিকর্তার উপর আক্রোশ প্রকাশ করে। মৃত্যুশয্যায় শায়িতা সুবর্ণ তার শেষ ইচ্ছে যেটা জানাল তা-ও অদ্ভুত। এমন একজনকে দেখতে চাইল যাকে এ সময় দেখতে চাওয়া স্বাভাবিক প্রত্যাশার মধ্যে পড়ে না। সে হল সুবর্ণর ননদ সুবালা। সারাজীবন সুবর্ণর সঙ্গে তাকে ঘর করতে হয়নি, তবু জানে মেজোবৌয়ের মতো মেয়েমানুষ গারদে ভরা আছে, পুরুষ হলে হয়তো 'জগৎ দেখব' বলে বেরিয়ে পড়ত। জগৎ দেখার বাসনায় সুবর্ণ ছটফট করেছে, তবু মুক্তি পায়নি। শেষ লগ্নে চারদেয়ালের মধ্যে মুক্তি পেতে চায়নি বলে পরিজন পরিবৃত সংসার থেকে বেরিয়ে দক্ষিণের বারান্দায় আস্তানা গেড়েছিল। যাবার আগে পর্যন্ত বঞ্চনার প্রতিবাদ করে গেছে—

> *"...বলেছিলাম আর চাই না। যাবার সময় বলে যাচ্ছি, চাই। এই দেশেই, মেয়েমানুষ হয়েই। ...শোধ নিতে হবে না?"*

অসুখের ঘোরেই এই প্রলাপ কি সত্যিই প্রলাপ, না কি ছিল কোনো কঠিন শপথ-বাক্য? হয়তো তা-ই। প্রলাপ বলে যারা তুচ্ছ ভাববে তাদেরকে এর সঠিক অর্থ বোঝাতে সুবর্ণকে অন্য নামে, অন্যভাবে আবার জন্মাতে হবে। প্রয়োজনে বারবার। নতুন ভোরের আগমনের কালে সুবর্ণ বিদায় নিল, ভোরের আলোর রেখা মৃত্যুর কালিমার উপর সৌন্দর্যের তুলি বুলিয়ে গেল। তবু এরপরও শেষ যাত্রায় সুবর্ণ প্রতিবারের মতো প্রাতিষ্ঠানিকতাকে অস্বীকার করতে ভুলল না, মৃত মানুষ কীভাবে প্রতিবাদ করতে পারল? পারল, আরেক নারী, সুবর্ণর মনের সই জয়াবতী তার শেষ ইচ্ছা পূরণের জন্য তৎপর হলেন বলে। সুবর্ণ চেয়েছিল মৃত্যুর পর ভালো পালিশ করা খাটে কালো ভোমরাপাড় গরদের শাড়ি পরে ছেলেদের কাঁধে চড়ে যেতে। সধবা মানুষের এমন বেখাপ্পা বায়না মেটাতেই হল। প্রতিবাদ করতে চাইলেও মৃতমানুষের সঙ্গে তো কলহ করা যায় না, তাই এবার সুবর্ণকে শেষবারের মতো বিদ্রোহী হতে হল না, সবাই মেনে নিল। শেষবারের মতো কাঁধে চড়ে বাইরে গেল সুবর্ণ, বাইরের পৃথিবী যার ঘর হবার কথা ছিল তার নিষ্প্রাণ দেহ বাইরে বেরোল। মুক্তকেশীর সংসারের বিদ্রোহী বধূকে নিয়ে যাদের বিরক্তির সীমা ছিল না, সেই দেহটিকে দেখে তারা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। সুবর্ণ থেকে শুরু করে তার সংসারের সকলেই মহিমান্বিত হয়ে উঠতে লাগল তাদের চোখে। সুবর্ণকে যারা সংসারে অলক্ষ্মীস্বরূপা দেখে এসেছে তারাই হুড়োহুড়ি করে পা ছোঁবার জন্য ছুটে এল। তবে কি এ কথাই ঠিক : 'পুড়বে মেয়ে উড়বে ছাই, তবে মেয়ের গুণ গাই'? না, সুবর্ণ সারাজীবনই প্রতিটি বিকৃতির বিরোধিতা করেছে, কোথাও অন্যায়ের সঙ্গে আপস করেনি, সুগৃহিণীর মোড়কে বাঁচতে চায়নি। তার প্রগাঢ় বোধশক্তি, প্রখর বুদ্ধি ছিল, এতদিন ধরে সমাজ মেনেই নিয়েছিল এগুলো পুরুষের একচেটিয়া। মেয়ে মাত্রেই হবে ঘরকন্নায় পারদর্শী। সমাজনির্দিষ্ট লিঙ্গ-ভূমিকার সম্পূর্ণ বিপরীত ছবি রয়েছে সুবর্ণলতা উপন্যাসে। যুগচক্রের আবর্তনে মুক্তকেশীর পরিবার আন্দোলিত না-হলেও সুবর্ণ হয়েছে। আর পাঁচটা বউদের মতো সে নয়। যারা সংসারী হয়ে পারিপার্শ্বিকের দৃষ্টিতে 'ভালো বউ' সাজার জন্য অভিনয় করে বা প্রাণপাত করে, তাদেরকে সুবর্ণ করুণা করেছে। আর এই অপরাধে তার প্রতি যথেচ্ছ অত্যাচার করবার সুযোগ পেয়েছে প্রবোধ, যে শুধু অশিক্ষিতই

নয়, রুচিহীনও। সুবর্ণর জীবনের বিড়ম্বনা এই যে, অযোগ্য স্বামীর সঙ্গে তাকে আমৃত্যু কাটাতে হয়েছে। যুবতি সুবর্ণ তখন বারবার দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে—

"এরা এরকম কেন? সারাজীবন এদের নিয়ে কাটাতে হবে আমায়!"

মুক্তারামবাবু স্ট্রিটের বাড়ি থেকে স্কুলে যাওয়ার দৃশ্য বারবার চোখের সামনে অপরূপ মহিমায় উদ্ভাসিত হত। সেই দৃশ্য যদি জীবনে সত্য হত তবে ক্লেদজ কুসুমের মতো সুবর্ণকে ছটফট করতে হত না। সুবর্ণ তো একা নয় যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়েছে মুক্তকেশীর পরিবারের সকল বধূ, সুবর্ণর নিজ সন্তানেরাও। তবু কেউ মানিয়ে নিয়েছে, কেউ বা গোপনে চোখের জল ফেলেছে। সুবর্ণ এ দুটোর কোনোটাই করেনি। তার ছটফটানিটা সকলের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল, কারণ সে নীরবে বিদ্রোহ করেনি। বিরোধে ক্ষত-বিক্ষত সুবর্ণ যা ভেবেছে তা শুধুমাত্র তার নিজের ভাবনার ফসল। সে না-পারলেও সকলকে তার সেই ভাবনার শরিক করতে চেয়েছে। কোনো সমালোচক তার এই চিন্তার মধ্যে আত্মকেন্দ্রিকতা লক্ষ করেছেন। সত্যিই যদি এটা আত্মকেন্দ্রিকতা হয়, তবে সুস্থ চিন্তা বলে কি কিছু থাকবে পৃথিবীতে? সুবর্ণ দর্জিপাড়ার জড় মানুষগুলির মধ্যে চলিষ্ণুতার গতি আনতে চেয়েছিল, এ ক্ষেত্রে যদি সুবর্ণ আপস করত তবে তার মহিমা খর্ব হত। যাকে অসত্য-অন্যায্য বলে মনে হয় তার সঙ্গে মিথ্যে সমঝোতা করার কোনো অর্থ নেই। যেমন একটি অন্যায় তাকে বোঝা হিসেবে বয়ে নিয়ে চলতে হয়েছে, সে হল প্রবোধ। সমালোচক অবশ্য প্রবোধের নীচতার মধ্যেও তার ভালোবাসা দেখতে পেয়েছেন, 'কাছছাড়া' করতে না-চাওয়াই কি ভালোবাসার মাপকাঠি হতে পারে? সুবর্ণ নিজেও জানত প্রবোধের ভালোবাসার মূল উদ্দেশ্য কী। প্রবোধের প্রতি 'নিগূঢ় প্রেমের ইঙ্গিত' দিয়ে তাকে সুবর্ণ প্রকৃত মানুষ করে তুলতে পেরেছে—এটা দেখানো যদি আশাপূর্ণার উদ্দেশ্য হত, তবে সুবর্ণকে লেখিকা, সমাজসেবিকা করে তোলাও কঠিন হত না। সাহিত্য ইচ্ছাপূরণের কাহিনি নয়।

মানিয়ে নেওয়ার যে লিঙ্গ-রাজনীতি প্রচলিত রয়েছে এই পিতৃতান্ত্রিক সমাজে, সুবর্ণ বরাবরই তার উল্টোপথে হেঁটেছে। প্রচুর তিরস্কার, প্রচুর অপমান সয়েও অবিচল থেকেছে বলে সুবর্ণ জীবৎকালে পেয়েছে সম্ভ্রম, মৃত্যুতে মহিমা! সংকীর্ণ পরিবেশের মানুষ তার স্বাভাবিক উদারতাবোধে অবাক হয়েছে। সুবর্ণ আপাদমস্তক এক মানুষ হয়ে বাঁচতে চেয়েছে, স্বাভাবিক উৎসাহে জানতে চেয়েছে তার চারপাশে কী ঘটছে, লুকিয়ে কবিতা লিখেছে, বই আনিয়ে গোপনে পড়েছে আর প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছে। তবু হার স্বীকার করেনি। সত্যবতীর মতোই জানতে চেয়েছে দীর্ঘকাল ধরে-চলা পাপের শেষ হবে কবে?

> *"...ভবিষ্যতে জগতের সর্বক্ষেত্রেই পুরুষ মানুষকে এ-কথা স্বীকার করতেই হইবে—মেয়েমানুষও মানুষ! বিধাতা তাহাদেরও সেই মানুষের অধিকার ও কর্মদক্ষতা দিয়াই পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন! এক পক্ষের সুবিধা সম্পাদনের জন্যই তাহাদের সৃষ্টি নয়।"*

সুবর্ণ-সত্যবতীর এই জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজতে পথে নামতে হয়েছে বকুলকেও। সুবর্ণ আর সত্যবতীর উত্তরসূরি বলে নয়, নারী বলে। পুড়ে যাওয়া, হারিয়ে-যাওয়া লেখা

না-লেখা ইতিহাস, বোবা যন্ত্রণার ইতিহাস সব কিছু আগামী পৃথিবীকে জানাতে তাকেও চলতে হবে। ঘরে নয়, এবার বাইরে থেকে সংগ্রাম চালাতে হবে, এমন এক দিন আনতে হবে যাতে—

"... ... ...
তাকে সম্পূর্ণ দেখাবে, তারা আসছে
অন্তরে বাহিরে এক, নতুন দর্শন নিয়ে"

(কবিতা সিংহ)

অগণিত সুবর্ণলতা আজও যে অপেক্ষা করে রয়েছে সেই ঐশ্বর্য-লোকের দরজাটির পরের পরম কাঙ্ক্ষিত প্রাপ্তির মুখ চেয়ে, হয়তো সেই পরম প্রাপ্তির দিকে তাকিয়ে তারা একটু পরিতৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলবে—

"আমরা ডাইনি আমরা আগুনে মরিনা
আগুন জ্বেলেছে পুরুষ আমরা মরিনি..."

(মল্লিকা সেনগুপ্ত)

অমীমাংসিত জিজ্ঞাসার গ্রন্থনা

রূপরাজ ভট্টাচার্য

আশাপূর্ণা দেবীর ত্রয়ী উপন্যাস নিয়ে কিছু লেখার আগে 'আর এক আশাপূর্ণা' থেকে লেখিকার একটি বক্তব্য প্রথমে উল্লেখ করতে চাই, কারণ,—এই কথাগুলোর মধ্যেই রয়েছে ত্রয়ী রচনার ভ্রূণ : —"অতি রক্ষণশীল পরিবারে জন্মগ্রহণের পরম সুযোগে স্কুলে যাওয়ার বালাই নেই, বালাই নেই ভূগোল, ইতিহাস মুখস্থ করার—অঙ্ক-কষার। কারণ স্কুলে পড়লেই যে মেয়েরা...বাচাল হয়ে উঠবে, এ তথ্য আর কেউ না জানুক আমাদের ঠাকুমা ভালভাবেই জানতেন, এবং তাঁর মাতৃভক্ত পুত্রদের পক্ষে ওই জানার বিরুদ্ধে কিছু করার শক্তি ছিল না।" —তবে নতুন বাড়িতে আসার পর আশাপূর্ণা আবিষ্কার করলেন 'প্রকাণ্ড ট্রাঙ্কে' তাঁর মায়ের সংগ্রহ করা বহু বই। আর এখানেই লেখিকার গ্রন্থ পাঠের হাতেখড়ি। তাহলে শুধুমাত্র এটুকু জেনেই বোঝা গেল তাঁর ত্রয়ী উপন্যাসের রসদ ছিল তাঁর নিজের জীবনের অলিগলির মধ্যেই। সত্যবতীকে যদি আশাপূর্ণা দেবীর মা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়, তাহলে সুবর্ণলতা এবং বকুলের চরিত্র-ভাবনা সে-পথ থেকেই আহৃত। তবে এসব কথার প্রসঙ্গে না গিয়ে এটুকু অবশ্যই বলা যায়—আশাপূর্ণা সময়ের আঙিনা থেকে দেখতে চেয়েছেন তাঁর পূর্ববর্তী, সমসাময়িক এবং পরবর্তী নারী-পরিসরকে। একটি প্রশ্ন মনে উঁকি দেয়; জানি না, হয়ত প্রশ্নটি একেবারেই অবান্তর! তবুও সাহসে ভর করে লিখতে ইচ্ছে করে—সময়ের সত্য বয়ান বা স্পষ্ট ছবি, অক্ষরের আধারে তার শুদ্ধ উচ্চারণে ফুটিয়ে তোলা কি আদৌ সম্ভব? যদি না-হয় তা লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্জাত! যাপিত-কালের আলেখ্য-রচনায় লেখকের স্বতঃস্ফূর্ততা থাকলেও, বিগত কালের বা না-দেখা অতীতের কথা বলা কতটুকু সম্ভব? যে-যুগের কথা তাঁর পাঠকৃতিতে লেখক রূপ দিতে চান, তাঁর সম-সময়ের পরিসরে বসে তিনি বহু আগের সময়ের সঠিক বয়ান কি যথার্থই রচনা করতে পারবেন? অথবা আসন্ন-সময়ের বার্তা কোনও লেখকই সঠিক, সাবলীল ও স্বচ্ছ ভাবে রচনায় তুলে ধরতে পারেন না, যদি না তাঁর সমাগত কালের সঙ্গে তিনি নিজেকে মনে-প্রাণে আদর্শে-বিশ্বাসে মেলাতে পারেন। আর তাই হয়ত আশাপূর্ণা দেবীর সত্যবতী পাঠকৃতিতে তার সময়ের চেয়ে অনেক বেশি এগিয়ে গেছে, অবিশ্বাস্য না বল্লেও, আশ্চর্যজনক ভাবে তো বটেই। আবার বকুলের বেলায়ও লেখিকা কিছুটা উদাসীন। অনামিকা দেবী বা বকুল কেউ যেন তাদের থিতু হয়ে দাঁড়াবার ভূমিটুকু খুঁজে পায়নি। প্রবাসী ভ্রমণবিলাসীর মতো শুধু পর্যবেক্ষণ করেই গেছে। কোনও ব্যাপারেই নিজেকে সম্পৃক্ত করেনি। তবে এ প্রসঙ্গের সূত্র ধরেই বলা যায়, তাঁর বেশিরভাগ গল্প-উপন্যাসেই নারীর নিজস্ব আর একান্ত ভুবনের পরিচয় ফুটে উঠেছে। কখনো সে প্রেমের দোলাচলতায় অস্থির, কখনো ভালোবাসার ডালি সাজিয়ে বসে থাকা চিরন্তন প্রেমিকা, কখনো নিজের চারপাশের উন্নাসিক পরিবেশে বঞ্চিত নারীর জেহাদ ঘোষণায় মুখর। তবে সব কিছুর মধ্যে নারীর অস্তিত্বের সংকট-ই প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। ত্রয়ী উপন্যাসের বিষয়ও তো তা-ই। তারা যেন নিতান্ত সমাজ-স্বীকৃত বা বলা যায়, বিশেষভাবে মর্যাদায় নন্দিত পরিচারিকা মাত্র। লেনিন-এর কথা উল্লেখ করা যাক,—"In all civilised

countries, even the most advanced, women are actually no more than domestic slaves. Women donot enjoy full equality in any capitalist state not even in the freest of republics."—এ প্রসঙ্গে একটি কথা প্রচলিত যে, পুরুষ-কেন্দ্রিকতার আবহে নারী মূলত প্রান্তিকায়িত অপর। সে-কথার সঙ্গে জুড়ে দিয়ে বলা যায়—পুরুষ-সর্বস্ব পরিসরে আসলে নারীরা আজও ইচ্ছাপূরণের উপায় মাত্র। এঙ্গেলস্-এর কথা ধার করে বলি— "The wife differs from the ordinary courtesan only in that she does not hire her body, like a wage-worker, on piece-work, but sells it into slavery, once for all." সুবর্ণলতাও অম্বিকাকে দেশের পরাধীনতার প্রসঙ্গে বলেছিল— "...পরাধীনতার যন্ত্রণা আমরা মেয়েমানুষরা বুঝবো না তো আর কে বুঝবে? আমরা যে চাকরেরও চাকরাণী!"

সব মিলিয়ে একথা অবশ্যই বলা যেতে পারে যে, ত্রয়ী উপন্যাসেই একটা না-বোধক ধারণা প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। 'বকুলকথা' উপন্যাসে যার প্রকাশ স্পষ্ট এবং কখনো তীব্র। শেক্সপীয়র সম্পর্কে কীট্স্ বলেছিলেন— 'negative capability', সুধীন্দ্রনাথ যার বাংলা অনুবাদ করেছেন 'নৈরাত্ম্যসিদ্ধি'; আশাপূর্ণার তিনটিউপন্যাস সম্পর্কেও কি একই কথা বলা যায় না? তবে সব কিছু ছাপিয়ে গেছে ঔপন্যাসিকের উপস্থাপনায় নারীর জীবনতৃষ্ণা এবং জীবনের সুস্থিত অবস্থানের ঠিকানা খোঁজার নিয়ত চেষ্টা। সত্যবতী যে-দাহে জ্বলছিল, তার সংক্রমণ ছড়ায় সুবর্ণলতার মধ্যে, যার উত্তর-দায় বহন করে বকুল। যেন—"বুকের উপরে তার রক্ত শোষে ঐতিহ্যের জোঁক/অকালে নিহত তার মাতামহী রোগ রেখে গেছে।" —বকুলের অন্তর্দাহ এ কবিতারই প্রতিধ্বনি। বকুল, সত্যবতী আর সুবর্ণলতার জীবনের হিসাব-নিক'শ বুঝেই তার নিজস্ব বয়ান সে রচনা করেছিল, লেখার জগতে তাই হয়ত তার বিহার। নারী-জীবনের অশেষ যন্ত্রণাকে স্পর্শ করে অসীম মমতায়; হয়ত নারী বলেই তা সম্ভব হয়। আসলে যে-যন্ত্রণার বিষে তারা নীলকণ্ঠ, তাকে প্রতিদিন চুমুকে চুমুকে গলায় ঢেলেই তো তাদের চলাচল। যেভাবে বাঁচতে চেয়েছিল, সে-স্বপ্ন তার সফল হয়নি। সত্যবতী-সুবর্ণলতারও সাধ ছিল, অথচ সাধ্যের চৌহদ্দি থেকে তাদের বহু যোজন দূরে অবস্থিতি। চারপাশের উদ্যত তর্জনি আর চোখ-রাঙানিতে তারা অন্যভাবে তৈরি হতে বাধ্য হয়। বকুল সময়ের সেই দীর্ঘশ্বাসের কথা শোনায়—"কাঁচা মাটিকে ছাঁচে ফেলে পুড়িয়ে শক্ত করার পর আর কি তাকে নতুন ছাঁচে ঢালা যায়? যায় না...শুধু ভাঙা যায়। কেউ ভেতরে ভাঙে, কেউ বাইরে ভাঙে।" —এই ভাঙাগড়ার খেলার মধ্যে থেকেই বকুল তার লেখার রসদ সংগ্রহ করে। আসলে সত্যবতী ও সুবর্ণলতা অনেক ক্ষেত্রেই স্বাভাবিক আচরণ করতে পারেনি, হয়তো সেই স্বাভাবিক সহমর্মি জীবন পায় নি বলেই। জীবনের প্রতিটি বিষয়েই ত্রুটিকে বড় করে তুলে ধরলে স্বাভাবিক জীবন-ধারণ ব্যাহত হতে বাধ্য। সত্যবতী ও সুবর্ণলতার ব্যবহারেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে অতিরিক্ত স্পর্শকাতরতা পাঠককেও সন্দিহান করে তোলে। কারণ, হৃদয়ের সম্পর্ক পরিবারের সবার সঙ্গে তাদের তৈরি হয় না। নিজের মতামত-আদর্শ বা ব্যক্তিত্বের আবহে নিজেরাই মগ্ন ছিল। সুবর্ণলতার কথায় তা স্পষ্টতা পায়— "ভয়ে তো কাঁটা হয়ে থাকি। বাবা ইস্তক সবাই। ...রাতদিন রাগের ঠাকুর হয়েই তো আছ।" সুবর্ণলতার মধ্যেই সেই অধৈর্য মনোভাব বা আপন মর্যাদা রক্ষার লড়াই-এর

একরোখা বাসনা লক্ষ করা যায়। ননদের বিয়ে উপলক্ষে দেওয়া গয়নাগুলো চুরি করার অপরাধে সকলের সামনে প্রবোধকে ডেকে এনে অপমান করে। সুবর্ণলতা বলে— "...মানে বুঝতে খুব কষ্ট হচ্ছে? গহনাগুলো কোথায় সরিয়েছ?" একঘর লোকের সামনে সুবর্ণলতার নিজের স্বামীর সঙ্গে এমন ব্যবহার আমাদের শীলিত আবেগকে আহত করে বৈকি।

আসলে নবকুমার বা প্রবোধ—এরা দুজনেই ব্যক্তিত্বহীন স্ত্রৈণ পুরুষ। সুতীব্র কামনার টানেই পুরুষ স্ত্রৈণ হয়। স্ত্রীর উপর যা-কিছু অত্যাচার করে, তার সবটুকুই নিজের আত্মবিশ্বাসের অভাব বা স্ত্রী-র কাছে নিজেকে হারিয়ে ফেলার ভয়ের জন্যে। তাদের ধারণা হাতের কাছে পাওয়া স্ত্রীধন ওই-বুঝি নাগালের বাইরে চলে যাবে। তাই প্রতিনিয়ত হারাবার ভয়ে শক্তির বল্গা পরাতে চেয়েছিল। নইলে বাড়ির ক্লেদাক্ত পরিবেশ থেকে মুক্ত করে তারা নিজেদের স্ত্রীকে আলাদা ঘর গড়ার জন্যে অন্যত্র সরিয়ে নিত না। এরা তথাকথিত পুরুষ-তান্ত্রিক সমাজের অত্যাচারী পুরুষ নয়। এরা ব্যক্তিত্বহীন নাবী-লোভী পুরুষ মানুষ মাত্র। সুবর্ণলতাকে প্রবোধ একেবারেই কি ভালবাসত না? জগুর বাড়িতে হাসের ডিম এবং ইলিশ মাছ রান্নার খবরে—"হঠাৎ মনটা চঞ্চল হয়ে ওঠে প্রবোধের। সুবর্ণ ইলিশের পরম ভক্ত।" —তারপর প্রবোধকে দেখা গেল ধুতিব আড়ালে সেই তরকাবি সমেত সুবর্ণলতার জানলার কাছে—"আগে খেয়ে তো নাও। ..জিনিস দুটো তোমার প্রিয় বলেই অনেক কৌশলে সরিয়ে নিয়ে এলাম।" —এই ব্যাপারগুলোকে একেবারেই অগ্রাহ্য করে দূরে সরিয়ে রাখা যায় কি?

অথচ এই জটিল আবহাওয়ায় থেকেও মুক্ত চিন্তার ক্ষেত্র নিজেরাই তৈরি করেছিল সত্যবতী বা সুবর্ণলতা বা বকুল। প্রথমে সমাজকে প্রাধান্য দেবে, না নিজেকে। এই দোলাচলতা তাদের ছিল না, বিশেষ করে সত্যবতীর। নইলে সে সেই রক্ষণশীল সময়ে দাঁড়িয়ে গৃহত্যাগি হবার সংকল্প গ্রহণ করত না। ইবসন-এর 'ডল্‌স্ হাউস'-এর নোরা যখন বলে—"I must make up my mind, which is right, society or I!" সত্যবতীর জীবনও যে সেই কথারই প্রতিধ্বনি করে। সমাজের নোঙরকে অগ্রাহ্য করে সে নিজের ব্যক্তিত্ব এবং আদর্শকে সহায় করে সংসার ত্যাগ করেছিল। সত্যবতী এবং কিছুটা সুবর্ণলতার প্রতিবাদী সত্তার ব্যাখ্যা করেছিল বকুল, এভাবে—"যতই তুমি ভদ্র হও, মার্জিত হও, মাঝে মধ্যে প্রতিবাদে মুখর হবারও দরকার আছে। অপ্রতিবাদ অন্যায় দুঃসাহসের জন্মদাতা।" প্রতিবাদ সত্যবতী বা সুবর্ণলতার জীবনের একমাত্র লক্ষ্যই ছিল। একথা একেবারেই নিন্দার্থে বলা নয়। আসলে আশপাশের আবহ যখন দুর্বিষহ প্রায়, তখন নিরুপায়ের একমাত্র পথ জেহাদ ঘোষণা যা কিছুটা আর্তনাদের সামিল। সত্যবতী সেই আর্তস্বরে মিশিয়ে দিয়েছিল কিছুটা প্রতিবাদের ভাষা; কিন্তু সুবর্ণলতার আর্ত কান্না নিষ্ফল পাথরে মাথা কুটে মরেছে। সে নিজের অবস্থার কারণ নির্ণয়ে তার ব্যাখ্যা তাই সহজেই করতে পারে,—"নিরুপায়তার প্রকাশই এই, অধস্তনের উপর বীরত্ব ফলানো। —তাই পুরুষজাতি যখন 'দরবারে না মুখ পায়' তখন ঘরে এসে বৌ ঠ্যাঙায়।" —সেই বৌ-ঠ্যাঙানোর মূল আসামী অবশ্য প্রবোধ। এই ত্রি-পর্বে বিন্যস্ত পরপর তিনটি উপন্যাসের পুরুষ চরিত্র অঙ্কনে আশাপূর্ণা বিশেষ এক অবস্থানের আধার তৈরি করেছেন, যে-আধারে স্থান পেয়েছে বিচিত্র পুরুষ চরিত্রের ভিন্নতর

স্বভাবের সমাবেশ। একদিকে সত্যবতীর বাবা রামকালী। যিনি মেধায়-মননে সে-যুগের অগ্রসর চিন্তা-চেতনাব পরিচয় দেন। আবার কখনও তিনি নারী সম্পর্কে চিরাচরিত ধারণাও পোষণ করেন। অন্যদিকে সত্যবতীর শ্বশুর নীলাম্বরের চরিত্রহীনতা ছিল লাগাম-ছাড়া। তবে স্বামী নবকুমার ব্যক্তিত্বহীন হলেও চরিত্রহীন নয়। কিন্তু সুবর্ণলতার স্বামী প্রবোধ যেমন ব্যক্তিত্বহীন, তেমনি কপট-চটুল মনোবৃত্তির পুরুষ। নবকুমার সম্পর্কে বুঝি সত্যবতীরও তেমন কোনও অভিযোগ ছিল না। ছিল বুকভরা অভিমান। সুবর্ণকে দেওয়া চিঠিতে সত্যবতীর সেই মনোভাবই প্রকাশ পেয়েছে—"সংসার হইতে দূরে থাকিয়া অবিরত মানুষকে বিশ্লেষণ করিতে করিতে এইটা বুঝিয়াছি এ সংসারে যাহাদের 'অন্যায়কারী' বলিয়া চিহ্নিত করা হয় তাহারা সকলেই হয়তো শাস্তির যোগ্য নয়। তাহারা যা কিছু করে, তার সবটাই দুষ্টবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া করে না। অধিকাংশই করে না বুঝিয়া। তাহাদের বুদ্ধিহীনতাই তাহাদের অঘটন ঘটাইবার কারণ। কাজেই তাহারা ক্রোধের যোগ্যও নয়। তাহারা বড় জোর বিরক্তির পাত্র এবং করুণার পাত্র।" নবকুমারও সুবর্ণলতাকে এক সময় নিজের অক্ষমতা স্বীকার করে এভাবেই বলেছিলেন—"...তবে একটা কথা বলে যাই রে, যা কবেছি, না বুঝে করেছি। বুঝে জেনে অত্যাচার করতে করিনি। কিন্তু সেই একজন তা বুঝল না—কোনোদিন।" —কিন্তু সুবর্ণলতা প্রবোধকে সত্যবতীর মতো ক্ষমা করে যেতে পারেনি। সে প্রবোধকে ঘেন্না করেছে। বলতে বাধ্য হয়েছে—"আমার ইচ্ছে হয় কেউ আমায় ভালবাসুক, আমি কাউকে ভালবাসি। জানি এসব কথা খুব নিন্দের কথা তবু চুপি চুপি না বলে পারছি না—প্রেমে পড়তে ইচ্ছে হয় আমার। ...একটা শিশুকে ধরে জোর করে বিয়ে দিয়ে দিলে, আর একটা বালিকাকে ধরে জোর করে 'মা' করে দিলেই তার মনের সব দরজা বন্ধ হয়ে যাবে? যেতে বাধ্য?" —কথাগুলো সুবর্ণলতার সময়ের নিরিখে অগ্রবর্তী বটে। মনে পড়ে বার্ণাড শ-এর নাটকের নায়িকার উক্তি—"Oh! How silly the law is! Why can't I marry them both! Well, I love them both." —আসলে সত্যবতী বাবা-স্বামী আর সবশেষে ছোট ছেলেকেও মনের সঙ্গি হিসেবে পেয়েছেন। সুবর্ণকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন—"তোমার ছোড়দাদা মোগলসরাইতে কাজ করে, মাঝে মাঝে আসে। নিষেধ শোনে না। মনে হয় সে হয়তো আমাকে কিছুটা বোঝে, তাই কখনো তোমার দাদার মত মায়ের অপরাধের বিচার করিতে বসে না।" —কিন্তু সুবর্ণলতা-বাবা-ভাই-স্বামী-পুত্র সব দিক থেকেই ছিল বঞ্চিত। আশাপূর্ণা সংশয় প্রকাশ করে নিজেই বলেন—".. সুবর্ণলতা না সত্যবতীর মেয়ে! যে সত্যবতী স্বামীর কাছ থেকে আঘাত পেয়ে এক কথায় স্বামী সংসার ত্যাগ করে গিয়েছিল, আর ফেরেনি! মায়ের সেই তেজের কণিকামাত্র পায়নি সুবর্ণলতা? সত্যবতী তার মেয়ের এই অধোগতি দেখে ধিক্কার দেবে না?" হয়তো দেবে না। দেবে না, কারণ—সত্যবতীর অবস্থায় আর সুবর্ণলতার অবস্থায় 'যে আকাশ পাতাল তফাত'। কী সেই তফাত? তফাতটা এখানেই—"সুবর্ণ-র মার জীবনের পৃষ্ঠপটে ছিল এক অত্যুজ্জ্বল সূর্যজ্যোতি, সত্যবতীর বাবা সত্যবতীর জীবনের ধ্রুবতারা, সত্যবতীর জীবনের বনেদ, সত্যবতীর মেরুদণ্ডের শক্তি। সুবর্ণর পৃষ্ঠপটে শুধু এক টুকরো বিবর্ণ ধূসরতা। ...সত্যবতীর স্বামী অসার অপদার্থ ছিল কিন্তু অসভ্য অশ্লীল ছিল না।" —সুবর্ণলতার অসার্থকতা সম্বন্ধে

লেখিকা নিজেই সংলাপ রচনা করেন সুবর্ণলতার আত্মপক্ষ সমর্থনের যুক্তি হিসেবে—"মা, তোমার মেয়ে তোমার মত নিষ্ঠুর হতে পারেনি, এই তার ত্রুটি। তোমার মত হাল্কা ছোট্ট সংসার পায়নি, এই তার দুর্ভাগ্য! ...সকলের জীবন সমান নয়, সবাইকে একই মাপকাঠিতে মেপে বিচার করা যায় না! যাকে বিচার করতে বসবে, আগে তার পরিবেশের দিকে তাকিও।" —যথার্থ যুক্তি অনস্বীকার্য। যা খণ্ডন করার মানেই হয় না। কিন্তু, এই যথার্থ যুক্তির মধ্যে সত্যবতী সম্পর্কে সুবর্ণলতার চাপা তির্যক মনোভাব ছিল না কি! সত্যবতীর গৃহত্যাগ জনিত পদক্ষেপের বিষয়ে পাঠক শুধু সমর্থনই করেনি, সাধুবাদও জানিয়েছিল উত্তর-প্রজন্মের সঠিক ও সফল উদাহরণযোগ্য নারী হিসেবে। সেখানে সুবর্ণলতা সম্পূর্ণ উপন্যাসের এখানে সেখানে তার অবস্থার জন্য সত্যবতীকে দায়ী করে কি কঠিন প্রশ্নচিহ্ন বসিয়ে দেয়নি? —না কি সুবর্ণলতা লেখার সময় আশাপূর্ণাই আগের তৈরি নারীচরিত্রের কাজকর্ম নিয়ে দোদুল্যমানতায় আক্রান্ত ছিলেন! এইখানে এসে, নারী-জীবনের বা নারীর অবস্থানগত অধ্যায়ের অবতরণের ইতিকথা সম্পর্কিত বাক্য কি আর বলা যায় আশাপূর্ণার ত্রয়ী উপন্যাস সম্পর্কে? বিবাহের ছকে-বাঁধা গ্রন্থিকে না মানার যে-উচ্চারণ সত্যবতীর পত্রে সুবর্ণ পেয়েছিল, বকুল তো সেই কথাই রক্ষা কবেছে নিজের জীবনে। স্বামী পুত্রের দ্বারা মানসিক নির্যাতন বকুলকে পেতে হয়নি। সে তার চলার পথ নিজেই তৈরি করেছিল। যার উত্তরসূরি শম্পা। হয়তো নারীর আত্মমর্যাদা রক্ষায় মরিয়া চেষ্টায় মাথা উঁচু করে রাখার যথার্থ সুরেই সুবর্ণ বলেছিল—"আহা-র চাইতে অনেক ভালো ঈর্ষা।"

অনেকেই বকুলকথার সমালোচনা করে বলে থাকেন, আশাপূর্ণা নতুন কালের নারীর জেগে ওঠার কথা না বলে তার অবনমনের বয়ানই লিখেছেন। কিন্তু, একথা আপাতভাবে মেনে নিলেও শম্পা বা পারুলের পুত্রবধূর ব্যক্তিত্বকে কি অস্বীকার করা যেতে পারে? যে-শম্পা জীবনের কোনও সংঘাতেই মুষড়ে পড়েনি, হারিয়ে যেতে চায়নি অন্ধকারে। অন্যদিকে পারুলের পুত্রবধূর সঙ্গে ছেলের বিবাহ-বিচ্ছেদের সময় খোরপোষ নিতে সে অস্বীকার করে। পারুল শুধু পুত্রবধূর এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেনি, স্বাগত জানিয়েছে পাঠকও। জাতপাতের বাঁধন যেখানে নির্মল আর বকুলের পথকে বন্ধুর করেছে, সেখানে সেই বাধাকে শম্পারা কত সহজেই অগ্রাহ্য করতে পেরেছে। এতে কি নতুনের জয় যাত্রা ঘোষিত হয় নি? পারুল-ই তো এর আরেক উদাহরণ। আশাপূর্ণা দেবীর 'তিনছন্দ' উপন্যাসের একটি চরিত্র বলেছিল—"মেয়েমানুষকে ওরা এমনি করে মারে, মনে করে পৃথিবীতে শুধু নিজেরা বাঁচবে। তা হয় না...তাতে নিজেকেও মরতে হয়।" —আশাপূর্ণা 'ট্রিলজি'-তে যে বিশেষ তিনটি এবং সেই সঙ্গে আরও কয়েকটি নারীচরিত্র সৃষ্টি করেছেন, প্রাথমিক দৃষ্টিতে তাদের অবমাননাকে পর্যুদস্ত হওয়া বা হারিয়ে যাওয়া মনে হলেও, তারা কিন্তু এর মধ্যেই তাদের জয়ের উচ্চকণ্ঠ শুনিয়ে গেছে। পরম্পরা অনুসারে এরা আসলে যে যার মতো জয়ের পতাকা নিয়ে এগোতে চেয়েছে। শুধু 'ট্রিলজি' নয়, তাঁর বহু উপন্যাসেই এর নজির আছে। এদের আপাত-দৃষ্টিতে কোন-ঠাসা, বা জ্বলে-পুড়ে ফুরিয়ে গেছে বলে মনে হলেও, আসলে তাদের ব্যক্তিত্ব বা আত্মমর্যাদার স্ফুলিঙ্গ রেখে যায় আগামী প্রজন্মের কাছে। Mark-zemansky তাঁর 'Heat and thermodynamics' বইতে লিখেছেন—

"Since irreversible processes are continually going on in nature, energy is continually becoming unavailable for work ... It must be understood that energy which is unavailable for work is not energy which is lost...Energy is merely transformed from one form into another." অর্থাৎ শক্তির শেষ নেই, সে পরিবর্তিত, রূপান্তরিত, পরিবর্ধিত বা স্থানান্তরিত হয় মাত্র। যেমন, সত্যবতী-সুবর্ণলতা-বকুল এবং শম্পা। এখানে আরও একটি নাম জুড়ে দেওয়া যেতে পারে, সে হচ্ছে পারুল। একেকসময় মনে হয় লেখিকা 'পারুলকথা' লিখলেই তো পারতেন। নাকি ভেবে নিয়েছিলেন তাঁর শেষ উপন্যাসের নায়িকাকে অবিবাহিত রেখে নবকুমার প্রবোধ-ইত্যাকার পুরুষদের যোগ্য উত্তর দেবেন? হয়তো তাও নয়।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথার অবতারণা করা যেতে পারে যে, 'বকুলকথা'-কে এই ত্রয়ী উপন্যাসের শেষ পর্ব বললেও, এরই সম্প্রসারিত রূপ আরও একটি উপন্যাসে লক্ষ করা যায় : 'কখনো দিন কখনো রাত' উপন্যাসটি এই ত্রিপর্বের পরিশিষ্টও বলা যেতে পারে। 'বকুল-কথা' ১৯৭৪ সালে লেখা হয়েছিল এবং 'কখনো দিন কখনো রাত' ১৯৭৫-এ লেখা। অর্থাৎ মাত্র এক বৎসরের ব্যবধান। কিন্তু ভাবাদর্শগত ভাবনার ফারাক অনেকখানি। কারণ, উপন্যাসের নারীচরিত্র রুচি বা সুরুচিও বকুলের মতোই লেখিকা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। তবে সুরুচি অনামিকা বা বকুলের সময়ের কাছাকাছি হয়েও এবং একই স্রষ্টার তৈরি হয়েও নিজে কিন্তু বিয়ে করে সুস্থ ভাবে বাঁচতে পেরেছে, পেরেছে লেখক-জীবনের সঙ্গে দাম্পত্য সম্পর্কের মেলবন্ধন ঘটাতে। বকুল সেখানেই থেমেছিল প্রপিতামহের জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতার মাশুল হিসেবে। দেখা গেছে সুরুচির স্বামী শুধু সাহিত্যরসিকই নয়, সেই সঙ্গে স্ত্রীকে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় সাহিত্যের জগতে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। যে না-বোধক স্বরক্ষেপে শেষ হয়েছে বকুলকথা, সেই নাস্তি-র বৃন্ত থেকেই ফুটেছে অস্তিবাদের ফুল, রুচির চরিত্র সৃষ্টির মধ্যদিয়ে। লেখিকা যেন 'বকুলকথা'র অস্বস্তিজনিত ত্রুটি গুলিকে মুছতে চেয়েছেন 'কখনো দিন কখনো রাত' উপন্যাস রচনা করে। অথবা এও বলা যায়, আশাপূর্ণা দেবী হয়তো বিশেষ কোনও ভাবনার বশবর্তী হয়ে তিনখানি উপন্যাস লিখেছিলেন। তাই ট্রিলজি-র ঠিক আগে, পরে বা এর মধ্যে যেগুলো উপন্যাস লিখেছিলেন, সেগুলিতে এর কোনও ছাপ পড়েনি; তিনটি উপন্যাসের বক্তব্যের চিহ্নমাত্র এর মাঝখানে একই সময়ে লেখা উপন্যাস গুলোতে আশ্চর্যজনক ভাবে অনুপস্থিত।

তবে মিল আছে চরিত্র চিত্রণে। পারুল ও বকুল চরিত্রের আভাস সুনীতি আর সুরুচি চরিত্রে যেমন দেখা গেছে, তেমনি তাদের বাবাকে সত্যবতীর বাবা রামকালী চট্টোপাধ্যায়ের অভিন্ন-সত্তা বলে মনে হয়। অন্যদিকে একান্নবর্তী পরিবারের যে-বিষক্রিয়া প্রথম প্রতিশ্রুতি এবং বিশেষ করে সুবর্ণলতায় দেখা গিয়েছিল, তারই ঠিক বিপরীত চিত্র 'কখনো দিন কখনো রাত' উপন্যাসে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ সব মিলিয়ে ত্রয়ী উপন্যাস গুলির একই সারিতে রাখা যেতে পারে আলোচ্য উপন্যাসকে।

প্রসঙ্গ সূত্রে 'বালুচরী' উপন্যাসের কথাও উল্লেখ করার ইচ্ছে জাগে। কারণ, সুবর্ণলতা এবং 'বালুচরী'র রচনাকাল একই সময়ে, ১৯৬৭। কিন্তু, একই সময়ে লেখা একই লেখিকার

দু'ধরনের চিন্তার বিস্তারে আমার্দের অবাক হতে হয়। যেখানে বিবাহ প্রতিষ্ঠানের সমালোচনা এবং পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতাপের বাস্তব বর্ণনা সুবর্ণলতা উপন্যাসকে বিশেষ পরিচিতি ও মর্যাদা দিয়েছে। সে-সময়েরই 'বালুচরী' যেন বিপরীত ভাবনার প্রকাশ না করলেও, কোথায় যেন অন্য সুর তাতে বেজে উঠতে শোনা গেছে। মন্দিরার জীবন-সংগ্রামে সহযোগী সত্তা হিসেবে অভিজিৎকে এগিয়ে আসতে যেমন দেখা গেছে, তেমনি সুবর্ণলতার সমসাময়িক হয়েও বিবাহের নিয়মতান্ত্রিক পরিসরকে অগ্রাহ্য বা আপাঙ্‌ক্তেয় বা অভিশপ্ত বলে সে দূরে সরিয়ে দেয়নি। সুবর্ণলতার যন্ত্রণাব ফসল যদি হয় বকুল, তবে বলব একই কালের মন্দিরা, সুরুচির মধ্যেই সেই যন্ত্রণার কাঁটা ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছে ভালবাসার কলিটিকে।

তাছাড়া. আরেকটি প্রসঙ্গের উত্থাপন করার প্রয়োজন মনে করি একারণেই যে, ত্রয়ী উপন্যাসের লেখিকার ভাবনাগত বা বলা ভালো, ভাবাদর্শের হদিশ সেখানেই হয়ত স্বচ্ছ হবার অপেক্ষা রাখবে। ১৯৫২ সালের 'অগ্নিপরীক্ষা' উপন্যাসের চিত্রলেখাকে লেখিকা বাঁকা চোখে শুধু দেখেনই নি তার ব্যবহারের রূঢ় সমালোচনাও করেছেন। কিন্তু, সেই একই ঘটনার জন্য সত্যবতীকে সমর্থন করেন জোরালো ভাবেই। আর এলোকেশীকে হেমপ্রভার শুচিশুভ্র ব্যক্তিত্ব থেকে পিছিয়ে পড়তে হয় একই কৃতকর্মের জন্য। কারণ, যেহেতু লেখিকার এমনতব কাজ সম্পর্কে আর সম্মতি ছিল না। অগ্নিপরীক্ষায় তাপসীর বাল্যবিবাহকে নিয়ে যেমন আশাপূর্ণা হিন্দু বাঙালির চিরন্তন ধর্মীয় আবেগকে প্রাধান্য দিয়েছেন, তেমনি হেমপ্রভা ও কান্তি মুখোপাধ্যায়ের বাল্যবিবাহ দেবার মতো ঘটনাকে সমর্থন করলেও বা মেনে নিলেও আশ্চর্য হতে হয়, প্রথম প্রতিশ্রুতি পড়ার পর। কেননা, প্রথম প্রতিশ্রুতিতে লেখিকা ঠিক ওই বিষয়কেই সমালোচনা করেছেন তীব্র ভাষায়। যেখানে তিনি একবার হেমপ্রভার ব্যবহাবে ক্ষমাশীল, ঠিক সেই একই ব্যবহার করার জন্যে তিনি হন এলোকেশীর দণ্ডদাত্রী। তা হলে কি ১৯৫২ সালের প্রায় ১২ বছর অর্থাৎ এক যুগের ব্যবধানে লেখিকার চিন্তাচেতনা তথা ভাবনাস্রোতের আমূল দিক্ পরিবর্তন ঘটেছে? অথচ বালুচরী আর সুবর্ণলতা তো একই সময়ে লেখা, সেখানে গল্প বা কাহিনি নাহয় একেবারেই আলাদা, কিন্তু প্রচ্ছন্ন প্রশ্ন থেকেই যায়, কাহিনির মূল সুর যে-চরিত্রের আধারে নির্মাণ করা হ'ল, তাদের স্রষ্টার মতাদর্শে এত ফারাক হয় কী করে? ১৯৭৪-এর মাত্র একবছর পরের লেখা 'কখনো দিন কখনো রাত'-এর সুরুচির জীবন-জিজ্ঞাসার আদল একেবারেই বদলে যেতে পারে একই লেখিকার কলমে? তাহলে কি আশাপূর্ণা দেবী তেমন কোনও ভাবাদর্শে চালিত হননি? যখন যেমন মনে হত তাকে সেভাবেই পাঠকৃতির আওতায় স্থান দিতেন? কোনও ভাবাদর্শ ছাড়া লেখক-সত্তার আত্মপরিচয় স্থাপনও সম্ভব কি? হয়তো এসব প্রশ্ন শুধু প্রশ্নের প্রতীকেই শোভা পাবে। হয়তো লেখিকার সত্তার যেমন, তেমনি তাঁর লেখা কাহিনির নানা নারীচরিত্রের সত্তার উন্মোচন সম্ভব নয় কোনও পুরুষের পক্ষেই। নারী তার জগৎ যেমন নিজেই রচনা করে, তেমনি তার সমস্যার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য সে নিজেই উন্মোচনে এবং কখনো বা আবিষ্কারের সমর্থ হয়। এটাই তো স্বাভাবিক।

"যে প্রতিমা গড়েছিলে সে আমার নয় কখনো
সে আমার প্রতিকৃতি নয়
দর্পণে দেখেছি আমি ইদানিং আমার স্বমুখ
সে মুখ তোমার চোখে পড়েনি কখনো।"

—হয়তো চিত্রলেখা, হেমপ্রভা, তাপসী, সত্যবতী, এলোকেশী, সুবর্ণলতা, মুক্তকেশী, মন্দিরা, বকুল আর সুরুচিরা নিজেদের জগৎ-কে এভাবে নিজেরাই চিনে নিতে চায় নিজেদের মতো করে।

নাকি এতে প্রমাণিত হলো যে আশাপূর্ণা শেষ পর্যন্ত মেয়েদের বরণীয় বা অবরণীয় সম্পর্কে স্থির কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেন নি? বরং রয়ে গেছেন অমীমাংসিত জিজ্ঞাসার দ্বন্দ্বে ও সংশয়ে অনিশ্চিত!

সুবর্ণলতা : নারীর আবহমানকালের ধারাভাষ্য

বিকাশ রায়

ভূমিকা

বিশ শতকের চারের দশক। পাল্টে যাচ্ছে দেশের সবকিছু। দুর্ভিক্ষ-দাঙ্গা-দেশভাগ-নানা আন্দোলন আর উদ্বাস্তু স্রোতে ভারত ইতিহাসের গতিপথ নির্মিত হচ্ছে আর এক প্রেক্ষাপটে। সেই সময়কালে কালখণ্ডের দাবির বিপ্রতীপে এক নতুন যুগ ও ব্যতিক্রমী উপস্থাপনা নিয়ে লেখালেখির জগতে পা রাখলেন আশাপূর্ণা দেবী (১৯০৯-১৯৯৫), যাঁর সাহিত্যজীবন বিশ শতকের চারের দশক থেকে শুরু করে চলেছিল এই শতকের শেষ দশক অবধি। এই দীর্ঘসময়ে বাংলা সাহিত্য-ভাণ্ডারে রেখে গেছেন অনেক কিছুই। তথাপি কথাসাহিত্যিক গোপাল হালদার বললেই যেমন 'একদিন', 'প্রতিদিন', 'অন্যদিন' বা 'ত্রিদিবা'-র কথা চলে আসে কিংবা ঔপন্যাসিক ধূর্জটিপ্রসাদ বললেই 'অন্তঃশীলা', 'আবর্ত', 'মোহানা'—এই 'ত্রয়ী'র কথা মনে পড়ে তেমনি বাংলা ক াসাহিত্যে আশাপূর্ণা দেবী বললেই (অন্যান্য লেখাকে ছোট না-করেও) তাঁর বিখ্যাত ট্রিলজি 'প্রথম প্রতিশ্রুতি', 'সুবর্ণলতা', 'বকুলকথা'-র কথাই পাঠকের বেশি করে মনে পড়ে।

আশাপূর্ণার সমস্ত সাহিত্যভাবনার সম্পাতবিন্দুতে রয়েছে—'মেয়েদের সবকিছুতেই এমন অধিকারহীনতা কেন? তাদের উপর অন্যায়-অবিচারের জাঁতা চাপানো কেন? তার জীবন অবরোধের মধ্যে কেন?' এই সমস্ত 'কেন'-ই তাঁকে বিচলিত করেছে। আর এই সমস্ত 'কেন'-র অনুসন্ধান ও উত্তর খুঁজতে চেয়েছেন তাঁর আখ্যানের স্বরান্তরে। 'বকুলকথা' উপন্যাসে অনামিকা দেবীর বাচনে যা থাকে তা তো আশাপূর্ণারই নিজস্ব অনুভববেদ্য উচ্চারণ—"মেয়েদের সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা, আশা-হতাশা, ব্যর্থতা-সার্থকতা অনামিকা দেবীর লেখনীতে যেমন ফোটে তেমন বুঝি আর কারো নয়। ...আমি যে দেখতে পাই ভয়ংকর প্রগতির হাওয়ার মধ্যেও জায়গায় জায়গায় বন্দি হয়ে আছে সেই চিরকালের দুর্গতির রুদ্ধশ্বাস। দেখতে পাই, আজও লক্ষ লক্ষ মেয়ে—সেই আলোহীন বাতাসহীন অবরোধের মধ্যে বাস করছে। এদের বাইরের অবগুণ্ঠন হয়তো মোচন হয়েছে, কিন্তু ভিতরের শৃঙ্খল আজও অটুট।" (বকুলকথা, পঞ্চবিংশতি মুদ্রণ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, পৃ:-২৮) স্বাভাবিকভাবেই নারীজীবনের হালহকিকত তাঁর উপন্যাসের প্রাণভোমরা বা কেন্দ্রবিন্দু। যে-নারী ভারত ইতিহাসে অবহেলিতা, বঞ্চিতা, অবরোধবাসিনী, পরাধীনা, দুঃখিনী, সেই নারীদের হয়েই কলম ধরেছেন আশাপূর্ণা দ্রোহাত্মক মেজাজে—"আমার নিরুচ্চার প্রতিবাদগুলোই যেন এক একটি প্রতিবাদের প্রতিমূর্তি হয়ে আমার কাহিনির নায়িকারূপে দেখা দিয়েছে" (আর এক আশাপূর্ণা, আশাপূর্ণা দেবী, পৃ: ১৬) আর এই নায়িকারা হলেন—সত্যবতী, সুবর্ণলতা, বকুল, কাবেরী, সুনয়না, সুমনা, টুনি। এই নায়িকারা সত্যিকার অর্থে কতটা প্রতিবাদী? প্রতিবাদের ধরন কেমন? উপন্যাসের সময় ও সমাজদর্পণে এই সমস্ত প্রশ্নের ভাববার অবকাশ আছে। আমরা বরং উপরিউক্ত আশাপূর্ণা কথিত বয়ান তাঁর আখ্যানে বিশেষত 'সুবর্ণলতা' উপন্যাসে কতখানি অনিবার্যরূপে

প্রতিফলিত হয়েছে, এই উপন্যাস পাঠে পাঠক কোন্ কোন্ প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছেন, ত্রয়ী উপন্যাসের কাহিনির পারম্পর্য সূত্রে 'সুবর্ণলতা'র অবস্থান কোথায়—এই নানাবিধ জিজ্ঞাসার নিরসনকল্পে উপন্যাসের সময়চেতনা ও সমাজতত্ত্বের গভীরে প্রবেশ করতে পারি। কেননা, উপন্যাসের ব্যাখ্যা— 'dialogue with our current Concerns'—এর মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে।

প্রস্তাবনা

'সুবর্ণলতা' উপন্যাসে কালচেতনা ও সমাজদ্বন্দ্ব পর্যালোচনার পূর্বে আশাপূর্ণার সাহিত্যচিন্তার প্রেক্ষিত বা সূত্রের দিকে ফিরে তাকানো যেতে পারে, যা তাঁর স্বীকারোক্তিতে প্রতিভাত হয়—

(১) "সারাজীবন এই যে এত লেখা লিখেছি তার সবগুলির মুখই ফিরে আছে সত্যের দিকে, জীবনের দিকে, বাস্তবের দিকে। সংগ্রামের কথা বলেছি, জটিলতার জট খুলিনি, কিন্তু দেখিয়েছি কত অসম্ভব জায়গায় থাকে তাঁর গাঁটগুলি, মনে হয়েছে আমার লেখা মানুষকে তার ব্যবহারিক জীবনের ক্ষেত্রে, তার মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে যদি কোনোরকমে কাজে লেগে যায়, তা হলেই তো লেখা সার্থক।"

(২) "বাইরের জগতের সব কিছু ভাঙাগড়া, যুদ্ধ-বিদ্রোহ, রাষ্ট্রের উত্থান-পতন এসবের হিসাব লিখে রাখেন ইতিহাসকার। কিন্তু সে ইতিহাস অন্তঃপুরের কথা বলে না এবং হিসেব রাখে না তার ভাঙাগড়ার অথচ সেখানেও চলে যুদ্ধ, বিদ্রোহ, মুক্তি ও তপস্যা। আমার এই তিনখানি উপন্যাস (ট্রিলজি) সেই যুদ্ধ আর তপস্যার ইতিহাস।"

এই দুই বাচনের যূথবদ্ধতায় লেখিকার মনন প্রকর্ষের ও সনিষ্ঠ উৎসৃজনের একটা কাঠামো আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেই কাঠামোটিই শ্রেয়সের চিন্তা হিসেবে তাঁর কাহিনি ও চরিত্রসৃজনের ক্ষমতাকে বিস্তারিত করে। তাছাড়া, ১৩৯৯ সালের শারদীয় 'উদ্বোধন' পত্রিকায় 'নারীমুক্তি' বিষয়ক প্রবন্ধে আশাপূর্ণা যে-অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন, লেখিকার সেই উপলব্ধির 'কাঠামো' (Pattern) সম্পর্কে Arnold Kettle -এর মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য—

'The history of novel is, in this sense, the history of the novelist's life...Life and Pattern are not in truth separate Pattern is the way, life developes.' (An Introduction of the English Novel, Vol-I)। আসলে তাঁর 'ট্রিলজি' বংশপরম্পরার ইতিহাস। তিন প্রজন্মের গল্পো। প্রবহমান মহাকালের প্রেক্ষাপটে তিনটি নারী চরিত্রের অন্তর্মোচন .

(ক) সত্যবতী : 'এ বিয়ে বিয়েই নয় শুধু মাত্র পুতুল খেলা। এ আমি মানি না' (ন'বছরের মেয়ে সুবর্ণলতার বিয়ে হওয়াতে) কিংবা, নিজের সংসার সম্পর্কে প্রশ্ন—'বিয়েটা কেন ভাঙা যায় না?'

(খ) সুবর্ণলতা : 'তোমার মেয়ে, মায়ে তাড়ানো বাপে খেদানো তেজটা ফলাবে কোন পতাকাতলে দাঁড়িয়ে? ধিক্কার দিতে এসো না মা শুধু এইটুকু ভেবো।'

(গ) বকুল : 'মাগো! তোমার পুড়ে যাওয়া, হারিয়ে যাওয়া লেখা সব আমি খুঁজে বার করবো, সবকথা আমি নতুন করে লিখবো। দিনের আলোয় পৃথিবীকে জানিয়ে যাবো

অন্ধকারের বোবা যন্ত্রণার ইতিহাস।'

সুবর্ণলতা : সেকাল-একাল-চিরকাল

সাহিত্যকে এক কথায় বলা হয় 'কালের আয়না'। কালের দর্পণে সাহিত্যে ব্যক্তি ও সমাজ প্রতিবিম্বিত হয়, সেইকারণে ব্যক্তি ও সমাজ—উভয়ই কাল ও কালান্তরের সাক্ষী। ঔপন্যাসিক তাঁর গল্পের বা কাহিনির স্বার্থে কালের আধারে চরিত্রসমূহের রূপ দেন। এ প্রসঙ্গে 'সাহিত্যের আকাশ' গ্রন্থে দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ জানাচ্ছেন—"...সাহিত্য একটি বিশিষ্ট যুগের চিন্তা, অনুভূতি, ভাষাদর্শ, অভীপ্সা, বাস্তবতা এবং সমস্যা—চেতনার বহিঃপ্রকাশ ছাড়া কিছু নয়। অন্তর্জগতের পরস্পরবিরোধী ভাবদ্বন্দ্ব কালের প্রভাবে সমন্বিত রূপ নিয়ে বহির্জগতে যখন আত্মপ্রকাশ করে তখনই হয় সাহিত্যের সৃষ্টি" (পৃ: ১৩৭)। কালসচেতন ঔপন্যাসিক সমকালে অবস্থান করে একাল-সেকাল-চিরকাল—এই ত্রিকালকে তুলে ধরেন। ই. এম ফর্স্টারের প্রবাদপ্রতিম উক্তি এবিষয়ে স্মর্তব্য—'In a novel, there is always a clock' উপন্যাসে দেশ-কাল-সময়ের পটে ব্যক্তিমানুষের ভাস্বর হওয়ার কাহিনি যেমন একদিকে থাকে তেমনই সমাজ ও সময়ের সঙ্গে পীড়িত মানবাত্মার ছবিও তাতে প্রতিফলিত হয়। এখন প্রশ্ন, কোনো সময় বা কোনো সমাজকে কেন একজন ঔপন্যাসিক অবলম্বন করেন? তাঁর অন্বিষ্ট ব্যক্তিমানুষটিই বা কেমন? 'সুবর্ণলতা' উপন্যাস অবলম্বনে এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে প্রথমেই এই উপন্যাসটি সম্পর্কে আশাপূর্ণার অভিমতটির দিকে ফিরে তাকানো যাক—

> *"আপাতদৃষ্টিতে 'সুবর্ণলতা' একটি জীবনকাহিনি, কিন্তু সেইটুকুই এই গ্রন্থের শেষ কথা নয়। সুবর্ণলতা একটি বিশেষ কালের আলেখ্য। যে কাল সদ্যবিগত, যে কাল হয়তো বা আজও সমাজের এখানে সেখানে তার ছায়া ফেলে রেখেছে। 'সুবর্ণলতা' সেই বন্ধন-জর্জরিত কালের মুক্তিকামী আত্মার ব্যাকুল যন্ত্রণার প্রতীক।*
>
> *আর একটি কথা বলা আবশ্যক। আমার 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' গ্রন্থের সঙ্গে এর একটি যোগসূত্র আছে। সে যোগসূত্র কাহিনির প্রয়োজনে নয়, একটি 'ভাব'-কে পরবর্তীকালের ভাবধারার সঙ্গে যুক্ত করার প্রয়োজনে।*
>
> *সমাজবিজ্ঞানীরা লিখে রাখেন সমাজ বিবর্তনের ইতিহাস, আমি একটি কাহিনির মধ্যে সেই বিবর্তনের একটি রেখাঙ্কনের সামান্য চেষ্টা করেছি মাত্র।" (সুবর্ণলতা উপন্যাসের ভূমিকা, ত্রিংশ মুদ্রণ ১৪০৯, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি.)।*

স্বভাবতই 'সুবর্ণলতা' উপন্যাস হিসেবে কালের আখ্যান, যে-কাল অপসৃয়মান এবং বর্তমান, যা আসন্ন ভবিষ্যৎ-এর সামনে প্রশ্নাতুর। ব্যক্তি সুবর্ণলতাকে জানতে হলে প্রথমে তার মা 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'-র সত্যবতীকে জানতে হয়। 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'-র সময়কাল উনিশ শতকের প্রাথমিক পট। যে-শতক শিক্ষার আলোয় ব্যক্তির আশা-আকাঙ্ক্ষা ও মননের

স্বাধীনতায় প্রাচীন জড়তাবদ্ধ প্রথার বিলুপ্তি সাধনে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, সেই শতকে বঙ্গজলোকে লেখকেব যখন অধিকাংশই ব্যক্তির ভূমিকাকে নিন্দার চোখে দেখছেন, প্রথার সপক্ষে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে সমর্থন যোগাচ্ছেন তখন আশাপূর্ণার সত্যবতী ব্যক্তি হিসেবে প্রথার বিপরীত স্রোতে অবগাহন করতে চেয়েছেন। পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে সে শুধু প্রতিবাদ করেই থেমে থাকেনি, ধীরে ধীরে সেই প্রতিবাদের ফল স্বরূপ ঘৃণায় বিরক্তিতে স্বামী সংসারের শৃঙ্খলকে অগ্রাহ্য করে বেরিয়ে পড়েছে মনুষ্যত্ববোধের আশ্রয়ে। ফলত সত্যবতীর স্বামী নবকুমার অভিশাপ দিয়েছে যে মর্মে—'মেয়ে মানুষের এত সাহস ভালো নয়। আমি বলে দিচ্ছি, অশেষ দুঃখু আছে তোমার কপালে।' সেখানে সত্যবতীর প্রতিক্রিয়া--'তাই দিয়ে এসেছ তোমরা আবহমানকাল থেকে। স্বামী হয়ে, বাপ হয়ে, ভাই হয়ে। ওটা নতুন নয়। অভিশাপেরই জীবন আমাদের।' 'আমরা'-'তোমরা' সম্বোধনে অপরতার পরিসর এবং যুগ-যুগ ধরে বঙ্গ রমণীর অবস্থানকে তুলে ধরলেন আশাপূর্ণা এভাবে। উনিশ শতকের এই সময়চিত্র দারুণভাবে ধরা পড়ে বিদ্যাসাগরের তেজস্বী কলমে—"প্রভুতাপূর্ণ প্রবল পুরুষজাতি যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া, অত্যাচার ও অন্যায়াচরণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা নিতান্ত নিরুপায় হইয়া সেই সমস্ত সহ্য করিয়া জীবনযাত্রা সমাধান করেন। পৃথিবীর প্রায় সর্ব প্রদেশেই স্ত্রীজাতির সদৃশী অবস্থা।" (বহু বিবাহ রহিত বিচার, সূচনা)

সত্যবতীর শেষ স্বপ্ন সুবর্ণলতা। একমাত্র আশা—'সংসারের তপ্ত বালুকায় এক টুকরো স্নিগ্ধ ছায়া।' 'সুহাসের মতো হবে সুবর্ণ'। 'ষোলো বছর বয়স না-হলে বিয়ে দেবো না সুবর্ণর'। সত্যবতীর সব স্বপ্নই ভেঙে যায়। 'সুবর্ণ যদি মানুষ হওয়ার মালমশলা নিয়ে জন্মে থাকে...হবে মানুষ। নিজের জোরেই হবে। তার মাকে বুঝবে।' সুবর্ণলতার 'নিজের জোর' কতখানি? 'নিজের ক্ষমতার উপর অনেকখানি আস্থা আর আশা ছিল'—সুবর্ণলতার। সুবর্ণ চরিত্রের কাঠামো বা পরিকল্পনা আশাপূর্ণা 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'-তেই এঁকে নিয়েছিলেন। 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'-তে সত্যবতী যে স্বপ্নে ও আকাঙ্ক্ষায় সুবর্ণকে প্রতিষ্ঠিত বা তার মানস গঠনে সক্রিয় ছিলেন সেই স্বপ্নভঙ্গের সম্প্রসারিত সৃজনভূমিতেই আশাপূর্ণার 'সুবর্ণলতা' উপন্যাস তথা কেন্দ্রীয় চরিত্রের নির্মিতি। সুবর্ণলতার 'নিজের জোর' অনেকখানি পরাস্ত হয় নয় বছর বয়সে 'অকালবিবাহ' নামক প্রতিষ্ঠানের কাছে। তা ছাড়া 'নয় বছর বয়স' কী 'নিজেব জোর' দেখানোর পক্ষে উপযুক্ত? অসংস্কৃত সঙ্কীর্ণ শ্বশুরালযের পুরুষতান্ত্রিক প্রতাপের বিরুদ্ধে সুবর্ণলতা নিজের ক্ষমতা ও আস্থার ওপর ভরসা করে ধীরে-ধীরে জেহাদ-গর্জন বর্ষণ করতে পেরেছে, আর পাঁচটা বাঙালি মেয়ের মতো বিয়ের পর নিজস্ব আশা-আকাঙ্ক্ষাকে স্পর্ধিত আওয়াজে তুলে ধরেছে। এর বহুপূর্বে বিবাহের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কমলাকান্তের দপ্তরের কলমচি আমাদের জানিয়েছেন—

> *'ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি বা পুত্রসুখ নিরীক্ষণের জন্য বিবাহ নহে। যদি বিবাহবন্ধে মনুষ্য-চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন না হইল, তবে বিবাহের প্রয়োজন নাই।'*

সুবর্ণলতা তার গৃহত্যাগিনী মার সামাজিক কুৎসাকে সঙ্গে নিয়ে সংসার-মঞ্চে প্রবেশ

করেছে। তবু তার ত্রিশ বছরের সংসার অভিজ্ঞতা—'পিঞ্জরের যন্ত্রণাবোধে অহরহই ছট্‌ফট করেছে।' হ্যানস্ মেয়ারহফ্ তাঁর 'Time in Literature' গ্রন্থে সময়কে দুইভাগে ভাগ করেছেন— (১) Time in nature (প্রাকৃতিক সময়) (২) Time in experience (অভিজ্ঞতার সময়)। এই দুই দৃষ্টিকোন থেকে দেখা যাক সুবর্ণলতার কাহিনিকে। পল রিকো কথিত—'All fictional narratives are tales of time' (1985 : 101) এখানে প্রাসঙ্গিক।

'সুবর্ণলতা' উপন্যাসে নামভূমিকায় যে-চরিত্রটিকে আশাপূর্ণা উপস্থাপিত করছেন এবং যে-যুগ বা কালের প্রেক্ষিতে তাকে আঁকছেন সেই যুগে বা কালে মুষ্টিমেয় মেয়েরাই বিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকারের ছাড়পত্র পেত। বিশেষ করে বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের মেয়েদের বাড়ির বাইরে বেরিয়ে স্কুলে যাওয়ার চল বা অভ্যেস কোনোটাই তখন পর্যন্ত প্রবর্তিত হয়নি। যদিও এই সময়ে বিধুমুখী, চন্দ্রমুখী, কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়, সরোজিনী নাইডু, অবলা বসুদের মতো জ্ঞানদীপ্তা শিক্ষিতা মহিলাদের আমরা পেয়েছি, তথাপি উনিশ শতকীয় 'রেনেসাঁস' বা 'নবজাগরণ' সংঘটিত হওয়ার আগে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের বঙ্গ রমণীদের জীবনের সার্বিক অবস্থা কতটা দুর্বিষহ ছিল তা আমাদের সামাজিক ইতিহাসের গ্রন্থগুলোর পাতা উলটালেই টের পাওয়া যাবে। উনিশ শতকে একদিকে পেয়েছে মেয়েরা লেখাপড়ার অধিকার, আবার এই শতকেই মেয়েদের লেখাপড়া শেখা বা বেশি লেখাপড়া শেখার কোনো দরকার নেই— শোনা গেছে এমন সামন্ততান্ত্রিক উচ্চকিত কণ্ঠস্বর। নারীকে আপন ভাগ্য জয় করবার অধিকার বা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার দুর্বার এষণার কথা যেমন এই শতকে ব্যক্ত হয়েছে, তেমনি আবার 'বঙ্গমহিলা' (১২৮২ বঙ্গাব্দে) নামক মেয়েলি পত্রিকায় পাতিব্রত্যের আদর্শ বা সতীত্বের ধারণাকেও তুলে ধরা হচ্ছে এইভাবে—

> 'পতিপদে ভক্তিভাবে সেবে যেই নারী।
> পতিরে যেভাবে সদা পারের কান্ডারী।।
> পতি জ্ঞান পতি ধ্যান জপ তপ পতি
> এমন যে নারী তার হয় স্বর্গে গতি।।'

উনিশ শতকীয় নারী-শিক্ষার দুই ধরনের রেওয়াজ বা মিশ্র সংস্কৃতির আভাস ফুটে ওঠে আশাপূর্ণার দুই উপন্যাসের কথাবয়নে—

(ক) 'সুবর্ণলতা' উপন্যাসে মেজবৌ 'পাশের পড়া'-র ইচ্ছায় মুক্তকেশীর তির্যক মন্তব্য 'ওর বিদ্যেবতী মা ওকে বিদ্যে শেখাতে ইস্কুলে পড়াচ্ছে। আরও পড়াবে, পাশের পড়া পড়বে মেয়ে।'

(খ) 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' উপন্যাসে সত্যবতীর স্বামী নবকুমারের মুখে শোনা গেছে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ—'বলি মেয়েকে বিদ্যেবতী করে হবেটা কি? তোমার ওপর আর 'দশকাঠি বাড়া' হবে, এই তো? গাঁয়ের পাঠশালে পড়েই যদি মায়ের এই মেজাজ হয়ে থাকে, কলকাতা শহরে ফ্যাসানি ইস্কুলে পড়ে মেয়ের কী হবে সে তো দিব্যচক্ষে দেখতেই পাচ্ছি।'

১৮৯০-৯১ সালের শিক্ষাবিবরণী থেকে উনিশ শতকের স্ত্রী-শিক্ষার অগ্রগতির সংবাদ

যেমন আমরা জানতে পারি তেমনই 'কৃষ্ণভাবিনী দাসের নির্বাচিত প্রবন্ধ' (স্কুল অব উইমেন্‌স স্টাডিজ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, সম্পাদনা—অরুণা চট্টোপাধ্যায়) থেকে সে-সময়ের স্ত্রী-শিক্ষার উল্টো চিত্র আমরা খুঁজে পাই—'গ্রামে তখন স্ত্রী-শিক্ষার ব্যবস্থা ও রীতি ছিল না।' উনিশ শতকের কোনো-এক পত্রিকায় যেমন বলা হচ্ছে—'রমণীদের অল্প বয়সে বিবাহ হওয়াই বিজ্ঞান ও ধর্ম্মানুমোদিত।' আবার উনিশ শতকের সংবাদপত্রের পাতায় মেয়েদের চিন্তনবিশ্বের খবরাখবর পরিবেশিত হচ্ছে। কৃষ্ণকামিনী দাসী, ফয়জান্নেছা চৌধুরানি, স্বর্ণকুমারী দেবী প্রমুখ লেখিকারা বাংলার মেয়েদের দুঃখ-কষ্টের কথা, স্ত্রী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, ব্যক্তি-স্বাধীনতার কথা তুলে ধরছেন তাঁদের নির্ভীক কলমে। আশাপূর্ণা দেবী সেই ধারারই যোগ্য উত্তরসূরি। সেই কারণেই তাঁর 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' ও 'সুবর্ণলতা'-র গল্পে থাকে উনিশ শতকের কৃষ্ণভাবিনী দাস (১৮৬৪ ১৯১৯) ও তাঁর অকালপ্রয়াত কন্যা তিলোত্তমা ঘোষের জীবনকাহিনির চিত্রিত ছায়া। এই ছায়াকে সামনে রেখেই চিরকালের কাছে আশাপূর্ণার জিজ্ঞাসা, যার সমাধান তাঁর 'বকুলকথা'-য়।

সুবর্ণলতা : স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের উপন্যাস

স্বপ্ন মানুষের ইচ্ছার প্রকাশ। এক কথায় স্বপ্ন হচ্ছে 'Fullfillment of Desire'। স্বপ্ন সাহিত্যের উপাদান নয় শুধু, মানুষের ভাবনার ফসল স্বপ্ন। বাস্তবের মরে যাওয়া বাসনাগুলো যখন ব্যক্তির নিদ্রিত পটভূমিতে এসে হাজির হয়ে স্বীকৃতির আকাঙ্ক্ষায় বা প্রতিষ্ঠিত করার এষণায় মনের মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে তখন তা স্বপ্নের আকারে ধরা পড়ে। ভারতীয় সাহিত্যে তাই শোনা গেছে—'যেনেদং ভূতঃ ভবনং ভবিষ্যৎ পরিগৃহীত-মমৃতেন সর্ব্বম্' অর্থাৎ মানব-মন অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই ত্রিকাল সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন থাকে। স্বপ্নের রূপটি তাই রবীন্দ্রকাব্যে প্রতিভাত হয় এভাবে—'স্বপন আমার ভরেছিল কোনো গন্ধে/ঘরের আধার কেঁপেছিল কী আনন্দে' স্বপ্নতত্ত্বের এই নিরিখে 'সুবর্ণলতা' উপন্যাসে সুবর্ণলতা নাম্নী নারীর স্বপ্ন-জগৎটিকে বুঝে নিতে পারি। এখন প্রশ্ন, সুবর্ণলতার স্বপ্নবিশ্বটা কেমন? 'সুবর্ণলতা ভব্যতা চেয়েছে, সভ্যতা চেয়েছে, মানুষের মতো হয়ে বাঁচতে চেয়েছে। সুবর্ণলতা বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে নাড়ীর যোগ রাখতে চেয়েছে...সে সমুদ্র দেখতে চেয়েছে, বই পড়েছে, পড়িয়েছে, ছেলেদের সঙ্গে আবৃত্তি করেছে 'বল বল বল সবে', মুক্ত আকাশে বাতাসের জন্য তার প্রাণ কেঁদেছে।' প্রতিদানে সুবর্ণলতা পেয়েছে কী? পেয়েছে স্বামীর আঘাত, শাশুড়ির কটু-তির্যক মন্তব্য, এমনকী নিজস্ব ছেলে-মেয়ের কাছেও অসহযোগিতা। ফলস্বরূপ সুবর্ণলতার মনের মধ্যে তৈরি হয় 'Loss of individuality'! সংসারের মধ্যে থেকেও মানবিক সম্পর্কের অভাবে মনের মধ্যে গড়ে ওঠে—'A sense of anonymity...The man (Woman) feels that he (She) is unimportant' [মেট্রোপলিটন মন মধ্যবিত্ত বিদ্রোহ, বিনয় ঘোষ, ওরিয়েন্ট লংম্যান, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা-২০৪] এরকম নিঃসঙ্গ, পরাজিত এক মেয়ের কাহিনি শোনাতে কিংবা বলা যায় সুবর্ণলতা চরিত্রের মধ্য দিয়ে নারীর ভাগ্য বিপর্যয়ের আবহমানকালের ইতিহাসকে ধরতে চেয়েছেন আশাপূর্ণা, যা তাঁর স্বীকারোক্তিতে ধরা পড়ে—'সুবর্ণলতা সেই দুর্লভ মেয়েদের একজন—যারা তাদের কালকে অতিক্রম করে যায়—এগিয়ে দেয় প্রবহমাণ

কালের ধারাকে. যে ধারা মাঝে মাঝে স্তিমিত হয়ে যায়, নিস্তরঙ্গ হয়ে যায়। এরা বর্তমান কালের পূজা পায় কদাচিৎ, এরা লাঞ্ছিত হয়, উপহাসিত হয়, সমসাময়িক সমাজের বিরক্তিভাজন হয়। এদের জন্য কাঁটার মুকুট, এদের জন্য জুতোর মালা। ...তবু এরাই একদিন স্মরণীয় হয়ে ওঠে—এদের দিয়েই সাহিত্য সৃষ্টি হয়। ...সুবর্ণলতা এইরকম একটি নারী চরিত্র'।

বকুলকথা : ঔপনিবেশিক সমাজের প্রেক্ষিত

প্রিয়কান্ত নাথ

'It is not easy to judge who has to face more aggression from this patriarchal society–the women who is imprisoned within her domestic walls or the women who goes out.' ('Women Heritage and Violence', Joya Mitra, Ed. by Shefali Moitra).

মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগ, নবজাগরণ, স্বাধীনতা—কত কিছুই না পেরিয়ে এলাম। কিন্তু পেরিয়ে আসতে পারলাম না প্রাচীন যুগ কিংবা পৃথিবীর জন্মলগ্ন থেকেই চলে-আসা সমাজ-সংস্কৃতিতে, ধর্ম-ইতিহাসে, নৈতিকতা অর্থনীতিতে, রাজনীতি-মননে, প্রকৃতি-পরিবেশে, চিন্তা-চেতনায় বহমান ঔপনিবেশিক বৃত্তিকে। আধুনিকতার ধ্বজা ধরে সময় হয়েছে সভ্য, সভ্যতা হয়েছে আগ্রাসী। বিধি হয়েছে বিধান, বিধান হয়েছে নিরঙ্কুশ। আর এটা তো পরীক্ষিত সত্য যে, নিষেধ আরোপিত হয় তাদেরই ওপর, যারা সত্যকে জানতে চায়—চায় জানাতে।

সেই নিষিদ্ধ ইতিহাসই ফুটে ওঠে বিশ শতকের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ইতিহাসের নানা প্রকাশ্য-প্রচ্ছন্ন টানাপোড়েনের সাক্ষী আশাপূর্ণা দেবীর রচনায়। সাক্ষ্য বহন করছে তাঁর অনবদ্য সব রচনা এবং 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' থেকে 'সুবর্ণলতা' হয়ে আমাদের আলোচ্য 'বকুলকথা' পর্যন্ত। তাই নির্দ্বিধায় তিনি জানিয়ে দেন আমাদেরকে এ-কথা—'অন্তঃপুর চিরদিনই অবহেলিত' (প্রাক্‌কথা, 'প্রথম প্রতিশ্রুতি')। তবে আমাদের পক্ষে ভরসার কথা, মানব-বিশ্বকে বাঁচিয়ে রাখতেই আত্মঘাতী এই হামলার মধ্য থেকেও সত্য শেষ পর্যন্ত ঔপনিবেশিক জটাজাল থেকে স্রোতস্বিনী হয়ে নেমে আসতে চায়—নেমে আসতে পারে।

কিন্তু তবুও কি সব সত্য উন্মোচিত হয়েছিল? না কি হতে পারে? এ প্রশ্নচিহ্ন দেখা দেয় আমাদের মনে, কেন না, 'the class which has means of material production has also control over the means of mental production.' কার্ল মার্কস-এর এই বক্তব্যের নিহিতার্থ অনুধাবন করে আমরা বুঝতে পারি, ভক্ষক যে-উপকরণগুলো তার প্রয়োজনে কাজে লাগায়, একই সঙ্গে অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় তা আত্মরক্ষায় লুকিয়ে রাখতেও সক্ষম হয়। ভক্ষ্য তা বুঝতেও সক্ষম হয় না। তাই 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' লিখিত হয়, 'সুবর্ণলতা' লিখিত হয়, লিখিত হয় 'বকুলকথা'ও। কিন্তু তারপরও সংশয়মুক্ত হওয়া যায় না। তাই 'বকুলকথা'র প্রথম প্রচ্ছদের ভেতরে লেখা থাকে এই সংশয়, 'বকুল তথা অনামিকা কী তার সমাজের নূতন রূপে মা ও দিদিমার সাধনায় সাফল্য দেখতে পাচ্ছে?'

কেন এই আশঙ্কা? 'সত্যেরে লও সহজে' এই বিশ্বাসে স্থিত সত্যবতী 'বদ্ধতা'কে 'মুক্তি'তে রূপান্তরিত করতে চেয়েছিল। কিন্তু 'সংসার' কি তাকে বুঝতে পেরেছিল? না কি বুঝতে চায়? রামকালীর কন্যা সত্যবতী, নবকুমারের স্ত্রী সত্যবতী, সাধন-সরল- সুবর্ণে-র মা সত্যবতী এ-কথা ভুলে গিয়েছিলেন যে 'কবিতা, বনিতা, লতা, বুঝে দেখ না,/নিরাশ্রয়ে কদাচিত শোভা থাকে না' (নিধুবাবুর টপ্পা)। 'নির্ভীক চোখে'র অধিকারী সত্য এ-কথা ভুলে যেতে চাইলেও সমাজ তাকে এ-কথা ভুলতে দেবে কেন? তাই তারই আত্মজ তার সম্বন্ধে

ভাবে—'মা না রাক্ষুসী!' তার শেষ ভরসার স্থল সুবর্ণ-ও অকাল-বৈবাহিক জীবনে (মাত্রই ৯ বছর বয়সে) আবদ্ধ হয়ে যান। আসলে ঔপনিবেশিক মন-মনন তার সু-চতুর কারসাজি দেখায়। যেখানে সত্যবতীর 'মূক' হয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। উপায় থাকে না সুবর্ণরও। তাই 'সমুদ্রের স্বপ্ন' দেখতে চাওয়া সুবর্ণের 'পৃষ্ঠপটে শুধু এক টুকরো বিবর্ণ ধূসরতা।'

'সহায় বিহনে ভাই, রমণী অবলা।/সংসার সাগরমাঝে স্বামী মাত্র ভেলা' ('চিন্তাতরঙ্গিনী', হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)—এই আপ্তবাক্যকে অস্বীকার করতে চেয়েছিলেন সুবর্ণ; তাই 'পাড়াসুদ্ধ সকলেই তো জেনে ফেলেছিল, এ বাড়ির মেজবৌ কুলের বার হয়ে গিয়েছিল।' সত্যবতীর পিতা যে-জানালা খুলে দিয়েছিলেন সত্যবতীর জন্য, তাতে আবার খিল এঁটে দিলেন সুবর্ণলতার পিতা। আর তাতে সিলমোহর লাগিয়ে দিল প্রবোধ-পুত্রী চাঁপা—'আমার মা-টির মতন এমন বেহায়া দুটি দেখিনি।' অতএব, আপাতত শান্তি কল্যাণ হয়ে আছে!

দুই

দেশ-কাল রূপ পায় উপন্যাসে। পাঠক তা থেকে নতুন বীক্ষা খুঁজে পান। আবার দেশ-কালের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে ঔপন্যাসিকও বাস্তব জীবন যাপন করে না। ফলে আপাতদৃষ্টিতে একই সময়বাহী হয়েও বাস্তবতার নানান আদল ফুটে ওঠে উপন্যাসে। ঔপন্যাসিক এবং পাঠকের মনেও। ঠিক যেমন একই সময়বাহী সমাজ-সংশ্লিষ্ট হয়েও কেউ চিরাচরিত প্রথাকেই মান্যতা দেয়, আবার কেউ বা তারই মধ্যে পরাধীনতার গ্লানি অনুভব করে। অর্থাৎ, ব্যক্তিক উচ্চারণ-সামাজিক উচ্চারণ, ভাষা-পরাভাষা একটি উপন্যাসে পাঠ-পরাপাঠের দ্যোতনাও নিয়ে আসে। তখনই অনুভূত হয় উপন্যাসের স্বর ও স্বরান্তরের বৈশিষ্ট্যসূচক স্বাতন্ত্র্য। ফলে উপন্যাসের ভাষা যখন 'Creating a polyphony of voices in dialogue'; তখনই উপন্যাস 'Concrete social' হয়ে ওঠে। ঠিক যেমন 'বকুলকথা'।

ঠিক যেমন বকুল ও অনামিকা দেবী। বিয়ে না-করা (কিংবা বিয়ে না-হওয়া)-র 'অগ্নিপরীক্ষা' গোটা উপন্যাস জুড়ে বকুলের। সেই 'জীবন-স্বাদ' লিখেছেন (কিংবা লিখছেন) অনামিকা দেবী। সে-আস্বাদ কখনও অম্ল, কখনও মধুর; কখনও কটু, কখনও স্বাদু। সাদা চোখে দেখায় বটে, অনামিকা দেবী যথেষ্টই তথাকথিত 'স্বাধীনতা' অর্জন করেছেন—স্বাবলম্বীও বটে। যখন-তখন কোথাও বেরিয়ে যেতে পারছেন, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে রাত-বিরেতেও লোক আসছে। সিনেমার ম্যাগাজিনও ঘরে আসছে। পরিচিতি তো বটেই, প্রভাব-প্রতিপত্তিও রয়েছে যথেষ্ট! সামনাসামনি লোকে এবং পরিবারের লোকেরা তাঁকে মান্য করে চলে। এবং করেও না। এখানেই লুকিয়ে রয়েছে সেই রহস্য, যেখানে এসেই সামাজিক চোরাবালিতে তলিয়ে যেতে থাকে ধীরে ধীরে। যেখানে এসে এগিয়ে চলার নাম করে চলে পেছন হাঁটা। অতএব, 'বকুলকথা'-র গোটা পাঠকৃতি জুড়েই চলে তাই আরেকবার নতুন করে পথ চলা। নতুন করে পাথেয় সন্ধান।

অতএব আশাপূর্ণা দেবীর কাছে লেখা কেবল খেলা মাত্র নয়—তা লেখাই। হতে পারে তা 'দু-ফুট বাই চার-ফুট ক্ষুদে ব্যালকনির ইতিহাস' কিংবা হতে পারে তা 'মস্ত সব তুতো

সাম্রাজ্যের ইতিহাস'! তাই তিনি যা দেখেন, তাই লেখেন বটে—তবে সে-দেখা শুধুমাত্র দেখা হয়েই থাকে না শেষ পর্যন্ত। হয়ে ওঠে দর্শন (কিংবা আলোকসম্পাত)। যার অভাবে নবজাগরণে উদ্দীপিত হলেও আমরা আধুনিক হই না; যার অভাবে স্বাধীনতায় উজ্জীবিত হলেও আমরা স্বরাজ বুঝি না। যার জন্যে বকুলের হয়ে অনামিকা দেবীকে কলম ধরতে হয়। লিখতে হয় : 'এ যুগের মানসলোকে 'সত্যে'র চেহারাও অস্থির অস্পষ্ট। দোদুল্যমান দর্পণে প্রতিফলিত প্রতিবিম্বের মতো সে চেহারা কখনো কম্পিত, কখনো বিকৃত, কখনো দ্বিধাগ্রস্ত, কখনো যেন অসহায়। যেন ঝড়ে বাসা ভাঙা পাখি ডানা ঝাপ্‌টে ঝাপ্‌টে পাক খেয়ে মরছে, এখনো ঠিক করে উঠতে পারছে না, ঝড় থামলে পুরোনো বাসাটাই জোড়াতালি দিয়ে আবার গুছিয়ে বসবে; নাকি নতুন গাছে গিয়ে নতুন বাসা বাঁধবে।'

এই সত্যের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারেন না বলেই অনামিকা দেবীর পক্ষে বকুল-কথা লেখা আর হয়ে ওঠে না! তাই বকুল-কথায় এসে যায় শম্পার কথা, সত্যভামার কথা, নমিতার কথা। এসে যায় রেখার কথা, রমলার কথা, মাধুরীর কথা। এবং পারুল। প্রত্যেকের মধ্যেই হৃদয় খুঁজতে যান অনামিকা দেবী। আশান্বিত হন। আশাহত হন। উদ্বেলিত হন। তাঁর ভাবনা হয়ে ওঠে ব্যাকুল : 'আমাদের কর্মে মর্মে জীবনে, জীবন যাত্রায়, আমাদের বিশ্বাসে, মূল্যবোধে, রাষ্ট্রচেতনায়, সমাজব্যবস্থায়, শিক্ষায়, সংস্কারে অহরহ লাগছে না ঝড়ের ধাক্কা? প্রতিমুহূর্তে আমরা আশান্বিত হচ্ছি আর আশাহত হচ্ছি। সোনার মূল্য দিয়ে সোনা কিনে হাতে তুলে দেখছি রাং। ...এই চোখ-ধাঁধানো ঝড়ের ধুলোর মাঝখানে উৎক্ষিপ্ত বিভ্রান্ত মন নিয়ে ছুটতে ছুটতে কোথায় বসে রচিত হবে আগের আদর্শের মননশীলতা?'

প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করতে গিয়ে অতএব জেগে ওঠে আরও নতুন প্রশ্ন। কোন্ আদর্শ? তবে কি প্রচলিত নারী-স্বাধীনতা তার অধিকারের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে? কিংবা এই যে শেষোক্ত প্রশ্নটা জেগে উঠল মনের মধ্যে, তা-ও কি সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধেরই ফসল? স্বাধীনতা-বোধ অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করে তোলে, অধিকার যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়, যুক্তি জেগে ওঠে প্রজ্ঞা থেকে, প্রজ্ঞা হৃদয়ের অনুভূতির মধ্যে রূপ পায়। অথচ এই প্রজ্ঞার সঙ্গেই অনুভূতির গভীর অন্তর্বিরোধ। যুক্তি-বুদ্ধি-জ্ঞান দ্বারা চালিত হওয়া উচিত না কি অনুভূতিকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত? এই প্রশ্নগুলো 'বকুলকথা' পাঠ করতে গিয়েই সবচেয়ে বেশি করে মনের মধ্যে জেগে ওঠে, কেন না, এ-কথা নিশ্চিত 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' ও 'সুবর্ণলতা'র সময় পেরিয়ে 'বকুলকথা'য় আসতে আসতে আপন ভাগ্য জয় করার অবস্থানে নারী পৌঁছে যায়। মূল কথা হচ্ছে এবার, কীভাবে পৌঁছাচ্ছে—কোথায় পৌঁছাচ্ছে?

তিন

কলকাতার রাজেন্দ্রলাল স্ট্রিটের দোতলা বাড়ির মুখুজ্জে পরিবারের সন্তান শম্পা পোশাক-আশাক বদলানোর মতোই ঘন ঘন বদলাচ্ছে 'বয়-ফ্রেন্ড'! শেষ পর্যন্ত সব বাধা অতিক্রম করে সত্যবানের সঙ্গেই সে জীবনের গাঁটছড়া বাঁধে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, নারী আজ শুধু নিজেই পথ চলছে না—অন্যকেও পথ দেখাচ্ছে। কিন্তু শারীরিকভাবে জীবন ও জীবিকা নির্বাহে অক্ষম সত্যবানের প্রতি মমতার চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে চলেছে শম্পা সাবিত্রীর মতো। কেননা, তারই ভাষায় : 'আমার শুধু চেহারাটা আধুনিক, আমার শুধু

কথাবার্তা এ যুগের, আমার শুধু গতিভঙ্গি বর্তমানের—আর কী তফাত আছে বল?' নিশ্চয়ই মনে পড়বে আমাদের, যে-বৎসর আশাপূর্ণা দেবী চলে গেলেন, সে-বৎসরই এক বঙ্গললনা বিশ্বসুন্দরীর শিরোপা পেয়েছিলেন এই বলে, মাতৃত্বেই নারীর পূর্ণতা। কিংবা তার ঠিক এক দশক পর মুক্তিপ্রাপ্ত এক হিন্দি চলচ্চিত্রে দেখানো হচ্ছে এক আধুনিকা তার সংসার-অনভিজ্ঞ পুরুষ-বন্ধুকে পৌরুষদীপ্ত করে তুলছে এবং তারপরই দুজনের গাঁটছড়া বাঁধা হচ্ছে। অর্থাৎ, নারী সেই আশ্রয় খুঁজছে আজও—যেখানে সে সুরক্ষিত, নিশ্চিন্ত।

অথচ উপন্যাসে বারবারই আমরা শম্পাকে বকুলের প্রতিতুলনায় দেখি। দেখি সে-যুগের সঙ্গে এ যুগের চিন্তা-চেতনা, মন-মননের প্রতিতুলনায়। কিন্তু অনামিকা দেবী এমন এক নারীর কথা লিখতে চেয়েছেন, যিনি কিনা মাতা-মাতামহীর 'অভিশপ্ত' জীবনকে অতিক্রম করে নিজের জন্যে এক 'নিজস্ব জীবন' (অবশ্যই একক জীবন নয়) সৃষ্টি করতে চান এবং যেখানে সমসাময়িক সমাজ তার প্রত্যেকটি চেষ্টাকেই পরাভূত করতে চেয়েছে। শম্পার মা-বাবার কেন এই আকুলতা শম্পাকে ফিরিয়ে আনার জন্য? সে কি সন্তানস্নেহ? না কি সমাজের চোখে নিজের অবস্থান বজায় রাখার জন্য এই আপ্রাণ প্রয়াস? অর্থাৎ, সমাজ সর্ব অবস্থায় স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে চায়। ঘুরিযে ফিরিয়ে সে আবার প্রমাণ নিতে চায়, তার অবস্থান অটুট রইল কী না! তাই কি সত্যভামার এই পরিণতি! তাই কি স্বামী-পরিত্যক্তা জলপাইগুড়ির নমিতার প্রাপ্তির শূন্য ঘরকে পূর্ণ করতে গিয়ে বোম্বাইয়ের রূপছন্দা হবার পরও নিষ্কৃতি নেই। তাকে হারিয়ে যেতে হয় চিরদিনের জন্য। অর্থাৎ, সমাজ তাকে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে রচনা করতে পারেনি বলেই তাকে পাঠকৃতি থেকে বিদায় নিতে হয়।

অ-নিরপেক্ষ সামাজিক বিধি-নিয়মই এক্ষেত্রে নিয়ন্তা হয়ে ওঠে উপন্যাসে। নৈতিক আদর্শ রক্ষার দায়িত্ব যেহেতু নারীর, অতএব নারীকে রক্ষা করার দায়িত্ব নিয়েছে সমাজ। সমাজ যখন সরাসরি সে-দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নেয়, তখন তা সহজবোধ্য। কিন্তু যখন অন্যের মধ্য দিয়ে সে কাজ চালায়, তখনই তা হয় অদৃশ্য এবং সে-সময়ই তা বিপজ্জনক। তখনই প্রয়োজন হয় ইতিহাস-নিরপেক্ষ এক মানবিক জগতের, যেখানে মুক্তি হবে বাস্তব-সংশ্লিষ্ট, জ্ঞান হবে অভিজ্ঞতা-নির্ভর, হৃদয়বোধ হবে নৈতিকতা-সম্পন্ন। তবেই সম্ভব এক আদর্শ জীবন-যাপন। এই আদর্শ জীবন-যাপনের সহজ ছক অন্যদের সঙ্গে বিনিময় করতে পারেন না-বলেই বকুল জীবনের শ্রেষ্ঠ দুটি স্বাদ (দাম্পত্য-জীবন, মাতৃ-জীবন) থেকে বঞ্চিত থাকেন! কিংবা এই স্বাদে অভ্যস্ত হলে তবে কি বকুলের দশা মাধুরী-বৌ'-এর মতোই হত! তাই কি নির্মলের জীবনে বকুলের জায়গায় আমরা মাধুরী-বৌ'কে দেখি! তাই বকুল যা ভাবেন, কিন্তু লিখতে পারেন না, বকুলকে তা-ই লিখে জানান পারুল : 'আমরা কি মেয়েদের এই স্বাধীনতারই স্বপ্ন দেখেছিলাম? আমরা, আমাদের মা-দিদিমারা?'

আসলে কেন্দ্র তার অবস্থান বদল করলেই কেন্দ্রত্ব হারায় না। কিংবা প্রান্ত কেন্দ্রে চলে এলেও কেন্দ্রত্ব পায় না। আবার প্রয়োজন-ভিত্তিক চাহিদা থেকে কেন্দ্র ও প্রান্ত পরস্পর মিলে যেতেও পারে। এতে ক্ষমতার দাঁড়ি-পাল্লা'র ওজন বজায় রাখতে সুবিধেই হয়। তখনই উপনিবেশোত্তর জগতেও জেগে ওঠে ঔপনিবেশিক অবভাস। গোটা 'বকুলকথা' উপন্যাস জুড়েই টুকরো টুকরো ঘটনা বর্ণনায়, কিংবা চরিত্রের উপস্থাপনায়, কিংবা সংলাপ প্রয়োগে

আমরা লক্ষ করি সম্পর্কের জটিল টানাপোড়েন। ফলে তত্ত্বে যা অকাট্য বলে মনে হয় অনেক সময়ই, অনামিকা দেবী প্রায়োগিক দিক থেকে তার উপস্থাপনা দেখে ব্যথিত হন। রবীন্দ্রনাথ যাঁকে অভিহিত করেছিলেন 'আশাপূর্ণা-সম্পূর্ণা' বলে, যিনি সাহিত্য অকাদেমির ফেলো হবার পর বলেছিলেন 'I have never idled my time'; সেই আশাপূর্ণা যে সভ্যতার সৌন্দর্যবোধের দিক্‌ভ্রষ্টতায় ব্যথিত হবেন, তা নিশ্চিতই ছিল। তাই যে বা যারা দৃশ্যত জিতে গেল উপন্যাসে শেষ পর্যন্ত, তার বিনিময়ে যে বা যারা অদৃশ্য থেকে গেল পরাজিতের দল হয়ে—তাদের ইতিহাস আরও সত্য।

কৃতজ্ঞ

১. 'নৈতিকতা ও নারীবাদ', শেফালী মৈত্র, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, ২০০০।
২. 'বিংশ শতাব্দীর নারী-ঔপন্যাসিক', সম্পাদনা : অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, পূর্বা, কলকাতা, ২০০১।
৩. 'নারী : বাংলা কথা সাহিত্যে', সম্পাদক : পুলক কুমার সরকার, শুভশ্রী, মুর্শিদাবাদ, ২০০০।
৪. 'প্রসঙ্গ : নারীবিশ্ব', সম্পাদক : সুধীর চক্রবর্তী, ধ্রুবপদ, কৃষ্ণনগর, ২০০০।

বকুলকথা : 'আধুনিকতার সমালোচনা-প্রকল্প

বিশ্বজিৎ চৌধুরি

বিলম্বিত পুঁজিবাদী যুক্তি-শৃঙ্খলায় আজ বিশ্বজুড়ে পুঁজির সর্বগ্রাসী চলাচল অবাধ হয়ে পড়েছে। ভাষা-আগ্রাসন ও ভাষার মৃত্যুর অনিবার্য প্রক্রিয়ায় মানুষের চিন্তাবিশ্ব অবলুপ্তির পথে। ভোগবাদী দুনিয়ায় মানুষ এখন লিবিডো-র ক্রীতদাস। গ্রহণ-বর্জন তথা সংশ্লেষণের সমস্ত মানসিক প্রক্রিয়ার দ্বার অবরুদ্ধ। ভালোমন্দের বিচার নিরর্থক। কিংবা বলা ভালো, বিচারের মাপকাঠিটাই উধাও। অসহায় ক্রেতা হয়ে যাওয়াটাই অবশ্যম্ভাবী। মূল্যবোধ এখন অপ্রাসঙ্গিক। ভাবাদর্শ অদৃশ্য। সাংস্কৃতিক একীকরণের প্রক্রিয়ায় মানুষের বিলীয়মান ঐতিহ্যের উপকূলরেখা মসীমাখা। কোনো বৈচিত্র্য নেই, কোনো স্বাতন্ত্র্য নেই, অতএব কোনো প্রতিবাদ নেই। তমসাচ্ছন্ন পরিসরের বুক চিরে কোনো আলোর ইশারা জাগে না যেন। 'যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দেখে তারা, পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া।' তিন তিনটে স্ফিংক্স-পরিচালিত বিশ্বে গ্রিক রূপকথার সেই প্রশ্নের উত্তরে 'মানুষ' শব্দটি উচ্চারিত হচ্ছে না। ইতিহাস ও ধারাবাহিকতার মৃত্যু ঘোষণা করা হয়েছে বিগত সহস্রাব্দেরই শেষের দিকে। প্রযুক্তি এখন সন্ত্রাস নয় শুধু, এককেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থায় আধিপত্যের উৎসও। 'গ্লোবাল টিন্‌স'-এর কথা উল্লেখ করেছে রাষ্ট্রসঙ্ঘ। এদের চিন্তা, অনুভব, কথা বলার ধরন, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদ সব একরকম হয়ে গেছে। এদের কাছে সিসিফাসের চেতনা, নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় আশা করা অরণ্যে রোদন। তা হলে অনেক বছর আগে কবিতার কথামুখ হিসেবে ব্যঙ্গচ্ছলে যে লিখেছিলাম Extreme point of civilization = Extreme point of barbarism. সেই সমীকরণটি কি সত্য হতে চলেছে? আমরা কি আবার বিনির্মিত বর্বরতার দিকেই ছুটে চলেছি? হয়তো তাই। তা হলে আধুনিকতা, উত্তর-আধুনিকতার প্রশ্ন আসছে কোথা থেকে? কোথাও কি কেউ এখনো জেগে আছে কেবলই হয়ে-ওঠার জন্যে প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখতে? 'কেউ কী জানে কোন দিকে যে পথ, কেউ কী জানে কোন দিকে সেই পথ?' সেই জানার জন্যেই তো নান্দনিক পরিসরের কাছে হাত বাড়ানো—ভিখিরির হাত নয়, প্রকৃত পাঠকের হাত যে-পাঠক নিজেকেই শুধু বিনির্মাণ করে না, বিনির্মাণ করে তার চারপাশকে, সমাজকে, সমাজ-সম্বিৎকে, কাল ও পরিসরকে এবং সেই বিনির্মিত চেতনাকে চালান করে দেয় ভবিষ্যৎ কালের বহু প্রজন্মের হাতে। এই প্রবহমানতার সূত্রেই সম্ভাবনার ইঙ্গিত পেয়ে যাই, পেয়ে যাই অচলায়তন ভাঙতে-ভাঙতে মুক্ত পরিসরকে নবায়িত ও পুনর্নবায়িত করে তোলার প্রেরণা। এই প্রেরণাই আশাপূর্ণা দেবীর 'বকুলকথা' উপন্যাসের পাঠ-পরাপাঠের চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করতে পারে। নতুবা যথাপ্রাপ্ত অবস্থান থেকে সব কিছুই ঝাপ্‌সা মনে হতে পারে, পাঠকৃতির বয়ানে ধৃত বাচনের নির্যাস চোরাবালিতে ডুবে যেতে পারে। উপন্যাসটির আকল্পে যে-প্রকল্পকে ধরা আছে তার বিশ্লেষণ-সংশ্লেষণের প্রক্রিয়াটাই হারিয়ে যেতে পারে। সে-ক্ষেত্রে পড়ে থাকবে শুধুই মজ্জাহীন মর্মহীন কাহিনির কঙ্কালটুকু। অস্থির ভেতরের ইতিহাস ও মর্মের পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞানকে খুঁজে পাওয়া যাবে না আর। উপন্যাসের প্রতিবেদন

যে কালেরই আলেখ্য এ কথাটি বোঝা তাই অত্যন্ত জরুরি। আশাপূর্ণা দেবী তাঁর ত্রয়ী উপন্যাসের দ্বিতীয়টির অর্থাৎ 'সুবর্ণলতা'-র বয়ান শুরু হওয়ায় আগে যে লিখেছিলেন, "সমাজবিজ্ঞানীরা লিখে রাখেন সমাজ-বিবর্তনের ইতিহাস, আমি একটি কাহিনির মধ্যে সেই বিবর্তনের একটি রেখাঙ্কনের সামান্য চেষ্টা করেছি মাত্র।"—এ কথাটির তাৎপর্য অনুধাবন করা সমালোচকের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ। ত্রয়ী উপন্যাসের তৃতীয়টি অর্থাৎ 'বকুলকথা' সম্পর্কেও উপর্যুক্ত কথাটি সমানভাবে প্রযোজ্য। সামাজিক বিবর্তনের একটি উন্নততর সোপানকে তার অন্ধকার ও অন্ধবিন্দু সহ এখানে উপস্থাপিত করা হয়েছে। কোনো সাম্প্রতিকই যে পূর্বতন অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, বরং অতীতের পুনর্নির্মাণ ও পুনর্নবায়নই যে সাম্প্রতিককে চিরকালের প্রেক্ষিতে স্থাপন করে উদ্ভাসিত করে তোলে এবং সেই সাম্প্রতিক নিজে পুনর্নির্মিত হতে হতে ভবিষ্যতের হাতে তুলে দেয় তার সোনা ও কয়লা, আলো ও অন্ধকার, স্থিতি ও গতি, খাঁচা ও আকাশকে—সেই বিস্ময়কর দ্বিরালাপকে পার্থক্য ও সমান্তরালতার প্রতীতি দিয়ে আবিষ্কার করাতেই 'বকুলকথা'-র বিশ্লেষণের যথার্থতা, সে-কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। আসলে 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'-র সত্যবতী যে-প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে সংসারের গণ্ডি ছেড়েছিলেন, সে-প্রশ্নের উত্তর লেখিকা অনামিকা দেবী ওরফে বকুল খুঁজে পেয়েছিল কী না, পেলেও কী উত্তর পেয়েছিল, সেটাই দেখার বিষয়।

সত্যবতীর প্রশ্নটি কী ছিল? 'বকুলকথা'য় কী উত্তরই বা পাওয়া গেল, তা শোনা যাক উপন্যাসটির আটত্রিশ সংখ্যক অধ্যায়ে বকুলের কাছে তার বড় বোন পারুলেব চিঠির বয়ানে :

> *"তুই তো জানিস আমাদের মাতামহী সত্যবতী দেবীর কথা! তিনি নাকি এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে সংসাবের গণ্ডি ছেড়েছিলেন. 'বিয়ে' জিনিসটা ভাঙবার নয় কেন? তিনি কী এখন কোনোখানে বসে তাঁর প্রশ্নের অনুকূল উত্তব পেয়ে খুব খুশি হযে উঠছেন? দেখছেন ওটা 'ভাঙবার কিনা' এই প্রশ্নটাই আজ হাস্যকর হয়ে উঠেছে।"*

শেষোক্ত বাক্যটি পাঠ করার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চৈতন্যের ভিত্তিভূমিতে যে অভূতপূর্ব ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয় তার পরিমাণটা রিখটার স্কেলের সীমানাকেও অতিক্রম করে যায়। ভাঙন যে-কালে অপ্রতিরোধ্য সে-কাল যে সমগ্রতার মানেটাই হারিয়ে ফেলেছে, এ ভেবে সামান্যতম মানবিক মূল্যবোধ যাদের আছে তারা স্থির থাকতে পারেন না, যেমন পারেনি পারুল ও বকুল। পারুলের ছোট ছেলে শোভনের বউ রেখা দশ বছরের বিবাহিত জীবন কাটানোর পর আবিষ্কার করল তাদের দাম্পত্যজীবনে ফাঁকির বহর বেড়েই চলেছে। সুতরাং বাঁদরের পিঠে ভাগাভাগির মতো করে ছেলে বুড়োকে তার বাবা শোভনের কাছে রেখে দিয়ে মেয়েকে নিয়ে সে আলাদা হয়ে যায়। আইনি জটিলতার জন্য যদিও তারা বিবাহবিচ্ছেদের জন্য আদালতে যায়নি, তবু কয়েক বছর আলাদা থাকলে আইনগত বিচ্ছেদের পথটা সুগম হবে বলে তারা আলাদা হয়ে গেছে। পরে শোভনের অসুস্থ অবস্থায় যদিও রেখা এসে সেবাযত্ন করে গেছে শোভনের, তবু পাকাপাকিভাবে একসঙ্গে আর তারা থাকেনি। রেখা চলে যায়। শোভনের আমলাতান্ি০০০ত্রক অহমিকা ও জেদ, অন্যের বৌয়ের প্রতি

শ্রদ্ধা-ভক্তি, সংকীর্ণচিত্ততা, গ্রাম্যতা ও ভগবানে বিশ্বাসই নাকি রেখার সঙ্গে তার দূরত্বের কারণ। রেখা উদার, আধুনিক ও ঈশ্বরে অবিশ্বাসী। দুজনের মূল্যবোধই আলাদা, অথবা কোনো মূল্যবোধই নেই। মানবিক সম্পর্কের ভাঙনই তো তথাকথিত আধুনিকতার গোত্রলক্ষণ। যে-আধুনিকতা সব কিছুকে টুকরো করে দেয়, সে-আধুনিকতা কি সত্যিকার আধুনিকতা সে-প্রশ্ন অমোঘ হয়ে ওঠে। শোভন ও রেখার বিচ্ছেদের কারণ সম্পর্কে পারুল বকুলকে চিঠিতে জানায় :

> *"শুধু রুচির অমিল, শুধু মতের অমিল। অর্থাৎ বনিয়ে থাকতে পারার অক্ষমতা। কিন্তু ওই অমিলের কারণগুলো যদি শুনিস মনে হবে সবই ঠাট্টা।*
> *একজন চেয়েছে জীবনযাত্রার প্রণালিটা সম্পূর্ণ পাশ্চাত্ত্য-ধর্মী হোক, অন্যজন চেয়েছে প্রণালিটা পাশ্চাত্ত্য-ধর্মী হয় হোক, তবু তাতে প্রাচ্যের একটু আভাস মেশানো থাক। ছেলেমেয়েরা সাহেব হোক তাতে ক্ষতি নেই, কিন্তু তারা যে আসলে বাঙালি, সেটা যেন ভুলে না যায়।"*

এই বাচনেই তথাকথিত আধুনিকতার ঝুলিয়ে-রাখা টবের মাটিতে ব্যাপক প্রতীচ্যায়ন ও নগরায়নের ফলে যে ক্ষয়, ভাঙন, বিমানবায়ন ও আত্মদ্রোহের মারণ-বীজ বপন করা হয়েছে তা স্পষ্ট হযে যায়। বহিরঙ্গ জৌলুসের ক্ষণপ্রভায় দেখার দৃষ্টি ধাঁধিয়ে গেল কী না, আত্মপরিচযহীনতার চোরাবালিতে তলিয়ে গেল কী না সত্তার নিজস্ব নির্মিতি, সময়বাহিত অচলায়তনকে ভাঙার পরিবর্তে নিজেদের শানিত আয়ুধকেই ভোঁতা করে দেওয়া হল কী না সে-প্রশ্ন ক্রমশ অবান্তর হয়ে পড়ে। মানুষ যে মানুষের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছে, নিরুপায়ের ভূমিকায় অচলায়তনের কাছেই আত্মসমর্পণ করে বসে আছে, এক কদমও এগিয়ে না-গিযে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে পা-তোলা-পা-ফেলার ভঙ্গিটাকেই প্রগতি বলে আঁকড়ে ধরেছে, সে-চিন্তা কখনও অসাড় চেতনায় তরঙ্গ সৃষ্টি করে না। বাঙালি সাহেব হতে গিয়ে বকচ্ছপ কিংবা হাঁসজারুতে যে পরিণত হয়ে গেছে সেদিকে কারুরই নজর পড়েনি। সব কিছু ভেঙে ফেলাকে যারা প্রগতি বলে মনে করে তাবা যে মূলত আত্মখণ্ডনই করে যাচ্ছে সে বিশ্লেষণ কবার প্রয়োজনই মনে করেনি কেউ। আশাপূর্ণা দেবী তাঁর 'বকুলকথা' উপন্যাসের পাঠকৃতি জুড়ে তারই বিশ্লেষণ করে আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন, ঠিক এসব কাবণেই শোভন ও রেখার জীবনে বিচ্ছেদ অনিবার্য হয়ে ওঠে। উপন্যাসটির আটত্রিশ সংখ্যক অধ্যায়ে তাই বকুলের কাছে লেখা পারুলের চিঠির বয়ানে পাই :

> *"কিন্তু এটাই কী চেয়েছিলাম আমরা? আমি, তুমি, আমাদের মা দিদিমা, দেশের অসংখ্য বন্দিনী মেয়ে? এটাই কী সেই স্বাধীনতার রূপ? যে স্বাধীনতার জন্যে একদা পরাধীন মেয়েরা পাথরে মাথা কুটেছে, নিরুচ্চার আর্তনাদে বিধাতাকে অভিসম্পাত করেছে? এ কী সেই মুক্তির আলো, যে মুক্তির আশায় লোহার কারাগারে শৃঙ্খলিতা মেয়েরা তপস্যা করেছে, প্রতীক্ষা করেছে? ...না বকুল, এ আমরা চাইনি।"*

এই চিঠির উত্তরে বকুল লিখেছে :

> *"আমরা আপন কল্পনায় সমাজের একটা ছাঁচ গড়েছিলাম। আমাদের সর্বাঙ্গের শৃঙ্খল যেখানে যেখানে অসহনীয় যন্ত্রণায় পীড়িত করেছে, সেখানটায় বন্ধন শিথিল করতে চেয়েছিলাম, ভেবেছিলাম এই শেকলের নাটবল্টু, কব্জা স্ক্রু এগুলো একটু আলগা হোক, কিন্তু আমাদের চাওয়াই তো শেষ চাওয়া নয়। আর চাওয়ার পথ ধরে ওই স্ক্রু, কব্জা, নাটবল্টুগুলো খুলে খুলে ছিটকে পড়ে হারিয়ে যাচ্ছে। ...যাবেই। কারণ আর এক নতুন ছাঁচ জন্মাবার অপেক্ষায় রয়েছে।"*

একটি খাঁচা থেকে বেবিয়ে এসে আরেকটি নতুন খাঁচায় ঢুকে পড়ার মধ্যে কোনো স্বাধীনতা যে আসলে অর্জিত হয়নি, এ বিষয়টি এমন ব্যঞ্জনাময় প্রতীকী ভাষায় আশাপূর্ণা ব্যক্ত করে গেছেন যা পড়ে বিস্ময় জাগে। বিস্ময় এ কারণে যে আমদানিকৃত আধুনিকতার এরকম সমালোচনা করার স্পর্ধা তিনি রাখেন যা একজন সৎ লেখিকার পক্ষেই সম্ভব। কাহিনির আবরণ সরিয়ে দিয়ে যে-আধুনিকতার মুখ চোখে পড়ে, তা যে আসলে আমাদের ঐতিহ্যের আধুনিকতা নয়, 'গ্রাম্যতা' বলে যাকে আমরা ঘৃণা ও অবহেলা করি সেখান থেকেই যে আধুনিক হয়ে-ওঠার প্রক্রিয়াটা শুরু হতে পারত, সে-বিষয়টি আমাদের নজর এড়িয়ে যায়। "আসলে 'গ্রাম্যতা' বস্তুটা একটা চরিত্রগত ব্যাপার। ওটা শহুরে জীবনের পরিবেশ পেলেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার নয়।" —এ যেমন সত্য, তেমনি গ্রামপ্রধান ভারতবর্ষের লোকায়ত জীবনের তৃণমূলে যে সমবায়ী চেতনা, দীপায়নের প্রেরণা ও মানবিকতার বন্ধন ছিল, তাকে পুঁজি করেই আমরা সামাজিক পরিসরের বিনির্মাণ ও পুনর্নির্মাণের কাজটা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু আমরা তা করতে পারিনি। তাই নান্দনিক পরিসরে আধুনিকতার মুখ দেখলেও সামাজিক পরিসরে কোনো সদর্থক আধুনিকতার মুখ আমরা দেখতে পাইনি। রেনেসাঁর হাত ধরে যে-আধুনিকতা এসেছিল এ দেশে, বিশেষত বাঙালির জীবনে, সে-আধুনিকতা আমাদের ঐতিহ্যের আধুনিকতা নয়, ওই আধুনিকতা প্রতীচ্যের। প্রতীচ্যের সেই আধুনিকতাকে আমাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে শুধু। তাই সামন্তবাদী ধ্যান-ধারণার শৃঙ্খলে আবদ্ধ 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'-র সত্যবতী যে-মুক্তির স্বপ্নকে বুকে ধরে ঘরছাড়া হয়েছিলেন, 'সুবর্ণলতা'-য় সে-স্বপ্ন অন্তর্লীন হয়েও বেঁচেছিল, যদিও সেখানেও ভাঙনের শব্দ আমরা শুনেছি; 'বকুলকথা'-য় এসে দেখি অনামিকা দেবী কিংবা শম্পা-সত্যবানের জীবন ছাড়া অন্য কারুর জীবনে সে-স্বপ্ন সার্থক রূপ পায়নি বাস্তবে। তার কারণ অনেক গভীরে প্রোথিত। সেটাই বিশ্লেষণের এক প্রধান বিষয় বলে বিবেচিত হতে পারে।

দুই

ইউরোপে শিল্প-বিপ্লবের ফলে পুঁজির উদ্ভব হয়েছিল। সেই পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার ওপর গড়ে উঠেছিল যে-চিন্তা-প্রস্থান তা-ই আধুনিকতাবাদ। সেখানকার সমাজে আধুনিকতার যে-চেহারা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি, বাঙালির জীবনে সে-আধুনিকতা বিপ্রতীপ

প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল কারণ ইউরোপের আর্থ-সামাজিক অবস্থা আর এ-দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা এক ছিল না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে এসে সামন্তবাদী শক্তির সঙ্গে পদে পদে আপস করতে করতে তার শোষণের জাল প্রসারিত করেছে। নিজের দেশে সে-শক্তি শিল্পের বিকাশকে যে-শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছে দিয়েছিল, ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে সেই বিকাশকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে গাঁটছড়া বেঁধেছে সামন্তবাদী শক্তির সঙ্গে। তাই এখনো বিয়ার বারে একসঙ্গে মদ্যপান করে বেরিয়ে এসে রাম ছোটে শনিতলার দিকে আর রহিম ছোটে পিরের মাজারে মোমবাতি জ্বালাতে। এভাবেই অবক্ষয়ী আধুনিকতার পঙ্কিল ক্ষেত্রটি নিরঙ্কুশ হয়ে উঠেছে। সত্যের প্রকৃত মুখকে ক্রমশ ঝাপ্‌সা করে দিতে দিতে যে-আধুনিকতা বিকার ও সংক্রমণের চাষ করে গেছে অনবরত তাতে চিত্তবৃত্তিরও উপনিবেশীকরণ ঘটে গেছে। রবীন্দ্রনাথও পল্লিপ্রধান ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক প্রতিক্রিয়াজাত নগরায়ন ও প্রতীচ্যায়ন প্রক্রিয়াপুষ্ট তথাকথিত আধুনিকতার সমালোচনা করেছেন তীব্র ভাষায়। কবি অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা একটি চিঠিতে (১৫ নভেম্বর ১৯৩৪) তিনি স্পষ্ট মন্তব্য করেছেন : "য়ুরোপের মতো আমাদের জনসমূহ নাগরিক নয়, চিরদিনই চীনের মতো ভারতবর্ষ পল্লিপ্রধান। নাগরিক চিত্তবৃত্তি নিয়ে ইংরেজ আমাদের সেই ঘনিষ্ঠ পল্লিজীবনের গ্রন্থি কেটে দিয়েছে। তাই আমাদের মৃত্যু আরম্ভ হয়েছে ঐ নীচের দিক দিয়ে। সেখানে কী অভাব, কী দুঃখ, কী অন্ধতা, কী শোচনীয় নিঃসহায়তা—বলে শেষ করা যায় না।" রবীন্দ্রনাথের এ লেখা থেকে বুঝতে অসুবিধে হয় না যে আমাদের সংকটটা ঠিক কোথায় ও কেন? ক্রমশ শিকড়হীন হতে-হতে আমরা আধুনিকতার যে-মুখোশকে আঁকড়ে ধরেছি তাতে প্রকৃত সময় ক্রমশ হারিয়ে গেছে। প্রতিবাদী পরিসর ক্রমশ লুপ্ত হয়ে গেছে। তাই পুঁজিবাদী ও সামন্তবাদীদের আপসের ভিত্তিতে যে-স্বাধীনতা এদেশে এসেছে সে তো শুধুই মালিকানার হস্তান্তর এবং শোষণের নতুন কৃৎকৌশলের সূচনা। শোষণের ক্ষেত্রটি যাতে অবাধ ও নিরঙ্কুশ হয়ে ওঠে সেজন্য সামাজিক প্রকৃত-আধুনিকতার প্রক্রিয়াকে চূড়ান্তভাবে বিপথগামী করার সমস্ত কৌশল রচনা করা হয়েছে। প্রকৃত-আধুনিকতার মধ্যে যে একটা প্রতিবাদের জায়গাও থাকে সেই প্রতিবাদী পরিসরকে ঝাপ্‌সা করে দিতে দিতে এগিয়েছে আমদানিকৃত আধুনিকতা। প্রকৃত-সত্যের মুখ তাই ঘনান্ধকারে নিমজ্জিত। 'বকুলকথা' উপন্যাসের দশম অধ্যায়ে উত্তরবঙ্গের সাহিত্যসভায় প্রধান বক্তা সুবিখ্যাত অধ্যাপক-সাহিত্যিক চক্রপাণি চট্টোপাধ্যায়ের 'যুগসাহিত্যে সত্য' বিষয়ক বক্তৃতায় শুনতে পাই :

> *"না, এ যুগে সে-যুগের কোনো স্পষ্ট অবয়ব খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কোথাও সে দুরন্ত সংহারের মূর্তি নিয়ে মুহূর্তে মুহূর্তে রেণু রেণু করে উড়িয়ে দিচ্ছে বহুযুগসঞ্চিত সংস্কারগুলি, উড়িয়ে দিচ্ছে চিরন্তন মূল্যবোধগুলি, অভ্যস্ত ধ্যান-ধারণার অবলম্বনগুলি, আবার কোথাও সে আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ির মতো আজও তার বহু সংস্কারে বোঝাই ঝুলিটি কাঁধে নিয়ে শিকড় গেড়ে বসে 'পাপপুণ্য', 'ভালোমন্দ', 'ইহলোক-পরলোকে'র চিরাচরিত খাজনা যুগিয়ে চলেছে।*

তাই এ যুগের মানসলোকে 'সত্যে'র চেহারাও অস্থির অস্পষ্ট। দোদুল্যমান দর্পণে প্রতিফলিত প্রতিবিম্বের মতো সে চেহারা কখনো কম্পিত, কখনো বিকৃত, কখনো দ্বিধাগ্রস্ত, কখনো যেন অসহায়। যেন ঝড়ে বাসাভাঙা পাখি ডানা ঝাপ্‌টে ঝাপ্‌টে পাক খেয়ে মরছে, এখনো ঠিক করে উঠতে পারছে না, ঝড় থামলে পুরোনো বাসাটাই জোড়াতালি দিয়ে আবার গুছিয়ে বসবে, নাকি নতুন গাছে গিয়ে নতুন বাসা বাঁধবে।
কিন্তু ঝড় কী থামবে?
ভাঙনের ঝড় কী ভেঙেচুরে তছনছ না করা পর্যন্ত থামে? সে কী ওই আদ্যিকালের বুড়ীটাকে শিকড় উপড়ে তুলে ফেলে না দিয়ে ছাড়ে?
অথবা হয়তো থামে।
হয়তো ছাড়ে।
কোথায় যেন একটা রফা হয়ে যায়। তখন বুড়ীটাকে দেখতে পাওয়া না-গেলেও শিকড়টা থেকে যায় মাটির নীচে। নিঃশব্দে সে আপন কাজ করে যায়। তাই এই 'বিশ্বনস্যাতে'র যুগেও 'মহাত্মা' আর 'মহারাজে'র সংখ্যা বেড়েই চলেছে, বেড়ে চলেছে 'ভাগ্যগণনা কার্যালয়', আর 'গ্রহশান্তির রত্ন-কবচ'।
তাই যখন 'সাম্য' 'মৈত্রী' আর 'স্বাধীনতা'র জয়ডঙ্কায় আকাশবাতাস প্রকম্পিত হচ্ছে, তখনও শুধু মাত্র চামড়ার রঙের তারতম্যের ছুতোয় মানুষ মানুষের চামড়া ছাড়িয়ে নিচ্ছে। এবং যখন মানুষের একটা দল চাঁদে পৌঁছবার সাধনায় আকাশ পরিক্রমা করছে, তখন আর একটা দল সভ্যতার সব পথ-পরিক্রমা শেষ করে ফেলেছি বলে আবার গুহার দিকে মুখ ফিরিয়ে চলতে যাচ্ছে।"

আর্থ-রাজনৈতিক অবস্থার ওপর ভিত্তি করে সামাজিক স্তরে ঐতিহ্যের আধুনিকতা আসার বদলে বাঙালির ভুবনে যে প্রতীচ্যের আধুনিকতাকে আমদানি করা হয়েছে, তার প্রতিক্রিয়া ও কূটাভাস যে কত বিধ্বংসী হতে, পারে চক্রপাণি চট্টোপাধ্যায়ের সুদীর্ঘ বক্তব্যে তা পরিস্ফুট। সন্ধানী আলো নিক্ষেপ করে সমাজের টানা ও পোড়েন, অন্ধবিন্দু ও পিছুটানকে যেভাবে উদ্ভাসিত করা হয়েছে এখানে, তা প্রতিষ্ঠান-উৎপাদিত সাহিত্যে প্রায় নেই বললেই চলে।

বিবাহও তো একটা প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি। একজোড়া নর-নারীর একসঙ্গে সারাজীবন কাটানোর স্বীকৃতি। কিন্তু সেই স্বীকৃতির পেছনে মানবিক কোনো মূল্যবোধ সত্যি-সত্যিই আছে কী না, কিংবা ভালোবাসার বন্ধনহীন একজোড়া নরনারীকে আমৃত্যু স্বীকৃতির খাঁচাটাকে বয়ে নিয়ে যেতে বাধ্য করা হল কী না, সে-সম্পর্কে সামাজিক অনুশাসন ও প্রতিষ্ঠান বিন্দুমাত্র মাথা ঘামায় না। অথবা অন্যভাবেও বলা যায়, সমাজ যতই আধুনিকতার মুখোশ পরুক না কেন, এখনও সামন্তবাদী বন্দিশালা থেকে বেরিয়ে এসে মানবিক মূল্যবোধের স্বীকৃতি দিতেই শেখেনি। আর ঠিক সে-কারণেই বকুলকে অবিবাহিতা থেকে অনামিকা

দেবীর খোলসে সারাটা জীবন কাটাতে হয়। নির্মলের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসার স্বীকৃতি পারিবারিক ও সামাজিক স্তর থেকে কোনোদিনই উঠে আসে না। আজীবন অবিবাহিতা থেকে নিজেই নিজের ভালোবাসাকে স্বীকৃতি দিয়ে যায়। ভালোবাসা ঝরে পড়ে না। মনের নিভৃততম প্রদেশে অতি গোপনে ফুল ফুটিয়ে সৌরভ বিতরণ করতে থাকে। আর সেই সৌরভে নিজেই নিজেকে মোহিত করে রাখে সারাক্ষণ। উপন্যাসের শেষ অধ্যায়ে বকুল তাই প্যাডে পারুলের উদ্দেশে লিখল :

> *"অতএব মস্ত লেখিকা অনামিকা দেবী এখনো কোনো কোনো দিন, যেদিন জীবনের সব কিছু নেহাৎ অর্থহীন লাগে, ছেলেমানুষের মতো রাত্রির আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রকে খোঁজেন, আর আরো ছেলেমানুষের মতো অসহায় গলায় বলেন, দেখো, যে লেখা আগামীকালই জলের আলপনার মতো মিলিয়ে যাবে, সেই লেখাই লিখলাম জীবনভোর,—শুধু বকুলের কথাটা আর লেখা হল না...তোমার আর বকুলের কথা।*
> *কী লিখব বলো? তারা তো হার মেনে মরেছে। হার মানার কথা কী লেখা যায়? সেই হার মানার মধ্যে যে পাওয়া, তার কথা বলতে গেলে লোকে হাসবে। বলবে, 'কী অকিঞ্চিৎকর ছিল ওরা!' তবে?*
> *প্রত্যক্ষে যারা জিতেছে, এখন তবে তাদের কথাই লিখতে হবে। ...*
> *এখন তাই শম্পার কথা লেখা হল। ..."*

চিঠির এ বয়ান থেকে স্পষ্টতই আমরা সামন্তবাদী কারার লৌহ কপাট ভেঙে ফেলার ইতিবাচক দিকটিকে খুঁজে পেয়েছি। পেয়েছি সামন্তবাদী সমাজের তথাকথিত অনুশাসনের নিগড় ভেঙে মুক্তির এক নিশ্চিত পরিসরের সন্ধান। এ পরিসরেও বন্ধন আছে কিন্তু তা শাস্ত্রীয় অনুশাসনের প্রাতিষ্ঠানিক বন্ধন নয়, মানবিকতার বন্ধন, ভালোবাসার বন্ধন, হার্দিক সম্পর্কের বন্ধন যে-বন্ধন অটুট থাকে চিরকাল। আইন দিয়ে দুটি রক্তমাংসের মানুষকে বেঁধে ফেলা যায় হয়তো, অথবা দুজনের বিচ্ছেদ ঘটানোও যায়, কিন্তু পৃথিবীর কো· ' আইনই দুটি ভালোবাসাময় হৃদয়কে বেঁধে ফেলতে পারে না, বিচ্ছিন্নও করতে পারে না। আইনকে তোয়াক্কা না-করে, সামাজিক অনুশাসন ও শাস্ত্রবাক্যকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে ভালোবাসার বন্ধন ও মানবিক মূল্যবোধই শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়। বোমায় দু'পা হারানো, হুইল চেয়ারের সাহায্যে চলাফেরা-করা সত্যবানের সঙ্গেই তাই শম্পা ঘর বেঁধে সুখী হয়। তথাকথিত সমাজের চোখ রাঙানিকে বিন্দুমাত্র মান্যতা না-দিয়ে প্রতিস্রোতে-চলা শম্পা তাই প্রত্যক্ষভাবে জয়কে ছিনিয়ে আনে যে-জয়ের পদতলে তার মা-বাবার অহংবোধ ও মিথ্যা বংশগৌরব অনায়াসে লুটিয়ে পড়ে ধুলোয় গড়াগড়ি যায়। শম্পা-সত্যবানের প্রেমের বন্ধনকে সামন্তবাদী মূল্যবোধের ধ্বজাধারী শম্পার মা-বাবা শেষ পর্যন্ত স্বীকৃতি না-জানিয়ে পারেন না। আর আপাতদৃষ্টিতে নির্মল ও মাধুরীর বিয়ের ফলে নির্মলের প্রতি বকুলের প্রেম সমাজের যূপকাষ্ঠে বলিপ্রদত্ত হলেও বকুলের হৃদয় থেকে তা হারিয়ে যায়নি। সেটা নির্মলের বৌ মাধুরীও জানত। আর তাই রোগশয্যায় বালিশের তলা থেকে সযত্নে রক্ষিত নির্মলের

ডায়েরির খাতাটা মাধুরী বকুলের হাতে তুলে দিয়ে বলে "যা বললাম, ঠিকই বলছি। পাতায় পাতায় যার নামাবলি, তারই জিনিস, তার কাছে থাকাই ঠিক।" এ ঘটনা থেকে বোঝা গেল, নির্মলের প্রেমও মরে যায়নি। এইটুকু থেকে কোনো কোনো পাঠকের রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা'-র লাবণ্য ও কেতকীর কথা হয়তো মনে পড়ে যাবে, কিন্তু নির্মল-বকুলের প্রেম লোকচক্ষুর অন্তরালে বেঁচে থেকে পরোক্ষে জয়ী হয়েছিল যে-জয়ের বার্তাটুকু এল মাধুরীর মুখ থেকেই। আর এই সূত্রে আমরা সত্যবতীর সেই প্রশ্নের উত্তরটুকুও পেয়ে যাই : "'বিয়ে' জিনিসটা ভাঙবার নয় কেন?" উপন্যাসের একেবারে শেষে পৌঁছে আমরা বকুলের চিঠিতে তাই একটা চিরকালীন বার্তার সম্মুখীন হই :

> *"কিছু মানুষ গম্ভীর গলায় বলবে, 'ওটা ঠিক নয়, ওটা অন্যায়, ওটা পাপ।'*
> *যেন পাপপুণ্যের মাপকাঠি তাদের হাতে। যেন আজ যা চরম পাপ, আগামী কাল তা পরম পুণ্য হয়ে সভায় এসে আসন নেবে না। তবু চেষ্টা চালিয়ে যাবে তারা। ভাববে তাদের হাতেই নির্ভুল ছাঁচ।*
> *তা বলে কী কোথাও কিছু নেই!*
> *আছে।*
> *তবু কোথাও কিছু আছে।*
> *তবু কোথাও কিছু থাকে।*
> *থাকবে।*
> *একান্ত তপস্যা কখনো একেবারে ব্যর্থ হয় না।"*

'আছে', 'থাকে' ও 'থাকবে'-এ তিনটি ক্রিয়াপদের কালিক বিন্যাসে নিত্যবৃত্ত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এখানে গ্রথিত হয়ে গেছে অভিন্ন এক চিরায়তনে। রুথ বেনেন কথিত (১৯৯৪ :২২২) 'Temporal intention of tensed verbs' অত্যাশ্চর্য গভীরতা অর্জন করেছে। আর তারই সূত্র ধরে আমরা একটি প্রকৃত-সত্যের মুখ দেখতে পাই · "একান্ত তপস্যা কখনো একেবারে ব্যর্থ হয় না।" তথাকথিত আধুনিকতা আপাত-সময়ের রঙিন ফানুসের আড়ালে প্রকৃত-সময়ের মুখকে ঢেকে রাখতে চায়, বুদ্বুদকে প্রবাহ বলে প্রচার করতে চায়। কিন্তু প্রকৃত-আধুনিকতা খণ্ডকালকে চিরকালের প্রেক্ষাপটে স্থাপন করে প্রগতির প্রসৃত জীবন-সূত্রকে আবিষ্কার করতে করতে এগিয়ে চলে। তাই উপন্যাসের এই আপাত-সমাপ্তিতে পৌঁছে আমরা সেই চলমান জীবনের সূত্রকেই আবিষ্কাব করতে পারি। ঐতিহ্য যেখানে স্থবিরত্বের বন্ধন নয়, চলমানতার ভিত্তি ও জীবনসূত্র, সেখানেই কালের সম্মুখ-যাত্রা অব্যাহত থাকে। সেই সম্মুখ-যাত্রার পথেই প্রকৃত-আধুনিকতার সাক্ষাৎ মেলে। এর নির্মাণ একার দ্বারা সম্ভব নয় কখনো। বহু মনীষার বহু কালের বহু তপস্যার ফল। আলোচ্য উপন্যাসে সর্বব্যাপ্ত অন্ধকারের বলয়ে এই আলোর প্রদীপটিই জ্বালিয়ে রেখেছেন আশাপূর্ণা দেবী।

এর পরও 'বকুলকথা' উপন্যাসের অতি সাধারণ পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগতেই পারে, উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিতে কার তপস্যার কথা বলেছেন লেখিকা? সত্যবতীর? সুবর্ণলতার? বকুলের? শম্পার? এ নিয়ে তর্ক চলতেই পারে। তবে মনে রাখতেই হবে, এরা সবাই

একেকটি সময়ের প্রতিনিধি। 'সত্তা যে স্বয়ংসম্পূর্ণ নির্মিতি নয়, অপরের দর্পণে প্রতিফলিত হয়েই সে গ্রাহ্য হয়ে ওঠে', এ সত্যটুকু আমরা তো বাখতিনের দ্বিবাচনিকতার সূত্রেই জেনেছি। অধ্যাপক ড. তপোধীর ভট্টাচার্যের ভাষায়, "অন্যদিকে অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় ঘটনা সংস্থানের মধ্যে যা কিনা সুনির্দিষ্ট সময় ও পরিসরের বাইরে হতেই পারে না। অর্থাৎ অস্তিত্ব সময়নিরপেক্ষ নয়, সময়শূন্য নয় পরিসরও। সত্তার অবস্থানে এভাবে এসে মেশে ইতিহাস, ভূগোল, রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, দর্শন।" (বাখতিনের তত্ত্ববিশ্ব ও দ্বিবাচনিকতা, বাখতিন · তত্ত্ব ও প্রয়োগ, মার্চ ১৯৯৬, পৃষ্ঠা-১৭) সত্যবতী, সুবর্ণলতা, বকুল ও শম্পাও তাই সময়েরই নির্মিতি যে-সময়ের গর্ভেই অসংখ্য অপরতা বিদ্যমান। আমরা তো প্রত্যেকেই সময়ে বাস করি, আবার এ-ও তো সত্য যে প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন সময়ের বাসিন্দা। সেই সূত্রে বুঝতে পারি, সত্যবতী, সুবর্ণলতা, বকুল ও শম্পাও ভিন্ন ভিন্ন সময়বাসী। এদের প্রত্যেকের নিজস্ব খণ্ড-সময়ের তপস্যা ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষা এদেরকে চিরায়তনে গ্রথিত করে নেয়। এখানে মনে রাখতে হবে, আয়তন বা পরিসর সময়শূন্য হতেই পারে না। তাই এদের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ও আয়োজন, চেতনা ও কর্ম সময়কেই ধারাবাহিকভাবে বিনির্মিত করতে করতে এগিয়ে চলে এবং শেষ পর্যন্ত প্রকৃত আধুনিকতার স্বরূপকে উদ্ঘাটন করে। বকুলের চিঠিতে তাই অনিবার্যভাবে লেখা হয়ে যায় :

> *"তাই সুবর্ণলতাদের সংসারে শম্পাদের আবির্ভাব সম্ভব হয়। যারা সর্বস্বের মূল্যে প্রেমকে প্রতিষ্ঠিত করে জীবন পাবার দুঃসাহস রাখে।"*

এই বয়ান থেকে বোঝা যায়, যে-তপস্যার কথা একটু আগে বলা হয়েছে তা মানবিক সমগ্রতাকে অচলায়তন ও ভাঙনের হাত থেকে বাঁচানোর তপস্যা এবং সে-তপস্যা একা শম্পার নয়, সত্যবতী, সুবর্ণলতা ও বকুলেরও। আর এই বিশ্লেষণ থেকেই পাঠকের বুঝতে অসুবিধে হবে না হয়তো—কেন একটু আগেই বলা হয়েছে, আধুনিকতার নির্মাণ একার দ্বাবা সম্ভব নয় কখনো, বহু মনীষার বহু কালের বহু তপস্যার ফল। আর এই তপস্যার আলো দিয়েই সময়ের অন্ধকারকে অতিক্রম করা যায়—পাঠকৃতিটির আপাত-সমাপ্তিতে পৌঁছে এই প্রত্যয় আরও বেশি দৃঢ় হয়ে ওঠে।

তিন

শম্পার কথা যখন উঠল তখন বলতেই হয় যে, অনেকেই শম্পাকে ভুল বুঝতে পারেন এবং সেই সঙ্গে অনামিকা দেবীকেও। শম্পাকে অবক্ষয়ী আধুনিকতার রোল মডেল ধরে নিয়ে চরিত্রহীনতা ও বেলেল্লাপনার দায়ে অভিযুক্ত করতে পারেন ও সেই সঙ্গে এ-ও বলতে পারেন যে, সেই বেলেল্লাপনায় প্রশ্রয় দিয়েছেন তারই পিসি অনামিকা দেবী ওরফে বকুল। উপন্যাসটির প্রথম অধ্যায়েই শম্পার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে যায়। উপন্যাসের কথকের বয়ানে জানা যায় :

> *"...শম্পার জীবনে এখন একটি নতুন প্রেমের ঘটনা চলছে। এখন শম্পা সব সময় আহ্লাদে ভাসছে।*
> *অনামিকা দেবী সঠিক খবর জানেন না, সত্যি কিছু আর সব খবর*

রাখেনও না, তবু যতটুকু ধারণা তাতে হিসেব করেন, শম্পার এ ব্যাপারে এই নিয়ে সাড়ে পাঁচবার হল। সাড়ে অর্থে এটা এখনও চলছে, তার মানে অর্ধপথে।

প্রথম প্রেমে পড়েছিল শম্পা ওর দূর-সম্পর্কের মামাতো দাদা বুবুলের সঙ্গে। শম্পার তখন এগার বছর বয়েস, বুবুলের বছর সতেরো।"

অনামিকা দেবীর ছোটবৌদি অর্থাৎ শম্পার মা এ ঘটনার জন্যে দায়ী করলেন সিনেমা-পত্রিকাগুলোকে এবং অনামিকা দেবী রচিত প্রেমকাহিনিগুলোকে। "তারপর মেয়েকে তুলো ধুনলেন এবং ভাইপোকে পথ দেখতে বললেন।" ভাবলেন প্রেমে পড়ার চরিত্রদোষের চিকিৎসা হল খুব। শম্পা আর কখনো প্রেমে পড়বে না। কিন্তু "সাড়ে বারো বছরেই আবার প্রেমে পড়ল শম্পা, পাড়ার এক স্টেশনারী দোকানের সেলস্‌ম্যান ছোকরার সঙ্গে।" এই প্রেমপর্ব সমাধা হওয়ার পব তৃতীয় প্রেম এক সহপাঠিনীর দাদার সঙ্গে। সেই প্রণয় ভেঙে যাবার পর শম্পা "সাঁতার ক্লাবে ভর্তি হল, আবদার করে সেতার কেনালো।" সবাই ভাবল সেতারে মন ডুবে গেলে আর সে হয়তো প্রেমে পড়বে না। কিন্তু আবার দেখা গেল সাঁতার ক্লাবের এক মাস্টারমশাইয়ের প্রেমে সে হাবুডুবু খেতে লাগল। এই প্রেম-ভঙ্গের পর পঞ্চম প্রেম "একজন ক্যাবলা-মার্কা প্রফেসারের" সঙ্গে যদিও প্রফেসারটি বিবাহিত। প্রেমের এই পঞ্চম অধ্যায় শেষ হওয়ার পর ষষ্ঠ অধ্যায়ে "কলেজ-লাইব্রেরীর লাইব্রেরীয়ান ছোকরার সঙ্গে"। শম্পার কাছে এগুলো 'চার্ম'। পিসি বকুলের কাছে সে অকপটে বলেছেও :

"একটা প্রেম-ট্রেম থাকবে না, কেউ আমার জন্যে হাঁ করে বসে থাকবে না, আমায় দেখলে ধন্য হবে না, এ ভালো লাগে না, বুঝলে পিসি? কিন্তু সত্যি প্রেমে পড়তে পারি এমন ছেলে দেখি না!"

এই সাড়ে পাঁচটি প্রেম-কাহিনির কথা জেনে যে-কোনো পাঠকেরই গা ঘিনঘিন করে উঠতে পারে এবং শম্পার দুশ্চরিত্র সম্বন্ধে সমালোচনার ঝড় বয়ে যেতে পারে। সামন্তবাদী ধ্যান-ধারণায় যাদের চেতনা গড়ে উঠেছে, তারা বলতেই পারেন, ছি ছি! সীতা-সাবিত্রী-র দেশে এ কী কাণ্ড! আবার কেউ কেউ অতি বিজ্ঞের মতো গম্ভীর উচ্চারণ করতেই পারেন, এই আধুনিকতা লাগামছাড়া উচ্ছৃঙ্খলতারই নামান্তর। কিন্তু তাঁরা যে একচক্ষু হরিণ এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাঁরা অপূর্ব-অলকার মেয়ে সত্যভামার সঙ্গে শম্পার কোনো পার্থক্যই খুঁজে পান না।

এই একদেশদর্শিতার কারণ সম্ভবত সমগ্রকে টুকরো করে পাঠ করা এবং পাঠকৃতিতে নিহিত শূন্যায়তনকে পাঠ না-করা। কারণ প্রথম প্রেমপর্ব থেকেই শম্পা কেন যে 'বিয়ে' ব্যাপারটাকে মেনে নিতে পারছে না এবং সত্যি-প্রেমে পড়ার মতো ছেলে খুঁজে পাচ্ছে না, তার গভীরে নিহিত চেতনাকে আমরা উপলব্ধিতে নিয়ে আসতে পারিনি। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, 'বিয়ে' ব্যাপারটাকে শম্পা প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতির খাঁচা হিসেবে দেখেছে, কোনো মানবিক বন্ধন ও মূল্যবোধ এতে খুঁজে পায়নি। হেঁসেল থেকে আঁতুড়ঘর আবার আঁতুড়ঘর থেকে হেঁসেলই যদি বিবাহজীবন হয় তা হলে, তা তো এক বন্দিশালারই নামান্তর। Wife

মানে যদি Wonderful instrument for enjoyment হয় এবং পুরুষতান্ত্রিক সমাজ যদি শুধু সেই Enjoyment-এরই স্বীকৃতি দেয় যুগ যুগ ধরে, কিংবা পুরুষরচিত শাস্ত্র অনুযায়ী ভার্যা যদি পুত্র লাভের জন্যেই হয় শুধু, তাহলে তো সেই 'বিবাহ' নামক প্রথাটার মাধ্যমে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারীকে সিন্দুকাবদ্ধ সম্পত্তিতেই পরিণত করে। যে-শাস্ত্র নারীকে নরকের দ্বার, দাসী ও ঊনমানব বানিয়েছে, সেই শাস্ত্রের ধ্বজাধারী উত্তরপুরুষেরা পাণিগ্রহণের নামে যদি ভোগ্য-পণ্য নারীর সঙ্গে Money-গ্রহণও করে এবং 'পরধনলোভে মত্ত' হয়ে ওঠে, তা হলেও কি আমরা বলব যে 'বিবাহ' জিন্দাবাদ? সহযোগী অপর সত্তা হিসেবে স্বীকৃতি আদায় করে নিতে হলে 'বিবাহ জিন্দাবাদ' শ্লোগানের বিরুদ্ধে 'বিবাহ মুর্দাবাদ' শ্লোগানই তুলতে হবে নারীকে। শম্পার জোর এখানেই যে, বয়সোচিত চপলতার মধ্যেও সে শেষোক্ত শ্লোগানই তুলতে পেরেছে এবং সহযোগী অপর সত্তা হতে পারার মতো মানুষকে সে খুঁজে বেড়িয়েছে। সে বংশগৌরব, কুলমর্যাদা, জাত-পাত, ধনদৌলত, সামাজিক স্তব, কলেজ-ইউনিভার্সিটির সার্টিফিকেট, পেশাগত স্ট্যাটাসকে খুঁজতে যায়নি। তাই সামন্তবাদের ধ্বজাধারী তার বাবার চোখে যে-সত্যবান দাস 'কারখানাব কুলি', ছোটলোক ও শম্পার বর হিসেবে অযোগ্য, সেই সত্যবানের সঙ্গেই নারী-হয়ে-ওঠা শম্পা ঘর বাঁধে কারণ তার মধ্যে সে পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব খুঁজে পায়নি। সত্যবানের তো বিয়ে ব্যাপারটাতে প্রচণ্ড অমতই ছিল এবং তার সঙ্গে জীবনের গাঁটছড়া বাঁধলে শম্পাব জীবন অভিশপ্ত হবে বলে বারবারই আশঙ্কাও প্রকাশ কবেছে। তবু শম্পা তার সঙ্গেই সংসার পেতে বসে কারণ তার মধ্যে পুরুষের বদলে সহযোগী সত্তাকেই সে আবিষ্কার করে। আর তাকে পাবার জন্যেই যে-পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্য নারীর জীবনযন্ত্রণা, মর্মবেদনা ও মানবিক মূল্যবোধকে অস্বীকার করে এসেছে, তারই প্রতিনিধি তার বাবার বিরুদ্ধে দাঁড়াতেও সে দ্বিধাগ্রস্ত কিংবা ভীত হয়নি। উপন্যাসের বয়ানে তাই কথকস্বর জানিয়ে দেয়

> *"বাপের মুখোমুখি দাড়িয়ে পড়লো শম্পা। শম্পার বাবার বোনের মতো ভীরু ভঙ্গিতে নয়, দাঁড়ালো নিজের ভঙ্গিতেই। যে ভঙ্গিতে ভীরুতা তো নয়ই, বরং আছে কিঞ্চিৎ অসহিষ্ণুতা। যেন ট্রেনের টিকিট কাটা আছে, যাবার সময় পার হয়ে যাচ্ছে, অতএব যা বলবে চটপট বলে নাও বাপু।"*

এই বর্ণনার একটু পরেই বাবার সঙ্গে শম্পার কথোপকথন এরকম ·

> "'ও।' শম্পার বাবা ফেটে পড়বার অবস্থাকেও আয়ত্তে এনে বলেন, 'ডাকনামে ডাকাডাকি চলছে তা হলে? কিন্তু আমি জানতে চাই কোন সাহসে তুমি একটা ছোটলোকের সঙ্গে মেশো?'
> শম্পা ফেরানো ঘাড় এদিকে ফিরিয়ে স্থির গলায় বলে, 'ছোট কাজ কবলেই কেউ ছোট হয়ে যায় না বাবা!'
> 'থাক থাক, ওসব পচা পুরোনো বুলি ঢের শুনেছি। আমি চাই না যে আমার মেয়ে একটা ইতরের সঙ্গে মেশে।'
> শম্পার সমস্ত চাপল্যের ভঙ্গি হঠাৎ একটা কঠিন রেখায় সীমায়িত হয়ে

যায়। শম্পা তার বাবার চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে বলে 'তোমার চাওয়ার আর আমার চাওয়ার মধ্যে যদি মিল না থাকে বাবা!'"

শম্পার এই আচরণ ও বাবার মুখের ওপর এমন তীব্র তীক্ষ্ণ ভাষায় কথা বলা মধ্যযুগীয় মূল্যবোধ ও মানসিকতায় আঘাত লাগতে পারে, কিন্তু প্রান্তিকায়িত নারীসত্তার পুরুষতান্ত্রিকতার অচলায়তন ভেঙে শিরদাঁড়া খাড়া করে প্রতিবাদী ও স্বাধীন নারীপরিসর গড়ে তোলার মধ্যেই তো আধুনিকতার প্রকৃত স্বরূপ নিহিত রয়েছে। যে-পুরুষতন্ত্র বারবার নারীর সতীত্ব পরীক্ষার অজুহাতে নারীকে লাঞ্ছিত, অপমানিত ও নিজের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে পাতাল-প্রবেশে বাধ্য করেছে, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় তোলাই তো আধুনিক-হয়ে-ওঠার একমেবাদ্বিতীয় পথ। এই পথ ও পাথেয় সন্ধান করতে-করতেই তো শম্পাও এগিয়ে গেছে। এ তো আধুনিকতারই গোত্রলক্ষণ। তুলনায় অপূর্ব-অলকার মেয়ে সত্যভামা যতই যুগের সঙ্গে মানিয়ে ফ্যাশন করুক না, কেন শম্পার মতো সে প্রতিবাদী হয়ে উঠতে পারেনি মোটেই, আধুনিক তো নয়ই। তার সময় ভিন্ন, পরিসর ভিন্ন, বিশ্বাসের জগৎটাই ভিন্ন—শম্পার মা-র শোনা কথায় তা স্পষ্ট :

"এই তো অলকা বৌমার মেয়ে, খুব নাক-উঁচু ফ্যাশানি, মানুষকে যেন মানুষ বলে গণ্যই করে না, তবু দ্যাখো তাকিযে, এই বয়সে মা-দিদিমাদের সঙ্গে গুরুদীক্ষা নিয়েছে। এদিকে যতই ফ্যাশান করুক আর নেচে বেড়াক, সপ্তাহে একদিন করে সেই 'আত্মাবাবা'র মঠে হাজরে দিতে যাবেই যাবে। তবু তো একটা দিকেও উন্নতি হচ্ছে। তা ছাড়া সেখানে নাকি সমাজের যত কেষ্ট-বিষ্টুরা এসে মাথা মুড়োন, কাজেই 'গুরুমন্ত্র' বলে একটা লোকলজ্জাও নেই। কুলগুরুর কাছে দীক্ষা নেওয়ায় যে গ্রাম্যতা আছে, এঁদের কাছে দীক্ষা নেওয়ায় তো সেটা নেই। বরং ওতেই মানমর্যাদা, ওতেই আধুনিকতা।"

এটাই তো চেয়েছিল সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। এই শক্তি ব্রাহ্মণ্যবাদী ঐতিহ্য ও আদর্শায়িত অতীতের দিকে মু ঘুরিয়ে দিয়ে উত্তরায়ণবাদী চেতনা ও লোকায়ত ঐতিহ্যের পুনর্নির্মাণের কাজটিকে বিধ্বস্ত করে দিয়ে সামাজিক আধুনিকতাকে বিপথগামী করে দেওয়ার সাংস্কৃতিক রাজনীতি করে এসেছিল। এতে প্রকৃত-আধুনিকতার নির্মাণকার্য মাঝপথে থেমে যায়। শম্পা ও অনামিকার কথোপকথনের মাধ্যমে আশাপূর্ণা সেই সাংস্কৃতিক রাজনীতিকেই বিদ্ধ করেছেন এভাবে :

"শম্পা হেসে ফেলে অপ্রতিভ-অপ্রতিভ হাসি। বলে. 'ব্যাপারটা আমি নিজেই ঠিক বুঝতে পারছি না পিসি। ঠাকুর-টাকুর তো মানি না, হঠাৎ সেদিন কেনই যে মরতে—এখন ভেবে পাচ্ছি না কী করি? পুজোফুজো দেওয়া মনে করলেই তো নিজের ওপর কৃপা আসছে, অথচ—
'তবে আর "অথচ" কি?' অনামিকা নির্লিপ্ত গলায় বলেন, 'ভেবে নে হঠাৎ একটা বোকামি করে ফেলেছিলি, তার জন্য আবার কিসের দ.খ?'
'তাই বলছো?'

শম্পা প্রায় অসহায়-অসুহায় মুখে বলে, 'আমিও তো ভাবছি সে কথা, মানে ভাবতে চেষ্টা করছি, কিন্তু কী যে একটা অস্বস্তি পেয়ে বসেছে। কাপড়ে চোরকাঁটা বিঁধে থাকলে যেমন হয়, প্রায় সেই রকম যেন। দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু—'
'তা হলে জিনিসটা চোরকাঁটাই।' অনামিকা মুখ টিপে হেসে বলেন, 'চোরের কাঁটা। অলক্ষিত চোর চুপি চুপি সিঁদ কেটে—'"

মধ্যযুগীয় এই বিশ্বাস ও মূল্যবোধের চোরকাঁটাকে ঝেড়ে ফেলে একেবারেই পরিষ্কার করা যায় না কারণ তার মূলে রয়েছে সামন্তবাদী শক্তির সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পদে পদে আপস। শম্পা যদিও সেই চোরকাঁটাকে দেখতে পায়, সত্যভামা তাকে দেখতেও পায় না কারণ সে একচুলও মধ্যযুগ থেকে এগিয়ে যায়নি। শম্পার মা-র বিচার অনুযায়ী যা আধুনিকতা, আদৌ যে তা আধুনিকতা নয়, কিংবা আধুনিকতা যে একটা বিশেষ মনোভঙ্গি ও চেতনার ফসল, তার খুব সুন্দর বিশ্লেষণ পাই শম্পার সঙ্গে কথোপকথনের সময় অনামিকা দেবীর সংলাপে

"দ্যাখ বিচ্ছু, তোর ওই ওদের যদি কখনো এ প্রশ্নের উত্তর দিতে চাস তো বলিস "আধুনিকতা" আর উচ্ছৃঙ্খলতা এক বস্তু নয়। আর—' অনামিকা দেবী একটু হাসলেন, 'আর "আধুনিক" শব্দটার বিশেষ একটা অর্থ আছে, ওটা বয়েস দিয়ে মাপা যায় না। একজন অশীতিপর বৃদ্ধও আধুনিক হতে পাবেন, একজন কুড়ি বছরের যুবকও প্রাচীন হতে পারে। ওটা মনোভঙ্গি। কেবলমাত্র বয়সের টিকিটখানা হাতে নিয়ে যারা নিজেদের "আধুনিক" ভেবে গরবে গৌরবে স্ফীত হয়, তারা জানে না ও টিকিটটা প্রতিমুহূর্তে বাসি হয়ে যাচ্ছে, অকেজো হয়ে যাচ্ছে। কুড়ি বছবটা পঁচিশ বছরের দিকে তাকিয়ে অনুকম্পার হাসি হাসবে। আমি একজনকে জানি, আজ যাঁর বয়েস আশীর কম নয়, তবু তাঁকেই আমি আমার জানা জগতের সকলের চেয়ে বেশি আধুনিক মনে করি।'"

এখানে পাঠকের মনে পড়ে যেতে পারে রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত উক্তি—'এই আধুনিকটা সময় নিয়ে নয়, মর্জি নিয়ে'। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন বলেই এই মন্তব্যকে ঘিরে সমস্যাটা আমাদের বেশি। সমস্যাটা এই কারণে যে, সময়নিরপেক্ষ কোনো 'মর্জি' থাকতে পারেই না। সময়বোধকে বাদ দিয়ে আধুনিকতা বা উত্তর-আধুনিকতা হয় না। সময়-চেতনার নিরিখেই ব্যক্তি ও সমষ্টির অবস্থান নির্ণীত হয়। সময়-বোধের মাত্রাভেদে বিকারের সংক্রমণকেও উত্তরণ কিংবা আধুনিকতা বলে ভুল হতে পারে যাকে বলা যায় সত্যভ্রম। এই সত্যভ্রমের ফলেই 'দ্বান্দ্বিক কাল-পরিক্রমার' বদলে উপনিবেশবাদের সাংস্কৃতিক রাজনীতিগত প্রয়োজনে উদ্ভূত ভাবকল্পের অবভাসকে আধুনিকতা বলে ভুল হতে পারে। বর্ণ-বর্গ-লিঙ্গ-ধর্ম-সম্প্রদায়-বিভাজিত ভারতীয় পল্লিকেন্দ্রিক সমাজের প্রকৃত বাস্তবকে আচ্ছন্ন করে দিয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থবাহী ঐ আধুনিকতাবাদী ভাবকল্প অবভাস তৈরি করে ব্রাহ্মণ্যবাদী জীবনচর্যা অনুসারী মেকি আধুনিকতার জন্ম দিয়েছিল যাতে 'দ্বান্দ্বিক কাল-পরিক্রমা' ঝাপসা

হয়ে গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের 'মর্জি' কিংবা আশাপূর্ণার 'মনোভঙ্গি' সময়বোধ থেকে যে বিচ্ছিন্ন নয়, বরং কালিক দ্বন্দ্বের মাত্রা যুক্ত হয়েই যে সেই 'মর্জি' কিংবা 'মনোভঙ্গি' আধুনিক হয়ে ওঠে, এটিই বোঝার বিষয়। পরিবার ও সমাজের মনোভঙ্গির বিরুদ্ধে গিয়ে শম্পার প্রতিবাদ ও সত্যবানের সঙ্গে ঘর-বাঁধার মধ্যে কালিক দ্বন্দ্বের অভিব্যক্তিই ব্যক্ত হয়েছে যা শম্পাকে পুরুষতান্ত্রিক অচলায়তন ও সামন্তবাদী বন্দিশালা থেকে মুক্তি দিয়েছে। এই মুক্তির আকাঙ্ক্ষা, মানবিক সমগ্রতার সন্ধান এবং মানবিক মূল্যবোধের পুনর্গঠনের প্রেরণার মধ্যেই তো প্রকৃত-আধুনিকতা। আশাপূর্ণা তাঁর এই 'বকুলকথা' উপন্যাসে প্রকৃত-আধুনিকতা ও আধুনিকতার অবভাসকে সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। আলো ও অন্ধকার, আপাত-কাল ও প্রকৃত-কাল, দ্বন্দ্ব ও কূটাভাসের আশ্চর্য দ্বিরালাপে উপন্যাসটি প্রকৃত অর্থেই সময়ের নির্মোহ ও বিশ্লেষণাত্মক দলিল হয়ে উঠছে।

চার

'সুবর্ণলতা' উপন্যাসের শেষ অধ্যায়ে দেখতে পেয়েছি সুবর্ণলতার শ্রাদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পর ছোটমেয়ে বকুল একদিন ঝিয়ের সঙ্গে জেঠামশাই জগুর প্রেসে গেছে মায়ের হাতের লেখা পাণ্ডুলিপির খোঁজে। কিন্তু সুবর্ণলতা মৃত্যুর আগেই সেগুলো পুড়িয়ে ফেলেছিল। কথকস্বর আমাদের জানিয়ে দিয়েছে :

> *"সুবর্ণলতা যে নিরক্ষর ছিল না, সে পরিচয়টা যেন একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে গেছে সুবর্ণলতা।"*

'নারীসত্তার নির্মাণ-প্রকল্প' রচনা করতে গিয়ে সুবর্ণলতার লেখক হয়ে ওঠার সংগ্রামময় জীবনালেখ্য শেষে সমস্ত লেখালেখির নিশ্চিহ্ন হয়ে-যাওয়া এক প্রতীকী দ্যোতনা নিয়ে আসে। অন্ধকারের গর্ভেই যেন দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের মাধ্যমে আলোর ইশারা ফুটিয়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা ও সম্ভাবনা আবৃত থেকে যায়। অথচ দ্বন্দ্ব ছিল, সংঘর্ষ ছিল, আলোও ফুটে উঠেছিল—সে-বোধটুকু আমাদের অনুভবে থেকে যায়। প্রদীপ জ্বালানোর আগে সলতে পাকানোর কাজটুকু করেছিল সুবর্ণলতা। কিন্তু যে-প্রদীপের আলো চারদিকে বিকিরণ করে যেতে পারেনি সুবর্ণলতা, তাকে প্রকাশ করার প্রতিজ্ঞা নিয়েছিল বকুল। 'সুবর্ণলতা' উপন্যাসের শেষ অধ্যায়ের শেষের দিকে মা-কে উদ্দেশ্য করে বকুলের ব'চনে সেই অঙ্গীকারের কথাই শোনা যায় :

> *"'মা. মাগো! তোমার পুড়ে যাওয়া, হারিয়ে যাওয়া লেখা, না-লেখা সব আমি খুঁজে বার করবো, সব কথা আমি নতুন করে লিখবো। দিনের আলোর পৃথিবীকে জানিয়ে যাব অন্ধকারের বোবা যন্ত্রণার ইতিহাস।..."*

জ্ঞানতাত্ত্বিক পরিসরে মুক্তির আলো জ্বালাবার চেষ্টা করেছিল 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'-র সত্যবতী, সেই মুক্তির পথটাকে অবিরত দ্বন্দ্বের মাধ্যমে নান্দনিক পরিসর পর্যন্ত প্রসারিত করার সংগ্রামটাই করেছিল 'সুবর্ণলতা' উপন্যাসের সুবর্ণ এবং সবশেষে 'বকুলকথা' উপন্যাসে অনামিকা দেবী ওরফে বকুল। মা-দিদিমার গড়ে-তোলা দ্বন্দ্বগর্ভ ঐতিহ্যের পুনর্নির্মাণ করেছিল নিজে লেখক হয়ে ওঠার মাধ্যমে যার অঙ্গীকারটুকুর কথা একটু আগেই

দেখেছি 'সুবর্ণলতা' উপন্যাসের শেষ অধ্যায়ের উদ্ধৃতিতে। এ যেন একটি নদীর তিনটি গতি। প্রাথমিক গতিটি হচ্ছে সত্যবতী, মধ্যগতি সুবর্ণ ও নিম্নগতি বকুল। ক্রমমুক্তির প্রবাহটি এভাবেই সাগর-সন্ধানে এগিয়ে গেছে। বকুলের অনামিকা দেবী হয়ে-ওঠার ইতিহাসের পেছনের ইতিহাসটি এরকমই দ্বন্দ্বের ভেতর দিয়ে এগিয়েছে।

এখানে কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়, সেই মুক্তি কি নিরঙ্কুশ হয়ে উঠতে পেরেছে, না কি আধুনিক-হয়ে-ওঠার পর্বে-পর্বান্তরে সময়ের দ্বন্দ্বটিকে ঝাপ্সা করে দেওয়ার কূট কৌশলও রচনা করা হয়েছে যুগপৎ? এ প্রশ্নকে ঘিরে 'বকুলকথা' উপন্যাসের পাঠকৃতি জুড়ে সময়ের অজস্র বিশ্লেষণী বয়ানকে আমরা এড়িয়ে যেতে পারি না। যেমন :

১। "যে জীবনটার জন্যে সামান্যতম প্রয়োজন, তার প্রয়োজনের সীমানা বাড়াতে বাড়াতে আর 'অধিকের' পিছনে অজ্ঞানের মতো ছুটবে, যে সোনার কনামাত্রও 'নিয়ে' যাবার উপায় নেই জানে, সেই সোনার পাহাড় গড়ে তুলতে জীবনের সমস্ত শ্রেয়গুলিকে জলাঞ্জলি দেবে।" (অধ্যায় ৩৮)

২। "অনামিকা আরও মৃদু গলায় বলেন, 'হয়তো তোমাদের কথাই ঠিক। হয়তো সেই যুগ আসছে—যখন কেউ কারুর কাছে "হৃদয়ে"র প্রত্যাশা করবে না--'

'হৃদয়!' রেখা হেসে ওঠে।

বলে, 'ওরে বাবা, ওসব দুর্লভ দামি জিনিস কী আর ব্যবহারে লাগানো যাবে মাসিমা? সোনার ভরি তিনশো টাকায় ওঠা পর্যন্ত বাজার কেমিক্যালেব গহনায় ভরে গেছে দেখেছেন তো? এখন আর ওতে কেউ লজ্জা অনুভব করে না। সোনা মুক্তো হীরে না জুটলে কাঁচ পুঁতি সিসেতেই কাজ চালাবে এটাই ব্যবস্থা। অলঙ্কারটা তো রইলো?'

'কিন্তু সে অলঙ্কারের মূল্য কোথায়?'

'কোথাও না।' রেখা শান্ত গলায় বলে, 'মূল্যবোধটাই যে বদল হয়ে যাচ্ছে।'" (৩৫ অধ্যায়)

৩। "এরপর থেকে হয়তো একটা জাতি সৃষ্টি হবে, যারা মা-বাবাকে অস্বীকার করবে, বংশপরিচয়কে অস্বীকার করবে, হৃদয়বৃত্তিকে অস্বীকার করবে। কঠিন মুখ নিয়ে শুধু নিজেদেরকে তৈরি করবে, পৃথিবীর মাটিতে চরে বেড়াবার উপযুক্ত ক্ষমতা আহরণ করে। আর সে ক্ষমতা অর্জন করতে পারলে বাপকে বলবে, 'আমাকে লেখাপড়া শেখাতে তোমার যা খরচ হয়েছে তা শোধ করে দেব।' ...অথবা বলবে, 'যা করেছো, করতে বাধ্য হয়েই করেছো। পৃথিবীতে এনেছিলে কেন আমাদের? তার একটা দায়িত্ব নেই?'

হয়তো ওইটুকুই তফাৎ থাকবে মানুষের জীবজগতের সঙ্গে। পশুপক্ষীরা তাদের জন্মের জন্যে মা-বাপকে দায়ী করতে জানে না, মানুষ সেটা জানে।" (৩৩ অধ্যায়)

উপরের তিনটি উদ্ধৃতিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা সময়ের কতকগুলি চরিত্রকে ধরতে পারি—

১। ভোগবাদের প্রসার ও লিবিডো-র দাস হয়ে যাওয়া।

২। বহিরঙ্গ জৌলুসের প্রতি তীব্র আকর্ষণ।

৩। মূল্যবোধের অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাওয়া।

৪। সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যবোধ মুছে যাওয়া।

৫। ঐতিহ্যের অস্বীকৃতি।

৬। নির্মানবায়নের (Nonhumanisation) আয়োজন।

৭। বিমানবায়নের (Dehumanisation) শীর্ষবিন্দুতে আরোহণ।

৮। জীবন থেকে নির্যাস ঝরে যাওয়া।

৯। সুকুমার হৃদয়বৃত্তির বিলুপ্তিসাধন।

খুব সচেতন পাঠক এসব নেতির গভীরে অনুসন্ধানী আলো ফেলেন কারণ, ভিত্তি ও প্রেক্ষিত হিসেবে পণ্যায়নের যুক্তিশৃঙ্খলাকে তিনি আবিষ্কার করবেনই। শোষণের মৃগয়াক্ষেত্রকে নিষ্কন্টক করে তুলতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ঔপনিবেশিক সমাজ-বাস্তবতায় প্রতিবাদী পরিসরকে মুছে দেওয়ার সাংস্কৃতিক রাজনীতি হিসেবে এই নেতির প্রসারকে নিরঙ্কুশ করে তোলে। আর এতে সাহায্য করে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরই স্বার্থরক্ষাকারী ও পদলেহনকারী প্রতিষ্ঠান যারা ছাপা মাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে এগুলোরই চাষ করে যায় অনবরত। অবক্ষয়ী আধুনিকতার এ এক মারাত্মক দিক যার সামনে বিকট ও বিকারগ্রস্ত চেহারা দেখার মতো কোনো দর্পণই থাকে না। সমস্ত রকম নান্দনিক সৃষ্টিকে পণ্য করে তোলে প্রতিষ্ঠান। যে-সত্য তারা উৎপাদন করে তা আসলে যে সত্য নয়, তা মাপার মাপকাঠিটাকেই ভেঙে ফেলে। তাই মুখোশের বিকৃতিই মুখ বলে প্রতিভাত হয়। লেখক এখানে প্রাতিষ্ঠানিক শক্তির হাতের পুতুল মাত্র, প্রতিষ্ঠান যেমনি নাচায় তেমনি নাচেন। সৃষ্টির স্বাধীনতা তাঁদের হাতে থাকে না। যা উৎপাদন করতে নির্দেশ দেওয়া হয় তা-ই তাঁরা উৎপাদন করেন কারণ প্রতিষ্ঠান তাঁদের সামনে লক্ষ্মীর ঝাঁপিটি খুলে রাখে। তাহলে সুবর্ণলতার লেখক হয়ে-ওঠার স্বপ্নটি কি এভাবেই ভেঙে পড়ে বকুলের জীবনে না কি প্রতিবাদের আয়ুধ আরও বেশি শানিত হয়ে ওঠে সেটি বিচারের দাবি রাখে।

পনেরো সংখ্যক অধ্যায়ে বকুল, নীরুদা ও সনৎকাকার কথোপকথনে প্রাতিষ্ঠানিক সাহিত্য সম্পর্কে বিতর্কে সেই প্রশ্নটাই বড় হয়ে ওঠে :

> *"যাঁর চোখ দিয়ে জগৎ দেখেন নীরুদা, তাঁর মতো অনুভূতির সূক্ষ্মতা যে অর্জন করে উঠতে পারেননি নীরুদা এটা ঠিক। তাই শ্লেষের সুরে বলেন, 'শুধু খেয়ে পরে, গাড়ি-বাড়ি করে নয়? অথচ চিরদিনই শুনে এসেছি সরস্বতীর সঙ্গে লক্ষ্মীর বিরোধ। মাইকেল পয়সার অভাবে বই বেচে খেয়েছেন, গোবিন্দদাস না কে যেন না খেয়ে মরেছেন! গানেও আছে, "হায় মা যাহারা তোমার ভক্ত, নিঃস্ব কী গো মা তারাই তত"! অথচ এখন?'*

এতক্ষণ কৌতুকের হাঁসি মুখে মাখিয়ে নিঃশব্দে এই আলাপ-আলোচনা শুনে যাচ্ছিলেন সনৎকাকা, এখন হঠাৎ একটু যোগ দিলেন। বললেন, 'আহা হবেই তো। এরা তো আর মা সরস্বতীর ভক্ত নয়, ভক্ত হচ্ছেন দুষ্টু সরস্বতীর, কাজেই লক্ষ্মীর সঙ্গে বিরোধ নেই। কী বলিস বকুল?'
'তাই মনে হচ্ছে—', অনামিকা হেসে ফেলে বলেন, 'কিন্তু যাই বলো নীরুদা, সরকারের অতবড় একটা দায়িত্বের জোয়াল কাঁধে নিয়েও যে তুমি "সাহিত্য" নিয়ে এত ভেবেছো, চর্চা রেখেছো, এটা আশ্চর্যি! এমন কী এত সব মুখস্থ-টুখস্থ রাখা—'
'চর্চা রাখতে দায় পড়েছে—', নীরুদা সিগারেটের ধোঁয়া উড়িয়ে অম্লান বদনে বলেন, 'তোর বৌদি বলে তাই শুনি। ও তো বলে—নাটক-নভেল গল্প-টল্প একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলে যদি দেশের কিছু উন্নতি হয়! জিনিসপত্রগুলো কি? কতকগুলো বানানো কথা মাত্র, তা ছাড়া আর কিছু? ওদের মেয়ে এদের ছেলের সঙ্গে প্রেম করল, নয়তো এর বৌ ওর সঙ্গে পালিয়ে গেল, এই তো ব্যাপার! এই নিয়েই ফেনিয়ে ফেনিয়ে ইনিয়ে বিনিয়ে সাতশো পাতার বই, কুড়ি টাকা দাম, দশটা এডিশন, একটা ক্লাস ওয়ান অফিসারের থেকে বেশি আয় আজকাল নামকরা লেখকের! রাবিশ!'"

সনৎকাকার সংলাপে 'দুষ্টু সরস্বতী' আর নীরুদার শেষ সংলাপে 'জিনিসপত্রগুলো' শব্দগুলো সাহিত্য অ্যান্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের সাংস্কৃতিক রাজনীতির গোপন স্বরূপটি প্রকাশ্যে এনে ফেলেছে। 'মাইকেল' আর 'গোবিন্দদাস'কে যদি সময়ের চিহ্নায়ক হিসেবে ধরে নিই, তাহলে দেখব আধুনিকতার বিবর্তনের পথটি কীভাবে পণ্যায়নের যুক্তিশৃঙ্খলায় অবক্ষয়ের চোরাবালির দিকে এগিয়ে গেছে, কীভাবেই বা বিকৃতকামিতা, যৌনতা ও পর্নোগ্রাফি সাহিত্যের মর্যাদা পেয়ে গেছে। সাহিত্য আর লেখালেখির মধ্যে যে-ব্যবধান, সেই ব্যবধানটুকু প্রতিষ্ঠান মুছে দিল কী না সে-প্রশ্নটাই এখানে আরও বড় হয়ে ওঠে। সনৎকাকার বাড়ি থেকে ট্যাক্সিতে করে নিজের বাড়িতে ফেরার সময় অনামিকা দেবীর আত্মসমালোচনাতেও সে-প্রশ্নটা বারবার ঘুরেফিরে এসেছে এরকমভাবে ·

"হয়তো অপম্রিয়মাণ সমাজজীবনের কিছু ছবি রয়ে গেল আমার খাতায়, কিন্তু যে সমাজজীবন বর্তমানের স্রোতে উত্তাল? মুহূর্তে মুহূর্তে যার রং বদলাচ্ছে, গড়ন বদলাচ্ছে? আমার অভিজ্ঞতায় কী ধরতে পারছি তাদের? না, পারছি না। তার কারণ, আজ আর সমাজের গোটা চেহারা নেই, সে খণ্ড ছিন্ন টুকরো টুকরো। সেই টুকরোগুলো অসমান তীক্ষ্ণ, তাতে যতটা ধার আছে ততটা ভার নেই। আর যেন ওই তীক্ষ্ণতাটা অদূর ভবিষ্যতে ভোঁতা হয়ে যাবার সূচনা বহন করছে। তবু এখন যারা সেটা ধরতে পারছে, তারা সমাজের সেই ধারালো টুকরোগুলো তুলে নিয়ে আর শান দিচ্ছে।

তা হলে কী কলমকে এবার ছুটি দেবেন অনামিকা?
বলবেন, তোমার ছুটোছুটি এবার শেষ হোক।
হয়তো অনামিকা দেবীর ভক্ত পাঠকের দল সেই অনুপস্থিতিতে হতাশ হবে, কিন্তু নতুন কিছু যদি তাদের দিতে না পারি, কী হবে পুরোনো কথাকে নতুন মোড়কে সাজিয়ে?

* * *

...সমাজে যখন যে পরিবেশ, তার খাঁজে খাঁজে ওই জীবনটাকে যেমন দেখতে পাওয়া যায়, সেটাই সাহিত্যের উপজীব্য। আজকের পরিবেশ যদি খাপছাড়া, পালছেঁড়া, হালভাঙা হয়, সাহিত্যই বা—

* * *

কিন্তু পরিবেশ সাহিত্যের ওপর জয়ী হবে, না সাহিত্য পরিবেশের উপর? সাহিত্যের ভূমিকা কী পরাজিতের?"

'সাহিত্য সমাজের দর্পণ'—বলে এতদিন যে-ধারণা ছিল তাকেই এখানে প্রশ্নে প্রশ্নে বিদ্ধ করা হয়েছে। সমাজ যা হতে পারত, বা অদূর কিংবা সুদূর ভবিষ্যতে যা হবে হয়তো, বা যা হওয়া উচিত সেদিকে ইঙ্গিত করা কি সাহিত্যিকতাব সীমানায় পড়ে না—এ প্রশ্নে আজকের এই বিমানবায়িত জিজ্ঞাসাহীন সময়ে পাঠকসত্তায় ঝড় না-উঠলেও লেখিকা অনামিকা দেবীর চিন্তার ভিতে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়। 'সাহিত্যের ভূমিকা কী পরাজিতের?' —এ প্রশ্ন বস্তুত আমাদেরও। অনামিকা দেবীর অন্তর্বৃত দ্বিরালাপে যে-প্রশ্নগুলো উঠে আসে তার আড়ালে যে-উত্তরের অনুপস্থিত উপস্থিতি ধরা পড়ে, তা থেকে সুবর্ণলতার লেখক-হয়ে-ওঠার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত হতেই দেখি। অর্থাৎ সাহিত্যের প্রতীকী বাস্তবতায় টুকরো মানুষের সমগ্রতার অনুভব জেগে থাকে, জেগে থাকে পচনশীল পরিবেশকে পাল্টে দিয়ে ক্রমশ সুস্থ সমাজ গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষাও। সেই আকাঙ্ক্ষা ও অনুভবেরই অপর নাম অনামিকা দেবী। পনেরো সংখ্যক অধ্যায়ে সনৎকাকার সঙ্গে দীর্ঘ কথোপকথনে তাই তিনি প্রতিষ্ঠানের সমালোচনা করতে পারেন এভাবে :

১। "যত দিন যাচ্ছে, ততই অনুভব করছি কাকা, গোটা তিনেক জিনিসকে অন্তত পরিকল্পনা করে গড়ে তোলা যায় না। সে তিনটে হচ্ছে—সমাজ, সাহিত্য এবং জীবন।"

২। "আগে তাই ধারণাই ছিল। ভাবতাম কলমটা তো লেখকের নিজের আয়ত্তে। কিন্তু ক্রমশই মনে হচ্ছে হয়তো ঠিক তা নয়। কোথাও কোনোখানে কারো একটি গভীর অভিপ্রায় আছে, সেই অভিপ্রায় অনুসারেই যা হবার হচ্ছে।"

৩। "সেকালেও মহা মহা কবিরা রাজসভার সভাকবি হতে পেলে কৃতার্থ হতেন। সেটাই তাঁদের পরম পাওয়ার মাপকাঠি ছিল। আর সেটা আশ্চর্যেরও নয়। পৃথিবীটা যেহেতু টাকার বশ, সেই হেতুই সব কিছুর মূল্য নির্ধারণ তো হয় ওই টাকার অঙ্ক দিয়েই? নিজের প্রতি আস্থা

আসারও তো ওইটাই মানদণ্ড। তার ওপর আবার সাহিত্য জিনিসটা আজকাল ধান চাল তুলো তিসির মতো ব্যবসার একটি বিশেষ উপকরণ হয়ে উঠেছে। অতএব লেখকরাও টাকার অঙ্ক দিয়ে নিজের মূল্য নিরূপণ করতে অভ্যস্ত হবেন এ আর বিচিত্র কী? আর যে লেখা বেশি টাকা আনবে, সেই রকম লেখাকেই কলমে আনবার চেষ্টা করাটাও অতি স্বাভাবিক।"

৪। "...সমাজের প্রতিটি স্তরের লোক অর্থাৎ প্রতিটি সুযোগ-সন্ধানীই লেখকের কলম ভাঙিয়ে খাচ্ছে। লেখকের কলমই তো বিজ্ঞাপনের বাহন। কাগজের সম্পাদকরা এখন আর 'লেখক' তৈরি করে তোলার দায়িত্বর ধার ধারেন না, ধার ধারেন শুধু সেই লেখকের যার লেখা থাকলে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন আসবে। অতএব প্রতিষ্ঠিত লেখকরা ক্রমশই তাঁদের ওই বিজ্ঞাপন সংগ্রহের কল হয়ে উঠছেন।"

প্রতিষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান-উৎপাদিত সাহিত্য, প্রতিষ্ঠানজাত পত্র-পত্রিকা ও সেই পত্র-পত্রিকার লেখকদের এই চাঁছাছোলা সমালোচনা আশাপূর্ণার কলমে উঠে এসেছে দেখে পাঠক অবশ্যই ঔপন্যাসিকের উদ্দেশে শ্রদ্ধায় অবনত হবেন। নান্দনিক পরিসরে সাংস্কৃতিক রাজনীতির নগ্ন চেহারা এখানে দিবালোকের মতো পরিষ্কার। তাহলে লেখিকা হিসেবে অনামিকা দেবী সেই "বিজ্ঞাপন সংগ্রহের কল হয়ে উঠেছেন" কী না সে-প্রশ্নটা পাঠক মনে আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। এখানে কবি জয় গোস্বামীর কবিতা সম্পর্কে অধ্যাপক ড. তপোধীব ভট্টাচার্যের মন্তব্যটি মনে পড়ে যায়, "জয় গোস্বামী তাই রুগ্ন সময়ের উপযোগী লিখন-প্রকরণে আধিক্লিষ্ট সেই সমাজের পাঠকৃতি তৈবি করেন যেখানে উন্মাদ নেতৃত্ব দেয় অন্ধজনের মিছিলে। অবক্ষয়ী আধুনিকতার এইটেই অন্তিম পর্ব, কারণ পিঠ ঠেকে গেছে দেওয়ালে, কেন্দ্রহীন অনুভূতি-পরম্পরা থেকে স্বপ্ন ও বিভ্রম, আসক্তি ও হিংস্রতা, শ্লেষ ও উদ্বেগের চলচ্ছবি ফুটে উঠছে তাই। পুঁজিবাদ-স্পৃষ্ট প্রতীচ্যে বিমানবায়নের স্তরে পরাবাস্তববাদী রেভের্ডো-চিরিকো-দালির ছবিতে ফুটে উঠেছিল 'Sadistic erotic spectacle' এবং 'theatrical impulse' · প্রতীচ্যায়িত ভারতীয় উপমহাদেশে একই গোত্রভুক্ত বিমানবায়ন জয়ের পাঠকৃতিতে ফিরিয়ে নিয়ে এল সেই প্রতিনন্দনকে।" (অবক্ষয়ী আধুনিকতা : পর্ব থেকে পর্বান্তরে, আধুনিকতা : পর্ব থেকে পর্বান্তর, ১ম প্রকাশ, জুলাই ১৯৯৫, পুস্তক বিপণি, কলকাতা—৭০০ ০০৯, পৃষ্ঠা—৫৩)। লেখিকা অনামিকা দেবীও 'আধিক্লিষ্ট সেই সমাজের পাঠকৃতি'ই কি শুধু রচনা করে গেছেন সারা জীবন, না কি বিকল্প চিন্তা ও বিকল্প জগতের ধারণা তাঁর মনে শেষ পর্যন্ত জেগে ছিল, সে-প্রশ্নের মীমাংসা এখানে জরুরি হয়ে ওঠে।

পাঁচ

মনে রাখা দরকার যে, আশাপূর্ণা দেবীর ত্রয়ী উপন্যাসের শেষটির নাম 'বকুলকথা'। অন্য কোনো নামও তো হতে পারত। হতে পারত 'চোরাবালি', হতে পারত 'অনামিকা', হতে

পারত 'জীবন যেরকম', হতে পারত অনেক কিছুই। 'চোরাবালি' হলে বুঝতে পারতাম অবক্ষয়ী আধুনিকতারই চিত্রাঙ্কন করা লেখিকার উদ্দেশ্য, 'অনামিকা' হলে বুঝতে পারতাম অবক্ষয়ী আধুনিকতার এই সময়ে লেখকের অবস্থা ও অবস্থান এই দুটি সত্তাকে পাচ্ছি— এক. লেখিকা কী সেটাই দেখাতে চেয়েছেন আশাপূর্ণা, 'জীবন যেরকম' হলে বুঝতে পারতাম এ তো আধুনিক জীবনেরই দর্পণ। কিন্তু তা নয়, পাঠকৃতিটির নাম 'বকুলকথা'। এখানে এক. অনামিকা দেবী, দুই. মানবী বকুল। এই দুটি সত্তার দ্বিরালাপে, ইতি ও নেতির দ্বন্দ্ব ও দ্বিবাচনে 'বকুলকথা' উপন্যাসটির পাঠকৃতি তাৎপর্যের ভিন্ন মাত্রায় পৌঁছে গেছে। তাই দৃশ্যমান উপস্থিতি ও অনুপস্থিত উপস্থিতির দ্বিরালাপকে বোধ ও চিন্তায় নিয়ে আসাই মনস্ক পাঠকের দায় হিসেবে এখানে বিবেচ্য হতে পারে।

'বকুল' ও 'অনামিকা' একই সত্তার দুটি রূপ হলেও যখন সে বকুল তখন সে কি 'অনামিকা' নয়, কিংবা যখন সে 'অনামিকা' তখনও সে কি 'বকুল' নয়? একজন পটলব্যাপারি যখন মঞ্চে রাজার অভিনয় করেন, তখন স্তানিস্লাভস্কির মতে, তাকে রাজাই হয়ে উঠতে হবে, সেই চরিত্রের সঙ্গে একাত্মবোধ করতে হবে। কিন্তু রাজার ভূমিকায় অভিনয় করার সময় তিনি কি ভুলে থাকতে পারেন যে, পরদিন সকালেই আবার তাঁকে পটল বিক্রি করতে বাজারে দোকান খুলে বসতেই হবে? এইমাত্র ভাত খেয়ে উঠার সঙ্গে সঙ্গেই কি আবার ভাত খাওয়ার সময়ে পৌঁছানোর প্রক্রিয়াটা শুরু হয়ে যায় না? ডায়ালেক্‌টিক্যাল মেটিরিয়ালিজম বা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদে বিশ্বাসী একজন লোক নিশ্চয়ই বলবেন, ক্ষুধানিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গেই আবার ক্ষুধা লাগার প্রক্রিয়াটাও শুরু হয়ে যায়। সেই সূত্র অনুসরণ করেই বলা যায়, স্তানিস্লাভস্কি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নাট্যতাত্ত্বিকদের অন্যতম হয়েও এই জায়গাটায় ভুল নির্দেশ দিয়েছেন, অর্থাৎ মঞ্চের রাজা অভিনয়কালেও অবচেতন মনে ভুলে থাকতে পারে না যে সে পটলব্যাপারি। যদি সে নিজের সত্তাটা ভুলে থাকে তাহলে মঞ্চের কোন জোনে দাঁড়িয়ে সে অভিনয় করবে, কোন জোনে গিয়ে সে লাল কিংবা নীল স্পট লাইটের আলোটি মুখে নেবে, কিংবা আদৌ কোনো আলো তার মুখে পড়ছে কি না, কি করে তা মনে রাখবে বা বুঝবে? তাই বকুল যখন বকুল তখনও সে অনামিকা, আর যখন অনামিকা তখনও সে বকুলই। আর উপন্যাসটি তো বকুলেরই কথা যার নাম 'বকুলকথা'। অর্থাৎ বকুলের মানবী সত্তারই বিশ্লেষণ যার চারদিকে ঘিরে-থাকা অসংখ্য অপর সত্তা তার সত্তাকে গড়ে তুলেছে বা অপর সত্তাদের মুকুরেই সে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। বকুলের অনামিকা হয়ে-ওঠার মধ্যে সুবর্ণলতার স্বপ্ন সার্থক হয়েছে নিঃসন্দেহে, কিন্তু পারিবারিক সম্পর্কের বৃত্তে সে তো বকুলও থেকে গেছে। মানবিক সম্পর্কের বন্ধনকে অস্বীকার করে সে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন একক সত্তা হয়ে ওঠেনি। পারিবারিক সমস্ত সুখ-দুঃখ-সমস্যার সঙ্গে সে নিজেকে জড়িয়ে নিয়েছে এবং সে-সমস্যাগুলোর সমাধানেরও চেষ্টা করেছে। পনেরো সংখ্যক অধ্যায়ে লেখিকা হিসেবে সে সনৎকাকাকে জানিয়েছে :

> *"'নিভৃত চিন্তায় নিমগ্ন হবার গভীর আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়ে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে বেড়াচ্ছে সবাই।'"*

এখানে সনৎকাকা যখন প্রশ্ন করেন যে অনামিকারও অবস্থা সে-রকম কি না, তখন

অনামিকা সে-প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে গিয়ে বলে :

> *"'আমার কথা বাদ দিন।' অনামিকা বলে ওঠেন, 'লিখলেই "সাহিত্যিক" হয় না। নিজেকে অন্তত আমি "সাহিত্যিক" শব্দটার অধিকারী ভাবিও না।'..."*

এখানে লেখিকা হিসেবে অনামিকার মনের সংকটটাকে চিনতে আমাদের ভুল হয় না। সনৎকাকার প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যাবার মধ্যে এটাই প্রমাণিত হয় যে, 'নিভৃত চিন্তায় নিমগ্ন হবার গভীর আনন্দ' পাবার আকাঙ্ক্ষাটি তার মনোভূমি থেকে একেবারেই বিদেয় নেয়নি। এই আকাঙ্ক্ষার জেগে থাকাটাই তো অনামিকাকে প্রতিষ্ঠানের আগ্রাসন থেকে নিজেকে বাঁচাবার প্রেরণা দিয়ে যায়। সর্বত্রব্যাপ্ত অন্ধকারবলয়ে আলোর আভাস জাগিয়ে তোলে। যদিও শেষ অধ্যায়ে কথকস্বর জানায় :

> *"অতএব মস্ত লেখিকা অনামিকা দেবী এখনো কোনো কোনো দিন, যেদিন জীবনের সব কিছু নেহাৎ অর্থহীন লাগে, ছেলেমানুষের মতো রাত্রির আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রকে খোঁজেন, আর আরো ছেলেমানুষের মতো অসহায় গলায় বলেন, দেখো, যে লেখা আগামী কালই জলের আলপনার মতো মিলিয়ে যাবে, সেই লেখাই লিখলাম জীবনভোর,—শুধু বকুলের কথাটা আর লেখা হল না...তোমার আর বকুলের কথা।"*

তবু সেই দীর্ঘশ্বাসের আড়ালে তো আমরা তথাকথিত আধুনিকতার বিকার ও সংক্রমণ, প্রাতিষ্ঠানিক আধিপত্য ও প্রলোভনকে অতিক্রম করে গিয়ে মানবিকতার প্রতিবেদনকেই বড় হয়ে উঠতে দেখি। সিনেমার রুপোলি পর্দায় এ দৃশ্যকে ধরতে হলে নির্দেশক হয়তো সমস্ত ক্যান্ভাস জুড়ে বকুলের মুখটাকেই ক্লোজ আপ-এ বড় করে দেখাতেন যেরকম তপন সিংহ 'সাগিনা মাহাতো' সিনেমার শেষ দৃশ্যে সাগিনাকে দেখিয়েছিলেন। লেখিকা অনামিকা দেবী অন্তরে মানবিক সমগ্রতাবোধের আলোকমালায় সজ্জিত হয়ে এভাবেই বকুল হয়ে ওঠেন, লেখিকার খোলস থেকে বেরিয়ে আসে এক সমগ্র মানুষ। শুধু তাই নয়, নারীবাদী চেতনাও তার মধ্যে রয়েছে। তার ভাবনার সমুদ্রকে তাই উদ্বেলিত হতে দেখি প্রশ্নে-প্রতিপ্রশ্নে ও বিস্ময়ে :

> *"এ একটা অদ্ভুত জীবন তাঁর, 'না ঘরকা না ঘাটকা!' এ সংসারে আছেন, কিন্তু এর সঙ্গে যেন সম্যক যোগ নেই। যেহেতু যথারীতি অন্য সংসারে গিয়ে প্রতিষ্ঠিত হননি, সেইহেতু অনামিকা যেন একটা বাড়তি বস্তুর মতো এখানে চেপে বসে আছেন। আজন্মের জায়গা, তবু জন্মগত অধিকারটুকু কখন যে চলে যায়। মেয়েদের জীবনে এ একটা ভয়ংকর কৌতুক।*
>
> *আচ্ছা, বাড়ির কোনো ছেলে যদি অবিবাহিত থাকে, এমন তো অনেকেই থাকে, আর কী এই রকম কেন্দ্রচ্যুত হয়ে 'বাড়তি'তে পরিণত হয়?" (২০ অধ্যায়)*

প্রান্তিকায়িত নারীসত্তার এই প্রশ্ন খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। 'কেউ নারী হয়ে জন্মায় না, সমাজই তাকে নারী করে তোলে'—এই সত্যটি যে বহুকালের সমাজতাত্ত্বিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রমাণিত, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। শারীরিক গঠনের ভিন্নতা সত্ত্বেও নারী ও পুরুষ উভয়েই যে মনুষ্য-প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত, সে-কথাটা ভুলে যায় পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্যবাদী সমাজ। নারী কি সত্যিই 'Second Sex'—এ প্রশ্নটি যেন আরও জোরালো হয়ে ওঠে তখন। তার অধিকার, তার স্বাধীনতা, তার নিজস্ব অনুভব, নিজস্ব চিন্তাকে প্রাধান্য দিয়ে সহযোগী সত্তা হিসেবে নারীকে কি মানবী হয়ে উঠতে দিয়েছে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ—এসব প্রশ্নই তো উঠে আসে প্রতিবাদী মানবীচেতনার নিভৃততম প্রদেশ থেকে। অনামিকা দেবীর মনেও তো একই প্রশ্ন জেগেছে। যে-চেতনা থেকে উপর্যুক্ত উদ্ধৃতির শেষাংশে ওই প্রশ্ন উঠে, আসে তা নিঃসন্দেহে মানবীচেতনা। অনামিকা দেবী তাই লেখিকা হিসেবে মানবীচেতনাবাদের চিন্তাপ্রস্থানে আলোকিত প্রতিবাদী দীপশিখা। এই অনামিকা দেবী যখন শম্পা-সত্যবানকে যথাযোগ্য মর্যাদায় বাড়িতে বরণ করে নিয়ে আসতে শম্পার মা-বাবাকে পরামর্শ দেন, তখন তাঁর মানবীচেতনা সহ মানবিক মূল্যবোধের স্বীকৃতি প্রদানের তীব্র আকাঙ্ক্ষাটাই পরিষ্কার হয়ে যায়। আর সেই সঙ্গে আমরাও সেই বোধে উত্তীর্ণ হয়ে যাই—

> *"সেই ইচ্ছা সঙ্ঘ নয় শক্তি নয় কর্মীদের সুধীদের বিবর্ণতা নয়,*
> *আর আলো : মানুষের তরে এক মানুষীর গভীর হৃদয়।"*
>
> *(সুরঞ্জনা : বনলতা সেন)*

সেই আলোতেই 'প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে' বকুল অন্ধকারের বন্দিশালাকে ভেঙে দেয়। সে তাই সুবর্ণলতার সার্থক উত্তরসূরি। 'বকুলকথা' নামকরণও এখানেই যথার্থতা লাভ করেছে।

ছয়

চারদিকে ঘিরে-থাকা অসংখ্য অপর সত্তার আরশিতে যেমন আমরা বকুলকে দেখেছি, তেমনি বকুলের দর্পণেও আমরা অসংখ্য অপরকে দেখেছি। দেখেছি যুগবাহিত অন্ধকার কীভাবে পরবর্তী সময়ে তার ছায়া ও মায়া বিস্তার করে, কীভাবে অবভাসকেই আধুনিকতা বলে ভ্রম হয়। কিন্তু এর মধ্যেও থাকে সময়ের দ্বন্দ্ব এবং এই দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে 'কালের যাত্রা'-র দুর্নিবার গতি। গতি ও স্থিতির টানা ও পোড়েনে দ্বন্দ্বমুখর এই পাঠকৃতিতে স্থিতাবস্থার বিরুদ্ধে বারবার প্রতিবাদী কণ্ঠ ধ্বনিত হয়ে উঠতে দেখি, দেখি আর্থ-সামাজিক বন্দিশালার লৌহকপাট ভাঙার দুর্মর প্রচেষ্টাও। গড্ডলিকা প্রবাহের প্রতিস্রোতে প্রতিস্পর্ধী মানবসমাজ কোন পথে এগিয়ে গেলে মুক্তির সীমাহীন দিগন্তকে স্পর্শ করবে, তারও ইঙ্গিত পাই পাঠকৃতিটিতে ধৃত বাচনের কোষে কোষে। শ্রেণিবিভক্ত সমাজে শোষিত মানুষের ঐক্য ও প্রতিবাদই সামাজিক প্রগতির চালিকা শক্তি এবং এপথেই মানুষের চিন্তায়, বোধে ও মননে প্রকৃত আধুনিকতা আসে—এই বার্তাটুকুই যেন 'বকুলকথা' উপন্যাস থেকে উঠে আসে। এখানেই আধিপত্যবাদীদের সংকট, যে-সংকটকে অতিক্রম করে যেতে তারা আধুনিকোত্তরবাদের জন্ম দেয়। উপন্যাসটিতে ধৃত পূর্বোক্ত স্থিতি ও গতির টানা ও পোড়েনের প্রেক্ষাপটে রয়েছে যে-আর্থ-রাজনৈতিক পরিসর এবং তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে

যে-সময়ের দ্বন্দ্ব, এখানে তার পরিচয় দেওয়া যেতে পারে।

কুড়ি সংখ্যক অধ্যায়ে সত্যবান কলকাতায় ফিরে গিয়ে দেখতে পায় :

"...যে আগুন অনেক দিন থেকে ভিতরে ভিতরে ধোঁয়াচ্ছিল, সে আগুন জ্বলে উঠেছে। ফ্যাক্টরীতে লক্ আউট, মালিকপক্ষ অনমনীয়। ওদিকে ইউনিয়নের পাণ্ডারাও ততোধিক অনমনীয়, অতএব আকাশ-ফাটানো চিৎকারে গলাফাটানো চলছে ফ্যাক্টরীকে ঘিরে, সকাল সন্ধ্যে দুপুর।

সেই এক ধ্বনি, 'চলবে না, চলবে না।'

* * *

'রক্তের বদলে রক্ত চাই।
খুনের বদলে লাল খুন!
জুলুমবাজি বন্ধ করো—
নিপাত যাও, নিপাত যাও!'

গাড়িটা মোড় ঘুরতেই হঠাৎ যেন সমুদ্র গর্জে উঠল। থেমে পড়লো গাড়ি।"

রাস্তার এক ধার থেকে অন্য ধারে যাচ্ছে ওরা, একবার দম ফেলতে-না-ফেলতে আবার গর্জন করে উঠছে।"

এই তো শোষকের বিরুদ্ধে শোষিত মানুষের লড়াই-র চিত্র। এ লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই তো মানুষের সমাজ-সভ্যতা অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যায়। মানবসভ্যতার ইতিহাসটাকে যদি আমরা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের মাপকাঠিতে বিশ্লেষণ করি, তাহলে তো দেখব এই ইতিহাসটি আসলে শ্রেণিসংগ্রামেরই ইতিহাস। এই শ্রেণিসংগ্রামের ইতিহাসটিকে ঝাপ্‌সা করে দিতে চায় আমদানিকৃত আধুনিকতা। উত্তরায়ণবাদী চেতনা সেই ইতিহাসকেই তুলে ধরতে চায়, সঞ্চারিত করতে চায় প্রতিস্পর্ধী চেতনার কোষে কোষে। আধিপত্যবাদীদের সাংস্কৃতিক রাজনীতি যেখানে আধুনিকতার অবভাস তৈরি করতে-করতে এগোয়, উত্তরণ ও প্রগতিকামী মানুষ সেই অবভাসেরই বুক চিরে প্রকৃত-আধুনিকতাকে জীবন ও মননের কেন্দ্রে ফিরিয়ে আনতে চায়। এই টানা ও পোড়েনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ঐ অধ্যায়েই অনামিকা দেবীকে একটি জীবনসত্য উচ্চারণ করতে শুনি :

"কেউ কাউকে কিছু দেয় না, বুঝলেন? সে প্রত্যাশা করাই অন্যায়। নিজের জীবনের মূলধন নিজেই সংগ্রহ করতে হয়।"

অধিকার যে ছিনিয়ে নিতে হয়, এই সত্যটুকু পরবর্তী প্রজন্মের চেতনাযও চারিত হয়ে যেতে দেখি উপন্যাসটিতে। বাইশ সংখ্যক অধ্যায়ে বকুলের সঙ্গে কথোপকথনে মাধুরীর সংলাপে তা স্পষ্ট :

"ছেলেদের (পল্টু ও বুবুন) মুখে পাকা কথা শুনে হাসি পেত।" বলতো, "এই বুর্জোয়া সমাজের মৃত্যুদিন আসছে, ওরা নিজেরাই নিজেদের

কবর রচনা করেছে, নিজেদের চিতা বানিয়েছে।" ...বলতো, "বিপ্লব আসছে, তাকে রোখবার ক্ষমতা অতি বড় শাসকেরও নেই।" আর কত কীই বলতো ভাই দুজনে ওদের দালানে বসে। "চোখে ঠুলি বেঁধে বসে থাকলেই কড়া রোদকে অস্বীকার করা যায় না, রোদ তার নিজের কাজ করে, চামড়া পোড়ায়।"

* * *

বুবুন ইস্কুলে যায় না, ইস্কুলের মাইনেটা নিয়ে পার্টিতে চাঁদা দেয় ... বোমা তৈরিতে যোগ দেয়।"

বোমা তৈরিতে যোগ দেওয়াটা হয়তো কারো কারো দৃষ্টিতে হঠকারী বলেই মনে হতে পারে, তবু এটা তো সত্য যে, শ্রেণির ধারণা, শ্রেণিসংগ্রামের ইতিহাস সম্পর্কে বস্তুবাদী প্রত্যয়, বিপ্লবের মাধ্যমে শোষণহীন ও শ্রেণিহীন সমাজ-প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন এ-প্রজন্মের চেতনাকে রাঙিয়েছে। এ প্রসঙ্গে 'ভাঙা-গড়ার সত্তর দশক'-এর কথা মনে পড়ে যেতে বাধ্য। নক্‌শাল আন্দোলনের ভুল-শুদ্ধ, সাফল্য-ব্যর্থতা নিয়ে কিংবা সে-আন্দোলন বিপ্লবকে পিছিয়ে দিল কী না সে-বিষয়ে তর্ক চলতে পারে, কিন্তু ভারতীয় রাজনীতির ফাঁক ও ফাঁকিটা ঠিক কোথায় সেটি ধরিয়ে দিতে পেরেছিল এই আন্দোলন। 'বন্দুকের নল ক্ষমতার উৎস'—এ কথাটা কোথায়, কখন, কোন অবস্থায় প্রযোজ্য, সে তর্কে না-গিয়েও বলা যায়, শ্রেণিদ্বন্দ্বের মাধ্যমেই আর্থ-সামাজিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন সম্ভব—এই চেতনায় উত্তীর্ণ হওয়াটাই কম প্রগতির লক্ষণ নয়। এই সময়ের প্রতীক বুবুন ও পল্টুর মাধ্যমে সেই দ্বন্দ্বমুখর 'রক্তে ধোয়া দিন'-এর দ্বান্দ্বিক মাত্রাটিকে চিনে নিতে পারে যে-কালচেতনা, সেটাই তো প্রকৃত অর্থে আধুনিক। এই সময়বোধ উপন্যাসের পাঠকৃতিতে ভিন্ন মাত্রা এনে দিয়েছে, তা বলাই বাহুল্য।

ভাবাদর্শ ও মূল্যবোধগত অবস্থান থেকে দ্বন্দ্বগর্ভ সময়ের নির্মোহ ও বিশ্লেষণাত্মক উপস্থাপনা যদি হয় প্রতিবেদনের সংজ্ঞা, তা হলে আশাপূর্ণা দেবীর 'বকুলকথা' উপন্যাসটি সত্যিকার অর্থে একটি প্রতিবেদন। আধুনিকতার অবভাস ও প্রকৃত-আধুনিকতার মধ্যে পার্থক্যটা ঠিক কোথায়, উপন্যাসটির পাঠ সমাপ্ত করার পর পাঠক তা উপলব্ধি করতে পারেন। তাই 'বকুলকথা' উপন্যাসটিকে বহু স্তরে বিন্যস্ত আধুনিকতার সমালোচনা-প্রকল্প বললে ভুল বলা হবে না। বরং এটিই পাঠকৃতিটির প্রকৃত অবয়ব।

ঋণ স্বীকার

১. আধুনিকতা : পর্ব থেকে পর্বান্তর—তপোধীর ভট্টাচার্য।
২. বাখতিন : তত্ত্ব ও প্রয়োগ—তপোধীর ভট্টাচার্য।
৩. জীবনানন্দ : কবিতার সংকেতবিশ্ব—তপোধীর ভট্টাচার্য।
৪. প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব—তপোধীর ভট্টাচার্য।

পিতৃতন্ত্রের প্রতি উচ্চারিত জিজ্ঞাসা
আশাপূর্ণা দেবীর দুটি গল্প

নন্দিতা বসু

আশাপূর্ণা দেবীকে (জন্ম ১৯০৯) বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের খাঁটি/নিখুঁত কথাশিল্পী বলা হয়। পঞ্চাশ বছর ধরে অক্লান্তভাবে তিনি লিখে গেছেন। মধ্যবিত্ত জীবনের ছোটসুখ আর ছোট দুঃখের সরু ও মোটা সুতোর টানা আর পোড়েনে বোনা অসংখ্য কাহিনি, যে কাহিনি বাঙালি জীবনের একটি আন্তরিক পরিচয় দেয়। তাঁর ভঙ্গির মধ্যে অনেক সময়ই লুকিয়ে থাকে এক কৌতুক, এক সমবেদনা যে সমবেদনা দিয়ে অনেক দূর থেকে জীবনের ছোট খাঁজগুলিতে তিনি আলো ফেলেন, দেখিয়ে দেন কোন তুচ্ছগুলি উচ্চ হয়ে আমাদের জীবনে আবর্তের সৃষ্টি করেছে।

আশাপূর্ণা দেবীর রচনার আরেকটি বৈশিষ্ট্য : তাঁর অনেক গল্পের কেন্দ্রে দেখি কিছু নারীচরিত্র, অনেক সময়েই, বার্ধক্যপীড়িতা বৈধব্যপীড়িতা তারা, দেখার কেউ নেই, তারা পরিবারের প্রান্তে অপসৃত হয়েছেন। তাদের অবলম্বনহীন অসহায় অবস্থাটি বেশ কয়েকটি গল্পে তুলে ধরা হয়েছে। বর্তমান আলোচনায় আশাপূর্ণার দুটি গল্প 'দত্তাপহারক' এবং 'নদীর চরে' বেছে নিয়েছি যে-গল্প দুটির কেন্দ্রে দুজন বিধবা নারী রয়েছেন। এই গল্প দুটির মধ্য দিয়ে আমরা দেখবার চেষ্টা করব কীভাবে আশাপূর্ণা শেষ পর্যন্ত পিতৃতান্ত্রিক সমাজকে প্রশ্ন করেন না, এই সমাজের মধ্যেই সামঞ্জস্য ঘটিয়ে একে বজায় রাখতে চান। মনে রাখতে হবে আমাদের এই বিশ্লেষণ বিশেষভাবে আমাদের আলোচ্য দুটি গল্প সম্পর্কেই প্রযোজ্য, আশাপূর্ণার সমস্ত রচনা সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়।

বলাই বাহুল্য 'দত্তাপহারক' এবং 'নদীর চরে' গল্প দুটিই বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে ব্যাখ্যা করা চলে।[১] কিন্তু আমরা পিতৃতান্ত্রিকতার সঙ্গে গল্পগুলিকে যুক্ত করেছি এই কারণেই যে 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' রচনাত্রয়ী এবং আর বেশ কিছু রচনা আশাপূর্ণা দেবীকে যে সাহিত্যখ্যাতি এনে দিয়েছে তাতে নারীমুক্তিবাদী লেখিকা হিসাবে তিনি সর্বভারতীয় খ্যাতি অর্জন করেছেন। পিতৃতন্ত্র এবং নারীমুক্তির সম্পর্ক দুই মেরুর সম্পর্ক।[২] যিনি নারীমুক্তির প্রবক্তা তিনি কিছুতেই পিতৃতন্ত্রের সমর্থক হতে পারেন না।

আলোচনায় প্রবেশের আগে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের কাঠামো সম্বন্ধে আমাদের ধারণাটি স্পষ্ট করে নিতে চাই। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পুরুষই সমাজের কর্তা। ঐ সমাজের সমস্ত মূল্যবোধই পুরুষের প্রতি পক্ষপাতিত্বপূর্ণ। পুরুষের চেয়ে নারীর অধিকার বেশি, জ্ঞান, শৌর্য, বীর্য সবই পুরুষদের অনেক বেশি। তার তুলনায় নারীরা শারীরিকভাবে তো বটেই, মানসিকভাবেও দুর্বল। জ্ঞান, বুদ্ধি সবই তার পুরুষের তুলনায় কম। যদি বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারীর ধৈর্য, মানবিকতা ও তিতিক্ষা ইত্যাদির প্রশংসা করা হয় সেটাও নির্ধারিত হয় পিতৃতন্ত্রের মাপকাঠিতে, পিতৃতন্ত্রের পক্ষে নারীর ঐ গুণগুলি কতটা কাজে লাগল তার ওপর, এবং ঐ ধৈর্য, তিতিক্ষা, মানবিকতা সবই শৌর্য, জ্ঞান ও বুদ্ধি থেকে নিম্নশ্রেণির গুণ। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ পুরুষ ও নারীর মধ্যে এই স্তরভেদ সৃষ্টি করেছে।

পিতৃতান্ত্রিক সমাজে এই মূল্যবোধও বলবৎ যে পুরুষরা নারীর তুলনায় অনেক বেশি উদার। পরিবারের শত্রুতা, তুচ্ছতা তাদের চোখে পড়ে না, যেটা একচেটিয়া মেয়েদেরই। ভাঁড়ারঘর আর রান্নাঘরের অধিকার নিয়েই মেয়েরা একে অন্যের সঙ্গে লাঠালাঠি করছে। আসলে পুরুষের দাসী তাঁরা সকলেই, কে কত বেশি পরিমাণে কর্তাপুরুষের নৈকট্যে যেতে পারছে, ফলে ক্ষমতার ছিটেফোঁটা অংশে ভাগ বসাতে পারছে তা নিয়েই মেয়েদের পরস্পরের মধ্যে লড়াই।

পিতৃতান্ত্রিক সমাজে এভাবেই সুপরিকল্পিতভাবে মেয়েদের অবমূল্যায়ন করা হয়েছে। তারা কলহপরায়ণ, নীচ, স্বার্থপর, ষড়যন্ত্রনিপুণ। বৃহৎ কিছুর প্রতি তাদের কোনো আকর্ষণ নেই। বড় কিছু প্রাপ্তির প্রতি তাদের কোনো আকাঙ্ক্ষাও নেই, কাজেই তারা বড় কিছুর যোগ্য কী না সে প্রশ্নই ওঠে না।

পিতৃতান্ত্রিক সমাজ এই আবহাওয়াটা তৈরি করে রাখে যে মেয়েরাই পুরুষের উপরে নির্ভরশীল। কখনো এটা জোর দিয়ে স্পষ্ট করা হয় না যে পুরুষরাও মেয়েদের উপর মৌলিকভাবেই নির্ভরশীল। এই সমাজ মেয়েদের ত্রুটিবিচ্যুতিগুলি যে তীক্ষ্ণ নজরে বিচার করে, পুরুষদের ত্রুটিবিচ্যুতিগুলি সম্পর্কে এ সমাজ অনেক বেশি সহানুভূতিশীল। পুরুষেরা মেয়েদের ক্ষমতার দ্বন্দ্বকে বুঝতে পারে না। সংসারের খুঁটিনাটি কাজ তারা করে উঠতে পারে না। 'আচ্ছা বেচারা' এই ক্ষমামিশ্রিত দৃষ্টি দিয়েই ওদের বিচার করা হয়।

পিতৃতান্ত্রিক সমাজের আরেকটা বৈশিষ্ট্য এই যে এই সমাজের মেয়েদের এই মূল্যবোধে অভ্যস্ত করানো হয় যে স্বামীর গৃহেই মেয়েদের সবচেয়ে বেশি সুখ, সেটাই মেয়েদের একমাত্র চাইবার বস্তু। স্বামীর সংসারে অথবা পুত্র, পিতা বা ভাইয়ের সংসারে যে যত খাটতে পারে সে-ই তত আদর্শ নারী।

পিতৃতান্ত্রিক সমাজ কখনো নারীদের একত্র হতে দেয় না, তাদের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি করে তাদের ঐক্য ভেঙে দেয়। অথবা নারীদের মধ্যে এমন একটি অশুভ আঁতাত তৈরি করে যা নারীমুক্তির বিরোধী এবং পিতৃতন্ত্রের ধারক ও বাহক।

এই কাঠামোর মধ্যে 'দত্তাপহারক' এবং 'নদীর চরে' গল্পদুটির বিচার করা যাক। প্রথম গল্পে বিধবা সরোজবাসিনীর বাবা মৃত্যুকালে বসতবাড়ি মেয়েকে উইল করে দিয়ে অবলম্বনহীনা মেয়েকে স্বাবলম্বী করে গেছেন। অর্থাৎ গল্পে উল্লিখিত একজন পুরুষ বিগতযুগের হয়েও অনেক বেশি দূরদর্শী এবং বিবেচক। গল্পের জীবিত চরিত্রদের মধ্যে সরোজবাসিনীর ভাইপো বিনয়ই একমাত্র সরোজবাসিনীর প্রতি সহৃদয় দৃষ্টিসম্পন্ন। বিনয়ই তার মেয়েদের বলে ঠাকুমার প্রতি মনোযোগী হতে। গল্পে বিনয়েব ভাবনার মধ্য দিয়েই জানানো হয়েছে যে ডাক্তারের দোষে সরোজবাসিনীর চোখ গেছে, মন-বুদ্ধি ঠিকই আছে। তাই জগতের প্রতি তাঁর আকর্ষণ কমে যায়নি। বিনয়ই সরোজবাসিনীর কাছে বসে, শরীরের কথা জিজ্ঞেস করে, খবরের কাগজে পড়া নতুন খবর শোনায়।

বিনয়ের স্ত্রী প্রতিমা, বিনয়ের মেযে লীলা, নীলা, রমলা, সরোজবাসিনীর বোনঝি বীণা বিভিন্ন কারণে সরোজবাসিনীর প্রতি সহৃদয় নয়। প্রতিমার অধৈর্যের কারণ "যতদিন চোখ ছিল সব তো মুঠোয় রেখেছিলে, চোখ এড়িয়ে এতটুকু কিছু করার জো ছিল না। এখন চোখ

গেছে, তবু স্বভাব যায় না। কি,, কেন, কখন, কে কোথায়-এর উত্তর দিতে দিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত। কত আর মান্য করা যায় গুরুজন বলে। নেহাৎ বাড়িটা কারো নামে দানপত্র করে বসে কিনা।"[৩]

মাংসরান্নার গন্ধ নাকে এলে সরোজবাসিনী যখন জিজ্ঞেস করেন কেউ নিমন্ত্রণে আসছে কিনা, 'নাতনি লীলা উত্তর দেয় কেন লোক ডেকে এনে না খাওয়ালে আর মাংস চড়াতে নেই? আমরা খেতে জানি না? সব তাতে অত জিজ্ঞেস ভালো লাগে না।.. রাজ্যির লোককে ডেকে খাইয়ে তোমার ভাইপোর সর্বস্ব উড়িয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছি না আমরা।" কিন্তু তবু সরোজবাসিনী টের পান যে লীলাদের দুই মামা এল, খেল, গল্প করল, চলে গেল। মনের ঘেন্নায় চুপ করে যান সরোজবাসিনী।

এই অংশটিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা কী পাই? সরোজবাসিনীর প্রশ্নটা নিছক একটা কৌতূহল নয়, এর মধ্যে অতীত ইতিহাসের একটা চাপ আছে। লীলাদের মামারা আসবে, মাংস খাবে সেটা লীলা যখন নির্ভয়ে সরোজবাসিনীকে জানাতে পারছে না তখন নিশ্চয় এর প্রতি সরোজবাসিনীর কোনো প্রতিরোধ আছে। এমন কেউ খাবে যে নাকি বৌমার বাপের বাড়ির লোক, যারা পিতৃতান্ত্রিক সমাজের নিয়মেই সরোজবাসিনীর প্রতিপক্ষের লোক। তাদের সঙ্গে সরোজবাসিনীর ক্ষমতার একটা দ্বন্দ্ব আছেই। কী নিয়ে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব? না পরিবারের কর্তাপুরুষ বিনয়ের সঙ্গে অপেক্ষাকৃত নৈকট্য কে দখল করে আছে? বিধবা পিসি না বিনয়ের স্ত্রীকন্যারা? 'রাজ্যির লোককে ডেকে খাইয়ে তোমার ভাইপোর সর্বস্ব উড়িয়ে পুড়িয়ে" দেওয়ার সম্ভাবনা প্রাধান্য পায় এখানেই। বাড়ির কর্তা বিনয়ের স্বার্থ যে শুধু সরোজবাসিনী দেখছেন না, লীলা রমলাও দেখছে, ঝাঁঝালো উত্তরের মাধ্যমে, লীলা সেটা প্রতিষ্ঠা করে দেয়। মনের ঘেন্নায় সরোজবাসিনী চুপ করে যান। ঘেন্না এই কারণেই যে পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠা হিসাবে যে-সম্মান তাঁর প্রাপ্য ছিল সেটা তিনি পাননি। ঘেন্না শুধু লীলা তার কাছ থেকে সত্য গোপন করল বলে নয়, বৌমার ভাইয়েরাও তাঁর প্রতি আনুগত্যের কোনো নিদর্শন দেখাল না-বলে। বিনয়ের পিসি তিনি, ছেলেপক্ষ মেয়েপক্ষের স্তরভেদে তাঁর স্থান উঁচুতে। সেটা স্বীকার না-করা মানে সরোজবাসিনীকে সম্মানের আসন থেকে টেনে নামানো। বেড়াতে এসে বোনঝি বীণারও তার সঙ্গে দেখা না-করা একইভাবে সরোজবাসিনীর অবমাননা। দাদামশাই যে বীণাদের বঞ্চিত করে একমাত্র মাসিকে বাড়ির উত্তরাধিকার দিয়ে গেলেন এই কারণেই মাসি সরোজবাসিনীর উপর বীণার রাগ।

গল্পের শেষে মেয়েদের অশুভ আঁতাতে সরোজবাসিনী যে পরিবারের অন্য মেয়েদের কাছে ক্ষমতার সম্পর্কে হেরে যান তাতে তাঁর প্রতি পাঠকের একধরনের করুণা জাগে, যেটা দুর্বল, অক্ষম, অশক্তকে মার খেতে দেখলে জাগা স্বাভাবিক কিন্তু বাকি মেয়েদের থেকে তিনি উন্নত চরিত্রের এটা ভাবার কারণ নেই। কারণ যতদিন তাঁর চোখ ছিল, সংসারের প্রতি ক্ষেত্রে তীক্ষ্ণ নজর রেখে আধিপত্য তিনি বিস্তার করেছেন। এখন চোখ গেছে তাই অন্যকে জিজ্ঞাসা করে পারিবারিক তথ্যগুলি সংগ্রহ করতে চান। এটা কোনো নির্দোষ কৌতূহল নয়। পরিবারের উপর ক্ষমতা বলবৎ রাখার উপায় এই তথ্যগুলি। সরোজবাসিনী যেটা'কে

গোয়েন্দাগিরির পর্যায়ে নিয়ে গেছেন। এই কারণেই 'হাতধরা' বুড়ির পর্যায়ে যেতে চান না তিনি। গল্পে চোখ-কে এক ক্ষমতা রক্ষার প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। আজকাল কোনো কোনো সমাজবিজ্ঞানী এই জাতীয় নজরদারি করাকে অবদমনের আরেকটি ঐতিহাসিক কৌশল হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। শারীরিক প্রহারের দ্বারা শাসন না-করে শাসিতকে সর্বক্ষণ দৃষ্টির সামনে রেখে অবদমিত রাখার কথা সমাজবিজ্ঞানে আজ নানাভাবে আলোচিত হচ্ছে। অর্থাৎ সর্বক্ষণ নজরবন্দি করে শাসনের দ্বারা ক্ষমতাকে প্রয়োগ করার কথা বলা হচ্ছে।

সরোজবাসিনী যদি স্বনির্ধারিত জায়গায় বসেন তা হলে বাড়িতে কোথায় কী হচ্ছে প্রতিমা-লীলাদের বেফাঁস মন্তব্যে তা জেনে যাবার আশা থাকে। গল্পের আয়োজন যদিও সরোজবাসিনীকে একজন Victim হিসাবে দেখানো, কিন্তু ক্ষমতার দ্বন্দ্বে গল্পের অন্যান্য নারী চরিত্র থেকে সরোজবাসিনী কিছু ভিন্নগোত্রীয় নন। পড়াশোনার প্রতি তাঁর আগ্রহের উল্লেখ গল্পে আছে, চোখ নেই বলে পড়াশোনা করতে পারেন না সেজন্য খেদের উল্লেখ-ও আছে কিন্তু এই অবস্থা থেকে উত্তরণের কোনো চেষ্টা নেই। সব মানুষই নিজের বৃত্ত থেকে বেরিয়ে একরকম মুক্তি পায়। জ্ঞানের চর্চা, সমাজসেবা, বা বৃদ্ধ বয়সে আধ্যাত্মিক জ্ঞানও মানুষকে একরকম মুক্তি দিতে পারে, যার সাহায্যে সে গণ্ডিবদ্ধ জীবন থেকে বাইরে বেরোতে পারে। সরোজবাসিনীর যে-জীবন তাতে সমাজসেবার মাধ্যমে মুক্তি পাওয়া হয়তো তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়, চোখ গেছে বলে জ্ঞানের চর্চাও তিনি করতে পারেন না কিন্তু বহুল অভিজ্ঞতাবিদ্ধ জীবনে যে উপলব্ধির কথা গল্পে রবীন্দ্রনাথের কবিতার উদ্ধৃতির মাধ্যমে করা হয়েছে, গল্পের শেষে কোথায় গেল সেই উপলব্ধি! তাঁর নিজের চোখ গেলেও জীবন তো থেমে নেই। পরমসত্যের সেই বাণী তখন এমনি করেই বাজবে বাঁশী এই হাটে। কাটবে গো দিন আজও যেমন দিন কাটে। গল্পের শেষে আছে দুর্বলের আত্মসমর্পণ বলবানের কাছে। 'কান রয়েছে এখনো তাই ওদের কথাগুলো শুনতে পাচ্ছি, দৃষ্টি থাকলে তো ওদের ওই হাসিতে ফেটে পড়া মুখগুলোও দেখতে পেতাম।'

তর্কের খাতিরে যদি ধরে নিই যে সরোজবাসিনী পরমসত্যের বাণীই উপলব্ধি করেছেন। ঈশ্বরের করুণাকে তিনি দৃষ্টাপহরণের মধ্যে উপলব্ধি করেছেন ঠিকই। কিন্তু ঈশ্বরের করুণা তিনি উপলব্ধি করছেন এই কারণে যে অন্ধত্বের কারণে তাঁকে তিক্ত সত্যের সম্মুখীন হতে হল না-বলে। এটা তো একধরনের আত্মসমর্পণই। যার থেকে আরেক ধাপ হচ্ছে মরে গেলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। সরোজবাসিনীর অন্ধত্ব, জীবনসম্পর্কে তিক্ত অভিজ্ঞতা তাঁকে কোনো প্রজ্ঞা দান করছে না, যে-প্রজ্ঞা লাভ করলে এক মহত্ত্বে উত্তরণ ঘটত তাঁর। আগেই উল্লেখ করেছি পিতৃতান্ত্রিক সমাজে মেয়েদের এই মূল্যবোধেই অভ্যস্ত করানো হয় যে স্বামীর গৃহেই মেয়েদের সবচেয়ে সুখ, সেটাই মেয়েদের একমাত্র চাইবার বস্তু। 'নদীর চরে' গল্পের সুজাতা রান্নাঘর, ঠাকুরঘর, ভাঁড়ারঘর, খাবারঘরের চতুষ্পদী সাম্রাজ্যবেদীতেই সারাজীবন ঘুরপাক খেয়েছে এবং এটাকে কখনো অন্যায় জ্ঞান করেনি। সে দীর্ঘদিনের জন্য শয্যাশায়ী হয়ে পড়লে মামাতো বিধবা ননদ সুনীলাকে আনানো হয়। মুমূর্ষু সুজাতা সুনীলার হাতে সংসার তুলে দিয়ে শান্তিতে মরতে চায় জেনে সুনীলা মুখে প্রতিবাদ জানালেও মনে

মনে খুবই আশান্বিত হয়। সংসারের 'কন্না' করে দেবার জন্য অনেকে অনেকবার তাকে ডাকলেও সম্পূর্ণ সংসার হাতে তুলে দেবার প্রস্তাব কেউ কখনো করেনি। সুনীলার সর্বাঙ্গে অজানা স্বাদের এক রোমাঞ্চ আসে। তাই সংসারটাকে হাতের মুঠোয় আনবার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগের সাধনা শুরু করে সুনীলা। বাড়ির সমস্ত জিনিস নাকি অগোছালো নোংরা হয়ে পড়ে আছে। সেগুলো পরিষ্কার করতে, আর চাকরদের হাঁকডাক করে তটস্থ করতে আরম্ভ করে দেয় সুনীলা। রাঁধুনির চাকরি খেয়ে, চাকরকে তাড়াবার ভয় দেখিয়ে সুনীলাই যে বাড়ির সর্দার চাকরানি তা প্রতিষ্ঠা করে ফেলে। বাড়ির পুরুষ শুভেন্দু-নীলেন্দুর সম্পূর্ণ ভার সে নিয়ে নেয়, ওদের কখন কী প্রয়োজন তা ওদের আগে সুনীলাই জানে।

সুজাতা কখনো বড়ি, আচার, গুল, ঘুঁটে দেয়নি। এত রকম রান্নার কথাও জানত না। সুনীলা অবলীলায় এসব কাজ করে ফেলে, সংসারের শ্রী ফিরে আসে, নীলেন্দু-শুভেন্দুর স্বাস্থ্যও। শুভেন্দুকে বহুকাল এত উৎফুল্ল থাকতে দেখা যায়নি।

> *'সুনীলা সংসার পেয়েছে, সন্তান পেয়েছে, একটা কর্তাপুরুষের ভাতজলের অধিকার পেয়েছে। সেই পুরুষটা তার ছোট ভাই মাত্র, তাতে কি? ভাই জিনিসটাই কী কম? মুখাপেক্ষী তো? দিদি দিদি বলে হাপসে পড়ে তো?*
> *এসবের স্বাদ কবে পেয়েছে সুনীলা? আমি ছাড়া এদের আর কেউ নেই। এ কী অনাস্বাদিত আনন্দ রস! 'শেষ পর্যন্ত আমাকে ওদের দরকার হবে' এর তুল্য রোমাঞ্চ আর কী আছে? আমাকে আর কেউ অবান্তর ভাববে না, আমাকে বিদায় করবার ছুতো খুঁজবে না, বাঁকা বাঁকা কথা শুনিয়ে আমাকে বোঝাবে না 'তোমার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। ঈশ্বর তুমিই ধন্য। ...ভগবানের খেলা বৈকি। খেয়ালের খেলা নইলে সারাজীবন মরুভূমির বালিতে ফেলে রেখে এই প্রায়-প্রৌঢ়কালে সুনীলাকে কাকদিঘির মালিকানাটা দিয়ে বসলেন তিনি? শুধুই কী রান্নাঘর ভাঁড়ার ঘরের একচ্ছত্র সম্রাজ্ঞীর? আর এক পরম ঐশ্বর্য নেই? বিপত্নীক পুরুষ আর মাতৃহারা শিশুর মতো অগাধ ঐশ্বর্য আর কী আছে, সুনীলার মতো চিরবঞ্চিত বালবিধবার কাছে?"*[৫]

যখন অঘটন ঘটার মতো সুজাতার সুস্থ হয়ে ফিরে আসার খবর আসে, সুনীলার আশাভরসা ধূলিসাৎ হয়ে যায়। সে আবার তার জরাজীর্ণ শ্বশুর ভিটেতে ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়।

সুজাতা সুনীলার দ্বন্দ্বটা তা হলে কোথায়? আসলে দু'জনেরই প্রভুত্ব অর্জনের ক্ষেত্র এবং শ্রদ্ধাও একই। কে কত নিপুণভাবে দাসত্ব করতে পারছে দ্বন্দ্বটা সেই নিয়ে। সুজাতা সারাক্ষণ রান্নাঘর, ঠাকুরঘর, খাবারঘর, ভাঁড়ারঘরের চৌহদ্দিতে ঘুরপাক খেয়েছে, হাঁকডাকে অধস্তন ঠাকুর-চাকরদের তটস্থ করে রেখেছে, স্বামীপুত্রকে জীবন্ত বিগ্রহের মতো সেবা করে তাদেরকে সদানির্ভরশীল অক্ষম জীবে পরিণত করেছে। সুজাতার সাময়িক ব্যাধিগ্রস্ততায় সংসার-সেবার অধিকার সুনীলার উপর বর্তায় এবং সুনীলা প্রমাণ করে ছাড়ে যে সে

সুজাতার চেয়ে অনেক বেশি কর্মপটু। অধিকন্তর এনার্জি নিয়ে কাজ করে সুনীলা, অনেক রকম কাজ সে জানেও, করতেও পারে এবং হাঁক-ডাক করার ক্ষমতাও তার বেশি। সুনীলা নীলেন্দুর সংসারে এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করে ফেলে যে তাকে ছাড়া ওদের আর একদিনও চলবে না। সুজাতা হাসপাতালে চলে গেলে, তারপর মরে গেলে সংসার সেবার একমাত্র অধিকার সুনীলারই হয়ে যায়। সংসারের প্রতি যত আকর্ষণ সুনীলার থাক, নীলেন্দু শুভেন্দুর উপর যতখানি ক্ষমতাই সে বিস্তার করুক না কেন এই সত্যটা সুনীলা কিছুতেই অস্বীকার করতে পারে না যে সুজাতা যেহেতু নীলেন্দুর স্ত্রী এবং শুভেন্দুর মা তাই ওদের সেবা করবার প্রাথমিক অধিকার সুজাতারই। একই নিয়মে রান্নাঘর, ভাঁড়ারঘর, ঠাকুরঘর ও খাবারঘরের দখলও প্রাথমিকভাবে সুজাতার। কাজেই যখন সুজাতার ফিরে আসার খবর আসে, পূর্ব-অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই সুনীলা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারে যে যত কর্মপটু সেবিকাই সে হোক না কেন এবারে তাকে পিছু হটতে হবে। অনুপস্থিতিকালে যে-অধিকার সুজাতা সুনীলাকে দিয়ে গিয়েছিল সে পুনরাবির্ভূত হলে সুনীলা সেই অধিকার থেকে চ্যুত হবে। কারণ পিতৃতান্ত্রিক পরিবারে নারীর স্থান নির্ধারিত হবে পরিবারের কর্তাপুরুষের সঙ্গে তার সম্পর্ক কোথায় তার ভিত্তিতে। স্বামী আর পুত্রের উপস্থিতি সুস্থ কর্মক্ষম সুজাতাকে সংসারের যে পাদপীঠে রাখবে সেখানে বিধবা সুনীলার স্থান কখনোই হতে পারে না।

পিতৃতন্ত্র যে নারীর ঐক্যকে ভেঙে দিয়ে, তাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ঈর্ষা সৃষ্টি করে তাদের নিম্নস্তরের জীবে পরিণত করে এ-কথা আগেই বলেছি। আমাদের আলোচ্য দুটি গল্পেই নারীর ঐক্যকে নষ্ট করা হয়েছে। সরোজবাসিনী ও প্রতিমা দু'জনের অবস্থান যে একই জায়গায় এই কথাটা তাদের কখনোই বুঝতে দেওয়া হচ্ছে না, এমনকী গল্পের সমস্ত স্ত্রী চরিত্রই যে একই সমাজব্যবস্থার ফাঁদে জড়িত সেই চেতনাটা কিছুতেই ওদের নেই বা হতে দেওয়া হচ্ছে না। সুজাতা, সুনীলা সম্পর্কে-ও একই মন্তব্য করা চলে। দন্তাপহারক গল্পে প্রতিমার মা-ও সরোজবাসিনী সম্পর্কে নিষ্ঠুর মন্তব্য করেন পিতৃতান্ত্রিক সমাজের নিয়মেই।

দুটি গল্পেই স্থিতাবস্থার দৃষ্টিকোন থেকে পুরুষ ও মেয়েদের দেখানো হয়েছে। স্থিতাবস্থা বলতে বোঝাচ্ছি পুরুষতান্ত্রিক সমাজ এতদিন ধরে যে-দৃষ্টি থেকে পুরুষ ও মেয়েদের দেখতে অভ্যস্ত। 'দন্তাপহারক' গল্পে 'মেয়েদের সম্পর্কে মায়ামমতাহীন নিষ্ঠুর সব' 'মুখরা লীলা' ইত্যাদি বিশেষণে, বীণার চরিত্রায়নে নারীসমাজের যে জঘন্য চিত্র আঁকা হয়েছে Kate Millet একেই Sexual politics আখ্যা দিয়েছেন।[৬] অর্থাৎ সুপরিকল্পিতভাবে গল্প উপন্যাসে নারীর চরিত্র হয় সে দেবী নয় সে দানবী। দুটি গল্পেই সুপরিকল্পিতভাবে মেয়েদের অবমূল্যায়ন ঘটেছে। যে সুনীলা পরের সংসারে খাটতে এসে শেষরাতে ওঠে, মাঝরাতে শোয়, পরের জন্য এতখানি করেও সে একজন ঈর্ষাপরায়ণ, ষড়যন্ত্র পটিয়সীই থেকে যায়। লোকের বিপদে সেবা করে একরকম সমাজসেবাই করছে কিন্তু তার কোনো উত্তরণ ঘটছে না কোথাও। সে নিম্নস্তরের মানবীই থেকে যাচ্ছে।

দুটি গল্পেই দেখি ক্ষমতার ছিটেফোঁটা কীভাবে মেয়েদের নষ্ট করেছে। Essential নারীচরিত্র সম্বন্ধে লেখিকার উক্তি স্থিতাবস্থার সমর্থক। মেয়েরা বাজে কথা বলতে ভালোবাসে। মেয়েরা অবলীলায় যে-কথা বলতে পারে পুরুষ তা শুনতেও বিব্রত হয়।[৭]

অথবা নার্স মানে মেয়ে-মানুষ। এবং পরিস্থিতি বুঝতে মেয়েমানুষের পক্ষে এক বেলাই যথেষ্ট। নার্স সুজাতার কাছে সুনীলার বিরুদ্ধে বিন্দু বক্রমন্তব্য করে ঘনিষ্ঠতা অর্জন করে। দন্তাপহারক গল্পের শেষ অংশে মেয়েদের অশুভ আঁতাত নারীমুক্তির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। বিশেষ করে 'দন্তাপহারক' গল্পের মেয়েদের সভার যে কদর্য দৃশ্য দেখি তা যেন ডাইনিদের প্রেতনৃত্যের কথা মনে করিয়ে দেয়।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজ পুরুষের ত্রুটিবিচ্যুতিগুলি এক ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতেই বিচার করে। ঘরসংসারের কাজে অনভ্যস্ত পুরুষেরা কাচা কাপড় ধোপাবাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। ময়লাকাপড় বাড়িতে পড়ে থাকে। তারা জানে না চাকরবাকরকে কী করে ডান্ডা মেরে কাজ করাতে হয়। রান্নার বামুন, বাড়ির চাকরেরা ছেলের যত্ন করতে পারে না। রাঁধুনি বহাল করবার অথবা দিনরাতের জন্য ঝি রাখার প্রশ্ন ওঠে। পুরুষের অক্ষমতার প্রতি সহানুভূতিমিশ্রিত দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে ক্ষমাই প্রতিষ্ঠিত হয়। বিনয় যে বোঝে না কেন সরোজবাসিনী লীলা-রমলারা তাঁকে যেখানে বসিয়ে দিতে চায় সেখানে বসতে চান না, এর মধ্যে বিনয়ের আপেক্ষিক সরলতা উদারতাই প্রকাশ পেয়েছে। মেয়েদের মতো সে জটিল নয়, তাদের রাজনীতি সে বোঝে না। পৌরাণিক শিব যেমন আদিদেব হয়েও নিষ্ক্রিয় ব্যোমভোলা মহেশ্বর, এই গল্পের বিনয়-ও তাই।

এখানে আমাদের উল্লেখ করা উচিত যেসব রচনায় Blindness-এর মধ্যেও Insight-এ Under erasure অনেক কিছু বলা থাকে, সমালোচকের কাজ তা টেনে বার করা।[৮] সাধারণত রচনার চরিত্র হয় খুব জটিল, যে-সময়েও পরিবেশে তা রচিত হয়, রচনা একই সঙ্গে তার সমর্থক এবং সমালোচকও। রচনামাত্রই "a contradictory text, part of a complex ideological system which can be heard as offering both challenge and hostage to contemporary social conservatism."

বিনয়ও যে মেয়েদের ঠাকুমাকে কাগজ পড়ে শোনাতে বলে, ঠাকুমার ঘরে এসে বসতে বলে কিন্তু কেউ তার কথায় খুব একটা কর্ণপাত-ও করে না, বিনয় খুব একটা আশাও করে না। কেন? কারণ বিনয় জানে যে স্কুল-কলেজে বেরোবার আগে লীলা, রমলাদের পক্ষে কাগজ পড়ে শোনানো সম্ভব নয়। তাদের মা প্রতিমা যদি সারাজীবন সরোজবাসিনীর দ্বারা অবদমিত হয়েই থাকেন তা হলে তাঁরই বা কেন সহানুভূতি জন্মাবে সরোজবাসিনীর প্রতি? 'সভায় সাব্যস্ত হ'ল', 'বুড়োবুড়িরা বোঝে না' ইত্যাদি অসম্মানজ্ঞাপক ক্রিয়াপদের মধ্যে লেখিকার দৃষ্টিকোন বুঝতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু বীণা যে প্রশ্নটা তোলে যে বুড়োরা যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিনই কর্তৃত্ব ভোগ করবে কী না সেটা যতই হাস্য-পরিহাসের মধ্যে উপস্থাপিত হোক না কেন, এর আন্তরিক সত্যতাটা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। Under Erasure-এ এগুলো বলা এই কারণেই বলছি যে সরোজবাসিনীর প্রতিপক্ষের মেয়েদের কালো রং-এ আঁকতে দিয়ে লেখিকা এই সংলাপগুলি বসিয়েছেন কিন্তু তা সত্ত্বেও এর মধ্যে এমন সত্যটিই প্রকাশিত হয়েছে যা পিতৃতন্ত্রের মূলে ঘা দেয়।

সুনীলাকে বাড়িতে এনে রাখার প্রস্তাবটা যেভাবে হয় তাতে নীলেন্দুর ভোলা মহেশ্বর মূর্তিটা নয়, এর বিপরীত মূর্তিটাই আভাসিত হয়েছে। ইচ্ছে করেই সে সুজাতার কাছে 'কিছুদিনের জন্য' সুনীলাকে আনার প্রস্তাব করে। খাম অথবা পোস্টকার্ড লেখার কথা বলে

যেন সেটাই প্রধান সমস্যা। কৌশলে এমনভাবে চিঠিটা লেখে যাতে সুনীলা কিছু মনে না-করে। সুনীলা চিঠি পেয়ে যেটা ভাবতে পারে সেটা আগে থাকতে আন্দাজ করে সেই কথাটাই সাফাই করে রাখে। গল্পের মধ্যে এটাই অন্তর্দৃষ্টির মুহূর্ত, গল্পটা যেটা দেখতে পেয়েছে কিন্তু চেপে গেছে। Movement of insight —গল্পের মূল project এর সঙ্গে এই অন্তর্দৃষ্টির দূরত্ব আছে। এই কারণেই গল্পটা যে অন্তর্দৃষ্টি পেয়েছে সেটা প্রকাশ করতে পারছে না।

এই কথাগুলো এই কারণে আলোচনা করলাম যে আশাপূর্ণা দেবীকে এই গল্প দুটির মাধ্যমে পিতৃতন্ত্রের সমর্থক এটা বলেছি। কিন্তু লেখিকা যেহেতু পিতৃতন্ত্রের সমর্থনে প্রবন্ধ রচনা করছেন না, একটা বিশেষ কালের জীবনকে ফুটিয়ে তুলছেন তাই সমাজের আভ্যন্তরিক অসংগতিগুলিই তার লেখায় ফাঁকফোঁকর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে।

আজ এই প্রশ্ন ওঠা এই কারণেও স্বাভাবিক যে নারীমুক্তিবাদী তত্ত্ব আজ নানা প্রশ্ন সমাজের কাছে উত্থাপিত করেছে, যা নানাভাবে আমাদের চিন্তায় এসে ঢেউ তুলেছে। অতীতের সমাজ ইতিহাস থেকে একটি প্রথাকে আজ নারীমুক্তিবাদীরা উপমা হিসাবে ব্যবহার করতে চান।[১০] প্রথাটি এই : কোনো কোনো প্রাচীন সমাজে কুমারী মেয়ের যোনিকর্তন করে সেলাই করা হত যাতে তারা স্বেচ্ছাচারী না হতে পারে এবং যৌনসুখও কখনো অনুভব না করতে পারে। নারীতত্ত্ববাদীরা এই ঘটনাটিকে এভাবে ব্যবহার করেন যে পিতৃতান্ত্রিক সমাজে মেয়েদের কোনো নিজস্ব সত্তা থাকতে পারে না, এমনকী যৌনসুখ উপভোগের অধিকারও তার নেই। মেয়েদের সব কিছুই সেই সমাজে পুরুষের প্রয়োজনে নিয়ন্ত্রিত হবে। পুরুষ তার বিভিন্ন প্রয়োজনে নারীকে ব্যবহার করবে মাত্র। মেয়েদের মধ্যে সেই মূল্যবোধগুলিই ধরিয়ে দেওয়া হবে পিতৃতান্ত্রিক সমাজকে যেটা ধরে রাখবে। এই কারণেই সংস্কৃত/বাংলায় 'পতিব্রতা', 'সতী', 'বিধবা' শব্দগুলির কোনো পুংলিঙ্গ নেই। এটা যে থাকতে পারে এই প্রশ্নটাই কখনো উঠতে দেওয়া হয়নি। মেয়েদের দুটি মূর্তিই প্রধানভাবে সাহিত্যে দেখানো হয়েছে, হয় তারা আত্মবিলোপ করে পরিজনদের সেবা করছে, উদয়াস্ত পরিশ্রম করে ঘরকন্না করছে, চরিত্রহীন নিষ্কর্মা স্বামীর অগুনতি সন্তান ধারণ করছে, নয় রাক্ষসীর মতো সব কিছু ধ্বংস করছে। Sexual politics-এর উল্লেখ আগে করেছি।

মেয়েরা নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন যাতে না হতে পারে সেজন্য পিতৃতান্ত্রিক সমাজ নারীর ঐক্যের বিরুদ্ধে। আজকাল যে গল্প-উপন্যাসেই নারী বন্ধনকে ভেঙে দেওয়া হয়েছে তা নিয়ে নানা সন্দেহ পোষণ করা হয়েছে।[১১] নারীমুক্তিবাদের মধ্যে যদি কোনো প্রগতিশীলতা থাকে তা হলে তা সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। সেই এগোনো হবে কোনো নির্দিষ্ট তত্ত্বের ভিত্তিতে, কোনো কর্মসূচির ভিত্তিতে। সেজন্য নারীমুক্তিবাদী তত্ত্ব, সাহিত্য সমালোচনা এবং সাহিত্যের একটাই লক্ষ্য—সমাজের চেতনাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, এতদিন যে জিনিস/যে অত্যাচার, অসমতাটা সমাজের চোখে পড়েনি, সেটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া। সিমোন দ্য বোভোয়া বলেছেন, Women are not born, they are made.[১২] সমাজ তার নিজের সুবিধার জন্যই এমন কতগুলি মূল্যবোধ মেয়েদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে যার ফাঁস থেকে মেয়েরা বেরোতে পারছে না। তেমনি আছে কতগুলি

ঋণাত্মক মূল্যবোধ। মেয়েরা নীচপ্রকৃতি, কলহপটিয়সী, ষড়যন্ত্রকারিণী। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে মেয়েদের অবমূল্যায়ন নিরন্তরভাবে হয়ে চলেছে।

সমাজ যেভাবে ভাবতে অভ্যস্ত নয় সেরকম বহু চিন্তা প্রতিযুগেই সমাজকে আঘাত করেছে, তাকে ভেঙেচুরে বদলে দিয়েছে। দর্শন এবং বিজ্ঞান যখন ঈশ্বরের অস্তিত্ব নাকচ করে দিল, রেনেসাঁসের সময় যখন সমাজের দৃষ্টিকোন ঈশ্বর থেকে মানুষের উপর কেন্দ্রিত হল তখনো সভ্যতার উপরে প্রবলের ঘা পড়েছিল। পিতৃতন্ত্রের উপর নারীমুক্তিবাদের পুনঃপৌনিক আক্রমণ সমাজ গ্রহণ করতে চাইছে না কিন্তু নারীমুক্তিবাদী সমালোচনার লক্ষ্যই হচ্ছে পিতৃতান্ত্রিক শাসনকে উৎখাত করা। পুরুষমাত্রেই বলবান এবং নারীমাত্রেই অবলা এই চিন্তাপদ্ধতির মূল ছেদন করা। আজকের নারীবাদ তাই পিতৃতান্ত্রিক এবং লিঙ্গকেন্দ্রিক সমস্ত পীড়নের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত। তাই নারীমুক্তিবাদীরা বলছেন যতদিন সমাজ পিতৃতান্ত্রিক থাকবে ততদিন সমাজে নারীমুক্তিবাদের প্রয়োজনও থাকবে।

নারীমুক্তিবাদী চেতনার প্রসারের জন্য যে-লিখনপদ্ধতির উপর জোর দেওয়া হচ্ছে তা হ'ল Gynesis; Gynesis বলতে বোঝানো হয়েছে Feminity।[১৩] তৃতীয় বিশ্বের প্রবক্তা নারীমুক্তিবাদীদের চেষ্টায় মহাশ্বেতা দেবীর 'দ্রৌপদী' গল্পটি বহুধাব্যাপ্ত খ্যাতিলাভ করেছে।[১৪] 'দ্রৌপদী' গল্পটি Gynesis পদ্ধতিতে লিখিত রচনার যথাযথ উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়। রবীন্দ্রনাথের অনেক গল্পও Gynesis-এর উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যায়। এই গল্পগুলির নারীচরিত্রগুলি তাদের অবস্থার কাছে আত্মসমর্পণ করেনি, যেভাবেই হোক তা থেকে বেরিয়ে এসেছে। সেখানে নারীকে আপন ভাগ্যবিজেতার ভূমিকাতেই দেখানো হয়েছে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে আশাপূর্ণা দেবী পিতৃতান্ত্রিক সমাজের সমর্থক এটা প্রমাণ করা আমার উদ্দেশ্য নয়। তাঁর অনেক গল্প-উপন্যাস থেকে উল্টো দৃষ্টান্তই দেওয়া যায়। আমার প্রবন্ধের উদ্দেশ্য এইটাই দেখানো যে কীভাবে পিতৃতন্ত্রের মতো একটি প্রতিপত্তিশালী তত্ত্ব যার মধ্যে প্রগতিশীলতার ছিটেফোঁটাও নেই সেটা কীভাবে আশাপূর্ণা দেবীর মতো নারীমুক্তিবাদী লেখিকাকেও গ্রাস করে নেয়। একজন লেখিকা যখন তাঁর লেখার মাধ্যমে পুরুষতান্ত্রিক সমাজকেই সমর্থন করেন, যে-লেখিকার খ্যাতি নারীমুক্তিবাদী বলে, তখন অবস্থাটা একটু গোলমেলে হয়ে দাঁড়ায়। এক্ষেত্রে সমালোচকের কাজ হয় চোরাপথে সিঁদ কাটবার খবরটি লেখিকাকে সদর দরজায় এসে জানিয়ে দেওয়া। একটি রচনা সে গল্পই হোক বা উপন্যাসই হোক আমাদের বুদ্ধি, আর অনুভবের সাড়া পেতে চায়, আমরা আমাদের নিজস্ব বুদ্ধি আর অনুভবক্ষমতার সাহায্যে সাড়া দিয়ে সেই রচনার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করি। বর্তমান গল্পদুটিও আমাদের আত্মপ্রতিকৃতির খণ্ডাংশের সামনে আমাদের দাঁড় করিয়ে দেয়।

অনেক সময়ই নূতন সাহিত্যতত্ত্ব, সমাজতত্ত্বের আবির্ভাব পুরোনো লেখার স্বাদ বদলে দেয়। নূতন চিন্তা, নূতন দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম দেয় যাতে প্রাচীনকে আর প্রাচীনভাবে আমরা গ্রহণ করতে পারি না, তার অর্থই আমাদের কাছে বদলে যায়। শার্লট ব্রন্টের বিখ্যাত উপন্যাস 'জেন আয়ার'-এর ক্ষেত্রে বারবারই তা হয়েছে। ভার্জিনিয়া উলফ 'জেন আয়ার'-কে কর্কশস্বরের উপন্যাস বলে খারিজ করেছিলেন।[১৫] সত্তর দশকে নারীমুক্তিবাদী আন্দোলন

প্রবল হয়ে উঠলে পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে জেন-এর জেহাদকে গুরুত্ব দিয়ে জেন আয়ারকে আবার নূতনভাবে বিচার করা হয়। আশির দশকের নারীমুক্তিবাদীরা আবার শ্রেণি, জাতি, এবং ঔপনিবেশিকতার দৃষ্টিকোন থেকে জেন আয়ারের দর্শনকে আর ততটা প্রগতিশীল বলে মানতে চাইলেন না।[১৬]

সাহিত্যিকের কাছে নূতন মূল্যবোধ নির্মাণের একটা প্রত্যাশায় আমরা অভ্যস্ত। জানি আধুনিকোত্তর সাহিত্যিকরা এরকম প্রত্যাশাকেও বিগত যুগের ভূত বলে উড়িয়ে দেবেন। তবু আমরা এই ধারণাতেই এখনো অভ্যস্ত যে সাহিত্যিক সত্যকে দর্শন করেন এবং পাঠকের কাছে উপস্থাপিত করেন। কবি যখন লেখেন 'অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে/তব ঘৃণা তারে যেন তৃণ-সম দহে।' তখন পাঠক অন্যায়ের এমন একটা নূতন সংজ্ঞা পায় হয়তো যে-বিষয়ে আগে সে সচেতন ছিল না। ভ্রমর যখন গোবিন্দলালকে চিঠিতে লেখে 'যতদিন তুমি ভক্তির যোগ্য, ততদিন আমারও ভক্তি, যতদিন তুমি বিশ্বাসী ততদিন আমারও বিশ্বাস', বঙ্কিমচন্দ্র তখন হিন্দুসমাজের প্রাচীন মূল্যবোধকে আঘাত করে এক নূতন মূল্যবোধ তৈরি করেন। সব লেখক তাঁদের সমস্ত রচনাতেই বিগতকালীন মূল্যবোধকে ভাঙতে পারবেন সে-আশা করাও উচিত হবে না। কারণ অতীত গোপনে গোপনে ভুবনে ভুবনে কাজ করেই চলে। সমাজের সদরে যখন ভাঙচুর চলে, অন্দরের গোপন সুড়ঙ্গে তখনো অতীতের ভূত বাসা ছাড়তে চায় না। অনেক ক্ষেত্রে লেখক নিজেও হয়তো সেই নির্বীজ অতীতের উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন থাকেন না। আশাপূর্ণা দেবীর ক্ষেত্রেও এরকম ঘটা একেবারে অসম্ভব না-ও হতে পারে। 'মিত্তিরবাড়ি', 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'-র মতো রচনা যাঁর সৃষ্টি, পিতৃতন্ত্রের সঙ্গে তাঁর আপসরফা একটু বেমানান বৈকি।